কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

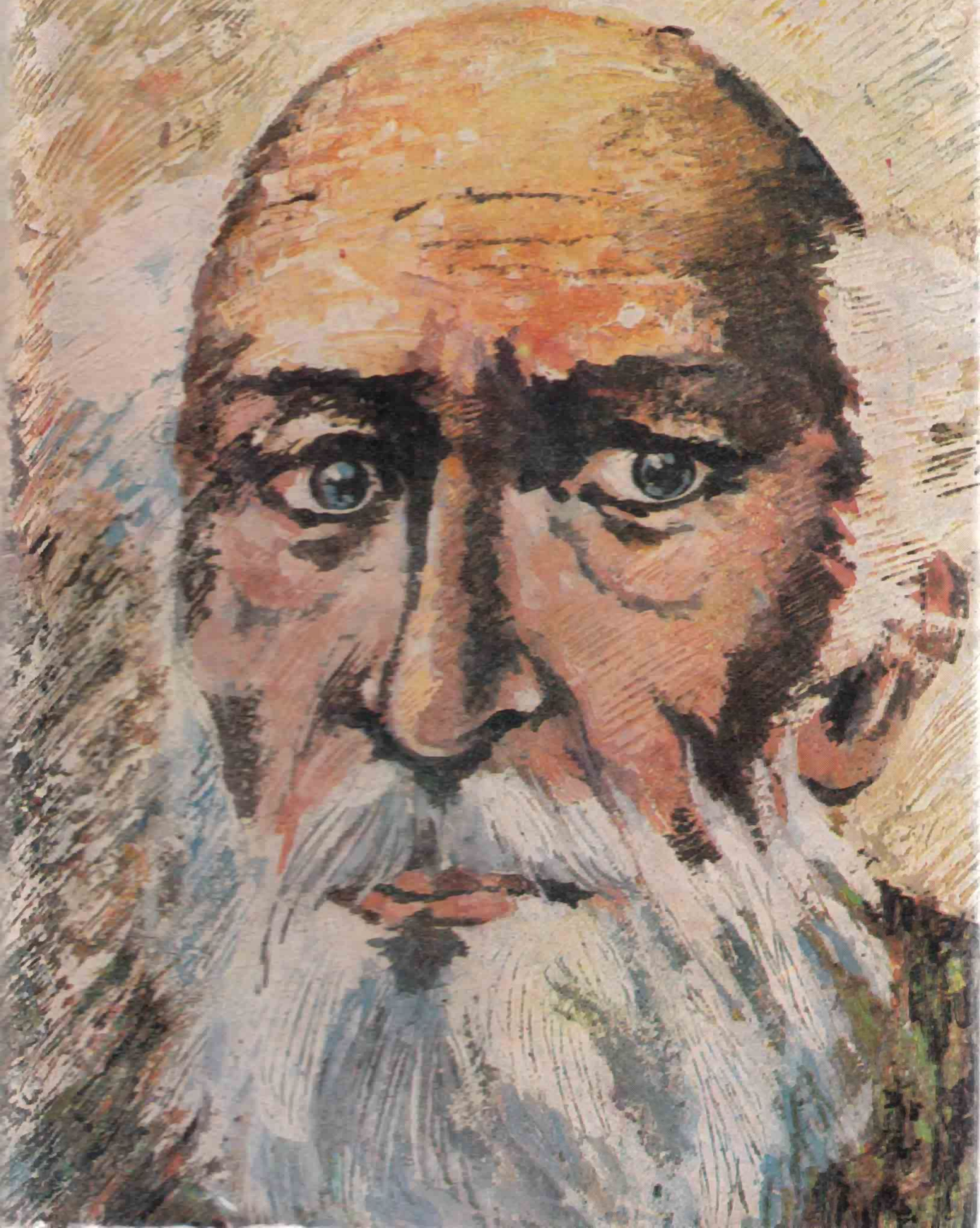

কর্নেল সমগ্র

২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচি

পাতাল-খন্দক	৩৮১
সুন্দর বিভীষিকা	৪৩৯
ম্যাকবেথের ডাইনীরা	৪৮৫
স্বর্গের বাহন	৪৯৯
বিগ্রহ রহস্য	৫৫৫
দানিয়েলকুঠির হত্যারহস্য	৬৬২
কাকচরিত্র	৭১১

পাতাল-খন্দক

॥ সূত্রপাত ॥

কানাজোল রাজ এস্টেটের মালিক রাজবাহাদুর বাপ্পাদিত্য সিং-এর দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলে দুটি যমজ। একঘণ্টা আগে-পরে তারা ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথমটির নাম রাখা হয় জয়াদিত্য, দ্বিতীয়টির নাম বিজয়াদিত্য। মেয়ের জন্ম আরও পাঁচ বছর পরে। তার নাম রাখা হয় জয়া। আশা ছিল রানী কুশলা পরের বারও কন্যা প্রসব করবেন এবং তার নাম রাখা হবে বিজয়া। কিন্তু তার আগেই কুশলা উৎকট হেঁচকি ওঠা রোগে মারা যান।

বাপ্পাদিত্যের মাথায় কেন কে জানে জয় শব্দটা ঢুকে পড়েছিল। হয়তো পার্শ্ববর্তী ভাণ্ডা এস্টেটের মালিক গৈবীনাথ ছত্রীবাহাদুরের সঙ্গে বারবার মামলায় হেরে গিয়েই।

কিন্তু জয়-বিজয়-জয়া তাঁকে বাকি জীবনে আর জেতাতে পারেনি। হতাশা আর ক্রমাগত ক্ষোভ-বিদ্বেষে স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে হতে বাপ্পাদিত্য চোখ বোজেন। তখন জয়-বিজয়ের বয়স ষোল বছর আর জয়ার বয়স এগারো বছর। তারা নাবালক হওয়ার দরুন উইল অনুসারে কানাজোল এস্টেটের ট্রাস্টি ছিলেন নায়েব বিপ্রদাস মুখুয্যে। মুখুয্যেমশাই বাঙালি। শিক্ষাদীক্ষার পক্ষপাতী। জয়-বিজয়-জয়াকে কলকাতার হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া শেখান। জয় তত মেধাবী ছিল না। বি-এটা কোনোক্রমে পাশ করে কানাজোল ফিরে যায়। বিজয় এম-এ পাশ করেছিল। আর জয়া বি-এ পড়ার সময় শরদিন্দু নামে এক বাঙালি যুবকের প্রেমে পড়ে। যুবকটি ছিল ব্যাংকের কেরানি। জয়াকে গোপনে বিয়ে করার কিছুদিন পরে নাকি ব্যাংকের ক্যাশ হাতিয়ে সে ফেরার হয়ে যায়। জয়া পুরো ঘটনা গোপন রেখেছিল। কিন্তু মনে দারুণ আঘাত পেয়ে সে বি-এ পরীক্ষার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেশে ফেরে। মুখুয্যেমশাই তখন আর ট্রাস্টি নেই। কিন্তু নীতিগত কারণে রাজপরিবারের অভিভাবক থেকে গেছেন। জয়-বিজয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে জয়ার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু জয়া জোর গলায় জানিয়ে দেয়, সে চিরকুমারী থাকবে। কারণ তার বাবা-মা দুজনেই স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে চিরকুমারী থাকার আদেশ দিয়েছিন। এদিকে জয় ও বিজয় নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে খুব অনুৎসাহী। দুজনেই শুধু বলেছিল, দেখা যাক। মুখুয্যেমশাই ও কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। তবে জয়া ছিল ছোটবেলা থেকেই

তেজী আর দুর্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকাল থেকে সে কিছুদিন শান্ত ও অমায়িক হয়ে উঠলেও কলকাতা থেকে ফিরে যাবার পর আবার পুরনো স্বভাব ফিরে পায়। তার মধ্যে কিছু পুরুষালি হাবভাবও ছিল। খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো—এসবে তার দক্ষতা ছিল। সে দাদাদের গ্রাহ্য করত না। ছোড়দা বিজয় তো নম্র স্বভাবের মানুষ। বইপত্র নিয়ে ডুবে থাকে। কবিতা লেখে। গঙ্গার ধারে টিলাপাহাড়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সবসময় তাকে কেমন উদাসীন আর ভাবুক বলে মনে হয়। তাকে জয়ার আমল না দেওয়ারই কথা। কিন্তু জয় একেবারে বিপরীত। তার সঙ্গে জয়ার স্বভাবের বাইরে বাইরে বিস্তর মিল থাকলেও সে ভেতর-ভেতর ভিতু প্রকৃতির। ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। মুখে বড় বড় কথা এবং হাঁকডাক তার যথেষ্টই, কিন্তু ভেতরে সাহসের অভাব। একবার ভাগুা এস্টেটের মালিক এবং তাদের চিরশত্রু গৈবীনাথ ছত্রীবাহাদুরকে মুখের ওপর অপমান করে এসে কিছুকাল আর বাড়ি থেকে বেরুতেই সাহস পেত না। বাড়ির ছাদে ছোট ছেলের মতো ঘুড়ি ওড়াত। কখনও পায়রা ওড়াত। তার এই একটা অদ্ভুত নেশা পাখি জন্তুজানোয়ার পোষার। বাগানের আউট হাউসে, গঙ্গার ধারে উঁচু টিলার ওপর সেই বাড়িটা প্রমোদের জন্য বানিয়ে ছিলেন বাপ্পাদিত্য। সেটাকে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিয়েছিল জয়। সেখানে ছিল একটা চিতাবাঘ, একটা হায়েনা, একটা হরিণ, একটা ময়াল সাপ আর অনেকরকমের পাখি। একটা নিউগিনির কাকাতুয়াও ছিল। জয় মাঝেমাঝে তাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরত। পরে তার মাথায় শিক্রে বাজ পোষা এবং তাই দিয়ে পাখি ধরার নেশা চাগিয়ে ওঠে। সে রাজস্থান থেকে একটা বাজপাখি পর্যন্ত আনিয়েছিল। পাখিটা পরে মারা যায়।

জয়া বড়দা জয়কেই সামান্য গ্রাহ্য করত। তবে সবসময় নয়। কিন্তু বৃদ্ধ নায়েব মুখুয্যেমশাইকে জয়া ভক্তিবশেই অগ্রাহ্য করতে পারত না। পারত না জয়ও। আর বিজয় তো নম্র প্রকৃতির এবং সাদাসিধে ধরনের যুবক। সে মুখুয্যেমশাইকে বাবার মতোই দেখত।

জয়-বিজয়ের বয়স যখন বত্রিশ আর জয়ার সাতাশ বছর, তখন এক বর্ষার রাত্রে সদর দরজার দিকে হইহল্লার শব্দ শোনা গেল। ঝিরঝির করে সারাদিন বৃষ্টি ঝরছে। রাত্রেও টিপটিপ করে ঝরার বিরাম নেই। জয় মাতাল অবস্থায় নিঃসাড় ঘুমোচ্ছিল। বিজয় তার ঘরে শুয়ে টেবিল বাতির আলোয় কবিতা লিখছিল আর জয়া তো জেগেই থাকে। প্রথমে তারই কানে গিয়েছিল হইহল্লার শব্দটা। সে দোতলার উত্তরের একটা ঘরে থাকে এবং পশ্চিমে বাড়ির ফটক। তার কানে এল, কেউ তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে।

অমনি তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। গলার স্বর চেনা মনে হয়েছিল জয়ার।

সে নীচে হন্তদন্ত নেমে এসে দেখল, হলঘর বা ড্রয়িংরুমের দরজার পর্দা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ঝামেলা দেখছে কলাবতী আর রঙ্গিয়া—তারা মা মেয়ে

রাজবাড়ির দাসী। জয়াকে দেখে তারা মুখ টিপে হাসল। জয়া তাদের সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দেখল, বিশাল হলঘরটার বাইরের দরজার মুখে দারোয়ান নছি সিং আর চাকর বুদ্ধুরাম একটা লোককে ঠেলে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। মুখুয্যেমশাই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জয়াকে দেখে চমকে উঠে বললেন, "আঃ জয়া!"

জয়া চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মেঝের মাঝামাঝি গিয়ে। বাঁদিকের কোণে সেকেলে সোফাসেট উল্টে রয়েছে। কয়েকটা চেয়ারও পড়ে আছে এদিকে-ওদিকে। জীর্ণ কার্পেটও একপ্রান্তে অনেকটা উল্টে রয়েছে। ঘরে যেন তুমুল একটা লণ্ডভণ্ড ঘটে গেছে। কাচের ঝাড়ের ভেতর সেট-করা বিদ্যুৎ-বাতিগুলো কম পাওয়ারের। তবু জয়ার চিনতে ভুল হল না। সে এগিয়ে গিয়ে নছি সিং আর বুদ্ধুরামের কাঁধ দুহাতে খামচে দুপাশে সরিয়ে দিল। তারপর লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

লোকটার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। শার্টটা গলার কাছ থেকে বুক পর্যন্ত ফালাফালা। তার প্যান্টে প্রচুর জলকাদা লেগে আছে। একপায়ে জুতো নেই—ধস্তাধস্তির সময় ছিটকে কোথায় চলে গেছে। সে জয়াকে দেখে হাসবার চেষ্টা করছিল।

জয়া কয়েক মুহূর্ত তাকে নিষ্পলক চোখে দেখার পর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, "এস"।

সে জয়ার পেছন পেছন যখন ভেতরে যাচ্ছে, মুখুয্যেমশাই গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাকলেন, "জয়া!"

জয়া ঘুরে তাঁর চোখে চোখ রেখে বলল, "আমার স্বামী"।

মুখুয্যেমশাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নছি সিং আর বুদ্ধুরাম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে রইল। ভেতরের দরজার পর্দার দুপাশে কলাবতী আর রঙ্গিয়া পুতুলের মতো প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বারান্দার চওড়া সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল বিজয়। জয়া আর যুবকটিকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, "কী রে জয়া?"

জয়া আস্তে বলল, "আমার স্বামী।" তারপর যুবকটির দিকে ঘুরে বলল, "আমার দাদা কুমার বিজয়াদিত্য নারায়ণ সিং।"

যুবকটি বিজয়ের পা ছুঁতে গেলে বিজয় ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে কয়েক-পা সরে গেল। তখন যুবকটি আহত স্বরে বলল, "প্রণাম নিলেন না দাদা? আমার নাম শরদিন্দু রায়। জয়া কলেজে পড়ার সময় আমরা বিয়ে করেছিলুম। রেজিস্টার্ড বিয়ে, দাদা! ডকুমেন্ট দেখতে চাইলে—"

জয়া তাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জয়া প্রথমে তার গালে আচমকা ঠাস করে একটা চড় মারল। শরদিন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "মারো! তুমি রাজকন্যা,

আমি রাস্তার লোক। মারবে তা তো জানি! তৈরি হয়েই এসেছি। প্রথমে দারোয়ান মেরেছে, এবার তোমার পালা।"

জয়া হিসহিস করে বললে, "কোথায় ছিলে এতদিন?"

শরদিন্দু মুখ নামিয়ে বলল, "জেলে"।

জয়া বলল, "ব্যাংকের টাকা চুরি করেছিলে কেন?"

শরদিন্দু মাথা সামান্য দুলিয়ে বলল, "আমি টাকা চুরি করিনি।"

"চুরি করোনি, অথচ খামোকা তোমাকে জেলে যেতে হল? বাজে কথা বোলো না!" জয়া একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, "না করলে তুমি গা ঢাকা দিয়েছিলে কেন?"

"প্রাণের ভয়ে।"

"তার মানে?"

শরদিন্দু করুণ হাসল। "আশ্চর্য! আমার এ অবস্থা দেখেও তুমি জেরা করতে পারছ, জয়া? কাপড়চোপড় বদলাতে দাও। একটু বিশ্রাম নিই। আর শোনো, যদি পারো, আগে অন্তত এক কাপ চা খাওয়াও। আমার প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে।"

জয়া ঠোঁট কামড়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা শ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে গেল। বাইরে সে চড়া গলায় রঙ্গিয়াকে ডেকে চায়ের কথা বলল। তারপর ফিরে এসে আলমারির মাথা থেকে ফার্স্ট এডের বাকসোটা নামাল। বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বলল, "যাও—আগে পরিষ্কার হয়ে এস।..."

কিছুক্ষণ পরে শরদিন্দু মোটামুটি ফিটফাট হয়ে বসলে জয়া তার কাটা ঠোঁটে ওষুধ লাগিয়ে প্লাস্টার সেঁটে দিল। ইতিমধ্যে রঙ্গিয়া চা দিয়ে গেছে এবং তাকে খাবার আনতে বলেছে জয়া। চা খেতে খেতে শরদিন্দু একটু হেসে বলল, "তোমাদের দারোয়ানটা বড্ড বদরাগী। ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল আমি কে, এত রাতে কেন এসেছি—তো যেই বলেছি আমি শ্বশুরবাড়ির জামাই, অমনি ব্যাটা আমার মুখে আড়াই কিলো ওজনের একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল।"

জয়া গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি চিরদিন বড্ড বোকা। এবার বলো, টাকা না চুরি করলে কেন গা ঢাকা দিয়েছিলে—তাছাড়া মিছিমিছি তোমাকে জেলে যেতে হল কেন? আর কেনই বা তুমি আমাকে সেকথা জানালে না?"

শরদিন্দু পকেট থেকে তোবড়ানো একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, "লজ্জায়। তুমি কী-ভাবতে!"

"আশ্চর্য তোমার লজ্জা তো!" জয়া ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ফের বলল, "আজ হঠাৎ এভাবে আমার কাছে আসতে তোমার লজ্জা হল না—অথচ এই পাঁচটা বছরে অন্তত একটা চিঠি লিখতেও লজ্জা হল! আমি বিশ্বাস করি না।"

শরদিন্দু জেল থেকে বেরিয়ে আজই চুল-দাড়ি কামিয়েছিল। তাকে জয়া আগের তুলনায় সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান দেখছিল। হয়তো জেলে থাকলে মানুষের শরীরে একটা রূপান্তর ঘটে যায়। শরদিন্দু বলল, "তখন তোমাকে বলেছিলাম— নেহাত প্রাণের ভয়ে।"

"বুঝলাম না!"

শরদিন্দু একটু চুপ করে থেকে চাপা স্বরে বলল, "আশা করি তোমার সঙ্গে আমার শেষবার দেখার তারিখটা মনে আছে। ১৭ আগস্ট, সন্ধ্যাবেলা। সেদিন শনিবার ছিল। ম্যাটিনি শো দেখে দুজনে পেটপুরে ধোসা খেলুম। তারপর তুমি গেলে তোমার হোস্টেলে। আমি ফিরলুম মেসে। ফিরেই একটা বেনামী চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, আমি যেন পরদিন সকালে কলকাতা ছেড়ে চলে যাই। কলকাতায় থাকলেই আমাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।"

"তুমি পুলিশের কাছে গেলে না কেন? আমাকেই বা জানালে না কেন?"

"ভয়ে মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া পুলিসকে কিছু জানাতে নিষেধ করা হয়েছিল চিঠিতে। আমি পরদিনই বর্ধমানে আমাদের বাড়ি চলে গিয়েছিলুম। ২১ আগস্ট বাইরে থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরে শুনি, আমার খোঁজে পুলিস এসেছিল। এদিকে কাগজে খবর বেরিয়েছে, ফেডারেল ব্যাংকের কাশ থেকে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা উধাও। ব্যাংকের এক কর্মী বেপাত্তা। বোঝো কী অবস্থা! সঙ্গে সঙ্গে আমি বেনামী চিঠির রহস্য বুঝে গেলুম। কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সেই চিঠিটা বের করে দেখি, একেবারে শাদা কাগজ মাত্র। কালিতে লেখা হরফ উবে গেছে।"

জয়া দমআটকানো গলায় বলল, "তারপর?"

"আমার আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই দেখে গা ঢাকা দিলুম। কলকাতা যাওয়ার সাহস তো আর ছিলই না। জব্বলপুরে মামার বাড়ি কিছুদিন, তারপর বোম্বেতে এক বন্ধুর বাড়ি—শেষে দিল্লি চলে গেলুম। দিল্লিতে—"

জয়া বাধা দিয়ে বলল, "তুমি কানাজোলে আমাদের বাড়ি চলে এলে না কেন?"

শরদিন্দু একটি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "কোন মুখে আসব? কাগজে তখন ব্যাংক-চোর ফেরারী আসামি শরদিন্দু রায়ের নামে হুলিয়া ছাপানো হয়েছে। দিল্লিতে পুলিস আমাকে অ্যারেস্ট করেছিল। মাসখানেক কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে মামলা চলার পর পাঁচ বছর জেলের হুকুম হল। হাজতে থাকার সময় খুব আশা করতাম, তুমি অন্তত কাগজ পড়ে জানবে এবং দেখা করতে আসবে। অন্তত এখন যেমন কৈফিয়ত চাইছ, তেমনি কৈফিয়ত চাইতেও হাজতে ছুটে আসবে ভেবেছিলুম। তুমি আসনি।"

জয়া শ্বাস ফেলে বলল, "আমি কিছু জানতুম না। কারণ তখন আমি কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি। তবে কলকাতায় থাকার সময় কাগজে একদিন দেখেছিলুম ফেডারেল ব্যাংক থেকে টাকা চুরির খবর। একটু সন্দেহ হয়েছিল

তোমাকে—কারণ তুমি নিপাত্তা। তবে এতখানি ভাবিনি। বিশ্বাস করিনি, তুমি সত্যি টাকা চুরি করেছ।"

শরদিন্দু একটু হেসে বলল, "করলে ভালই হত দেখছি। দিব্যি জেল খেটে এসে এখন সে-টাকায় বাবুগিরি করা যেত।"

জয়া আস্তে বলল, "তোমাকে ফাঁদে ফেলেছিল কেউ, কিন্তু কাউকে তোমার সন্দেহ হয়নি?"

শরদিন্দু আস্তে বলল, "বুঝতে পারিনি—এখনও পারি না। কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চের ক্যাশ ডিপার্টে আমার কলিগ ছিল চারজন। ভূপেশ, মণিশংকর, গোপাল নায়ার নামে একজন কেরলি—তাকে খুব সৎ মনে হত, আর ছিল পরিতোষ। সবাই আমার সমবয়সী। পরস্পর বন্ধুত্বও ছিল। তবে আমার সন্দেহ পরিতোষই আমাকে বিপদে ফেলেছিল।"

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখি, তোমার খাবার ব্যবস্থা করল নাকি..."

॥ অন্ধ প্রজাপতি ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ইলিয়ট রোডে অবস্থিত 'সানি লজ' নামে তিনতলা বাড়িটির ছাদে তাঁর 'প্ল্যান্টওয়ার্ল্ডে' একটি ফুলবতী অর্কিডের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। কদিন বৃষ্টির পর আজ সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। সবে সূর্য উঠেছে। শরতকালের সকালের রোদ কলকাতায় স্বরূপ হারিয়ে ফেলে, আবহমণ্ডলের যা দুরবস্থা! কর্নেল ভাবছিলেন এই নীল-লাল অর্কিডফুল আগুনের মতো দেখাত। মনে পড়ছিল, গত শরতে ভীমগোলা জঙ্গলে এই অর্কিডের ফুল দেখেছিলেন—যেন জঙ্গল দাউদাউ জ্বলছে মনে হচ্ছিল। কলকাতা কী যে হয়ে গেল দিনে দিনে!

ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ সিঁড়ির মাথায় মুখ বের করে বলল, "বাবামশাই! এক ভদ্রলোক এয়েছেন।"

কর্নেল তার দিকে না ঘুরেই বললেন, "ধুতি-পাঞ্জাবি-জহর-কোট। কাঁধে কাপড়ের থলে। চোখে কালো চশমা। মুখে দাড়ি।"

ষষ্ঠীর দাঁত বেরিয়ে গেল। "আজ্ঞে, আজ্ঞে!"

"মাথায় বড়-বড় চুল। ফর্সা রঙ। খাড়া নাক।" বলে কর্নেল ঘুরলেন তার দিকে।

এবার ষষ্ঠী হাঁ করে ফেলেছে। তার চোখ বড়ো হয়ে গেছে। কর্নেল হাতের খুরপিটা রেখে গ্লাভস খুলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। মুচকি হেসে বললেন, "আমার চোখের দৃষ্টি দেয়াল-কংক্রিট সব ফুড়ে চলে যায়। কাজেই ষষ্ঠী, সাবধান! তাছাড়া তুই একটু আগে আবার প্রজাপতিটাকে ধরে পরীক্ষা করে দেখছিলি যে আমার কথা সত্যি কি না—তার মানে প্রজাপতিটা সত্যিই কানা কি না।"

এ পর্যন্ত শুনে ষষ্ঠী জিভ কেটে বলল, "না, না। শুধু একটুখানি ছুঁয়েছিলাম। দেখতে বড় ভাল লাগে না বাবামশাই? কিন্তু আপনি কথাটা আন্দাজেই বলছেন। কেমন করে জানলেন, আগে শুনি?"

মাঝেমাঝে ষষ্ঠী কর্নেলকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "ওরে হতভাগা! তোর আঙুলে প্রজাপতিটার ডানার রঙ মেখে আছে—ওই দ্যাখ!"

"ওঃ হো!" ষষ্ঠী তার আঙুল দেখে লাফিয়ে উঠল। একগাল হেসে বলল, "আপনার নজর আছে বটে বাবামশাই! কিন্তু ওই ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন কী করে?"

কর্নেল মৃদু হেসে চাপা গলায় বললেন, "একটু আগে ওই নিমগাছ থেকে একঝাঁক কাক এসেছিল। তাড়াতে গিয়ে দেখলুম, নিচের রাস্তায় এক ভদ্রলোক বাড়ির দিকে তাকিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাদের কার্নিশে আমাকে দেখতে পেয়েই রাস্তা পেরিয়ে আসতে থাকলেন হন্তদন্তভাবে। কাজেই..."

ষষ্ঠী তারিফ করে বলল, "ওরে বাবা! আপনার সবদিকেই চোখ!..."

একটু পরে কর্নেল গার্ডেনিং-স্যুট ছেড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে নমস্কার করে বলে উঠলেন, "আশা করি, কানাজোল রাজবাড়ির ছোট কুমারবাহাদুরকে দেখছি।"

আগন্তুক বিজয় ভীষণ অবাক হয়ে বলল, "আশ্চর্য তো!"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু নয় কুমারবাহাদুর। এযুগে খবরের কাগজে দূরকে কাছে আর অচেনাকে চেনা করে দেয়।"

বিজয় বলল, "হ্যাঁ—কাগজে খবর বেরিয়েছিল বটে! কিন্তু যে ছবিটা ছাপা হয়েছিল, তাতে তো আমি ছিলাম না। আমার দাদা জয়ের ছবি ছিল, চিতাবাঘটার খাঁচার পাশে দাঁড়ানো। আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, দাদাকে দেখে আমাকে চেনা তো কঠিনই। কারণ আমার মুখে দাড়ি আছে। আমরা যমজ ভাই হলেও—"

কর্নেল তাকে থামিয়ে নিজের শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "আমাকে অহংকারী ভাববেন না কুমারবাহাদুর! প্রকৃতি কোনো দুর্বোধ্য কারণে আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে সাধারণ মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ করে দিয়েছেন। কোনো মানুষের মুখ—তা সে ছবিতেই হোক, আর বাস্তবে, যদি কোনো কারণে আমার লক্ষ্যবস্তু হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখের একটা পৃথক ফিচার বলুন বা বৈশিষ্ট্য বলুন, আমার দৃষ্টির ফিল্টারে ছেঁকে তার নিখুঁত নিজস্বতা নিয়ে স্মৃতিতে ঢুকে যায়। আপনার দাদার মুখের সেই পৃথক নিজস্বতা স্মৃতিতে এখনও টাটকা বলেই আপনাকে দেখামাত্র সনাক্ত করে ফেলেছি। তাছাড়া খবরসহ কাগজে বেরিয়েছে মাত্র গত সপ্তাহে। ছবিতে বড় কুমারবাহাদুরের মুখে দাড়ি ছিল না। দ্বিতীয়ত, যিনি চিতাবাঘ বা জন্তুজানোয়ার পোষেন, যিনি শিকারী এবং স্বাস্থ্যচর্চাও করেন,

তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি-জহরকোট পরে অমায়িকভাবে সোফায় বসে থাকবেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, এবার বলুন কুমারবাহাদুর, আপনার জন্য কী করতে পারি?"

বিজয় সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে আমাকে কুমারবাহাদুর বলবেন না। বিজয় বলে ডাকলে খুশি হবো। আমাকে তুমি বললে আরও ভাল লাগবে।"

ষষ্ঠী কফি ও স্ন্যাকসের প্লেট রেখে অভ্যাসমতো আগন্তুককে আড়চোখে দেখতে দেখতে ভেতরে চলে গেল এবং অভ্যাসমতোই পর্দার ফাঁকে একটা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল ডাইনিং ঘরের দরজার ওপাশে।

কর্নেল এটা জানেন। তাই চোখ কটমটিয়ে সেদিকে তাকালে ষষ্ঠি সরে গেল। কর্নেল বিজয়ের হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "মর্গের রিপোর্টে তো বলেছে চিতার নখের আঘাতেই মৃত্যু। খবরের কাগজে পড়ে যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হচ্ছে, সেটাই সম্ভব। তাছাড়া তোমার ভগ্নীপতি শরদিন্দুবাবুর পেটে নাকি অ্যালকোহলও পাওয়া গেছে। মাতাল অবস্থায় রাত দুপুরে গিয়ে চিতার খাঁচা খুলে দিয়েছিলেন নাকি। তাহলে আর সন্দেহ কিসের?"

বিজয় কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "জয়া বিশ্বাস করে না। জয়া—আমাদের একমাত্র বোন।"

"কাগজে তোমাদের পারিবারিক পরিচয় বেরিয়েছিল। পড়েছি।"

"হ্যাঁ স্ক্যান্ডাল রটানোর সুযোগ পেলে আজকাল খবরের কাগজ মেতে ওঠে।" বিজয় দুঃখিত হয়ে বলল।..."জয়া-শরদিন্দুর ব্যাপারটা নিয়ে কেচ্ছার চূড়ান্ত করেছে। শরদিন্দু ব্যাংকের টাকা চুরি করে জেল খেটেছিল, তাও লিখেছে। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।"

"জয়া কেন বিশ্বাস করে না যে স্বামীর মৃত্যু চিতার আক্রমণে—"

বাধা দিয়ে বিজয় বলল, "জয়া খুব জেদী। তার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে তাই নিয়ে চূড়ান্ত করে ছাড়ে।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "মাথায় তোমারও সম্ভবত কিছু ঢুকে থাকবে। তা নাহলে তুমি ছুটে আসতে না।"

বিজয়কে একটু চঞ্চল ও উত্তেজিত দেখাল। চাপা স্বরে বলল, "শরদিন্দুর মৃত্যু নিয়ে আমারও সন্দেহ আছে। তবে আমি আরও এসেছি দাদার ব্যাপারে।"

কর্নেল সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "হুঁ—বলো!"

"দাদা কিছু দিন যাবৎ মনমরা হয়ে গেছে। জিগ্যেস করলে বলে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। তার নাকি সবসময় মনে হচ্ছে, সুইসাইড করে ফেলবে।"

"তোমাকে তাই বলছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। কিছু জিগ্যেস করলে পরিষ্কার কোনো জবাব দেয় না। খালি বলে, দেখবি বিজয়, কখন আমি সুইসাইড করে বসেছি।"

"জয়া জানে এ কথা?"

"না। জয়া দাদার সঙ্গে কথা বলে না। কারণ দাদা চিতাটাকে মেরে ফেলতে চায়নি।"

"তুমি ছাড়া আর কাউকে বলেছে সে?"

"না। আর কাউকে বলতে নিষেধও করেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "কিন্তু আমি তো সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার নই। আমার কাছে কেন এসেছ?"

বিজয় আরও চাপা স্বরে বলল, "পরশু অনেক রাতে একবার বেরিয়েছিলুম ঘর থেকে। আমি রাত দুটো অব্দি জেগে লেখাপড়া করি। কবিতা লেখার নেশা আছে। তবে কোনো কাগজে ছাপতে পাঠাই না। নেশায় লিখি। তো একটা লাইন লিখে পরের লাইনটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। তাই ভাবলুম, একবার গিয়ে খোলামেলায় দাঁড়াই। রাতের আকাশ দেখে যদি পরের লাইনটা মাথায় আসে। সিঁড়িতে নামার মুখে দাদার ঘরের জানালায় আলো দেখে একটু অবাক হলুম। দাদা রাত্রে মদ খায়। তারপর নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য মাতলামি করে না কখনও। কিন্তু দাদার ঘরে আলো দেখে তারপরই আমার আতঙ্ক হল, সুইসাইড করে ফেলল নাকি—তা না হলে আলো কেন এখনও? দরজার কাছে যেতেই কানে এল, দাদা কার সঙ্গে যেন চাপাগলায় কথা বলছে। ভীষণ অবাক হয়ে দরজার কড়া নেড়ে ডাকলুম ওকে। অমনি ঘরের আলো নিভে গেল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে আর সাড়াই পেলুম না। আমার ডাকাডাকিতে জয়া তার ঘর থেকে বেরিয়ে জানতে চাইল, কী হয়েছে? ব্যাপারটা বললে সে বলল, "ছেড়ে দাও। শুয়ে পড়ো গে।" কিন্তু আমি তো ভুল শুনিনি। যাই হোক, দক্ষিণের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি, সবে শুক্লপক্ষের চাঁদটা উঠেছে, সেই ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখলুম, দাদার ঘরের ও পাশের ব্যালকনির লাগোয়া ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে যাচ্ছে। ওদিকটায় গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম "জয় নাকি?" লোকটা জবাব না দিয়ে জোরে নামতে থাকল। তারপর বাগানের দিকে দৌড়ে চলে গেল। তখন আচমকা মনে পড়ল, দাদার ম্যাস্টিক কুকুরটা এই ব্যালকনিতে বাঁধা থাকে। সে কেন চুপচাপ আছে? যাই হোক, সকালে দাদাকে ব্যাপারটা জিগ্যেস করলে বলল, "কই! আমি তো কিছু জানি না। ছপেগ হুইস্কি টেনে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলুম"...তাহলে দেখুন কর্নেল, ব্যাপারটা বড় রহস্যময় কি না।"

শুনতে শুনতে কর্নেল অভ্যাসমতো পর্যায়ক্রমে টাক ও দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন এবং চোখদুটি ছিল বন্ধ। হঠাৎ উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডানপাশে একটা র‍্যাকের মাথায় টবে রাখা একটা ফুলন্ত সিঙ্কেসিয়া লতার ওপর। তারপর

কী একটা ধরে ফেললেন খপ করে। গর্জন করে ডাকলেন, "ষষ্ঠী! অ্যাই হতচ্ছাড়া!"

বিজয় হকচকিয়ে গিয়েছিল কাণ্ড দেখে। চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। ষষ্ঠীর সাড়া পাওয়া গেল না। কর্নেল গজগজ করছিলেন, "তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, ব্যাটাচ্ছেলে একটা গণ্ডগোল বাধিয়েছে। ওতে আঙুলে ছোপ দেখেও তলিয়ে ভাবিনি। আসলে আমার মন তখন বিজয়ের সঙ্গে আলাপের জন্য ব্যগ্র! হতভাগা বাঁদর! উল্লুক!"

বিজয় বলল, "কী হয়েছে কর্নেল?"

কর্নেল তাঁর হাতে ধরা একটা প্রজাপতি দেখিয়ে বললেন, "ভাগ্যিস এসব প্রজাপতি জন্মান্ধ। আর ফুলের টবটা এখানে ছিল। নইলে দেওয়াল হাতড়ে-হাতড়ে ঠিক জানালার খোঁজ পেত আর উড়ে চলে যেত। ষষ্ঠী নিশ্চয় কাচের খাঁচার ঢাকনা খুলেছিল। রোসো, দেখাচ্ছি মজা!"

বিজয় বলল, "কর্নেল! প্রজাপতিটা পালিয়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না। কানাজোলে গঙ্গার ধারে টিলাপাহাড়ের ঝোপে অবিকল এইসব প্রজাপতি প্রচুর দেখেছি। তবে ওরা অন্ধ, তা জানি না।"

কর্নেল কোনার দিকে সচ্ছিদ্র কাচের খাঁচায় প্রজাপতিটা ঢুকিয়ে রেখে এসে বললেন, "এই প্রজাপতি প্রকৃতির এক বিস্ময়। চোখ নামে কোনো ইন্দ্রিয় এদের নেই। শুঁড় দিয়েই ঘ্রাণের সাহায্যে এরা উড়ে বেড়াতে পারে। কানাজোলে এসব প্রজাপতি সত্যিই কি তুমি দেখেছ?"

"মনে হচ্ছে। ডানার ওপরটা লাল, তলাটা কালো আর হলুদ, শুঁড়গুলো লম্বাটে—"

কর্নেল হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, "তাহলে তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব। তোমার দাদার রহস্যের চেয়ে প্রজাপতিগুলোর রহস্য আমার কাছে অনেক বেশি জোরালো। তবে যাবার আগে ষষ্ঠী হনুমানটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যাব।"

এতক্ষণে ষষ্ঠী নেপথ্য থেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "মরার মতো পড়ে আছে দেখে রেকজামিং করতে গিয়েছিলুম। আমার কী? এরপর কেউ মরে পড়ে থাকলে তাকিয়েও দেখব না। তখন যেন বলবেন না, কেন খবর দিসনি? কেনই বা রেকজামিং করিসনি?—হুঁ, তখন আর বলতে আসবেন না যেন।"

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। "না, না। রেকজামিং করবি বৈকি। তবে ঢাকনা খুলবিনে। সাবধান!"

বিজয় অবাক হয়ে বলল, "কর্নেল, রেকজামিং জিনিসটা কী?"

কর্নেল আরও হেসে বললেন, "বুঝলে না? ওটা আমার ষষ্ঠীর ইংলিশ। একজামিন—পরীক্ষা—ষষ্ঠীর এমন অজস্র ইংলিশ আছে।"

॥ কালো মুখোশ ॥

বিপ্রদাস মুখুয্যে রাজবাড়ির একতলায় ড্রয়িং রুম বা হলঘরের পাশের ঘরে থাকেন। চিরকুমার বলেই তাঁকে সবাই জানেন। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু এখনও শক্তসামর্থ মানুষ। স্বপাক খান। নিত্য প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস আছে। সকালে বাইরে থেকে হাঁটাচলা করে এসে ঘরে ঢুকেছেন, এমন সময় জয়া এল।

জয়া বলল, "কাল রাত্তিরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু ভীষণ মাথা ধরার জন্য চুপচাপ শুয়েছিলুম। রাগ করেননি তো?"

বিপ্রদাস একটু হেসে সস্নেহে বললেন, "তোমার ওপর রাগ কখনও যে হয়নি, এমন কথা বলব না। তবে কাল রাত্তিরের জন্য রাগ করিনি। রঙ্গিয়া বলেছিল, তোমার শরীর খারাপ।"

জয়া আস্তে বলল, "কেন ডেকেছিলেন কাকাবাবু?"

বিপ্রদাস গম্ভীর হয়ে জানালার বাইরে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকার পর বললেন, "তুমি কলকাতা থেকে একজন ডিটেকটিভ আনিয়েছ—"

জয়া দ্রুত বলল, "ডিটেকটিভ! কে ডিটেকটিভ?"

"সে কী! তুমি—তাহলে যে বিজয় বলল, তুমিই বলেছিলে ওকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ আনিয়ে শরদিন্দুর মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করতে! তাই সে ওই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছে।"

জয়া অবাক হয়ে বলল, "ওই বুড়ো ভদ্রলোক বুঝি ডিটেকটিভ? ছোড়দা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে সাম কর্নেল বলে। উনি নাকি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার। পাখিপ্রজাপতি এসব নিয়ে প্রচণ্ড হবি। কানাজোলে নাকি কানা প্রজাপতি আছে। তাই দেখতে এসেছেন। তবে কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। প্রজাপতি কি কানা হয়?"

বিপ্রদাস হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "কাল সন্ধ্যায় বিজয়ের সঙ্গে এসেছেন ভদ্রলোক। সামান্য আলাপ হয়েছে। তখন ভেবেছিলুম বিজয়ের পরিচিত উনি। কানাজোলে বেড়াতে এসেছেন ওর সঙ্গে। পরে বিজয় আমাকে চুপিচুপি বলল, ভদ্রলোক বিখ্যাত ডিটেকটিভ। তোমারই তাগিদে শরদিন্দুর ব্যাপারটা—যাই হোক, তুমি যখন কিছু জানো না, তখন বুঝতে পারছি, শরদিন্দুর মৃত্যু সম্পর্কে বিজয়ের মনে কোনো সন্দেহ আছে।"

"সন্দেহ তো আমারও আছে!" জয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল। "কিন্তু সেজন্য গোয়েন্দা ডাকার কথা আমি ভাবিনি। ছোড়দা কেন মিথ্যে বলল আপনাকে? সত্যি কথাটা বলতে পারত।"

"হয়তো আমি ওকে বকব ভেবে তোমার নাম করেছে।"

"আমাকে বুঝি আপনি বকতে পারেন না?"

বিপ্রদাস একটু হাসলেন, "পারি। কিন্তু বকলেও তো তুমি আমার কথা

শুনবে না! তাই বিজয় তোমার নাম করেছে। যাই হোক, এ নিয়ে আর মাথাব্যথা করে লাভ নেই। ছেড়ে দাও।"

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "ব্যাপারটা টের পেলে বড়দা ভীষণ রাগ করবে। আমার ভয় হচ্ছে, বড়দা ওই ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে না অপমান করে বসে।"

বিপ্রদাস গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ—তাও ঠিক। আমার মতে, জয়কে কথাটা বোলো না। আমিও বলব না। আর বিজয়কেও নিষেধ করে দেব। ওকে একবার পাঠিয়ে দাও তো!"

"ছোড়দা কর্নেল ভদ্রলোককে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ভোরে। এখনও ফেরেনি।"

বিপ্রদাস স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন, "হুঁ—কানাপ্রজাপতি দেখাতে।"

জয়া চলে আসছিল। বিপ্রদাস হঠাৎ ডাকলেন, "জয়া শোনো!"

জয়া ঘুরে দাঁড়াল।

বিপ্রদাস একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি দুদিনের জন্য একটু ভাগলপুর যাব। জরুরি দরকার। একটা জিনিস তোমার কাছে রেখে যেতে চাই। জিনিসটা খুব দামি। তুমি গোপনে লুকিয়ে রাখবে। কেমন?"

জয়া মাথাটা একটু দোলাল, বলল, "আপনি কখন যাবেন?"

"এখনই।" বলে বিপ্রদাস তাঁর হাফহাতা পাঞ্জাবিটা তুলে কোটের কাছ থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে চাপা স্বরে বললেন, "এক্ষুনি লুকিয়ে ফেলো। সাবধান!"

জয়ার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। দম আটকানো তার হাত একটু-একটু কাঁপছিল। সে ভেলভেটমোড়া শক্ত এবং ছোট্ট কৌটোটা ব্লাউসের ভেতর চালান করে দিল।

বিপ্রদাস আস্তে বললেন, "ঠিক আছে লুকিয়ে রাখোগে। সাবধান!" বলে ব্যস্তভাবে একটা স্যুটকেস গোছাতে থাকলেন। জয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অন্দরমহলের ভেতরকার প্রাঙ্গণে ইঁদারা থেকে জল তুলছিল রঙ্গিয়া। সে জয়াকে লক্ষ্য করছিল না। কলাবতী রান্নাশালে বৈজু ঠাকুরের সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক করছিল, তারাও লক্ষ্য করল না। রাজবাড়ি এই সকালে খুবই স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। পায়রার বকবকম, কলাবতী-বৈজুর তর্ক, ইঁদারায় বালতির শব্দ সেই গভীর স্তব্ধতায় কোনো আঁচড় কাটতেই পারছিল না।

দোতলায় গিয়ে জয়া বড়দা জয়ের ঘরের দিকে তাকাল। জয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। জয়ের এখন 'চিড়িয়াখানায়' থাকার কথা। নিজের ঘরে ঢুকে জয়া নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করল। তারপর তার ইচ্ছে হল, কৌটোটা খুলে দেখে নেয় দামি জিনিসটা কী। কিন্তু লোভ সংবরণ করল অতি কষ্টে। সে ঠোঁট কামড়ে ভাবতে থাকল, এটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে।

জয়া গণ্ডগোলে পড়েছিল। যেখানে রাখতে যায়, মনে হয়, সেখানটা তত

নিরাপদ নয়। আলমারির লকার, পুরনো আমলের সিন্দুক, দেয়ালের গুপ্ত তাক, পালঙ্কের শিয়রের তলার বাকসো,—কোনো জায়গাই তার মনঃপূত হচ্ছিল না।

ঠিক সেই সময় দরজায় কেউ টোকা দিল। অমনি জয়া ঝটপট কৌটটা আবার ব্লাউসের ভেতর লুকিয়ে ফেলল! রাত্রে হলে সে জিগ্যেস না করে দরজা খুলত না। কিন্তু এখন সকাল প্রায় নটা। তাছাড়া এভাবে তার দাদারাই দরজায় নক করে তাকে ডাকতে পারে, যদিও সেকথা জয়া সে-মুহূর্তে ভাবল না। সে বরং বিরক্ত হয়েছিল। কিছুটা খাপ্পাও হয়েছিল। সেই ঝোঁকেই দরজা খুলে দিল।

দরজার ভারী পর্দা ফাঁক করতে গিয়ে জয়া বুকে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল। টাল সামলানোর মুহূর্তে সে লোকটাকে একপলক দেখে নিল। ছাইরঙা স্পোর্টিং গেঞ্জির ওপর কালো একটা কুৎসিত মুখোশ। ঘরের ভেতরটা আবছা বলে এক সেকেন্ডের জন্য এর বেশি কিছু দেখা সম্ভব হল না এবং পরের মুহূর্তে ঝাঁঝালো অথচ মিঠে একটা গন্ধ টের পেল জয়া। তারপর অতল শূন্যতায় তলিয়ে গেল সে।

॥ বোবা কাকাতুয়া ॥

গঙ্গার পাড় ধরে ছোট্ট টিলার ওপর রাজবাড়ির আউটহাউসে বা জয়ের চিড়িয়াখানার দিকে হেঁটে আসছিলেন কর্নেল আর বিজয়। ওদিকটায় রাজবাড়ির বাগানে ঢোকার ছোট্ট ফটকটা বহুকাল আগে বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশে একখানে পাঁচিলের খানিকটা ধসে গেছে। বিজয় বলল, "দেখুন কর্নেল, এখানটা দিয়ে ঢুকতে পারবেন নাকি?"

কর্নেল প্রকাণ্ড মানুষ। এখন তাঁর প্রশস্ত টাক ঢেকে ধূসর টুপি। গলায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। পিঠে ছোট্ট কিটব্যাগ আটকানো। হাতে ছড়ির মতো দেখতে প্রজাপতি ধরা জালের হ্যান্ডেল। চোখে সানগ্লাস। বিজয়ের পর কাত হয়ে পাঁচিলের ফোকর গলে ভেতর ঢুকতেই ঘ্রাউ ঘ্রাউ করে উঠল কোথায় একটা কুকুর। বিজয় চাপা গলায় বলল, "সর্বনাশ! দাদার কুকুরটা ছাড়া আছে দেখছি।"

কর্নেল দেখলেন, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে টিলার আউটহাউস থেকে শাদারঙের লম্বাটে একটা কুকুর নেমে আসছে। বিজয় জোরালো শিস দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল, "জয়! তোমার কুকুর সামলাও!"

কোনো সাড়া এল না। বিজয় বলল, "থাক কর্নেল! জয়ের চিড়িয়াখানায় পরে যাওয়া যাবে। চলুন, আমরা বাগানের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরি।"

কর্নেল একটু হেসে পিঠের কিটব্যাগের চেন খুলে একটা টিউবের গড়নের শিশি বের করলেন। তারপর বললেন "এস বিজয়! তোমাকে একটা ম্যাজিক দেখাই।"

বিজয় ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ওদিকে যাবেন না কর্নেল! সনি আমাকেও খাতির করে না। ও একটা সাংঘাতিক কুকুর।"

কর্নেল গ্রাহ্য না করে টিলায় উঠতে থাকলেন। টিলার গায়ে প্রচুর ঝোপঝাড়। কিন্তু তার মধ্যে অসংখ্য ঝোপ যে ফুল বা সৌন্দর্যের খাতিরে একসময় বাপ্পাদিত্য লাগিয়েছিলেন, তা বোঝা যায়। অযত্নে সেগুলো এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি মারছে এখনও কিছু ভাঙাচোরা ভাস্কর্যও। কোথাও-কোথাও নানাগড়নের পাথরও দেখা যাচ্ছে। কুকুরটা একলাফে সামনের একটা পাথরে এসে পৌঁছেছিল। তারপর কর্নেলের দিকে ঝাঁপিয়ে এল। বিজয় একটু তফাত থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কর্নেল! চলে আসুন! চলে আসুন!"

তারপর সে দেখল, কর্নেল সেই টিউব-শিশির ছিপি খুলে এগিয়ে গেলেন। অমনি একটা মিরাকল ঘটে গেল যেন। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল এবং লেজ গুটিয়ে কুঁউ-কুঁউ শব্দ করতে করতে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল হাসতে হাসতে ঘুরে ডাকলেন, "চলে এস বিজয়!"

বিজয় দৌড়ে কাছে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আশ্চর্য তো!"

কর্নেল টিউব-শিশিটা পিঠের কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, "এই ওষুধটার নাম ফরমুলা সিনিক টোয়েন্টি—সংক্ষেপে ফরমুলা ২০। সিনিক কথাটা গ্রিক। সিনিক মানে কুকুর। যাই হোক, জয়ের প্রহরী সনিবাবাজি এরপর আমাকে দেখলেই লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে পড়বে।"

"জিনিসটা কী?"

"কিচ্ছু না। একরকম উৎকট দুর্গন্ধ। কুকুরের পক্ষে অসহ্য।"

চিড়িয়াখানার অংশটা এই ছোট্ট টিলার মাথায়। তারের জাল দিয়ে ঘেরা খানিকটা খোলা জায়গা। তার পেছনে তিনঘরের একতলা বাড়ি। ওপরে করগেটশিট চাপানো। কালো হয়ে গেছে শিটগুলো। মরচে ধরে ভেঙে গেছে। সে-সব জায়গায় টুকরো টিন বা খড় গুঁজে মেরামত করা হয়েছে।

বিজয়ের ডাক শুনে জয় কাঁধে তার প্রিয় কাকাতুয়া রাজাকে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'সনি'কে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। জয় সগর্বে বলল, "আসুন কর্নেলসায়েব! আমার জ্যু দেখুন।"

কর্নেলের সঙ্গে গত সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল জয়ের। বিজয় বলল, "সনি তেড়ে এসেছিল। কর্নেল ভাগ্যিস—"

কথা কেড়ে জয় একটু হেসে বলল, "সনির তো সেটাই কাজ।"

"কিন্তু সনি দ্যাখো গে ভীষণ জব্দ হয়ে গেছে কর্নেলের পাল্লায় পড়ে।"

বিজয় হাসতে লাগল। জয় শিস দিল। তারপর সনিকে বারকতক ডাকাডাকি করে বলল, "সনির আজ মেজাজ ভাল নেই। যাক, গে, বলুন কর্নেলসায়েব, কেমন লাগছে আমার জ্যু?"

"অসাধারণ।" কর্নেল ঘুরে চারপাশটা দেখে নিয়ে বললেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, "চিতাবাঘটা কোথায়?

"আসুন দেখাচ্ছি। বাহাদুরকে আজকাল ঘরবন্দি করেছি। বড্ড বেয়াদপি করছে।"

একটা ঘরের দরজায় তালা আটকানো। তালা খুলে জয় ভেতরে ঢুকল। পেছন-পেছন কর্নেল ও বিজয় ঢুকলেন। ঘরটা আন্দাজ বারোফুট-দশফুট। একপাশে মজবুত খাঁচার ভেতর চিতাবাঘটা চুপচাপ শুয়ে ছিল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। কর্নেল খাঁচার কাছে গেলে চিতাটা খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে কোনায় সেঁটে গেল।

জয় বাঁকা মুখে বলল, "শরদিন্দু নিজের দোষে মারা পড়েছে। মদ তো আমিও খাই। কেউ বলতে পারবে না আমি মাতলামি করি। খাই, চুপচাপ শুয়ে পড়ি। ব্যস! আর শরদিন্দু মাতাল হয়ে আমার জ্যুতে ঢুকে বাহাদুরের সঙ্গে ফাজলেমি করতে গিয়েছিল।"

"খাঁচা খুলে দিয়েছিলেন বুঝি শরদিন্দুবাবু?"

"হ্যাঁ!"

"চিতাটা ওঁকে মেরে পালিয়ে যায়নি শুনলুম?"

"পালাবে কেন? পোষা চিতা। ফের খাঁচার ভেতর ঢুকে চুপচাপ বসে ছিল। কেউ কিচ্ছু টের পাইনি আমরা। ভোরে আমি এসে দেখি, শরদিন্দু ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে খাঁচার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজাটা আগে আটকে দিলুম। তারপর—"

"রাত্রে যে শরদিন্দুবাবু বাড়ি ফিরলেন না, জয়া তার স্বামীর খোঁজ করেনি?"

"সেকথা জয়াকে জিগ্যেস করবেন।" জয় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর বিকৃত দৃষ্টে তাকিয়ে ফের চড়া গলায় বলল, "আপনি কে মশাই? আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে আপনার দেখছি বড্ড কৌতূহল। কাল রাত একটায় দেখলুম, আপনি বাগানে ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার এসব ভাল লাগে না। আপনি বিজয়ের চেনাজানা লোক এবং গেস্ট না হলে আপনি কর্নেলসায়েব হোন আর লেফটন্যান্ট জেনারেলই হোন, আমি ছেড়ে কথা কইতুম না।"

বিজয় বলে উঠল, "জয়! জয়! কাকে কী বলছ? ছিঃ!"

জয় ঢোক গিলে বলল, "সরি! আমাকে ক্ষমা করবেন কর্নেলসায়েব!"

কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন, "বিজয় আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। তাকে আমি তুমি বলি। সেই কারণে তার দাদাকেও তুমি বলতে পারি কি?"

জয় তাঁর মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টে তাকিয়ে তখনই মুখটা নামিয়ে বলল, "নিশ্চয় পারেন।"

"তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে জয়।"

"কী কথা?"

কর্নেল বিজয়ের দিকে তাকালেন। বিজয় বলল, "আপনারা কথা বলুন। আমি বাইরে যাচ্ছি।"

সে বেরিয়ে গেলে কর্নেল বললেন, "তোমার এই কাকাতুয়াটি বেশ। বিজয় বলছিল এর নাম রেখেছে রাজা। নামটাও চমৎকার! রাজাকে কথা বলতে শেখাওনি কেন?"

জয় গলার ভেতর বলল, "আপনার কথাটা কী?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "কাকাতুয়াটা কথা বলতে পারলে দারুণ হত। তাই না?"

জয়ের চোখদুটো জ্বলে উঠল। "এই কথা বলার জন্যই কি বিজয়কে সরে যেতে ইশারা করলেন?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল এবার গলা চেপে খুব আস্তে বললেন, "রাজাকে যখন কিনেছিলে তখন কিন্তু সে বোবা ছিল না শুনেছি। হঠাৎ একদিন সে বোবা হয়ে যায় নাকি। তুমি—"

জয় আবার উত্তেজিত হল। বলল, "আপনি আবার নাক গলাচ্ছেন কিন্তু ! কে আপনি?"

"জয়! প্লিজ! উত্তেজিত হয়ো না। রাজাকে তুমি নিশ্চয় এমন একটা কথা শেখাতে চাইছিলে, যেটা কারুর পক্ষে হয়তো বিপজ্জনক। তাই সে তোমার রাজাকে রাতারাতি অপারেশন করে বোবা করে দিয়েছিল। তাই না?"

জয় ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ। দিনকয়েক আগে ভোরে এসে দেখি রাজার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ধড়ফড় করছে দাঁড়ে। ভেবেছিলুম মারা পড়বে। শেষে কুর্ডি জঙ্গল এলাকা থেকে এক আদিবাসী বদ্যিকে ডেকে পাঠালুম। তার চিকিৎসায় প্রাণে বেঁচে গেল। তবে গলা দিয়ে নিছক শব্দ করা ছাড়া কথা বলা ওর পক্ষে অসম্ভব। কোনো শুওরের বাচ্চা ওর জিভটা কেটে ফেলেছে।"

"কী কথা শেখাচ্ছিলে জয়?"

জয় একটু সরে গিয়ে বলল, "আপনি যেই হোন, বড্ড বেশি ট্রেসপাস করছেন কিন্তু।"

"জয়! আমি তোমাদের ভাইবোনের হিতৈষী।"

জয় অদ্ভুত হাসল। উদ্‌ভ্রান্ত একটা হাসি। বলল, "পৃথিবীসুদ্ধ সবাই কানাজোল রাজবাড়ির হিতৈষী। কিন্তু কোনো হিতৈষীর সাধ্য নেই এ রাজবাড়িকে বাঁচায়। এ বাড়ির ওপর পাপের ছায়া পড়েছে। প্লিজ, আমাকে আর ঘাঁটাবেন না। আমার মাথার ঠিক নেই।"

বলে সে জোরে বেরিয়ে গেল। তারপর গলা তুলে ডাকতে থাকল, "সনি! সনি! কোথায় গেলি? এই রাস্কেল! থাম, দেখাচ্ছি মজা!"

বিজয় তারের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিণটা তার হাত শুঁকছিল। কর্নেলকে দেখে পিছিয়ে গেল। উল্টোদিকে হায়েনার খাঁচাটা দেখা যাচ্ছিল। হায়েনাটা পা ছাড়িয়ে শুয়ে ছিল। বিজয় একটু হেসে আস্তে বলল, "কী বুঝলেন?"

কর্নেল জবাব দিতে যাচ্ছেন, একটা লোক সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে চড়াই ভেঙে এদিকে আসছে দেখে বললেন, "ও কে, বিজয়?"

বিজয় দেখে নিয়ে বলল, "নানকু। ও দাদার এই চিড়িয়াখানার দেখাশোনা রে। খাবার আনতে গিয়েছিল বাজারে। কসাইখানা থেকে রোজ হাড়গোড় আর নিকটা করে মাংস আনে। পাখিদের জন্য নিয়ে আসে কাংনিদানা, ছোলা, মটর ইসব।"

"নানকু কোথায় থাকে?"

"দাদার ঘরের ঠিক নিচে একটা ঘর আছে, সেখানে। তবে ও সারাদিন এই াতেই থাকে, শুধু খাওয়ার সময়টা ছাড়া।"

নানকু সাইকেলটা বেড়ার গেটের পাশে রেখে বিজয় ও কর্নেলকে সেলাম ল। তারপর ব্যাকসিটে আটকানো চটের বোঁচকা আর রডে ঝোলানো একটা স্কেট খুলে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানা জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গল। হায়েনাটা উঠে দাঁড়াল এবং জিভ বের করে খাঁচার রডের ভেতর দিয়ে কটা ঠ্যাং বাড়িয়ে দিল। একজোড়া বানর গলার চেন টানটান করে একটা ছোট্ট ছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরিণটা বেড়ার বাইরে মুখ বাড়াল। একদল ক্যানারি াখি তুমুল চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। ঘরের ভেতর থেকে চিতাবাঘের চাপা ঘ্রাঁও- ও গর্জন শোনা গেল।

বিজয় হাসতে হাসতে বলল, "প্রকৃতির জাগরণ। তাই না কর্নেল?"

কর্নেলও হেসে বললেন, "তুমি কবি। তোমার কাছে তাই মনে হওয়া উচিত। বে আমার কাছে ক্ষুধার্তের কান্নাকাটি বলেই মনে হচ্ছে। সম্ভবত নানকু ওদের কমতো খেতে দেয় না।"

বিজয় চাপা স্বরে বলল, "নানকু এক নম্বর চোর—দাদাও জানে! যে টাকা দেয় নকুকে, তার তিনভাগ নানকুর পকেটে যায়, সে আমি হলপ করে বলতে পারি।"

দুজনে কথা বলতে বলতে টিলার ঢাল বেয়ে একটা নালার ধারে এলেন। লার ওপর কাঠের সাঁকো আছে। একসময় গঙ্গা থেকে এই নালা দিয়ে বাগানে দচের জল আনা হত। রাজবাড়ির চৌহদ্দি পাঁচিল-ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে ছিল ইসগেট। সেটা কবে ভেঙে পড়েছে এবং বন্যা ঢোকার আশঙ্কায় নালার বুক থকে পাঁচিল গেঁথে সীমানার পাঁচিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির লে নালাটা প্রায় বারোমাস ভরে থাকে।

কাঠের সাঁকোর ওধারে খোলামেলা ঘাসের জমি, অযত্নলালিত কিছু ফুল- লের গাছ, তারপর রাজবাড়িটা। খিড়কির ফটকের কাছে পৌঁছুনোর আগেই ঠাৎ খিড়কির বড় কপাটের অন্তর্গত চোর-কপাট খুলে রঙ্গিয়া প্রায় দৌড়ে রুল। বেরিয়ে বিজয় ও কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখে াতঙ্ক লেগে আছে। বিজয় বলল, "কী রে রঙ্গি?"

রঙ্গিয়া হাঁফিয়ে বলল, "দিদিজি বেহোঁশ হয়ে পড়েছিল দরজার কাছে। অনেক রে হোঁশ হয়েছে। কথা বলতে পারছে না। বড়কুমারজিকে খবর দিতে বলল মা।"

বিজয় বলল, "তোকে যেতে হবে না আর। চল, দেখি কী হয়েছে।"

রঙ্গিয়া দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে গেল। বিজয় চাপা স্বরে কর্নেলকে বলল, "নানকুটা খুব পাজি। রঙ্গিয়ার ওপর বড্ড লোভ। তাই যেতে দিলাম না।"

কর্নেল হঠাৎ বললেন "আচ্ছা বিজয়, কাকাতুয়াটাকে যেদিন কেউ জিভ কেটে বোবা করে দিয়েছিল, সেদিন কি নানকু জয়ের চিড়িয়াখানায় ছিল?"

বিজয় বলল, "জানি না। তবে ওর ব্যাপারটা বলি শুনুন। নানকু আগে ছিল সার্কাসের দলে। ওর পরামর্শেই তো দাদা চিড়িয়াখানা করেছিল। সেসব প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে এল প্রায়। আমি তখন কলকাতায় ছিলুম। দাদা তো আগেই চলে এসেছিল। তারপর এইসব করেছিল।"

"নানকুর দেশ কোথায়, জানো?"

"বলে তো সাহেবগঞ্জের লোক।"

দোতলায় সিঁড়ির মুখে গিয়ে কর্নেল ইতস্তত করছিলেন। বিজয় বলল, "আসুন, আসুন! জয়ার কী ব্যাপার দেখি। হঠাৎ কেন অজ্ঞান হল কে জানে!"

ওপরের বারান্দায় যেতেই কানে এল কলাবতী কাউকে ডাক্তার ডাকতে বলছে। বুদ্ধুরাম গাল চুলকোতে চুলকোতে জয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। বিজয়দের দেখে বলল, "দিদিজির তবিয়ত খারাপ। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে যাচ্ছি ছোটকুমার সাব!"

জয়ার ঘরের পর্দা তুলে বিজয় বলল, "কী হয়েছে, জয়া? মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলি শুনলুম। এই দ্যাখ, কর্নেলসায়েব তোকে দেখতে এসেছেন।"

ঘরের ভেতরকার কড়ামিঠে গন্ধটা কর্নেলের নাকে আচমকা ঝাঁপিয়ে এসেছিল। কর্নেল দ্রুত দরজার পর্দা টেনে দুপাশে সরিয়ে দিয়ে জয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। জয়া হেলান দিয়ে পালঙ্কে বসে আছে। ফ্যানটা ফুল স্পিডে ঘুরছে মাথার ওপর। জয়ার চোখদুটো নিষ্পলক।...

॥ বাড়ির নকশা ॥

জয়া কিছুক্ষণ বিজয় বা কর্নেল কারুর কোনো প্রশ্নের জবাব দিল না। তারপর কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "বিজয়, কলাবতী বা তার মেয়েকে বলো, এককাপ কড়া কফি নিয়ে আসুক।"

বিজয়ের কথায় ওরা চলে গেলে কর্নেল জয়ার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, "জয়া, তুমি কি জানো আমি কে?"

জয়া খুব আস্তে মাথাটা একটু দোলাল। বিজয় বলল, "আমি কিন্তু বলিনি ওকে। শুধু কাকাবাবু—মানে মুখুয্যেমশাইকে না জানালে বিবেকে বাধে, তাই—"

কর্নেল তাকে থামিয়ে বললেন, "জয়া, ঘরে ক্লোরোফর্মের গন্ধ কেন? কেউ তোমাকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, তাই না?"

জয়ার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে বোবার মত তাকিয়ে রইল শুধু।

"কিছু নিয়ে গেছে কি ঘর থেকে?"

জয়া আবার মাথা দোলাল। বিজয় চমকে উঠেছিল। বলল, "এ তো অসম্ভব ব্যাপার! দিনদুপুরে কেউ এই ঘরে ঢুকে ওকে অজ্ঞান করাবে এবং কিছু চুরি করে সবার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যাবে! নাঃ—আমি বিশ্বাস করি না।"

কর্নেল মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "আঃ! তুমি একটু চুপ করো, বিজয়! আমাকে কথা বলতে দাও।"

জয়া পালঙ্কের পাশে রাখা গোলাকার টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিল। এক চুমুক জল খেয়ে গেলাসটা রেখে আবার কর্নেলের দিকে ভিজে চোখে তাকাল।

কর্নেল বললেন, "কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

জয়া মাথা দোলাল।

"ঠিক আছে। পরে শুনব। কফি নিয়ে আসুক। গরম কফি খেলে গলাটা ঠিক হয়ে যাবে। তবে শুধু ইশারায় দেখিয়ে দাও, কোথায় তোমার ওপর কেউ ক্লোরোফর্ম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।"

জয়া ইশারায় দরজার কাছটা দেখিয়ে দিল। তখন কর্নেল ঘরের বাতি জ্বেলে দিলেন। জানালাগুলোর পর্দাও সরিয়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে আতসকাচের মতো দেখতে প্রকাণ্ড একটা গোল এবং হ্যান্ডেল লাগানো কাচ নিয়ে দরজার মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসলেন।

ওই অবস্থায় বাইরের বারান্দায় গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, "লোকটা খালি পায়ে এসেছিল মনে হচ্ছে। কলাবতী, রঙ্গিয়া, বুদ্ধুরাম সবাই এ ঘরে খালিপায়ে ঢুকেছে। লোকটা জুতোপায়ে ঢুকলে তা সত্ত্বেও একটু-আধটু চিহ্নও মেঝেয় পেতুম।"

একটুখানি চোখ বুজে থাকার পর চোখ খুলে ফের বললেন, "আচ্ছা বিজয়, এ বাড়ির দোতালায় আর নিচের তলায় কতগুলো ঘর আছে?"

বিজয় হিসেব করতে থাকল। ইতিমধ্যে কলাবতী কফি নিয়ে এল। কর্নেল বললেন, "ঠিক আছে! তুমি এখন এস, কলাবতী!"

কলাবতী সলজ্জ হেসে বলল, "আপনাদের জন্য কফি আছে সায়েব!"

কর্নেল হাসলেন। "তুমি বুদ্ধিমতী কলাবতী!"

কলাবতী ট্রে রেখে চলে গেল। কর্নেল নিজের হাতে পট থেকে কফি ঢেলে জয়াকে দিলেন। ততক্ষণে বিজয়ের হিসেব শেষ হয়েছে। সে বলল, "বড্ড ভুল হয় আমার। মনে হচ্ছে, নিচের তলায় আটখানা আর ওপরে পাঁচখানা ঘর।"

জয়া মৃদু স্বরে বলল, "না। ওপরে ছখানা।"

বিজয় বলল, 'ও, হাঁ। জয়ের—মানে দাদার ঘরের এপাশে একটা ঘর আছে। ভুলে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "সে-ঘরে কী আছে?"

বিজয় বলল, "জানি না। তালাবন্ধ আছে—ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। বাড়িতে

কয়েকটা ঘরেই তালাবন্ধ আছে।"

জয়া বলল, "মায়ের কাছে শুনেছিলাম ও ঘরে আমার এক পিসি নাকি সুইসাইড করেছিলেন। তখন আমাদের জন্ম হয়নি। পরে বাবা ঘরটা অস্ত্রাগার করেন। আমাদের পূর্বপুরুষের সব অস্ত্রশস্ত্র এই ঘরে আছে।"

বিজয় বলল, "কে জানে! আমি ওসব খবর রাখি না।"

কর্নেল বললেন, "জয়া, আর কথা বলতে আশা করি কষ্ট হচ্ছে না?"

জয়া বলল, "না।"

"তোমাকে অজ্ঞান করে ঘর থেকে কিছু নিয়ে গেছে কি না জিগ্যেস করলে তখন তুমি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বললে! তার মানে তুমি জানো চোর কী নিতে এসেছিল?"

জয়া মুখ নামিয়ে বলল, "জানি। জিনিসটা আমার কাছেই ছিল।"

"কী সেটা?"

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "কাকাবাবু একটা ছোট্ট কৌটোর মতো জিনিস লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন। সেটা জামার ভেতর বুকের কাছে লুকিয়ে সবে ওপরে এসেছি—"

বিজয় নড়ে বসে বলল, "তাই তো! কাকাবাবু তো এলেন না! নিশ্চয় খবর পেয়েছেন কী হয়েছে।"

জয়া বলল, "কাকাবাবু ভাগলপুর গেছেন। যাবার আগে আমায় জিনিসটা দিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করে সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখব ভাবছি, হঠাৎ দরজায় কেউ নক করল। রাত্রে হলে জিগ্যেস না করে দরজা খুলতুম না। দরজা যেই খুলেছি, কেউ আমার ওপর এসে পড়ল। তারপর কিছু টের পাইনি। রঙ্গিয়া কখন এসে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে ফ্যান চালিয়েছে। জলের ঝাপটা দিয়েছে। জ্ঞান হবার পর সব মনে পড়ল। তখন দেখি জিনিসটা নেই।"

"জামার ভেতর রেখেছিলে আগের মতো?" কর্নেল জিগ্যেস করলেন।

"হ্যাঁ।" জয়া কফির পেয়ালা পাশের টেবিলে রেখে বলল, "একপলকের জন্য লোকটার মুখে কালো কুচ্ছিত একটা মুখোশ দেখেছিলুম। তার গায়ে ছাইরঙের কলারওয়ালা গেঞ্জি ছিল।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "তুমি বিশ্রাম করো জয়া! পরে আবার কথা বলব।"

বারান্দায় গিয়ে কর্নেল একটু দাঁড়ালেন হঠাৎ। বললেন, "বিজয়, খালি ঘরগুলোর চাবি কার কাছে থাকে?

বিজয় বলল, "সম্ভবত কাকাবাবুর কাছে।"

"জয়ের ঘরের পাশের ঘরটা একবার দেখে যাই, এস।"

"কিন্তু তালাবন্ধ যে! ভেতরে তো ঢোকা যাবে না।"

"বাইরে থেকেই দেখে যাব।"

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলেন দুজনে। বারান্দা পুব-পশ্চিমে এগিয়ে বিজয়ের

ঘরের পর ডানদিকে দক্ষিণে ঘুরেছে। পাশাপাশি দুটো ঘরের দরজা সেখানে। বিজয় প্রথম ঘরের দরজাটা দেখিয়ে বলল, "এটাই সেই ঘর। পাশেরটায় জয় থাকে। ওর ঘরে তালা এঁটে বেরোয়।" বলে সে জয়ের ঘরের পর্দাটা তুলে দেখিয়ে দিল।

জয়ের ঘরের পর বারান্দাটা শেষ হয়েছে জাফরিকাটা দেয়ালে। চৌকোনা নকশাকাটা ঘুলঘুলি-গুলোতে বাইনোকুলার দিয়ে কর্নেল বাইরেটা দেখে বললেন, "পুকুরের পাড়ে ওই বাড়িটাই কি তোমাদের ঠাকুরদালান!"

বিজয় উঁকি মেরে দেখে বলল, "হ্যাঁ। ওই যে পাশের ঘরের দরজার সামনে মাধব পাণ্ডাজি দাঁড়িয়ে আছেন দেখছেন, উনিই মাইনে করা পূজারী।"

"পুব-দক্ষিণ কোণের টিলাটা কি বাড়ির ভেতর, না বাইরে?"

"বাড়ির চৌহদ্দি-পাঁচিলের ভেতরই। ওই টিলার মাথায় ছোট্ট মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হরমন্দির। আর ঠিক এমনি একটা ছোট টিলা আছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। ওটার মাথায় ওইরকম ছোট্ট একটা মন্দির আছে। সেটা গৌরীমন্দির। লোকে বলে হরটিলা গৌরীটিলা।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "তোমার বাড়ির এলাকা দেখছি বিশাল। জঙ্গল পাহাড় জীবজন্তু আছে, আবার—"

কথা কেড়ে বিজয় বলল, "একটা আলাদা পৃথিবী বলতে পারেন। তবে ভীষণ গোলমেলে পৃথিবী। এখনও অব্দি পুরো এলাকার অনেকটাই আমার অচেনা। তেমনি রহস্যময়ও মনে হয়।"

কর্নেল ঘুরে পা বাড়িয়ে বললেন, "একটা নকশা পেলে ভাল হত।"

বিজয় বলল, "কিসের?"

"তোমাদের বাড়ির পুরো চৌহদ্দির। বিশেষ করে বাড়িটার নিচের তলা এবং এই দোতলার।"

"করে দিচ্ছি। আধঘণ্টা সময় দিন।"

"তুমি তো বললে অনেকটাই অচেনা তোমার।"

বিজয় হাসল। "জয়ার হেল্প নেব। তাছাড়া কলাবতীকেও ডাকব। দুজনের সবটাই নখদর্পণে।"

জয়ের ঘরের পাশের ঘরটার দরজায় পর্দা নেই। মরচে ধরা তালা ঝুলছে। দেখে মনে হল, বহুকাল তালাটা খোলা হয়নি। কপাটের ফাঁকেও মাকড়সার জাল রয়েছে। ভেতরে কী সব অস্ত্র আছে কে জানে।

বারান্দা ঘুরেছে পশ্চিমে এবং বাঁকের মুখে নিচে নামার আরেকটা সিঁড়ি। কর্নেল সেই সিঁড়িতে নামতে যাচ্ছিলেন। বিজয় বলল, "ওটা বন্ধ রাখা হয়েছে। দাদার কুকুর নিচে গিয়ে বৈজু ঠাকুরকে ভয় দেখাত। শেষে কাকাবাবু নিচে সিঁড়ির দরজায় তালা আটকে দিয়েছেন।"

বারান্দায় অজস্র থাম। জয়ার ঘরের পর প্রথম সিঁড়ি। সেখান দিয়েই ওঠানামা করা হয়। কর্নেল নিচে গিয়ে বিজয়কে বললেন, "তুমি এবার একটা কাজ করো।

একে একে দারোয়ান নছি সিং, কলাবতী, রঙ্গিয়া, বৈজুঠাকুর, আর বুদ্ধুরাম ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলে তখন তাকেও পাঠিয়ে দেবে। ওদের কাছে কিছু জানবার আছে।"

সিঁড়ির পাশেই গেস্টরুমে কর্নেল আছেন। ঘরে ঢুকে ক্যামেরা বাইনোকুলার ইত্যাদি টেবিলে রেখে ঝটপট পোশাক বদলে তৈরি হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একে-একে নছি সিং, কলাবতী ও তার মেয়ে রঙ্গিয়া, বৈজু শেষে বুদ্ধুরাম এল বিজয়ের সঙ্গে।

না—কেউ আজ সকাল থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেনি। প্রত্যেকেই বলল যে, অন্দরমহলে একটা চুহা বা বিল্লি ঘুসলেই তারা টের পাবে। কোনো অচেনা লোকের বাড়ি ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পুবের খিড়কি আর দক্ষিণের খিড়কি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। বাকি রইল সদর দরজা। সেখানে করিডোর মতো প্যাসেজের মুখে সারাক্ষণ নছি সিং বসে আছে। কেউ এলে তার অজান্তে বাড়ি ঢুকতে পারবে না। পেটিকোর সামনে হলঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পাশে বিপ্রদাসজির ঘরের বাইরের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। অতএব বাইরের কেউ বাড়ি ঢোকেনি বা বেরিয়েও যায়নি।

ঘণ্টাখানেক পরে বিজয় নকশা নিয়ে হাজির হল। কর্নেল নকশার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।...

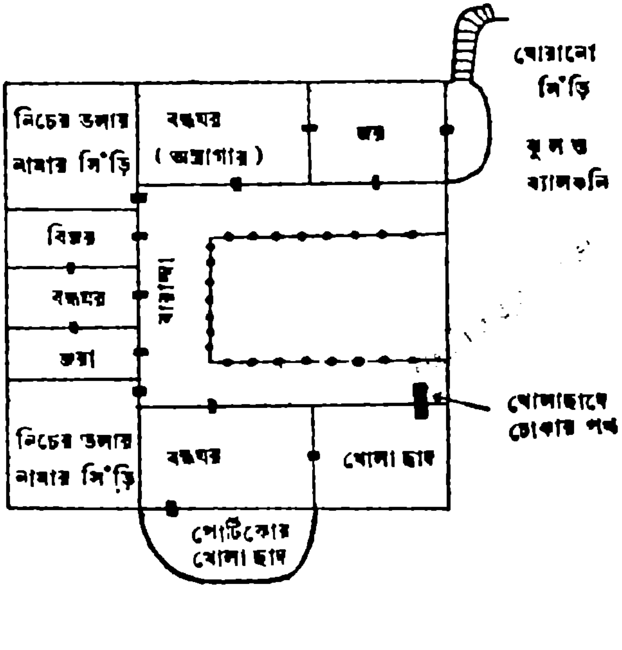

দোতলার নকশা

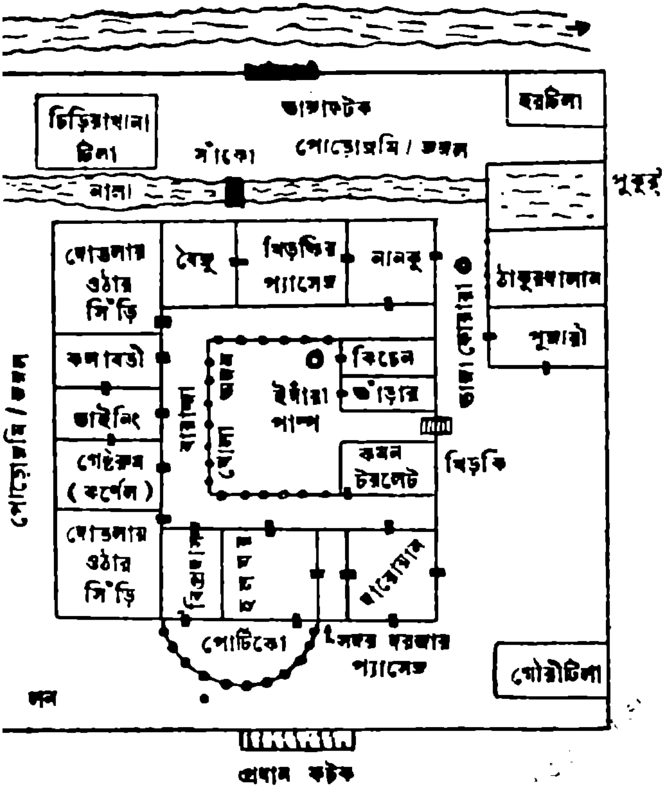
চিড়িয়াখানা টিলা
ভাঙাফটক
সাঁকো
পোড়োজমি / জঙ্গল
নালা
পুকুর
দোতলায় ওঠার সিঁড়ি
খিড়কির প্যাসেজ
ঠাকুরদালান
পূজারী
কিচেন
ভাঁড়ার
ইঁদারা পাম্প
ডাইনিং
গেস্টরুম (কর্নেল)
কমন টয়লেট
খিড়কি
দোতলায় ওঠার সিঁড়ি
পোর্টিকো
সদর দরজার প্যাসেজ
পোড়োজমি / জঙ্গল
লন
প্রধান ফটক

একতলার নকশা

॥ মন্দিরে কার ছায়া ॥

কর্নেল সারাদুপুর নকশা নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। বিকেলে বিজয়কে ডেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। দক্ষিণের পোড়ো জমি আর বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে ঠাকুরবাড়িতে গেলেন। মাধবজি তাঁর ঘরের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। বিজয় কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মাধবজি বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে কর্নেলকে বললেন, "আমার সৌভাগ্য কর্নেলসাব! একটেরে পড়ে থাকি। কেউ আমার খোঁজ-খবর রাখে না। বড়কুমারসাব তো চিড়িয়াখানা নিয়েই মশগুল। আর এই যে দেখছেন ছোটকুমারসাব, ইনি তো ঘর থেকেই বেরোন না। শুধু জয়াবেটি আসে কখনও-সখনও। আর হ্যাঁ—বিপ্রদাসজি আসেন হরঘড়ি। উনি না আসবেন তো চলবে কী করে? তবে আজ বিপ্রদাসজিকে দেখতে পাচ্ছি না।"

বিজয় বলল, "ভাগলপুরে গেছেন সকালে। দুদিন থাকবেন বলে গেছেন।"

মাধবজি বললেন, "ও, হ্যাঁ। কাল বলছিলেন বটে! ভাগলপুরে ওঁর এক বহিনজি থাকেন শুনেছি।"

কর্নেল পা ঝুলিয়ে বসে বাইনোকুলারে নালা ও পুকুরের সঙ্গমস্থলে কিছু দেখছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "মাধবজি, আপনি কতবছর রাজবাড়িতে আছেন?"

মাধবজি হিসেব করে বললেন, "তা বিশসালের বেশি। সত্যি কথা বলতে গেলে, কর্নেলসাব, সে জমানা আর নেই। রাজবাহাদুরের আমলে কী ছিল! হরঘড়ি শোরগোল, লোকজন, কত কিছু। এখন তো শ্মশান মনে হয়। মোটর গাড়ি ছিল। দুটো ঘোড়া ছিল। এখন আর কিছু দেখতে পাবেন না। তবে বাকি যেটুকু দেখছেন, সব বিপ্রদাসজির জন্য। কুমারসাবদের তো বিষয়সম্পত্তিতে মন নেই। ঘর সংসারেরও ইচ্ছে নেই। আবার দেখুন, জয়াবেটির বরাত। এই বয়সেই বিধবা হয়ে গেল!"

কর্নেল বললেন, "শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে আপনার কেমন আলাপ ছিল?"

"খুউব। অমন ভদ্রলোক আমি কখনও দেখিনি কর্নেলসাব। নিজের পেটের কথা সব আমাকে বলতেন। এক বদমাসের পাল্লায় পড়ে খামোকা বেচারা জেল খেটেছিলেন।"

কর্নেল বিজয়ের দিকে তাকালেন। বিজয় বলল, "শরদিন্দু বিশেষ কারুর নাম করেছিল বলে জানি না। অন্তত জয়া আমাকে বলেনি।"

মাধবজি চাপা স্বরে বললেন, "জামাইবাবু তো আর বেঁচে নেই। তাই বললেও ক্ষতি নেই এখন। আমাকে বলতে বারণ করেছিলেন। সেই হারামিটা ওঁর সঙ্গে ব্যাংকে চাকরি করত। তার নাম ছিল পরিতোষ। তো জামাইবাবু যে রাতে চিতার পাল্লায় পড়েন, সেইদিন বিকেলে এসে আমাকে কথায় কথায়

বলেছিলেন, পরিতোষ হারামিকে বাজারে কোথায় দেখেছেন। তাঁর খুব ভয় হচ্ছে। আবার কোনো ক্ষতি না করে। কী মতলবে কানাজোলে এসেছে সে, ওই নিয়ে খুব ভাবনা করছিলেন। আমি বললুম, বড় কুমারসাবকে বলুন। ওকে খুঁজে বের করে চাবুক মারবে। তারপর পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তো জামাইবাবু বললেন, কী জানি, দূর থেকে দেখেছি। ভুল হতেও পারে।"

কর্নেল বললেন, "শরদিন্দুবাবু যে রাতে মারা যান, আপনি কোনো চিৎকার শুনেছিলেন?"

"না। তবে এখান থেকে বড়কুমারসাবের ঘর নজর হয়। ওই দেখুন—ওই ঘরের ব্যালকনিতে বড়কুমারসাব আর জামাইবাবুকে বসে থাকতে দেখেছিলুম। তখন রাত প্রায় দশটা। অবাক লাগছিল জামাইবাবু মদ খাচ্ছেন দেখে। উনি মদ খান বিশ্বাস করতে পারিনি।

"আপনি দেখেছিলেন মদ খেতে?"

"হ্যাঁ দুজনের হাতেই গেলাস ছিল। ঘর থেকে আলো এসে ব্যালকনিতে পড়েছিল।"

"আচ্ছা মাধবজি, আজ সকালে বা অন্য কোনো সময়ে অচেনা কোনো লোককে রাজবাড়ির চৌহদ্দিতে দেখেছেন কি? ধরুন, খিড়কি দিয়ে বেরুতে বা বাগানে, কি অন্য কোথাও?"

মাধবজি মাথা জোরে নেড়ে বললেন, "দেখিনি। তবে সবসময় তো সবদিকে নজর থাকে না। চোখ এড়িয়ে যেতেও পারে।"

কর্নেল উঠলেন। "চলি মাধবজি! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

মাধবজি করজোড়ে বললেন "কৃপা করে যদি এক কাপ চা পিয়ে যেতেন কর্নেলসাব!"

"ঠিক আছে। ফেরার সময় হবে। একটু ঘুরে আসি ওদিক থেকে।"

ঠাকুরদালানের সামনে দিয়ে পুকুরের ধারে পৌঁছলেন দুজনে। পুকুরটা চৌকোনা। শালুক পদ্ম আর জলজদামে ভর্তি। সেই নালাটা এসে পুকুরে পড়েছে। এখানে ইটের সাঁকো আছে। সাঁকোটা পেরিয়ে হরটিলার নিচে গিয়ে কর্নেল বললেন, "এস বিজয়, মন্দিরটা দেখে আসি।"

বিজয় একটু হাসল। "কোনো ক্লু থাকতে পারে ভাবছেন?"

"কিসের?"

"জয়াকে অজ্ঞান করে যে একটা কী জিনিস হাতিয়েছে, সে এদিকে নিশ্চয় আসেনি।" বিজয় খিকখিক করে হাসতে লাগল। "পরিতোষ না কার কথা বললেন মাধবজি, তারও হরটিলায় উঠে লুকিয়ে থাকার চান্স কম। মাধবজি বললেন বটে, সবদিকে নজর থাকে না, কিন্তু আমি জানি উনি একটি বাজপাখি।"

কর্নেল কৌতুকে মন না দিয়ে গম্ভীরভাবেই বললেন, "পূর্বে গঙ্গার তীরে ওই

ফটকটার পাশে পাঁচিল ভাঙা আছে। আমরা সকালে বাইরে থেকে ওখান দিয়েই ঢুকেছি। সেইভাবে কেউ ঢুকে কোথাও লুকিয়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই, বিজয়। তোমার কী মনে হয়?"

বিজয় বলল, "তাই তো! ওটার কথা মনে ছিল না। আমাদের পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা দরকার।"

এবার কর্নেল হাসলেন। "তবে জয়ার কাছ থেকে মূল্যবান জিনিসটি হাতিয়ে সে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকবে না আর। কী দরকার আর লুকিয়ে থাকার?"

"তাহলে—"

কর্নেল টিলার গায়ে পাথরের ধাপে পা রেখে বললেন, "জিনিসটা কী হতে পারে বলে তোমার ধারণা?"

বিজয় তাঁকে অনুসরণ করে বলল "কোনো দামি রত্ন-টত্ন হবে। কাকাবাবুকে হয়তো বাবা রাখতে দিয়েছিলেন।"

কর্নেল আর কোনো কথা বললেন না। টিলাটা একেবারে সিধে উঠেছে। পরিশ্রম হচ্ছিল সিঁড়ি ভাঙতে। ওপরে উঠে ছোট্ট মন্দিরটার সামনে একটা পাথরে বসে বিশ্রাম নিতে থাকলেন। বিজয় গঙ্গার শোভা দেখতে থাকল। এখান থেকে চারদিকে অনেক দূর অব্দি চোখে পড়ে। চিড়িয়াখানার টিলার দিকে বাইনোকুলার তাক করলেন কর্নেল। নানকু হরিণটাকে কিছু খাওয়াচ্ছে। ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদরও করছে। জয় কাকাতুয়াটা কাঁধে নিয়ে আউট-হাউসের ছাদে বসে আছে। সেও গঙ্গার শোভা দেখছে হয়তো। বাইনোকুলার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কর্নেল চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

সেইসময় হঠাৎ বিজয় চমকখাওয়া গলায় বলল, "আরে! ওটা কী?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "কী বিজয়?"

বিজয় এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের পাশে জবাফুলের ঝোপের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ভেলভেটে মোড়া কৌটো কুড়িয়ে আনল। উত্তেজিতভাবে বলল, "কর্নেল! কর্নেল! জয়া তো এরকম একটা কৌটোর কথাই বলছিল! সেইটেই সম্ভবত।"

কর্নেল কৌটোটা নিয়ে বললেন, "ভেতরের জিনিসটা নেই। খালি কৌটোটা ফেলে রেখে গেছে।"

বলে জ্যাকেটের পকেট থেকে আতস কাচ বের করে খুঁটিয়ে কৌটোর ভেতরটা দেখতে থাকলেন। বিজয় দমআটকানো গলায় বলল, "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!"

একটু পরে কর্নেল বললেন, "তুমি বলেছিলে রত্নের কথা। কিন্তু কৌটোর ভেতর মরচের গুঁড়ো দেখতে পেলাম। পুরনো লোহার কোনো জিনিস ছিল সম্ভবত।...হুঁ চাবি হতেও পারে।"

"কিসের চাবি?"

"জানি না। এর জবাব বিপ্রদাসবাবুই দিতে পারেন। ওঁকে কালই লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে আনা দরকার।"

"বুদ্ধুকে পাঠিয়ে দেব।" বিজয় চঞ্চল হয়ে বলল। "এখনও পাঠানো যায়। সাড়ে ছটায় একটা ট্রেন আছে।"

"ভাগলপুরে রাত্রে গিয়ে কি ওঁকে খুজে বের করতে পারবে বুদ্ধু? অবশ্য ঠিকানা জানা থাকলে—"

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি বরং এখনই গিয়ে খোঁজ নাও, বুদ্ধু বা কেউ ভাগলপুরের ঠিকানা জানে নাকি। মাধবজিকে জিগ্যেস করে যেও।"

"আপনি থাকছেন?"

"হ্যাঁ—আমি ঘুরি কিছুক্ষণ।"

বিজয় সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে গেল সবেগে। কর্নেল ফের কিছুক্ষণ বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে তারপর মন্দিরের ভেতর উঁকি দিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। তবে পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যের আলো সোজা এসে মন্দিরে ঢুকেছে। তাই ভেতরটায় রোদ পড়েছে।

একটা শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। ধূসর গ্রানাইট পাথরের বেদির ওপর শাদা পাথরের যোনিপট্টে প্রোথিত কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। কর্নেল গুঁড়ি মেরে ঢুকে বেদিটার চারদিকে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পেছনদিকে হাত বুলোতে গিয়ে হাতে শক্ত কাঠের মতো কী ঠেকল। অত্যন্ত অপরিসর ভেতরটা। অনেক কষ্টে ওপাশে ঝুঁকে চমকে উঠলেন। একটা গর্তে যে জিনিসটা ঢোকানো, সেটা একটা ভাঙা চাবি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ নিচেই গোলাকার চাকতির মতো ভাঙা মাথাটা পড়ে আছে।

কেউ চাবি ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতে গিয়ে চাবিটা ভেঙে গেছে। হতাশ হয়ে চলে গেছে। হয়তো অন্ধকার নামলে বেদিটা ভাঙার জন্য তৈরি হয়েই আসবে। কী আছে বেদির ভেতর? বেদিটা তাহলে সম্ভবত পাথরের সিন্দুকই?

হঠাৎ কর্নেলের মনে হল একটা বিপদ আসন্ন।

এই অদ্ভুত অনুভূতি জীবনে বহুবার আসন্ন বিপদের মুহূর্তে তাঁকে সজাগ করে দিয়েছে। এ যেন অতিরীন্দ্রিয়ের বোধ।

দ্রুত ঘুরলেন। একপলকের জন্য বিকেলের লালচে আলোয় যেন একটা ছায়া সরে যেতে দেখলেন। পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুঁড়ি মেরে ঝাঁপ দিলেন মন্দির-গর্ভ থেকে।

কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। টিলার পেছন দিকটা খাড়া নেমে গেছে। তার পেছন চৌহদ্দিঘেরা উঁচু পাঁচিল। কিন্তু টিলার চারদিকই ঘন ঝোপে ঢাকা। রিভলবারটা অটোমেটিক। নল তাক করে মন্দিরের চারদিক ঘুরে খুঁটিয়ে দেখলেন। কোনো ঝোপের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

তাহলে কি মনের ভুল? অথবা যে এসেছিল, সে যেন অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র

জানে। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে কর্নেল সিঁড়ির ধাপে পা রাখলেন। ছায়া যে দেখেছেন, তা ভুল নয়। আর একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে সে যেই হোক, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। থাকলে গুলি ছুড়ত। তাঁকে রেহাই দিত না।...

॥ ভৌতিক ছড়া ॥

বুদ্ধুরাম বা কেউই জানে না ভাগলপুরে কোন ঠিকানায় বিপ্রদাসবাবুর বোনের বাড়ি। তাই বুদ্ধুরাম আগামীকাল ভোরের ট্রেনেই ভাগলপুরে যাবে। সেখানে তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকে। কাজেই দিনসবরে গিয়ে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। বিজয় এসে জানাল কর্নেলকে।

কর্নেল জয়াকে দেখতে গিয়েছিলেন তার ঘরে। তার শরীর ভাল, কিন্তু মন ভাল নেই। কর্নেলকে বসিয়ে রেখে বিজয় হয়তো কবিতা লিখতে গেল।

একথা-ওকথার পর কর্নেল বললেন, "আচ্ছা জয়া, তোমাকে শরদিন্দু কি পরিতোষ নামে কারুর কথা বলেছিল?"

জয়া একটু চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ—বলেছিল। ওদের ব্যাংকের ক্যাশডিপার্টে কাজ করত সে।"

"তাকে কানাজোলে দেখতে পাওয়ার কথা বলেছিল কি?"

জয়া বলল, "বলেছিল। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?"

"কী বলেছিল, আগে বলো। আমি পরে বলছি সেকথা।"

"বলেছিল, দেখার ভুল হতেও পারে। তবে বাজারের ওখানে যেন পরিতোষ নামে ওর কলিগকে দেখেছে। আসলে ওর সন্দেহ ছিল পরিতোষই ক্যাশ সরিয়ে ওকে বিপদে ফেলেছিল। কারণ পরিতোষের স্বভাবচরিত্র নাকি ভাল ছিল না।"

"শরদিন্দুর মদ খাওয়া সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?"

জয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "ওর মদ খাওয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু মর্গের রিপোর্টে পাওয়া গেছে, ওর পেটে অ্যালকোহল ছিল।"

"বিশ্বাস করিনি। এখনও করি না।"

"মাধবজি দেখেছিলেন, যেরাতে শরদিন্দু মারা যায়, সেরাতে—তখন দশটা বাজে, জয়ের সঙ্গে ব্যালকনিতে বসে মদ খাচ্ছিলো।"

জয়া নিষ্পলক চোখে তাকাল। "...মাধবজি বলেছেন?"

"হ্যাঁ। উনি দেখেছিলেন।"

জয়া মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, "সেদিন সন্ধ্যায় আমার মেজাজ ভাল ছিল না। ওকে নিয়ে কানাজোল জুড়ে স্ক্যান্ডাল ছড়িয়েছিল। লোকে আড়ালে আমার নামেও কদর্য তামাশা করত। এমন কি আমাদের বাড়িতেও গোপনে আলোচনা চলত দারোয়ানের ঘরে। রঙ্গিয়া এসে বলে যেত। তো সেদিন সন্ধ্যায় খামোকা

র সঙ্গে ঝগড়া করলুম। বললুম, আমাকে যদি কোথায় না নিয়ে যেতে পারো, াহলে চলে যাও।"

জয়া ধরা গলায় বলতে থাকল, "সেরাতে ও খেতে এল না। মাধবজির খানে আছে খবর পেলুম। আমিও খাইনি। শরীর খারাপ বলে দরজা আটকে য়ে পড়লুম। অনেক রাতে দরজায় নক করে ডাকল। আমি দরজা খুলিনি।"

জয়া চুপ করলে কর্নেল বললেন, "তারপর?"

"তারপর আর সাড়া পেলুম না। মিনিট পাঁচেক পরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলুম, বারান্দায় নেই। ভাবলুম, ছোড়দার ঘরে শুয়েছে। সেরাতে আমার কী যে হয়েছিল!"

"জয়ের সঙ্গে শরদিন্দুর সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"বড়দা ভীষণ খেয়ালি। মাঝেমাঝে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গল্প করত।"

"হুঁ—আচ্ছা জয়া, কেন তোমার সন্দেহ যে শরদিন্দু চিতার আক্রমণে মারা ায়নি?"

জয়া একটু উত্তেজিত হল। "কেন ও অত রাতে বড়দার জ্যাতে যাবে? ্যুইসাইড করার ইচ্ছে থাকলে অন্যভাবে কি করা যেত না? তাছাড়া ওর ডিতে যেসব ক্ষতচিহ্ন ছিল, তা চিতার নখ বা দাঁতের বলে আমার মনে য়নি।"

"কিন্তু মর্গের ডাক্তার তো—"

"ডাক্তারের রিপোর্ট আমি বিশ্বাস করি না। কেউ তাকে ঘুষ খাইয়ে মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়েছে।"

"তুমি কি বলতে চাইছ শরদিন্দুকে খুন করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। তাছাড়া কিছু হতেই পারে না।"

"কেন ওকে খুন করবে কেউ?"

আবার একটু চুপ করে থাকার পর জয়া আস্তে বলল, "আমার সন্দেহ হয় বড়দা জানে, কে কেন ওকে খুন করেছে। বড়দা খুনীকে গার্ড করেছে। বড়দাই হয়তো ব্যাপারটা ঢাকতে চিতাবাঘের কাঁধে দোষ চাপিয়েছে।"

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, "কেন বড়দাকে সন্দেহ হয়, জয়া?"

"বড়দার হাবভাব দেখে। সেদিন থেকে বড়দার পাগলামি বেড়ে গেছে। তাছাড়া লক্ষ্য করেছি, মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁদে। রাত্রে মাতাল-অবস্থায় চুল আঁকড়ে ধরে বলে, আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না, আমি শিগগির মরে যাব।"

"তুমি শুনেছ নিজের কানে?"

"হ্যাঁ"। জয়া গলার স্বর আরও চেপে বলল, "দুদিন আগে রাত বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি হচ্ছিল। দরজা খুলে বারান্দায় গেলুম। হঠাৎ শুনি

বড়দার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। ছুটে ওর ঘরের দিকে গেলুম। চমকে উঠলুম বড়দার কথা শুনে। বড়দা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমিই জয়াকে বিধবা করে ফেলেছি! ভগবান, আমাকে শিগগির মেরে ফেলো! দরজায় নক করে ওকে ডাকলুম। অমনি আলো নিভে গেল ঘরের ভেতর। বড়দার কোনো সাড়াই পেলুম না। তখন অবাক হয়ে ফিরে এলুম।"

"তোমার মনে হয় না হঠাৎ ঝোঁকের বশে জয় মানুষ খুন করতে পারে?"

জয়া জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না। বড়দা মনে মনে ভীষণ ভিতু। খুব দয়ালু ছেলে বড়দা। ওই যে চিড়িয়াখানা করেছে, জন্তু আর পাখিগুলোকে কী যে ভালবাসে ভাবতে পারবেন না। তাছাড়া ওর মুখেই যত হাঁকডাক। ভেতর-ভেতর খুব ভিতু আর গোবেচারা।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, "জয়ের কাকাতুয়ার জিভ কেটে বোবা করে দিয়েছিল কেউ। এসম্পর্কে তোমার কী ধারণা?"

জয়া ঈষৎ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, "রঙ্গিয়ার কাছে শুনেছি বড়দা নাকি পাখিটাকে অসভ্য কথা শেখাত।"

"বেশ। তাই যদি হয়, কে পাখিটার জিভ কেটেছিল বলে তোমার সন্দেহ হয়?"

জয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে বলল, "আমার সন্দেহ কাকাবাবুকে।"

"বিপ্রদাসবাবুকে?"

জয়া মাথাটা একটু দোলাল।

"কেন, বলতে আপত্তি আছে?"

জয়া মুখ তুলল এবং কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না। সেই সময় বিজয় হন্তদন্তভাবে ঘরে ঢুকে বলল, "জানিস জয়া? আমাদের বাড়িতে নিশ্চয় ভূত আছে।"

কর্নেল বললেন, "কী ব্যাপার, বিজয়?"

বিজয় ধপাস করে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে বলল, "ইশ! এখনও বুকটা কাঁপছে। ভাবা যায় না।"

জয়া বিরক্তভাবে বলল, "কী হয়েছে বলবে তো?"

বিজয় চাপা গলায় বলল, "কয়েক লাইন লিখেছি—বেশ এগোচ্ছে লেখা, হঠাৎ আলো নিভে গেল ঘরের। তারপর খসখস শব্দ—কেউ যেন ঘরে ঢুকেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। ইশ! এখনও বুকটা—"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এস তো দেখি।"

বিজয় কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে বলল, "চলুন। কিন্তু আমি পেছনে থাকব।"

জয়াও অনুসরণ করল। কিন্তু কর্নেল বললেন, "জয়া, তুমি বারান্দায় থাক—

অথবা তোমার দরজায় তালা এঁটে তবে এস।"

জয়া বিস্মিত হল। বলল। "ঠিক আছে। আমি এখানেই থাকছি।"

জয়ার ঘরের পাশেরটা তালাবন্ধ। তার পরেরটা বিজয়ের ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে দেখে বিজয় অবাক হয়ে বলল, "এ কী! আলো জ্বলছে দেখছি যে! ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!

কর্নেল ও বিজয় ঘরে ঢুকল। বিজয় বলল, "তার চেয়ে অদ্ভুত, আমি টেবিলল্যাম্প জ্বেলে লিখছিলুম। কিন্তু দেখুন কর্নেল, টেবিলল্যাম্পের প্লাগটা সুইচবোর্ডে অফ করা আছে। ওটা অন করেই লিখছিলুম। আর বড় আলোটা কেউ জ্বেলে দিয়ে গেছে।"

কর্নেল টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "বিজয় কি বাংলাভাষায় কবিতা লেখ?"

বিজয় অবাক হয়ে বলল, "না তো। হিন্দি আমার মাতৃভাষা। হিন্দিতেই লিখি।"

"ওই বাংলা দুলাইন পদ্য তাহলে তোমার নয়। ভূতটাই লিখে গেছে।"

বিজয় কবিতার খাতার ওপর ঝুঁকে গেল। বলল, "কী আশ্চর্য!"

কর্নেল বললেন, "ভূতটা রসিক। পড়ে দেখ, কী লিখেছে।"

বিজয় বাংলা পড়তে পারে। সে পড়ল ঃ

"বামুন গেছে যমের বাড়ি।
বুড়ো ঘুঘু ছিঁড়বে দাড়ি" ॥

বিজয় হাসতে হাসতে বলল, "ধাঁধা নাকি? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না ...!"

কর্নেল গুম হয়ে বললে, "তোমার খাতায় ছড়া লিখে আমার সঙ্গেই রসিকতা করে গেছে কেউ। তুমি হয়তো জানো না বিজয়, আমাকে পুলিসমহলে রসিকতা করে বুড়ো ঘুঘু বলে থাকে। কিন্তু বামুন গেছে যমের বাড়ি—মাই গুডনেস!" কর্নেল নড়ে উঠলেন। "বিপ্রদাস মুখুয্যেমশাইয়ের কোনো বিপদ হানি তো? কিংবা মাধবজি—বিজয়, তুমি বুদ্ধুরামকে বলো, মাধবজি ঠিক আছেন কি না খোঁজ নিয়ে আসুক!"

বিজয় বারান্দার থামের পাশে কার্নিসে ঝুঁকে বুদ্ধুকে ডাকতে থাকল। কর্নেল পদ্যটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন জয়া বলল, "কী হয়েছে, কর্নেল?"

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ঘরে চলো, বলছি!"

॥ পরিতোষ এবং রমলা ॥

বুদ্ধুরাম ফিরে এসে খবর দিয়েছিল, মাধবজি দোঁহা আওড়াতে আওড়াতে রোটি পাকাচ্ছেন। তবিয়ত ঠিক আছে। বুদ্ধুরামের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে বিরক্ত হয়েছে কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে। এই বুড়ো ভদ্রলোক এসে তার ঝামেলা

বাড়াচ্ছেন, যেন এরকম তার মনোভাব। খামোকা তাকে ভাগলপুর পাঠাতে চাওয়া! দৌড়তে দৌড়তে ঠাকুরদালানে পাঠানো! হয়েছেটা কী এত?

কথাটা রঙ্গিয়া চুপিচুপি জয়াকে বলতে এসেছিল, কর্নেল তখনও জয়ার কাছে বসে কথা বলছিলেন তার ঘরে। জয়া বলেছিল, "বুদ্ধুটা খুব কুঁড়ে আসলে। নছি সিংয়ের সঙ্গে দাবা খেলতে পেলে আর কিছু চায় না।" কিছুক্ষণ পরে কর্নেল নিচের তলায় উঁকি মেরে দেখলেন, তাই বটে। সদর দরজার পাশের ছোট্ট ঘরটায় নছি সিং আর সে থাকে। সেই ঘরে দুজনে দাবা নিয়ে বসেছে।

বিজয় তখন তার ঘরের দরজা বন্ধ করে কবিতা লিখতে বসেছে ফের। কর্নেল গেস্টরুমে কিছুক্ষণ একা গুম হয়ে বসে থাকলেন। তারপর টর্চ নিয়ে বেরুলেন। বাড়ি একেবারে সুনসান। কিচেনে কলাবতী, রঙ্গিয়া আর বৈজু ঠাকুরকে চাপা গলায় কথা বলতে দেখা যাচ্ছিল। নানকুর ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে আলো জ্বলছে। সে কী করছে বোঝা গেল না। বিজয় বলেছে, নানকু রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে চিড়িয়াখানার আউট-হাউসে শুতে যায় ইদানীং— শরদিন্দুর মৃত্যুর পর তার ওপর জয়ের নাকি এই হুকুম।

বৈজুর ঘর আর নানকুর ঘরের মাঝামাঝি খিড়কিরাস্তার করিডোর। কর্নেল নিঃশব্দে সেই দরজা খুলে এবং ভেজিয়ে দিয়ে বেরুলেন। সেপ্টেম্বরের নক্ষত্রজ্বলা আকাশের নিচে জংলা জমি জুড়ে যেন রহস্য থমথম করছে। ভ্যাপসা গরম। বেশ কিছুদিন এ তল্লাটে বৃষ্টি হয়নি। কর্নেল টর্চ জ্বালতে গিয়ে জ্বাললেন না। জয়ের ঘরের ব্যালকনি থেকে নেমে আসা ঘোরানো লোহার সিঁড়ির কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন। অমনি জয়ের কুকুরটার গজরানি কানে এল। কিন্তু কুকুরটা ওপরে গজরাচ্ছে না, সামনের দিকে জংলা জমিতেই সে কোথাও আছে। জয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। কুকুরটা কি সারারাত বাইরে ছাড়া থাকে?

কর্নেল নালা ও পুকুরের সঙ্গমস্থলে যেতেই ফের কুকুরটা গরগর করে উঠল। পুকুরপাড় ধরে একটু এগিয়ে কর্নেল বুঝলেন, কুকুরটা হরটিলার ওখানে আছে। কারণ তিনি যত এগোচ্ছিলেন, তত তার গজরানি বাড়ছিল। তারপর তাঁর গায়ে টর্চের আলো পড়ল। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "জয় নাকি?"

টর্চ নিভে গেল। কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "এখানে কী করছ জয়।?"

অন্ধকার থেকে জয় বলল, "যাই করি, আপনার কী মশাই? আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—এক পা এগোবেন না। সনিকে লেলিয়ে দেব।"

"সনি আমাকে ভয় পায়। তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো ডার্লিং, যদি ওকে—"

"ডার্লিং? গায়ে পড়ে আত্মীয়তা আমার বরদাস্ত হয় না বলে দিচ্ছি।"

"অভ্যাস—নিছক অভ্যাস ডার্লিং বলা।" কর্নেল হাসলেন। "যাই হোক, আশাকরি বুঝতে পারছ সনি আমাকে ভয় পায়।"

জয় ধমক দিল। "সনি! সনি! কী হয়েছে তোর?"

হরটিলার সিঁড়ির ওপরদিকে সনির ডাক শোনা গেল। এবার যেন নিরাপদে পৌঁছে কর্নেলকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিতে শুরু করেছে। জয় বলল, "আশ্চর্য তো!"

"জয়! তার চেয়ে আশ্চর্য তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা। তুমি কি হরটিলার মন্দির পাহারা দিচ্ছ?"

জয়ের গলার স্বর বদলে গেল। "আপনি কেমন করে জানলেন"?

"জানি। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি, ডার্লিং!

জয় দাঁড়িয়েছিল একটা পাথরের কাছে। কয়েক-পা এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন ফের, "কিছুক্ষণ আগে জয়া তোমাকে যা সব বলে এসেছে, তা আমারই পরামর্শে। ভেবেছিলুম, তুমি ওর কথায় পাত্তা দেবে না। কিন্তু পাত্তা দিয়েছ এবং সরাসরি কাজে নেমেছ দেখে আমি খুশি হয়েছি, ডার্লিং!"

"কে আপনি? আমাদের ব্যাপারে আপনার কেন মাথাব্যথা বলুন তো?"

"আমি তোমাদের হিতৈষী।"

একটু চুপ করে থাকার পর জয় বলল, "আপনি পুলিশের লোক?"

"মোটেও না।" কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সনি পাহারা দিক। ততক্ষণ আমরা খোলা জায়গায় গিয়ে কথা বলি, যাতে আড়ি পেতে কেউ না শোনে। এস।"

জয় কথা মানল। নালার ধারে কিছুটা এগিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলামেলা ঘাসজমি। চারদিকে আলো ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "হরটিলার শিবলিঙ্গের বেদির তলায় কী আছে, তুমি জানো জয়"?

জয় খুব আস্তে বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে—"

"হুঁ—বলো ডার্লিং!"

"রমলার ডেডবডি লুকোনো আছে হয়তো।"

কর্নেল চমকে উঠলেন। "কে রমলা!"

"স্কাউন্ড্রেল পরিতোষের বোন।"

"পরিতোষ মানে—যে ছিল শরদিন্দুর ব্যাংকের সহকর্মী?"

"হ্যাঁ। পরিতোষ জুয়াড়ি চোর বদমাস। কিন্তু তার বোন রমলা ছিল উল্টো।" বলে জয় ওঠার চেষ্টা করল। "না, এর বেশি আমার বলা চলে না। আমার মুখ বন্ধ।"

কর্নেল তাকে টেনে বসতে বাধ্য করলেন। জয় একটু অবাক হয়ে বলল, "আপনার গায়ে দেখছি সাংঘাতিক জোর। আপনাকে ভীষণ বুড়ো দেখে ভেবেছিলুম। আপনি কেন এসব সাংঘাতিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন?"

"প্লিজ ডার্লিং। আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু। আমাকে কিছু গোপন কোরো না। তাতে তোমার জীবন নিরাপদ হবে।"

"কেন? আমাকে কি কেউ রমলার বা শরদিন্দুর মতো মেরে ফেলবে?"

"তাহলে তুমি জানো শরদিন্দু চিতাবাঘের হাতে মারা পড়েনি?"

জয় গলার ভেতর বলল, "হ্যাঁ!"

"শরদিন্দুকে কে মেরেছে বলে তোমার ধারণা, জয়?"

"বলব না। মুখ বন্ধ।"

"বেশ কীভাবে ওকে মারা হয়েছিল, সেটা অন্তত বলো।"

"বাঘনখ দেখেছেন কি? আগের যুগে এসব অস্ত্র ব্যবহার করা হত।"

"দেখেছি—অনেক রাজবাড়ির অস্ত্রাগারে আছে।"

"ইতিহাসে পড়েছি শিবাজি বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁকে মেরে ফেলেছিলেন। বাঘনখ আমাদের বাড়িতেও আছে। মানে—ছিল। আর নেই। শরদিন্দু মারা যাওয়ার পর আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোন ঘরে তোমাদের অস্ত্রাগার?"

"আমার ঘরের পাশের ঘরে। বাইরে তালাবন্ধ। কিন্তু আমার ঘর দিয়ে ঢোকা যায়।"

"শরদিন্দু কেন অত রাতে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল?"

"আমি পরিতোষের সঙ্গে ওর মিটমাট করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পরিতোষ ব্যাংকের চুরিকরা টাকার একটা শেয়ার হিসেবে চৌষট্টি হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিল। চুরিকরা টাকার অর্ধেকটা পরিতোষের কাছে মজুত ছিল। পরিতোষ চোর, জুয়াড়ি, স্কাউন্ড্রেল। কিন্তু বোনকে ভীষণ ভালবাসত। বোনের খোঁজেই সে এখানে—"

জয় থামলে কর্নেল বললেন, "হুঁ! বলো ডার্লিং!"

"রমলার কথা বলব না। অন্য কথা জানতে চাইলে বলব।"

"বেশ। বলো, শরদিন্দু কীভাবে মারা পড়ল?"

জয় একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "পরিতোষের নামেও হুলিয়া ঝুলছে পুলিশের। ব্যাংকে চুরির পর শরদিন্দুকে ধরল। তার জেল হল। কিন্তু পুলিশ পরিতোষকেও সন্দেহ করেছিল। তাই সে গা ঢাকা দিয়েছিল ব্যাপারটা আঁচ করেই।"

"শরদিন্দু কীভাবে মারা পড়ল বলো?"

"আউট-হাউসে পরিতোষের থাকার কথা ছিল। রাত এগারোটা নাগাদ আমি শরদিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি গেলুম। মিটমাট হয়ে গেল। শরদিন্দু আমার অনুরোধে একটু হুইস্কি খেতে গিয়ে শেষে বেশ কয়েক পেগ খেয়ে ফেলেছিল। তখন সে বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। আসলে মদ খাওয়ার অভ্যাস বেচারার সত্যি ছিল না। সে মাতাল অবস্থায় অনেক কথা বলছিল। টাকাগুলো পাপের। কিন্তু সে মিছিমিছি জেল খেটেছে। কাজেই টাকাগুলো তার ধর্মত পাওনা। টাকা পেয়ে সে কলকাতা নিয়ে যাবে জয়াকে। এবাড়িতে তার থাকা তার নিজের পক্ষে এবং জয়া বা আমাদের সবার পক্ষেই অপমানজনক। কারণ লোকে

স্ক্যান্ডাল ছড়াচ্ছে শরদিন্দু-জয়াকে নিয়ে।...এইসব বলার পর হঠাৎ সে বলে গেল, রমলাকে খুন করা হয়েছে। কে খুন করেছে এবং কোথায় ডেডবডি লুকোনো আছে সে জানে। তবে এখন বলবে না। পরিতোষ টাকা দিলেই সে বলবে। এদিকে পরিতোষ আর আমি ওর কথা শুনে তো ভীষণ উত্তেজিত। সাধাসাধি করেই ওর কাছে কথাটা আদায় করা গেল না। শরদিন্দু গোঁ ধরে বলল, পরদিন এমনি সময় পরিতোষ যখন টাকা নিয়ে আসবে, টাকা আগে গুনে নিয়ে তবে সে সেকথা ফাঁস করবে। যাইহোক পরিতোষ গেল গঙ্গার পাড় দিয়ে। আমি তাকে এগিয়ে দিয়ে আউট-হাউসের দরজা বন্ধ করছি, তখনই শরদিন্দুর চাপা গোঙানি শুনতে পেলাম। তখন চিতাবাঘের খাঁচাটা ছিল বাইরে। খাঁচার সামনে শরদিন্দু পড়ে ধড়ফড় করছে আর তার খুনী পালিয়ে যাচ্ছে। একে রমলাকে খুন করা হয়েছে শুনে আমার মাথার ঠিক নেই, তার ওপর ওই সাংঘাতিক ঘটনা। আউট-হাউসের যে ঘরে আমরা কথা বলছিলুম, সেই ঘরের জানালা দিয়ে আলো আসছিল। সেই আলোয়—থাক। আমার মাথা ঘুরছে।"

জয় দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধরে দুহাঁটুর ফাঁকে মুখ নামাল। কর্নেল তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "জয়! ডার্লিং! মন শক্ত করো।"

জয় মাথা তুলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "আমার বোন আমারই দোষে বিধবা হয়ে গেছে কর্নেল! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। অথচ মরতেও পারি না। খালি মনে হয়, রমলা হয়তো বেঁচে আছে। শরদিন্দু হয়তো টাকা পাওয়ার লোভে মিথ্যা বলেছিল। হয়তো রমলাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কর্নেল, এই ধাঁধার জন্যই আমার মরা হল না। নইলে কবে আমি—"

হরটিলার মন্দিরে জয়ের কুকুরটার ডাক ভেসে এল। জয় অমনি "সনি" বলে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গেল।

কর্নেল ভাবলেন তাকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু করলেন না। মনে হল, জয় এখন নিরাপদ—অন্তত তিনি যতক্ষণ কানাজোলে আছেন।

শুধু একটিই উদ্বেগ আপাতত—বিপ্রদাসের জন্য। ভৌতিক ছড়াটা নিছক রসিকতা না হতেও পারে।...

॥ বিজয়ের সংশয় ॥

খেতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেছে। ডাইনিং রুমে এ-রাতে জয়া খেল কর্নেল ও বিজয়ের সঙ্গে। জয়ের খাবার কলাবতী পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

জয়া চলে গেলে কর্নেল বিজয়কে বললেন, "এসো বিজয়, কিছুক্ষণ গল্প করি। নাকি তোমার কবিতার মুড চলে যাচ্ছে?"

বিজয় হাসল। "নাঃ! কোনো মুড নেই আজ। আমার তো ঘরে ঢুকতেই ভয় হচ্ছে। ভাবছি, আপনার কাছে এসে শোব।"

"স্বচ্ছন্দে। গেস্টরুমে তো আরেকটা খাট আছে। অসুবিধে নেই।"

বিজয় খুশি হয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাকল, "বুদ্ধু! শুনে যা!" বুদ্ধু এলে সে তাকে তার ঘরে তালা আটকে দিতে বলল। চাবি দিল। বুদ্ধু একটু পরে চাবিটা ফেরত দিয়ে গেল।

গেস্টরুমের দ্বিতীয় খাটে বিছানা পাতাই ছিল। বিজয় বলল "যাক্। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। ধোঁয়ার ভেতর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা বিজয়, জয় হঠাৎ কলকাতা থেকে পড়াশুনা ছেড়ে চলে এসেছিল কেন বলো তো?"

বিজয় বলল, "ছেড়ে ঠিক আসেনি। বি. এ. পাশ করেছিল। কিন্তু এম. এ.-তে ভর্তি হয়নি।"

"শরদিন্দুর সহকর্মী পরিতোষকে তুমি কখনও দেখেছ?"

"না তো!" বিজয় অবাক হল। "কেন?"

"জয়ের সঙ্গে তার আলাপ ছিল।"

"বিজয় আরও অবাক হয়ে বলল, তাই বুঝি! জয়া বলছিল নাকি?"

কর্নেল চোখ বুজে বললেন, "হ্যাঁ।"

"সেটা সম্ভব। জয় শরদিন্দুর কলিগকে দেখে থাকবে। তবে আমি তাকে দেখা দূরের কথা, সবে আজ বিকেলে মাধবজির মুখে তার নাম শুনলাম।" বিজয় একটু পরে ফের বলল, "জয়া বলেছে দাদার সঙ্গে পরিতোষের আলাপ ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বিশ্বাস করি না। জয়া বড্ড ভুলভাল কথা বলে।"

"তাহলে তুমি রমলাকেও চেনো না?"

বিজয় চমকে উঠল। "রমলা! সে আবার কে!"

"পরিতোষের বোন। জয়ের সঙ্গে তার—" একটু বিরতি দিয়ে চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে কর্নেল বললেন, "জয়ের সঙ্গে রমলার এমোশনাল সম্পর্ক ছিল।"

"বলেন কী! জয়া বলেছে আপনাকে? নাকি জয়ের কাছ থেকে শুনলেন?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল এমনভাবে হ্যাঁ বললেন, যাতে বোঝা যায় না কার কাছে শুনেছেন।

বিজয় জোরে মাথা নেড়ে বলল, "জয়া বড্ড বানিয়ে বলে। এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন?"

বিজয় নড়ে বসল। "দাদার কোনো ব্যাপার আমার অজানা নেই। বিশেষ করে কলকাতায় হোস্টেলে থাকার সময় দাদার কোনো প্রেমের ব্যাপার থাকলে আমি নিশ্চয় জানতে পারতুম।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ছোটভাইকে ওসব কথা বলা যায় না—অথবা ছোটভাইয়ের চোখের আড়ালেই দাদার গোপন প্রেম করা স্বাভাবিক।"

বিজয় জোর গলায় বলল, "জয় সে-রকম দাদা নয়। মাত্র ছ'ঘণ্টা পরে আমার জন্ম। কাজেই আমার বন্ধুর মতো। ওকে আমি নাম ধরে ডাকি, নিশ্চয় লক্ষ করেছেন?"

কর্নেল হাসলেন। "কিন্তু ইদানীং জয়ের অনেক গোপন ব্যাপার তোমার জানা নেই। এবং নেই বলেই তুমি রহস্যের ধাঁধায় পড়ে আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলে। আমাকে নিয়ে এসেছ তার জট ছাড়াতেই।"

"হ্যাঁ। ইদানীং শরদিন্দু মারা যাবার পর থেকে জয় আমাকে কিছুই জানতে দিচ্ছে না আগের মতো।"

"অথচ সেটাই তুমি জানতে চাইছ, এই তো?"

বিজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, শুধু তাই নয়। আপনাকে বলেছি—আমার ভয় হচ্ছে জয় সুইসাইড না করে। ওর পাগলামি যে হারে বাড়ছে।"

কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন "জয়ের গোপন রহস্যের একটা আমি ধরতে পেরেছি।

"কী বলুন তো?"

"রাতে জয়ের ঘরে তুমি জয়কে কার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলে এবং এক রাত্রে কাউকে ব্যালকনির ওই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে দেখেছিলে। আশা করি, কে সে এবার বুঝতে পারছ।"

বিজয় শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "পরিতোষ?"

"ঠিক ধরেছ। তুমি বুদ্ধিমান।"

বিজয় চাপা স্বরে বলল, "পরিতোষের সঙ্গে জয়ের কী ব্যাপার চলছে বলে মনে হয় আপনার?"

"এখনও এতটা এগোতে পারিনি। তবে—"

বিজয় দ্রুত বলল, "পরিতোষ কি তার বোন রমলার ব্যাপারে জয়কে ব্ল্যাকমেইল করেছে?"

"বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। আরও একটু গোপন তদন্ত দরকার।"

"কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে, তাহলে পরিতোষকে জয় এ বাড়িতে গোপন আশ্রয় দিয়েছে। তিনটে ঘর বন্ধ আছে ওপরে। তারই কোনোটাতে পরিতোষ লুকিয়ে থাকতে পারে।"

বিজয় খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কর্নেল বললেন, "তাও সম্ভব। বিপ্রদাসবাবু না ফিরলে তো ওসব ঘরের চাবিও পাওয়া যাবে না। দেখা যাক।"

বিজয় দমআটকানো গলায় বলল, "সব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কর্নেল। আজ পরিতোষই তাহলে জয়াকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে কৌটো হাতিয়েছে। নিশ্চয় ওর মধ্যে কিছু দামি জিনিস ছিল!"

"চাবি!"

"কিন্তু কিসের চাবি?" বিজয় একটু হাসল। "হ্যাঁ—হরটিলায় তখন আপনি চাবির কথা বলেছিলেন।"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হরটিলার মন্দিরের ভেতর যে শিবলিঙ্গ আছে, তার বেদিটা সম্ভবত একটা গোপন সিন্দুক। চাবিটা সেই সিন্দুকের। চাবিচোর তাড়াতাড়ি জোর করে সিন্দুকের তালা খোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে চাবিটা ভেঙে ফেলেছিল।"

"সর্বনাশ! আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল একটু হাসলেন। "তবে ব্যাপারটা কীভাবে জয়ও জেনে গেছে। সে তার কুকুরটাকে হরটিলায় পাহারায় রেখেছে দেখে এসেছি।"

বিজয় চমকে উঠল। তারপর বলল "চাবি-চোর পরিতোষ। পরিতোষই জয়কে বলেছে, ওখানে গুপ্তধন আছে। ভাগ দেবে বলে লোভ দেখিয়েছে। সত্যি, জয় এমন বোকা হবে ভাবতে পারিনি। যাতে অন্য কেউ টের পেয়ে ওখানে হানা দেয়, তাই সনিকে পাহারায় রেখেছে। সনি তো পরিতোষকে কিছু বলে না। তাই তার অসুবিধে নেই।"

কর্নেল হাসলেন। "আচ্ছা বিজয়, সিন্দুকের ভেতর যদি গুপ্তধনের বদলে অন্য কিছু থাকে?"

"আর কী থাকবে? পরিতোষকে নিশ্চয়ই জয়ই নেশার ঘোরে বলেছে ওর ভেতরে আমাদের পূর্বপুরুষের গুপ্তধন আছে। জয় বড্ড বোকা। গায়ের জোর ছাড়া আর কিছু নেই ওর।"

"বিজয়, যদি সিন্দুকের ভেতর একটা ডেডবডি লুকোনো থাকে?"

বিজয় ভীষণ চমকে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "ডেডবডি? কার ডেডবডি?"

"ধরো পরিতোষের বোন রমলার?"

বিজয় শিউরে উঠে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "প্লিজ! প্লিজ কর্নেল! এসব কথা বললে আমি হার্টফেল করে মারা পড়ব। আমার হাত-পা কাঁপছে!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ। জাস্ট কথার কথা। শুয়ে পড়ো। এগারোটা বাজে।"

বিজয় মশারি টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বলল, "আজ রাতে আমার ঘুম হবে না।"

ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে কর্নেল ফের বললেন, "ঘুমোও।"

একটু পরে বিজয় ডাকল, "কর্নেল!"

"বলো ডার্লিং!"

"পদ্যটা তাহলে পরিতোষই লিখেছে তাই না! বাংলা তার মাতৃভাষা। কাজেই—"

"আচ্ছা বিজয়!"

"বলুন।"

"তুমি দাড়ি রাখতে শুরু করেছ কবে থেকে?"

"তা অনেকদিন হয়ে গেল। কেন?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি। ঘুমোও।"

তারপর কর্নেলের নাক ডাকতে থাকল। বিজয় ডাকাডাকি করে আর সাড়া পেল না।...

॥ জয়কে নিয়ে সংশয় ॥

ভোরে অভ্যাসমতো কর্নেল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। বিজয় তখন গুটোসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। রাতে ও ঘুমোয়নি ভেবেই কর্নেল তাকে ডাকেননি আজ।

প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির আউটহাউসের ওপাশ ঘুরে যখন পুবের ভাঙা ফটকের কাছে পৌঁছলেন, তখন সূর্য উঠেছে। ফটকের এধারে প্রচুর পাথরের স্তূপ। তার ফাঁকে গুল্মলতায় শরতের সজীবতা ঝিকমিক করছিল। শিশিরের ফোঁটায় প্রতিফলিত হচ্ছিল রক্তাভ রোদ। গঙ্গার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সৌন্দর্য দেখলেন। তারপর পাঁচিলের ভাঙা জায়গা দিয়ে রাজবাড়ির এলাকায় ঢুকলেন কর্নেল।

বাঁদিকে হরটিলা পর্যন্ত অসমান জমি জুড়ে আর ঝোপঝাড় শিশিরে চবচব করছে। সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ ধরে হরটিলার দিকে যেতে জুতো-প্যান্ট ভিজে সপসপে হয়ে গেল। একখানে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে চোখ রেখে মন্দিরটা দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন।

জয় মন্দিরের সামনে পাথরের ওপর বসে আছে একা। পাশে দাঁড়িয়ে তার কুকুর সনি।

হরটিলার পাথরের ধাপে কর্নেল পা রাখতেই কুকুরটা ওপরে গরগর করে উঠল। কর্নেল যখন কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন শুনলেন, জয় সনিকে ডাকাডাকি করছে।

কর্নেলকে দেখে সে গম্ভীর হল। কোনো কথা বলল না। কর্নেল বললেন, "গুডমর্নিং জয়।" জয় তারও জবাব দিল না।

কর্নেল চূড়ায় উঠে একটু হেসে বললেন, "আশাকরি, তুমি সারারাত এখানে বসে নেই?"

জয় বলল, "আপনাকে দেখে সনি এত ভয় পায় কেন? কী ব্যাপার?"

কর্নেল বললেন, "ফর্মুলা-টোয়েন্টির পাল্লায় পড়লে সব কুকুরই ভড়কে পিছু হটে।"

"তার মানে? আপনার দেখছি সব তাতেই হেঁয়ালি?"

কর্নেল তার একটু তফাতে পাথরটার অন্যপ্রান্তে বসে বললেন, "কতক্ষণ এসেছ?"

জয় আস্তে বলল, "কতক্ষণ কী! আমি সারারাত এখানে আছি।"

"সে কী!"

"রমলার ডেডবডি খুনী সরিয়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি তা টের পেয়েছি।"

"কিন্তু তুমি ধরে নিচ্ছ এখানেই ওর ডেডবডি আছে?"

"জয়ার কাছ থেকে শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে—" সে হঠাৎ থেমে বলল, "আপনি যা সব জয়াকে বলেছেন, তা কি বিজয়কেও বলেছেন?"

"মোটামুটি আভাস দিয়েছি।"

"বিজয় কী বলল?"

"সে ডেডবডিতে বিশ্বাস করে না। কারণ রমলাকে চেনে না। পরিতোষকেও চেনে না।"

"বিজয় পরিতোষকে না চিনতেও পারে।"

"রমলাকে?"

জয় রুক্ষস্বরে বলল, "বিজয় তো বলেছে রমলাকে চেনে না। আবার ওকথা কেন?"

"জয়! আমাকে একটা কথার জবাব অন্তত দাও। রমলার খোঁজে পরিতোষ কানাজোলে এসেছিল বলেছ। রমলা কবে তোমার কাছে এসেছিল?"

জয় একটু চুপ করে থাকার পরে বলল, "আজ তারিখ কত?"

"২৩ সেপ্টেম্বর।"

"শরদিন্দু খুন হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। রমলা এসেছিল ৯ সেপ্টেম্বর। কিছু বুঝলেন?"

"শরদিন্দু যেভাবেই হোক জানত রমলা এসেছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে। তাই শরদিন্দুকে মরতে হয়েছে। বেঁচে থাকলে সে ১৪ সেপ্টেম্বর রাতেই ফাঁস করে দিত—"

"সে তো বলেছ। আমি জানতে চাই, রমলা ৯ সেপ্টেম্বর কোথায় এল? সরাসরি রাজবাড়িতে তোমার কাছে তো?"

জয় একটু শ্বাস ছেড়ে বলল, "রমলা চিঠি লিখে জানিয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে-ছটায় আপ দিল্লি এক্সপ্রেসে পৌঁছুবে কানাজোল স্টেশনে। ছটার আগেই রেডি হয়ে বেরুতে যাচ্ছি, নানকু এসে খবর দিল ময়াল সাপটার খাঁচা খোলা—সাপটা পালিয়েছে। দৌড়ে জুতে গেলুম। একঘণ্টা তন্নতন্ন করে খুঁজে সাপটাকে পাওয়া গেল নালার কাঠের ব্রিজের তলায়। তাকে খাঁচায় পুরে স্টেশনে পৌঁছেছি প্রায় সওয়া সাতটা। ট্রেন মিনিট কুড়ি আগে ছেড়ে গেছে। খুঁজে-খুঁজে রমলাকে দেখতে পেলুম না।"

জয় থামলে কর্নেল বললেন, "তারপর?"

"ক্ষমা করবেন কর্নেল, আর আমি বলব না।"

"তুমি কলকাতা থেকে কেন হঠাৎ চলে এসেছিলেন জয়? কেন তুমি আর পড়াশুনা করতে চাওনি?"

"জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আর কোনো কারণ নেই।"

"কেন ঘেন্না ধরেছিল?"

"অত কেন্নর জবাব আমি দেব না। আপনি প্লিজ আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমার মাথা ঘুরছে।"

"রমলার ব্যাপারটা কী?"

জয় খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়াল। "আঃ! বড্ড জ্বালাতন করেন আপনি!"

বলে সে সনির খোঁজে মন্দিরের পূর্বপাশে গেল। সনি ঝোপের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছিল। দৌড়ে তার বকলেস ধরে গলায় পরানো চেন খুলে তাকে টানতে টানতে জঙ্গল ভেঙে নেমে গেল জয়।

কর্নেল গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর মন্দিরের ভেতর গুঁড়িমেরে ঢুকলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন বেদির ওধারে ভাঙা চাবিটা তেমনি আটকানো আছে।

বেরিয়ে এসে পাথরটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন কর্নেল।

কর্নেল ভাবছিলেন, যদি সত্যি এই বেদির ভেতর রমলার লাশ লুকোনো থাকে এবং খুনী যদি এতদিন পরে লাশটা সরানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় ঃ

(এক) সে খুন করেছিল কিন্তু লাশ ফেলে রেখে গিয়েছিল। অন্য কেউ লাশটা এই মন্দিরে বেদির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। এতদিনে সে লাশের খোঁজ পেয়েছে।

(দুই) এতদিনে খোজ পেয়েছে বলেই বেদির চাবি চুরি করেছে ঝুঁকি নিয়ে এবং ওঁত পেতে বেড়াচ্ছিল। বিপ্রদাসের জয়াকে কৌটো দেওয়া সে দেখেছিল। কৌটোতে কী আছে সে জানতে পেরেছিল।

(তিন) বিপ্রদাসই লাশটা এখানে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। নিশ্চয় কাউকে বাঁচানোর জন্যই এ-কাজ করেছিলেন।

(চার) রমলা খুন হয়েছিল কারুর প্রতিহিংসা বশে—কিংবা তাকে রেপ করাও হয়ে থাকবে।

(পাঁচ) নিচের নির্জন জঙ্গলেই কোথাও রেপ এবং খুন করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়েছিল কেউ।

কিন্তু এই পাঁচটা পয়েন্ট পুরো ঘটনাটা পরিষ্কার করছে না। প্রচুর ফাঁক থেকে যাচ্ছে। প্রশ্ন থাকছে অসংখ্য। কর্নেল আবার উদ্বিগ্ন হলেন বিপ্রদাসের জন্য। বিপ্রদাস অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন। সবার আগে এখন তাঁকে দরকার।

টিলা থেকে নামতে চোখে পড়ল একটা সুন্দর প্রজাপতি সবে ঘুম ভেঙে ঘাস থেকে শিশির ঝেড়ে উড়ে চলেছে। তাকে লক্ষ্য করে জোরে নামতে

থাকলেন। কিন্তু নিচে এসে হারিয়ে ফেললেন প্রজাপতিটাকে। পুকুরের কাছে আসতেই দেখা হয়ে গেল মাধবজির সঙ্গে। মাধবজি ঘাটের ধাপে বসে লোটা মাজছিলেন—বললেন, "নমস্তে কর্নেলসাব!"

"নমস্তে মাধবজি!"

"বেড়াতে বেরিয়েছিন বুঝি?"

কর্নেল ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকলেন মাধবজির সঙ্গে। একথা সেকথার পর কর্নেল বললেন, "আচ্ছা মাধবজি, আপনার নজর তো সবদিকেই থাকে।"

মাধবজী হাসলেন। "সব সময়ে থাকে না। কালও বলেছি আপনাকে।"

"বলেছেন।" কর্নেল হাসলেন। "কিন্তু ধরুন, বিশেষ কোনো ব্যাপার ঘটলে আপনার নজরে পড়তে পারে।"

"তা পারে।"

"ধরুন, কোনো বাইরের লোক রাজবাড়ির এই এলাকায় এলে আপনার চোখে পড়তেও পারে।"

"কী জানি।"

"ধরুন, সন্ধ্যার পর কোনো মেয়ে—"

"জয়াবেটির কথা বলছেন কি? সে মাঝেমাঝে এদিকে ঘুরতে আসে দেখেছি।"

"জয়াকে আবছা আঁধারে চিনতে পারেন নিশ্চয়?"

"পারি। কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন কর্নেলসাব?"

"প্রায় দুসপ্তাহ আগে এক সন্ধ্যাবেলায় কোনো মেয়ে—না, জয়া নয়—বাইরের একটি মেয়ে এই বাগান আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে—"

মাধবজি চমকে উঠে তাকালেন। "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না কৃপা করে। আমি কিছু জানি না।"

"আমি শুধু জানতে চাই, মেয়েটি একা ছিল, না তার সঙ্গে কেউ ছিল?"

"কর্নেলসাব, আপনি নিশ্চয় পুলিশ অফিসার! আমাকে মাফ করবেন। বিশবছর রাজবাড়ির নিমক খাচ্ছি। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।"

"মাধবজি আমি পুলিশের অফিসার নই। আমি রাজবাড়ির হিতৈষী।"

"তাহলে আর কোনো কথা নয়। কথা তুললেই বিপদ।"

"আপনি শুধু বলুন ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এই এলাকায় কোনো বাইরের মেয়েকে দেখেছিলেন কি না?" কর্নেল চাপা স্বরে ফের বললেন, "আপনার কথার ওপর একজনের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।"

"সে কী!" অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাধবজি। "কৃপা করে বুঝিয়ে বলুন।"

"পরে বলব। আমার প্রশ্নের জবাব দিন আগে।"

মাধবজি এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, "ওই পূর্বের ফটক দিয়ে বড়কুমারসাবের সঙ্গে একটা অচেনা মেয়েকে ঢুকতে দেখেছিলাম। তখনও দিনের আলো সামান্য মতো ছিল। দুজনকে আউট-হাউসের টিলায় না গিয়ে দক্ষিণের জঙ্গল বরাবর আসতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। তারপর আর তাদের দেখতে পেলাম না। খুব খারাপ লাগল, বড়কুমারসাব শেষে এমন লম্পট হয়ে গেছে দেখে খুব দুঃখ হচ্ছিল।"

"আপনি ঠিক দেখেছিলেন বড় কুমারসাবকে?"

"হ্যাঁ। পরনে প্যান্টশার্ট ছিল। বড় কুমারসাব প্যান্টশার্ট পরে। ছোটো কুমারসাব ধুতিপাঞ্জাবি পরে।"

"তারপর?"

"হুজুর, আমি সামান্য মানুষ। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে কয়েক-পা এগিয়ে দ্রুত ঘুরে বললেন, "মেয়েটির লাশ আপনি দেখতে পেয়ে বিপ্রদাসকে খবর দিয়েছিলেন?"

নেহাত অনুমানে ঢিল ছোড়া। নিছক একটা সম্ভাবনার যুক্তিতে। কিন্তু ঢিলটি লক্ষ্যভেদ করল। মাধবজির মুখ সাদা হয়ে গেল। ঠোঁট ফাঁক করে রইলেন।

"আপনারা দুজনে লাশটাকে হরটিলার মন্দিরে বেদির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

মাধবজির ঠোঁট কাঁপছিল। অতিকষ্টে বললেন, 'বিপ্রদাসজি বলেছেন তাহলে?"

কর্নেল একটু হাসলেন শুধু।

মাধবজি এগিয়ে এলেন কাছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "বড়কুমারসাব একাজ করবেন ভাবতে পারিনি, হুজুর কর্নেলসাব! ওকে কিছুক্ষণ পরে দৌড়ে চলে যেতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তাই মেয়েটিকে খুঁজতে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি পড়ে আছে ঠাণ্ডা হিম হয়ে। ওঃ! সে এক সাংঘাতিক ঘটনা।"

কর্নেল হনহন করে ঠাকুরদালানের সামনে দিয়ে চলতে থাকলেন। মাধবজি খড়িতে আঁকা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

কর্নেল গৌরীটিলার পাথরের ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করলেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের এই টিলার মাথায় মন্দিরটা সামান্য বড় শিবমন্দিরটার চেয়ে। ভেতরে পাথরের ছোট গৌরীমূর্তি। সেখানে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে রাজবাড়ি দেখতে থাকলেন কর্নেল।

জয় ব্যালকনিতে বসে কিছু খাচ্ছে। সারারাত সত্যিই কি সে হরটিলায় পাহারা দিচ্ছিল? মাধবজি তাকেই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রমলার সঙ্গে দেখেছেন। পরে তাকে পালিয়ে যেতেও দেখেছেন, মেয়েটির লাশও আবিষ্কার করেছেন।

তাহলে বলতে হয়, জয় বড় দক্ষ চতুর অভিনেতা। কিন্তু কেন সে রমলাকে খুন করবে—যদি রমলা হয় তার প্রেমিকা?

বাইনোকুলারে রাজবাড়ির নিচের তলাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন কর্নেল। নিচের তলার বারান্দায় রঙ্গিয়া হেঁটে যাচ্ছে। নিজেদের ঘরে গিয়ে সে ঢুকল। দোতলার বারান্দায় জয়া দাঁড়িয়ে আছে। লেন্স অ্যাডজাস্ট করলে বিজয়ের ঘরের দরজার পর্দা ভেসে উঠল চোখে। মনে হল বিজয় তার ঘরে আছে।

হ্যাঁ। বুদ্ধুরাম বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। নিশ্চয় এবার ভাগলপুর যাচ্ছে সে। তারদিকে লক্ষ্য রাখলেন কর্নেল। একটু পরে তাকে পোর্টিকোর তলা থেকে বেরিয়ে প্রধান ফটকের দিকে যেতে দেখা গেল। তারপর সে রাস্তা ধরে হনহন করে চলতে থাকল বাজারের দিকে।

কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তর-পূর্বকোণে আউট-হাউস বা চিড়িয়াখানার টিলাটি দেখতে থাকলেন। হঠাৎ আউট-হাউসের শেষ জানালাটায় একটা মুখ দেখা গেল। তারপর নানকু যেন মাটি ফুঁড়ে গজাল এবং জানালাটার কাছে গেল। কথা বলছে দুজনে। ভেতরকার লোকটা—

কর্নে গৌরীটিলা থেকে নেমে বাগান ও ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলতে থাকলেন আউট-হাউসের টিলার দিকে। মাধবজি তখন ঠাকুরদালানে পুজোয় বসেছেন। ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।...

॥ 'বামুন গেছে যমের বাড়ি' ॥

নানকুর যেন জন্তুদের ইন্দ্রিয়। চিড়িয়াখানার তারের বেড়ার কাছে পৌঁছে কর্নেল দেখলেন, সে গিনিপিগের খাঁচায় ঘাস ঠেলে দিচ্ছে—পিঠ এদিকে। বন্ধ গেটের সামনে কর্নেল দাঁড়ালে সে ঘুরল এবং সেলাম করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আসুন স্যার!"

লোহার মজবুত গরাদ দেওয়া গেট খুলে দিল সে। কর্নেল সোজা আউট-হাউসের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। পেছনে নানকু জিজ্ঞাসার সুরে "স্যার" বলল। ডাইনে প্রথম ঘরটা খোলা এবং ভেতরে চিতাবাঘের খাঁচা রয়েছে। বাঁদিকের ঘরের দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। সামনে করিডোরের পর দেয়াল। কর্নেল বাঁদিকের দরজায় নক করে কোনো সাড়া পেলেন না। নানকু অবাক হয়ে নিচের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একবার বলল, "বড়কুমারসাব তো রাজবাড়িতে আছেন স্যার।" কিন্তু কর্নেল তাকে গ্রাহ্য করলেন না।

তারপর পেছনদিকে দরজা খোলার চাপা শব্দ হতেই করিডর দিয়ে এগিয়ে দেখেন বাঁদিকে একটা বারান্দা রয়েছে এবং সেই বারান্দা থেকে একটা লোক সবে নেমে যাচ্ছে। বারান্দার নিচেই বড়বড় পাথর এবং খানিকটা দূরে গঙ্গা। কর্নেল ছুটে গিয়ে ডাকলেন, "পরিতোষবাবু! পরিতোষবাবু!"

সে পাথরের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে গেল। তখন কর্নেল রিভলবার বের করে বারান্দা থেকে একলাফে একটা পাথরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "পালানোর চেষ্টা করলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব পরিতোষবাবু!"

পরিতোষ গুঁড়ি মেরে তাড়াখাওয়া প্রাণীর মতো বসে ছিল। দাঁত বের করে উঠে দাঁড়াল। তারপর নমস্কার করে বলল, "পালাইনি স্যার, এখানকার বাথরুমটা ভেঙে গেছে। তাই—"

"আসুন। ঘরে গিয়ে বসি।"

পরিতোষ একটু ইতস্তত করে বারান্দায় ফিরে এল এবং ঘরে ঢুকল। কর্নেল ঘরে ঢুকে এদিকের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং করিডরের দিকের দরজাটা খুলে দিলেন। ঘরের ভেতর একটা তক্তাপোশে যেমন তেমন করে বিছানা পাতা রয়েছে। কয়েকটা ভাঙা বেতের চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে একপাশে। পরিতোষ কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল নোংরা বিছানাটা সরিয়ে বসে বললেন, "বসুন পরিতোষবাবু।"

পরিতোষ বসে বলল, "আমাকে আপনি চেনেন স্যার?"

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, "আপনার নামে তো পুলিশের হুলিয়া আছে।"

পরিতোষ মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল।

"নিখোঁজ বোনের খোঁজে কানাজোল এসেছিলেন আপনি। তারপর যখন জানতে পারলেন যে তাকে খুন করে লাশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তখন কী উদ্দেশ্যে কানাজোলে থেকে গেলেন আপনি? উঁহু—আমিই বলছি। বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। কেমন? ঠিক বলছি তো?"

পরিতোষের হাত কাঁপছিল। মুখ তুলে আস্তে বলল, "আমি খারাপ। কিন্তু আমার বোন রমলা—" সে ঢোক গিলে ফের বলল, "রমলা ছিল খুব ভাল মেয়ে। সরল বলেই ভীষণ বোকা। আমার একমাত্র বোন কর্নেল! আমি চোর, মহাপাপী, কিন্তু রমলা তো পাপী ছিল না! তবুও কেন তাকে এমন করে মরতে হল?" পরিতোষ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

কর্নেল বললেন, "পরিতোষবাবু, বড়কুমার জয়াদিত্যের সঙ্গে আপনার কীভাবে পরিচয় হয়েছিল?"

পরিতোষ রুমাল বের করে চোখ মুছে বলল, "শরদিন্দু ব্যাংকে আমার কলিগ, সে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আমি কমবয়স থেকেই মদ খাওয়া ধরেছিলাম। তাই ভেবেছিলাম রাজামহারাজা লোকের ছেলে জয়াদিত্য। তার সঙ্গে ভাব করলে বিনাপয়সায় রোজ মদ খাওয়া যাবে। তাই জয়কে প্রথম আলাপের দিনই বারে নিয়ে গিয়েছিলাম। শরদিন্দু মদ খাওয়া পছন্দ করত না। যাই হোক, জয় প্রথমদিকে মদের মজাটা পেয়ে গেল। সে নিজেই প্রোপোজ করল, পরদিন সব খরচ তার, এটাই নিয়ম। পরদিন কথামতো পার্কস্ট্রিটের সেই বারে গিয়ে দেখি জয় হাজির। তারপর থেকে সে রোজ সন্ধ্যা ছটায় বারে হাজির থাকতো। কিছুদিন পরে দুদিন সে এলো না। তখন শরদিন্দুর কাছে খোঁজ নিয়ে তার হোস্টেলে গেলুম। কিন্তু তখনও আমি জানি না ওরা যমজ

ভাই—যদিও শরদিন্দু বা জয় বলে বিজয়ের কথা, কিন্তু ওরা বলেনি যে জয় ও বিজয় যমজ ভাই। তাই হোস্টেলের গেটে জয় ভেবে যাকে বারে নিয়ে যাবার জন্য সাধছি, সে বিজয় তা জানতুম না। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, দুভাইয়ের গলার স্বর, হাবভাব প্রায় একইরকম—মেজাজ বা স্বভাবচরিত্র যা আলাদা। শুধু আলাদা নয়, উল্টো।"

"ঠিক তাই। তারপর?"

"বিজয় ব্যাপারটা ফাঁস করে বলল, আপনি আমাকে জয় ভেবেছেন। জয়কে আপনিই তাহলে মদ ধরিয়েছেন। এইসব বলে বিজয় আমাকে খুব শাসাল। ব্যাপারটা শরদিন্দুকে বললে সে খুব হাসল। যাই হোক, তার দিনকতক পরেই সকালে জয় আমার বাসায় হাজির। আমার ঠিকানা সে শরদিন্দুর কাছে যোগাড় করেছে। সে বিজয়ের হয়ে ক্ষমা চাইলো। তাকে খুব খাতির করে বসালাম। রাজকুমার শুনে মা—তখন মা বেঁচে ছিলেন, একেবারে অস্থির। রমলার সঙ্গে আলাপ হল জয়ের। সেই শুরু। এবার বাকিটা বুঝে নিন।"

"বিজয় এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু জয় বি. এ. পাশ করে চলে এল কেন জানেন?"

পরিতোষ মুখ নামিয়ে বলল, "সঠিক জানি না। তবে যে জানত, সে তো আর বেঁচে নেই।"

"রমলা জানত?"

পরিতোষ গলা ঝেড়ে একটু কেসে বলল, "আমার ধারণা রমলাকে নিয়ে দুভাইয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল। তবে জয় গোঁয়ার, পাগলাটে স্বভাবের ছেলে।"

"রমলারও নিশ্চয় আপনার মতো ভুল হয়ে থাকবে কে জয় বিজয় না চিনতে পেরে?"

পরিতোষ আস্তে বলল, "হ্যাঁ। রমলার ভুল করা স্বাভাবিক। সেজন্য আমি রমলাকে সাবধান করে দিইনি, তা নয়। কিন্তু রমলা বড্ড বোকা ছিল বরাবর। খুব সেন্টিমেন্টালও ছিল সে।"

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন, রমলা যদি বিজয়কেই জয় বলে ভুল করে, বিজয় কি সেই সুযোগ নেবে?"

পরিতোষ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলল, "বিজয়ের সঙ্গে আদৌ মিশিনি। কাজেই জানি না কেমন স্বভাবের ছেলে। তবে জয় বিজয়ের প্রশংসাই করেছে বরাবর। বিজয় খুব নীতিবাগীশ।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে কয়েকটা আলতো টান মেরে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন, "আপনি বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এখনও কানাজোলে আছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, কে রমলাকে খুন করেছে?"

পরিতোষ গলার ভেতর বলল, "আমি খুঁজছি। এখনও বুঝতে পারছি না।"

"কাকে সন্দেহ বেশি?"

'কমবেশির প্রশ্ন নয়, স্যার! আমার সন্দেহ এ বাড়ির সকলকেই।"

"জয়কেও?"

"হুঁউ।"

"বিজয়কে?"

"হুঁউ।"

কর্নেল বললেন, "জয় আপনাকে বলেনি তার কাকে সন্দেহ?"

"জয় তো রমলাকে ভালবাসত।"

"বাসত বটে।"

"তাহলে রমলা তার কাছে এলে কেন সে তাকে খুন করবে?"

পরিতোষ চুপ করে রইল।

কর্নেল বললেন, "বলুন পরিতোষবাবু!"

পরিতোষ আস্তে বলল, "আপনার কথা আমি কাগজে প্রচুর পড়েছি। আমি জানি, আপনি একজন বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনাকে রাজবাড়িতে দেখে আমি মনে বল পেয়েছি স্যার। রমলাকে যেই খুন করুক, আপনি তাকে খুঁজে বের করবেন, আমি বিশ্বাস করি। দয়া করে আমার কাছে জানতে চাইবেন না আর।"

কর্নেল হাসলেন। "আমার কোনো অলৌকিক শক্তি নেই পরিতোষবাবু! আমি বাস্তব তথ্য থেকে যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসি। আমি আপনার কাছে তথ্য চাইছি।"

পরিতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "জয় কলকাতা ছেড়ে যখন চলে আসে, তখন রমলা প্রেগন্যান্ট ছিল।"

"মাই গুডনেস!" কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।

"রমলা পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করেনি। মা তাকে রাজি করাতে পারেনি। শেষে সেই শোকে মা মারা গেল। রমলাকে আমি ভীষণ স্নেহ করতুম। তাই আমি ওকে কিছু বলিনি।"

"তারপর কী হল, বলুন?"

"রমলার একটি মেয়ে হল নার্সিংহোমে। জয়কে চিঠি লিখলুম। জয় অপমানজনক ভাষায় জবাব দিল যে রমলার সন্তান তার নয়। এমন কি লিখল রমলাকে সে ঘৃণা করে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী! রমলা মেয়েকে মানুষ করতে লাগলো। রমলা স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরি পেয়েছিল। আলাদা বাসা নিয়ে থাকত।"

"রমলার মেয়ের এখন বয়স কত?"

"বছর আট-নয় হবে বোধ করি। ক্লাস ফোরে পড়ে।"

"এখন সে কোথায়?"

পরিতোষ এতক্ষণে সিগারেট ধরালো। কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পর বলল, "আমার ভাগ্নীর ডাক নাম ছিল মিমি। আসল নাম জয়িতা। রমলা কেন এ নাম রেখেছিল, বুঝতে পারছেন তো?

"পারছি। মিমি এখন কোথায়?"

"মিমিকে বালিগঞ্জে একটা আবাসিক স্কুলে রেখেছিল রমলা। মাঝেমাঝে দেখে আসত। আমার নামে হুলিয়া। লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। সম্প্রতি কলকাতা গিয়ে রমলার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। গিয়ে দেখি, তার ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। পাশের ফ্ল্যাটে খোঁজ নিলুম। এক ভদ্রমহিলা বললেন, রমলা কদিন থেকে নেই। কোথায় গেছে বলে যায়নি। মিমিদের স্কুলে গেলুম। মিমি আমাকে দেখে কাঁদতে শুরু করল। বলল, মাম্মি কেন আসছে না। তখন আমার সন্দেহ হল, কানাজোলে যায়নি তো? মিমির স্কুলে পরদিন থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহিলা—"

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, "মিমি আপনাকে চিনত?"

"হ্যাঁ। আমি ফেরারি হয়ে বেড়ালেও মাঝেমাঝে গিয়ে রমলা আর মিমির খোঁজ নিতুম। রমলার সঙ্গে বারকতক মিমিকে দেখতে গেছি। তাই সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহিলা আমাকে চিনতেন। তবে জানতেন না আমি ফেরারি আসামি।" পরিতোষ থেমে আঙুল খুঁটতে থাকল।

"বেশ। বলুন।"

"ভদ্রমহিলা বললেন, "বরং মিমিকে নিয়ে যান। কাল থেকে হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর মা আজও এলেন না। আমি তো সমস্যায় পড়েছি কী করব ওকে নিয়ে।"

"আপনি মিমিকে নিয়ে এলেন?"

"হ্যাঁ। সোজা কানাজোলে চলে এলুম। রাজবাড়িতে বিপ্রদাসবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। ওঁকে সব কথা বললুম। উনি প্রথমে তো পাত্তাই দিলেন না। তারপর জয়কে ডেকে পাঠালেন।"

"কোন তারিখে এবং কখন?"

"১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা-টাতটা হবে।"

"তারপর কী হল বলুন?"

"জয় এসে আমাকে দেখে চমকে গেল। তারপর মিমিকে কোলে তুলে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।"

"একমিনিট।" বলে কর্নেল জানালার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "জয় আসছে। ও আসার আগে সংক্ষেপে বলুন।"

পরিতোষ রুমালে নাক ঝেড়ে বলল, "জয় মিমিকে কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু বিপ্রদাসবাবু বললেন—কেন বললেন এখনও বুঝতে পারিনি, মিমিকে রাজবাড়িতে রাখা আপাতত ঠিক হবে না। ভাগলপুরে ওঁর বোনের কাছে

কিছুদিন রেখে আসা ভাল। তখনও জানি না, রমলা খুন হয়েছে। তো জয় বিপ্রদাসবাবুর কথায় সায় দিল। তখনই বিপ্রদাসবাবু আমাকে আর মিমিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আটটার ট্রেনে আমরা ভাগলপুর গেলুম। বিপ্রদাসবাবুর বোনের বাড়িতে রাত্তিরটা আমি থাকলুম। বিপ্রদাসবাবু সেই রাত্তিরেই ফিরে এলেন কানাজোল। মিমি ওখানেই থাকল। আমি পরদিন চলে এলুম কানাজোলে। এই আউটহাউসে জয়ের সঙ্গে দেখা হল। তখন জয় বলল, ৯ তারিখে রমলা আসবে লিখেছিল। স্টেশনে তাকে থাকতে বলেছিল। কিন্তু স্টেশনে যেতে দেরি হয়ে যায়। তারপর রমলার কী হয়েছে, সে জানে না। শুনেই আমার বুকটা—"

বাইরে জয়ের সাড়া পাওয়া গেল। সনি গরগর করে উঠল। জয় সোজা এসে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

কর্নেল হাসলেন। "এস জয়। তুমি তো রমলার দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাওনি। তাই নিজে থেকেই পরিচয় করতে এসেছিলুম।"

জয় ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি কেমন ডিটেকটিভ মশাই, আপনার নাকের ডগায় আবার একটা খুনখারাপি হয় আর আপনি শুধু বকর-বকর করে ঘুরে বেড়ান?"

কর্নেল মুহূর্তে শক্ত হয়ে বললেন, "মাধবজি খুন হয়েছেন কি?"

জয় বিকৃতস্বরে বলল, "আপনার মাথা! বিজয়টা একটা বুদ্ধু। তাই কার পরামর্শে আপনার মতো একটা গবেট গোয়েন্দা ভাড়া করে এনেছে। যান, গিয়ে দেখুন—কাকাবাবুর ঘরে কাকাবাবুর ডেডবডি পড়ে আছে। পচা গন্ধে অস্থির। আপনার নাকও নেই মশাই! কলাবতী টের না পেলে—"

কর্নেল সবেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।...

॥ রহস্যের শেষ প্রান্তে ॥

ভুতুড়ে ছড়াটা সত্যি হল তাহলে! কর্নেলের সত্যিই দাড়ি ছেঁড়ার অবস্থা। কলাবতী রোজ সকালে সব ঘরে ঝাড়ু দেয়। ওপরতলার তিনটে বন্ধ ঘর বাদে সব ঘরে তাকে ঝাড়ু দিতে হয়। হলঘর আর বিপ্রদাসজির ঘরের একটা করে ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। বিপ্রদাসজি তাকে বিশ্বাস করতেন। গতকাল সকালে যখন সে বিপ্রদাসজির ঘরে ঝাড়ু দেয়, তখন বিপ্রদাসজি ঘরে ছিলেন। বলেছিলেন, জরুরি কাজে ভাগলপুর বহিনজির বাড়ি যাবেন আটটার ট্রেনে। দুদিন থাকবেন। আজ সকালে কলাবতী প্রথমে হলঘর ঝাড়ু দিতে গিয়ে 'বদ গন্ধ' পায়। সে ভেবেছিল কোথাও চুহা মরে পড়ে আছে। হলঘর থেকে বিপ্রদাসজির ঘরে ঢোকা যায়। কিন্তু সে দরজাটা বন্ধ। তার সন্দেহ হয়, তাহলে বিপ্রদাসজির ঘরে চুহা মরেছে। সে বারান্দায় এসে বিপ্রদাসজির ঘরের তালা খোলে। জানালা বন্ধ ছিল। পচা গন্ধে অস্থির হয়ে সে জানালা, ওপাশের

দরজা—সব খুলে দেয়। আলো জ্বেলে চুহাটাকে খুঁজতে থাকে। তারপর তার চোখে পড়ে, খাটের তলা থেকে মানুষের একটা পা বেরিয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। তখন নছি সিং, বৈজু, তারপর জয়া দৌড়ে আসে। রঙ্গিয়া ইঁদারায় পাম্প চালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও দৌড়ে আসে। শেষে আসে বিজয়। এসে হুকুম দেয় টেনে বের করতে। নছি সিং টেনে বের করলে সবাই চমকে উঠে দ্যাখে, বিপ্রদাসজির মাথার মাঝখানটা থ্যাঁতলানো। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। হাতুড়ি বা ওইরকম কিছু শক্ত ভারী জিনিস দিয়ে মাথায় মারা হয়েছে। মেরে বডিটা খাটের তলায় ঢোকানো হয়েছে।

জয় আসে অনেক পরে। একটু দাঁড়িয়েই সে চলে যায়।

কর্নেল গিয়েই নছি সিংকে থানার পাঠিয়েছিলেন। পুলিশের গাড়ি এল প্রায় আধঘণ্টা পরে। জয়া তার ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তাকে কলাবতী সান্ত্বনা দিচ্ছিল। বিজয়ও দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদছিল হলঘরে বসে।

কানাজোল পুলিশ স্টেশনের ও সি রাঘবেন্দ্র শর্মা কর্নেলকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "প্রবাদ শুনেছিলুম, 'যাঁহা ভি যাতা হ্যায় কর্নেল, উঁহাভি খুনখারাপিকা খেল।' ক্ষমা করবেন কর্নেল সরকার! গতবছর কলকাতার ডিটেকটিভ ট্রেনিং সেন্টারে একটা কনফারেন্সে গিয়ে প্রবাদটা শুনেছিলুম। যাই হোক, ব্যাকগ্রাউন্ড তো ইতিমধ্যে আপনার নিশ্চয় জানা হয়ে গেছে। বলুন—হাউ টু প্রসিড!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "যত শিগগির পারেন, বুদ্ধুরামকে গ্রেফতার করুন।"

"কে বুদ্ধুরাম?"

"এই রাজবাড়ির চাকর। আমার ধারণা, পুরনো রেকর্ডে ওর পরিচয় থাকা সম্ভব।"

রাঘবেন্দ্র তাঁর সঙ্গে আসা সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে ইশারা করলেন। তখন কর্নেল দ্রুত বললেন, "বুদ্ধুরাম রাজবাড়িতে নেই। তাকে পাঠানো হয়েছে বিপ্রদাসজির খোঁজে। আমার মনে হয়, এই সুযোগে আসলে সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুঁজে বের করা দরকার।"

সাব-ইন্সপেক্টর বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। রাঘবেন্দ্র কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন, "আপনাদের রুটিন ওয়ার্কস শেষ হোক। তারপর কথা হবে।"

একটু পরে অ্যামবুল্যান্স এল। ফোটোগ্রাফার এল। মর্গের লোকেরা এল। প্রাথমিক তদন্ত ও একে একে বাড়ির সবাইকে ডেকে স্টেটমেন্ট নেওয়া হল—শুধু জয় আর নানকু বাদে।

কর্নেল বললেন, "আপনার কলিগরা বাকি কাজ সেরে ফেলুন। ততক্ষণ আউটহাউসে বড়কুমার আর নানকুর স্টেটমেন্ট নেবেন চলুন মিঃ শর্মা।"

দক্ষিণের বাগান আর পোড়ো জমি দিয়ে যাবার সময় ঠাকুরদালানের কাছে

এসে কর্নেল দেখলেন, মাধবজি তাঁর ঘরের ভেতর রান্না করতে বসেছেন। রাঘবেন্দ্র বললেন, "এখানে কে থাকে?"

কর্নেল দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। রাজবাড়ির ভেতর দেড়ঘণ্টা যাবৎ যে হুলুস্থুল চলেছে, মাধবজি নিশ্চয়ই টের পাননি। তাহলে এমন নিশ্চিন্তে বসে রান্না করতে পারতেন না। ছুটে যেতেন।

আসলে লোকটিকে কেউ গণ্য করে না রাজবাড়ির একজন বলে। কর্নেল রাঘবেন্দ্রের প্রশ্নের জবাবে বললেন "মাধবজি এই ঠাকুরদালানের সেবায়েত। মিঃ শর্মা, উনি আপনার কেসের একজন শক্ত সাক্ষী।"

"বলেন কী! তাহলে তো আগে ওঁর সঙ্গেই কথা বলতে হয়।"

কর্নেলের ডাকে মাধবজি বেরিয়েই ভড়কে গেলেন। কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, "নমস্তে"!

কর্নেল বললেন, "খবর খারাপ, মাধবজি। আপনি জানেন না কিছু?"

মাধবজি ভাঙা গলায় বললেন, "বড়কুমারকে গ্রেফতার করেছেন, মালুম হচ্ছে।"

"না। বিপ্রদাসজিকে কে খুন করে গেছে!"

মাধবজি আর্তনাদের সুরে বললেন, "হায় ভগবান! কে এমন কাজ করল? অমন সাচ্চাদিল মানুষটাকে—তার হাতে কুষ্ঠব্যাধি হবে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি!"

নাক ঝেড়ে চোখ মুছে মাধবজি ফের বললেন, "হাম সমঝ লিয়া, হুজুর! আমি সব বুঝতে পেরেছি কেন বিপ্রদাসজিকে খুন করেছে।"

"কেন মাধবজি?"

"সেই অচেনা বে-পহচান লেড়কিকে খুন করার কথা বিপ্রদাসজি আর আমিই শুধু জানি। তাই প্রথমে বিপ্রদাসজিকে খুন করে মুখ বন্ধ করে দিল। এবার আমাকেভি খুন করবে। আমাকে আপনারা বাঁচান, হুজুর!"

মাধবজি করজোড়ে কান্নাকাটি করতে থাকলেন। রাঘবেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে, আরও একটা মার্ডারের ব্যাপার আছে এবং সেজন্যই আপনার এখানে আসা, কর্নেল!"

কর্নেল বললেন, "দ্যাটস এ লং স্টোরি, মিঃ শর্মা। একটু অপেক্ষা করুন।" বলে মাধবজির দিকে ঘুরলেন, "মাধবজি, হরটিলার শিবলিঙ্গের বেদিটা কী-ভাবে খোলা যায় আপনি তো জানেন!"

"জি হাঁ কর্নেলসাব! বিপ্রদাসজির কাছে চাবি ছিল। সেই চাবি দিয়ে খোলা যায়।"

"ওই গোপন সিন্দুকটা—"

বাধা দিয়ে মাধবজি বললেন, "সিন্দুক নয় হুজুর, ওটা একটা পাতাল-খন্দক। ইঁদারার মতো। নিচে পাতাল-গঙ্গা বইছে। আমি কেমন করে জানব বলুন? বিপ্রদাসজি বলেছিলেন।"

"বলেন কী! তাহলে তো সেই লাশটা পাওয়া যাবে না?"

"না পাতাল গঙ্গায় গিয়ে পড়লেই তো মাগঙ্গা ওকে টেনে নেবেন।" মাধবজি আবার ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বললেন, "বিপ্রদাসজি বলেছিলেন, আগের আমলে রাজাবাহাদুররা দুশমন লোকেদের মেরে ওইখানে লাশ ফেলে দিতেন। কেউ জানতে পারত না।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "আপনি রান্না করুন নিশ্চিন্তে। আর কোনো ভয় নেই আপনার। বিপ্রদাসজির খুনীকে ধরতে পুলিশ বেরিয়ে পড়েছে।"

মাধবজি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন, "মিঃ শর্মা, একটু ধৈর্য ধরুন। দ্যাটস এ লং স্টোরি।"

আউটহাউসের দিকে যেতে যেতে কর্নেল ভাবছিলেন, বিপ্রদাসজি জয়াকে ডেকে ওই পাতাল-খন্দকের চাবি দেন। তাঁর খুনী ওঁত পেতে বেড়াচ্ছিল তাঁকে খুন করার জন্য। ভাগলপুর যাচ্ছেন শোনামাত্র সে সুযোগ পেয়ে যায়। তখনই খুন করলে সে লাশ পাচারের জন্য একটা রাত্রি সময় পাবে। কলাবতী ঘরে ঝাড়ু দিতে ঢুকবে পরের দিন সকালে—সে জানে। রাত্রে লাশটা সরিয়ে ফেললে আর কেউ টের পাবে না কিছু। সবাই ভাববে, বিপ্রদাসজি ভাগলপুরে বোনের বাড়ি গেছেন এবং তারপর তাঁর নিপাত্তা হওয়া নিয়ে পুলিশ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে।

তাহলে সে জনত, লাশ নিপাত্তা করে দেওয়ার একটা চমৎকার জায়গা আছে এবং ওই হরটিলার শিবলিঙ্গের তলায় পাতাল-খন্দক।

এমন কি সে আরও জানত জানত, বেদিটা খোলার জন্য গোপন তালা ও চাবি আছে। বিজয় ও জয়ার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, তারা এই পাতাল-খন্দকের কথা জানে না। জানে তাদের ভাইবোনের মধ্যে একমাত্র জয়। কারণ জয় বলেছে, রমলার লাশ ওখানে লুকানো আছে। কিন্তু জয় জানে না ওটা পাতাল-খন্দক। জানেন শুধু মাধবজি, আর জানতেন বিপ্রদাসজি। তার চেয়ে বড় কথা, তাঁর হত্যাকারী কে সেকথা ভালই জানতেন।

অতএব সে কি বিপ্রদাসজির অনুগত লোক? কিংবা দৈবাৎ জানতে পেরেছিল?

ঘটনাটা সাজানো যাক : খুনী ওঁত পেতে বেড়াচ্ছিল। জয়াকে বিপ্রদাসজি চাবির কৌটোটা গোপনে দিচ্ছেন, তার নজর এড়ায়নি। জয়া সেটা নিয়ে ওপরে চলে গেলে সে বিপ্রদাসজির ঘরে ঢোকে। ওই সময় কর্নেল বিজয়কে নিয়ে গঙ্গার ধারে অন্ধ প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিপ্রদাসজির ঘরে ঢুকে—

হঠাৎ কর্নেলের মনে পড়ল, ও-ঘরেও জয়ার মতো আবছা ক্লোরোফর্মের গন্ধ পাচ্ছিলেন।

ঠিক তাই। খুনী প্রথমে ক্লোরোফর্মে বিপ্রদাসজিকে অজ্ঞান করে তারপর মাথায় শক্ত কিছুর আঘাত করে। খুলি ফেটে যায়। বডিটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে পকেট হাতড়ে চাবি নিয়ে দরজায় তালা এঁটে সে ওপরে চলে যায়। জয়াকে অজ্ঞান করে চাবির কৌটো হাতিয়ে নেয়। কাল বিকেলে হরটিলায় গিয়ে সে কি

পরীক্ষা করে দেখছিল পাতাল-খন্দক আছে কি না? চাবিটা ভেঙে যায়। তারপর কর্নেল ও বিজয় গেলে সে লুকিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, কর্নেল তারই ছায়া দেখেছিলেন। সম্ভবত তার মতলব ছিল কর্নেলকেও খুন করবে। সাহস পায়নি। রাতে জয় ও তার কুকুর পাহারা দিচ্ছিল। কাজেই সে ওখানে আর যেতে পারেনি—নইলে বেদি ভেঙে ও বিপ্রদাসজির লাশ নিপাত্তা করে দিত।...

আউটহাউসের টিলায় উঠতে উঠতে হঠাৎ রাঘবেন্দ্র ডাকলেন, "কর্নেল সরকার!"

"বলুন!"

"বুদ্ধুরামকে কেন আপনার সন্দেহ?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "সামান্য একটা কারণে। তার গায়ে একটা ছাইরঙা স্পোর্টিং গেঞ্জি দেখেছি আজ সকালে। অবশ্য কাছে থেকে নয়, বাইনোকুলারে দূর থেকে। তবে আমার বাইনোকুলারটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিশ্বাসযোগ্য।"

"আপনার হেঁয়ালি বোঝা কঠিন।" রাঘবেন্দ্র হাসতে লাগলেন।...

জয় কাঁধে কাকাতুয়া নিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কর্নেল ও রাঘবেন্দ্রকে দেখছিল। নানকু ঘাস কুচো করছিল। পাশে গামলায় ভেজানো মটর আর ছোলা। মুখ ঘুরিয়ে সে একবার দেখল মাত্র।

কর্নেল বললেন, "এক মিনিট মিঃ শর্মা। আমি আগে জয়কে কয়েকটি প্রশ্ন করে নিই।"

রাঘবেন্দ্র বললেন, "ওকে। করে নিন।"

কর্নেল বললেন, "জয়, তুমি কি জানো হরটিলার শিবলিঙ্গের বেদিটা সিন্দুক নয়, আসলে একটা পাতাল-খন্দক এবং নিচে গঙ্গা বইছে?"

জয় অবাক হল। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর মাথাটা নাড়ল।

"তুমি ওই বেদির চাবি থাকার কথা জানতে?"

"না। শুধু জানতাম বেদির তলায় নাকি গুপ্তধন আছে।"

"কে বলেছিল তোমাকে?"

"মনে নেই। ছোটোবেলায় শুনেছি কারো কাছে।"

"তাহলে চাবির কথা জানতে না?"

"না, না, না। এক কথা হাজারবার বলতে ভাল লাগে না।" বলে রাঘবেন্দ্রের দিকে ঘুরল। "আমাকে গ্রেফতার করতে এসে থাকলে করুন। দেরি করে লাভ নেই।"

কর্নেল বললেন, "আরও প্রশ্ন আছে জয়!"

"ঝটপট করুন।" বলে সে বাঁকা হাসল। "পরিতোষ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে বলে দিচ্ছি, সে ভাগলপুরে চলে গেল। রমলার মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে কলকাতা। তাকে—"

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, "জয়, বিজয়ের কাছে তোমার তো কোনো কথা গোপন থাকেনি কোনোদিন—তাই না?"

'হ্যাঁ, কেন?"

"৯ই সেপ্টেম্বর রমলা আসছে, তাকে বলেছিলে?"

জয় তাকালো কর্নেলের দিকে। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল। বলল, "হ্যাঁ।"

"বিজয় দাড়ি রাখতে শুরু করেছে.৯ই সেপ্টেম্বরের পরে—তাই তো?"

জয় চুপ করে থাকল।

"জবাব দাও, জয়!"

নানকু কাজ থামিয়ে এদিকে ঘুরে কান করে শুনছিল। সে বলে উঠল, "কুমারসাব। আর মুখ বন্ধ করে থাকবেন না। এরপর আপনার জানটাও চলে যাবে—"

জয় ঘুরে গিয়ে তাকে লাথি মারল। নানকু লাথি খেয়ে পড়ে গেল। তারপর দ্রুত উঠে একটু তফাতে সরে গেল। "আর আমি চুপ করে থাকব না। সব বলে দেব—কে ময়ালসাপের খাঁচা খুলে দিয়েছিল, কে কাকাতুয়ার জিভ কেটে বোবা করে দিয়েছেল, কে বহুরানীকে স্টেশন থেকে স... করে এনে—"

জয় আবার তাকে লাথি মারতে গেল, কর্নেল ধরে আটকালেন। জয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "নেমকহারাম! মিথ্যাবাদী! যা—আজ থেকে তোর চাকরি খতম! দূর হয়ে যা গিদ্ধড় কা বাচ্চা! বোবা কাকাতুয়া ভয় পেয়ে তার কাঁধ থেকে উড়ে ক্যানারি পাখির খাঁচার ওপর বসল। তখন নানকু পাখিটাকে ধরে দাঁড়ে বসাতে গেল।

কর্নেল এবার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বললেন, "এই লেখাটা তুমি চিনতে পারো কি না দেখ তো জয়!"

জয় তাকিয়ে দেখে বলল, "আমি বাংলা পড়তে পারি না।"

"মিথ্যা বোলো না জয়! তোমরা দুভাই-ই বাংলা শিখেছিলে কলকাতায়।" কর্নেল তার কাঁধে হাত রাখলেন। জয় মুখ নামিয়ে কাঁদতে থাকল। কর্নেল বললেন, "এই পদ্যটা বিজয়ের হাতের লেখা—তাই না?" জয় মাথাটা একটু দোলালো। এবার কর্নেল রাঘবেন্দ্রের দিকে ঘুরে বললেন, "আমার প্রশ্ন শেষ। আপনি স্টেটমেন্ট নিতে চাইলে নিতে পারেন এবার।"

রাঘবেন্দ্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুহাত একটু দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আগে আপনার কাছে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড না নিয়ে আমি আর একপাও বাড়াতে চাইনে কর্নেল!"

॥ মর্মান্তিক ॥

আগাগোড়া সব শোনার পর রাঘবেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বললেন, "তাহলে এখনই গিয়ে ছোটকুমারসাবকে গ্রেফতার করা দরকার।"

কর্নেল বললেন, "কেন?"

রাঘবেন্দ্র ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। "কেন করব না? তিনিই তো রমলা দেবীকে—"

কর্নেল হাসলেন। বাধা দিয়ে বললেন, "ইন্ডিয়ান পেনালকোড অনুসারে মার্ডার একটা কগনিজিবল্ অফেন্স। পুলিশ কারুর কাছে অভিযোগ না পেলেও নিজে থেকে অ্যাকশান নিতে পারে। ঠিক কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে রমলার ডেডবডি কোথায়? ডেডবডি পেলে তবে তো কাউকে গ্রেফতারের কথা ওঠে। তাছাড়া জয় তো নালিশ করছে না। করলেও প্রথমে দরকার ডেডবডি।"

আউটহাউসের সেই ঘরটায় বসে কথা বলছিলেন তাঁরা। জয় দ্রুত বলল, "না। আমার কোনো নালিশ নেই কারুর বিরুদ্ধে।"

রাঘবেন্দ্র বললেন, "আপনাকে আমরা প্রসিকিউশন উইটনেস করতে পারি।"

"বাট ইউ নিড দি ডেডবডি! পাতাল-খন্দকে ডুবুরি নামাতে পারেন অবশ্য।"

রাঘবেন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, "চেষ্টা করে দেখব।"

"কিন্তু ডেডবডি যতক্ষণ না পাচ্ছেন, বিজয়কে গ্রেফতার করবেন কোন আইনে?"

রাঘবেন্দ্র বিব্রত হয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "কেন? বিপ্রদাসকে মার্ডারের চার্জ আনা যায় না?"

"না। কারণ আমি তার ডিফেন্স উইটনেস। বিজয় কাল সারা সকাল থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছিল। বিপ্রদাসবাবুকে খুন করেছে বুদ্ধুরাম এবং জয়াকে যে অজ্ঞান করেছিল—সেও বুদ্ধুরাম। কাজেই আইনত বিজয়কে ততক্ষণ গ্রেফতার করতে পারছেন না, যতক্ষণ না বুদ্ধুরামকে গ্রেফতার করে তার কাছে কনফেসন আদায় করতে পারছেন। আমি আইনের কথাই বলছি মিঃ শর্মা!"

রাঘবেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন,"ওক্কে, ওক্কে! কিন্তু আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, বিজয়সাবই বুদ্ধুরামের সাহায্যে—"

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "লেট বুদ্ধুরাম কনফেস। আগে তাকে গ্রেফতার করুন। সে কী বলছে আগে জানা দরকার।"

রাঘবেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন—দেখি ওদিকে কী হল।"

টিলা থেকে নামবার সময় বললেন, "এটাই আশ্চর্য লাগছে, বিজয় কেন আপনাকে ডেকে নিয়ে এল? সে তো জানে, আপনি রহস্যভেদী ধুরন্ধর মানুষ। আপনি জেনে ফেলবেন সব কথা। অথচ সে আপনাকে একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে নিয়ে এল।"

কর্নেল বাইনোকুলারে পাখি দেখছিলেন নামিয়ে বললেন, "কী বলছিলেন যেন।"

"বিজয় আপনাকে নিয়ে এল কেন? নিজেকে ধরিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয় নয়?"

"নিশ্চয় নয়।"

"তাহলে?"

কর্নেল আবার বললেন, "আগে বুদ্ধুরামকে গ্রেফতার করুন। লেট হিম কনফেস।"

"কর্নেল! তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলব, রহস্যভেদী হিসেবে আপনি নিশ্চয় একজায়গায় এসে ব্যর্থ হয়েছেন।"

"ঠিকই বলেছেন মিঃ শর্মা!" কর্নেল শ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "একটা জায়গায় এসে আমি সামনে দেয়াল দেখছি। আর এগোনো যাচ্ছে না।"

"হুঁ—সম্ভবত সেটা হল ঃ কেন বিজয় আপনাকে ডেকে আনল—এই তো?"

"ইউ আর এগেন ড্যাম রাইট।" বলে কর্নেল লম্বা পায়ে হঠাৎ জোরে হাঁটতে থাকলেন।

রাঘবেন্দ্র সঙ্গ ধরার চেষ্টা করে বললেন, "কেন হঠাৎ আপনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কর্নেল?"

"শিগগির চলুন! রাজবাড়িতে আবার কী ঘটেছে মনে হচ্ছে!"

॥ উপসংহার ॥

বিজয় তার ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছিল। তার লেখার টেবিলে কবিতার খাতায় তার জবানবন্দী পাওয়া যায়। বিজয় লিখেছিল ঃ

"আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। জানি, আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবে জয়। জয়ার মনটা শক্ত। সে সহ্য করতে পারবে। জয়ের জন্যেই মরতে একটু দ্বিধা ছিল। নইলে ৯ই সেপ্টেম্বর রাতেই ঠিক করেছিলুম আমি মরব। পারিনি। শেষে শরদিন্দু খুন হল। তখন ঠিক করলাম, যে পাপ করেছি—জয়ের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের মহাপাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করার আগে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যাই। জয়কে জানিয়ে দিই যে সত্যি আমি রমলাকে খুন করিনি। শরদিন্দুর খুনী যে, সেই রমলার খুনী। কিন্তু জয় আমার কথা যদি আর বিশ্বাস না করে! তাই কলকাতায় গিয়ে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে নিয়ে এলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, কর্নেল শরদিন্দুর মৃত্যুরহস্য ভেদ করলেই রমলার মৃত্যুরহস্য জেনে ফেলবেন এবং জয়কে জানিয়ে দেবেন যে বিজয় রমলাকে খুন করেনি—জয়ের ধারণাটাই ভুল। কিন্তু কর্নেলের দেখলুম পাখি-প্রজাপতির দিকে যত মন, আমার কাজটার দিকে তত নেই। ওয়ার্থলেস! আমি চাইছিলুম, উনি নিজের বুদ্ধির জোরে সব জেনে নিন। তাহলে জয়ের বিশ্বাস হবে। আমি বলেছি শুনলে জয় বিশ্বাস করবে না। কারণ জয়ের বিশ্বাস হারিয়েছি কলকাতায় থাকার সময়েই।

হ্যাঁ—আমার পাপের সূত্রপাত কলকাতায় থাকার সময়।

রমলা আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো তফাত বুঝতে পারত না প্রথম-

প্রথম। শুধু চেহারার জন্য নয়, জয় আমাকে রমলার ব্যাপারে কোনো কথা গোপন করত না বলেই। রমলা আমাকে জয় ভেবে সেইরকম ব্যবহার করত এবং আমি সেই সুযোগ নিতুম। জয়ের মেজাজ নকল করতুম। জয় ওর সঙ্গে মেলামেশার জন্য গোপনে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। জয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে রমলাকে সেখানে নিয়ে যেতুম। বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন দেখি না। এভাবেই চলছিল। কিন্তু জয় এবং রমলা দুজনেই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল কিছুদিনের মধ্যেই। তারপর জয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আর এম. এ.-তে ভর্তি হল না। কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। তারপর আমি রমলাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলুম। রমলা আমাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কিন্তু রমলাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম। তার কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনি। তার নামে অসংখ্য কবিতা লিখেছি। সব রেখে যাচ্ছি। সে জয়ের প্রেমিকা, তাই আমারও প্রেমিকা। কারণ জয় আর আমি যে একই আত্মার দুটি অংশ। কেমন করে ভুলব রমলাকে?

গত ৯ই সেপ্টেম্বর যখন জয় আমাকে জানাল, রমলার চিঠি এসেছে—আজই সাড়ে ছটায় আপ দিল্লি এক্সপ্রেসে সে আসছে, আমি লোভে অস্থির হয়ে উঠলুম। জয়ের জ্যুতে গিয়ে সাপটার খাঁচা খুলে দিলুম। জানতুম, জয় সাপটাকে আগে না খুঁজে কোথাও যাবে না। রমলার চেয়েও ওর এই নেশাটা এখন বেশি। স্টেশনে রমলা আমাকে ভাল করে যাচাইয়ের চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার চিঠিটা আমার কাছে। জয় আমাকে দিয়েছে সেটা। রমলা আমাকে জয় না ভেবে যাবে কোথায়? ওকে মিথ্যা করে বললুম, এখন সরাসরি বাড়ি নিয়ে গেলে স্ক্যাণ্ডাল উঠবে—রাজবাড়ির ব্যাপার। তাই আপাতত আউটহাউসে যাই। কিন্তু জয়ের কথা ভেবে ওকে হরটিলার দিকে নিয়ে চললুম। অমনি রমলার সন্দেহ হল। সে টিলার নিচে গিয়ে বেঁকে দাঁড়াল। আমি তখন ওকে পাওয়ার জন্য উন্মাদ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্জন জঙ্গল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলুম। সে আমাকে চড় মারল। গালাগালি দিতে শুরু করল। জানাজানির ভয়ে আমি তখন ওকে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেলুম। হঠকারিতায় এতখানি এগিয়ে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল এতক্ষণে।

তারপর লজ্জায়, দুঃখে, অনুতাপে আমি আর বাড়ি থেকে বেরোইনি। প্রতিমুহূর্তে ভাবছি, জয় এসে আমাকে চার্জ করবে। কিন্তু জয়ের সাড়া নেই। রঙ্গিয়া খেতে ডাকতে এল। বললুম, "খাব না। শরীর ভালো নেই।" রাত দশটায় হঠাৎ বুদ্ধুরাম এসে সেলাম দিল। বললুম "কী চাই?" বুদ্ধুরাম একটু হেসে বলল, "হরটিলার নিচের জঙ্গলে একটা লাশ পড়ে আছে।" চমকে বললুম, "কী বাজে কথা বলছিস হতভাগা?" বুদ্ধু বলল যে, লাশটার কথা সে কাউকে বলবে না—যদি আমি তাকে একশো টাকা দিই। থরথর করে কেঁপে

উঠলুম। রমলাকে কি জয়ই রাগের বশে খুন করে ফেলেছে? তবে সেই শুরু হল বুদ্ধুরামের ব্ল্যাকমেল করা। যখন-তখন সে টাকা দাবি করে। শুধু জয়ের কথা ভেবে মুখ বুজে থাকি। টাকা দিই। অবশেষে শরদিন্দুকে গোপনে ব্যাপারটা জানালুম। শরদিন্দু বলল, যে একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ লাগিয়ে রমলার ডেডবডিটা উদ্ধার করে বুদ্ধুকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ তার বিশ্বাস খুনটা বুদ্ধুই করেছে। অথচ মাধবজি আভাসে বলেছেন, হরটিলার নিচে একটা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। বিপ্রদাসজিকে গোপনে বলে সেটা গুম করে দিয়েছেন। তার আগে জয়কে নাকি ওখান থেকে পালিয়ে আসতে দেখেছিলেন। শুনে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলুম। শরদিন্দুই আমাকে কর্নেলের কথা বলেছিল।

১৩ সেপ্টেম্বর রাতে শরদিন্দু চিতাবাঘের হাতে মারা পড়ল। তখনও তলিয়ে কিছু ভাবিনি। পরদিন বুদ্ধু আবার টাকা চাইতে এসে বলল যে, সেই মেয়েটার ডেডবডি কোথায় পোঁতা আছে সে জানে। কাজেই তাকে দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।

তারপর আর দ্বিধা না করে কর্নেলের খোঁজে কলকাতা গেলুম। পাঁচদিন কলকাতায় থাকার পর তাঁর ঠিকানা যোগাড় করা গেল। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় একটা খবর না পড়লে ঠিকানা যোগাড় করতে পারতুম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী লাভ হল? উল্টে উনি আমাকেই সন্দেহ করে বসলেন। আমার ভয় হল, বুদ্ধুরামের ব্ল্যাকমেলের কথা বললেই হয়তো বুদ্ধুরামকে গ্রেফতার করবেন এবং বুদ্ধুরাম আমাকে অথবা জয়কে ফাঁসাবে। মাধবজিও সাক্ষী দেবেন নিশ্চয়। তারপর কর্নেলের কথামতো বুদ্ধুরামকে ভাগলপুর পাঠানোর জন্য ডাকলুম। শয়তান বুদ্ধুরাম বলল যে, আরও একটা ডেডবডির খোঁজ সে পেয়েছে। সেটা আছে বিপ্রদাসজির ঘরে। বডিটা না সামলালে কুমারসাবের বিপদ হবে। ওকে জিজ্ঞেস করলুম বডিটা কাকাবাবুর কি না। বুদ্ধু বলল যে তাই বটে। ভয় পেয়ে ওকে বললুম, "বডিটা রাত্রেই সামলে দে। টাকা দিচ্ছি।" টাকা নিয়ে বুদ্ধু বলল, "নিশ্চিন্তে থাকুন ছোটোকুমারসাব। রাত্তিরেই সামলে দিব।"

কিন্তু সামলাতে পারেনি। হরটিলার শিবলিঙ্গের তলায় নাকি রমলার লাশ বিপ্রদাসজি লুকিয়ে ফেলেছেন। সকালে বুদ্ধু আমাকে সেকথা বলল। তারপর বলল, "বড়কুমারসাব কুকুর নিয়ে সারারাত পাহারায় ছিলেন। তাই লাশটা গুম করা গেল না।" বিপদ দেখে বললুম, "তুই কত পেলে চিরকালের জন্য রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাবি বল?" বুদ্ধু পাঁচহাজার টাকা চাইল। ওকে তাই দিলুম। কবিতার বই ছাপানোর জন্য যে পাঁচহাজার টাকা ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে এনেছিলুম, তার সবটাই চলে গেল বুদ্ধুর খপ্পরে।

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় কর্নেলের ঠিকানার খোঁজে এক সাংবাদিক ভদ্রলোক—জয়ন্ত চৌধুরী বোধ করি তাঁর নাম, হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

"বুড়ো ঘুঘুকে কী দরকার? রহস্যময় কিছু ঘটছে কি?" আমি 'বুড়ো ঘুঘু' কথাটা সেই প্রথম শুনি।

গতরাতে কর্নেলকে ইশারায় সজাগ করে দেবার জন্য ভূতের গল্প বলে একটা ছড়া উপহার দিয়েছিলুম বুড়ো ঘুঘুর নামে। এখন মনে হচ্ছে, উনি যদি আমাকে ছড়াটা নিয়ে জেরা শুরু করতেন তাহলে রাতেই সব কথা বলে ফেলতুম। উনি ছড়ার দিকে মনই দিলেন না। উল্টে জিগ্যেস করলেন, যে কবে থেকে আমি দাড়ি রাখছি। শুনেই বুঝলুম, রমলা ও শরদিন্দুর খুনের জন্য আমিই ওঁর সন্দেহভাজন। হায়, ওঁর সন্দেহ দূর করতে পারতেন হয়তো কাকাবাবু। তিনি জানতেন বুদ্ধু আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। কারণ আভাসে আমাকে বলেছিলেন, "বুদ্ধুকে প্রশ্রয় দিও না।"

কিছুক্ষণ আগে কাকাবাবুর ডেডবডি উদ্ধার করা হয়েছে। বুদ্ধুরাম চলে গেছে। এবার আমি কর্নেলের হাতে বিপন্ন। খাল কেটে কুমির ঢুকিয়েছি। কী নির্বোধ আমি!

পুনশ্চ ঃ জয়ের উদ্দেশে—জয়, তুই আর আমি একই আত্মার অংশ। আমরা যমজ ভাই। রমলার মেয়ে মিমি হয়তো আমার, হয়তো তোর—দুজনেরই কোনো একজনের ঔরসে জন্ম নিয়েছে। মিমির মধ্যে একই আত্মার স্বাক্ষর আছে কি না ভেবে দেখিস। তুই ওকে মেনে নিস নিজের মেয়ে বলে। স্টেশন থেকে আসার পথে রমলা মিমির কথা বলেছিল আমাকে। আমার কী যে ইচ্ছে করছিল তাকে দেখতে। এ জীবনে তো তাকে স্নেহ দিতে পারলুম না। তুই থাকলি আমার হয়ে ওকে স্নেহ দিতে। জয়, আমার এই শেষ ইচ্ছা কি তুই মেটাবি না? ইতি, হতভাগ্য বিজয়াদিত্য।"

সুন্দর বিভীষিকা

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার সম্পর্কে সব বলতে গেলে একখানা আঠারো পর্ব মহাভারত হয়ে পড়ার ভয় আছে। আইন-আদালত সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা এবং নানান জায়গায় পুলিশ জার্নালে যাঁরা চোখ বুলিয়েছেন, তাঁরাই জানেন লোকটা কে বা কী।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরনো দলিল-দস্তাবেজ হাতড়ে যাঁরা যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে চান, আফ্রিকা ও বর্মাফ্রন্টে মাঝে মাঝে এক যোদ্ধার উল্লেখ পাবেন—তাঁর নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। উনিশশো বিয়াল্লিশে বর্মায় যে মার্কিন গেরিলাদলটি জাপানিদের পিছনে গিয়ে চোরাগোপ্তা লড়াই করেছিল,

তাদের রেকর্ডেও এই নাম পাওয়া যাবে। তখন উনি ছদ্মবেশে বর্মিদের গ্রামে থাকতেন এবং গেরিলাদলটিকে প্রচুর খবরাখবর যোগাতেন।

যুদ্ধ শেষ হল। তারপর একদা ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। তারপর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার অবসর নিলেন। এবার তাঁর খ্যাতি ছড়াল প্রকৃতিবিদ হিসেবে। শিকারের নেশা বরাবর ছিল। সেই সুবাদে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে উদ্ভিদ, পোকা-মাকড় আর পাখি নিয়ে খোঁজখবর করতেন। অবসর নেবার পর এটাই হয়ে দাঁড়াল একটা বড় নেশা। দেশবিদেশের পত্রপত্রিকায় এসব ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখতেন। বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দিতেন। অনেক তর্কবিতর্ক হত। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁদের সরজমিনে নিয়ে গিয়ে নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করে ছাড়তেন—এমনি জেদী মানুষ তিনি।

তখন অবশ্য আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। হবার কথাও না। আমি কলকাতার এক প্রখ্যাত দৈনিক কাগজের রিপোর্টার। কাজের সূত্রেই এমন এক সাংঘাতিক ঘটনার মুখোমুখি গিয়ে পড়লুম, যার পরিণামে নিজেরই প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ল এবং কর্নেল ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

সে ছিল একটা আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের ব্যাপার। স্থানীয় এক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তাদের যোগসাজশ ছিল। সেটা দৈবাৎ আমি আবিষ্কার করি এবং আমার সহকর্মী এক ফটোগ্রাফার খুন হয়ে যায়। আমাকেও শাসানো হয়। পুলিশ খুব একটা সুবিধে করতে পারছিল না। কারণ ওই নেতার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। অথচ আমার কাছে তেমন কোনো প্রমাণ ছিল না। যেটুকু ছিল, তা ফটোগ্রাফার বন্ধুটির ক্যামেরার মধ্যে ফিল্মে। সে খুন হবার সময় ফিল্মটাও খুনীরা হাতিয়ে নেয়।

যাই হোক, পুলিশ যখন খুনটা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, তখনই প্রথম কর্নেলের নাম আমি শুনি। প্রথমে ভেবেছিলুম, উনি কোনো গোয়েন্দা অফিসার। পরে জানলুম, না—শৌখিন গোয়েন্দা। কিন্তু পুলিশ মহলে ওঁর সুনাম প্রচণ্ড। শেষ অব্দি কর্নেলের সহায়তায় আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্র ধরা পড়ল এবং সেই রাজনৈতিক নেতাকেও পাকড়াও করা হল। আমাদের কাগজের বিক্রিসংখ্যা দু'লাখ থেকে রাতারাতি তিন লাখে দাঁড়াল। কর্নেলের নাম এবার সাধারণ মানুষও জানতে পারল। এবং দেখতে দেখতে আমিও ওঁর ন্যাওটা হয়ে উঠলুম।

ঠিক কবে থেকে এবং হঠাৎ কীভাবে উনি গোয়েন্দা হয়ে উঠলেন, আমাকে খুলে বলেননি। প্রশ্ন করলে রহস্যময় হেসেছেন শুধু। তবে আমিও দুঁদে রিপোর্টার। আবছা অনুমান করেছি—অন্তত কীভাবে উনি ঘুঘু গোয়েন্দা হয়ে গেলেন।

প্রকৃতিবিদের পক্ষে সেটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। পোকামাকড়ের আচরণ পর্যবেক্ষণ কিংবা দুর্লভ জাতের পাখির পিছনে ঘুরে বেড়ানোতে তাঁদের প্রায় গোয়েন্দাগিরিই করতে হয়। কত সময় যায়, কত ধূর্তামির দরকার হয় এসব কাজে, কহতব্য নয়।

অবশ্য উনি বলেন—দেখ জয়ন্ত, একবার একটা মাকড়সার আচরণ দেখতে দেখতেই আমার গোয়েন্দাগিরি শেখা হয়ে গেছে। আমার কতকগুলো দুর্লভজাতের পোকামাকড়ের সংগ্রহ ছিল। সেবার প্রায়ই দেখতুম, একটা করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সারাক্ষণ পাহারা দিয়েও ধরতে পারতুম না, এর রহস্যটা কী। অবশেষে আবিষ্কার করলুম, আমার কোটের মধ্যেই একটা মাকড়সা থাকে। এবং আশ্চর্য জয়ন্ত, আমার হাত দিয়েই সে খুনটা সেরে লাশ গুম করে। বুঝতে পারলে না? কোটের হাতা বেয়ে সে এগিয়ে কাচের জারে ঢোকে এবং...

বাকিটা বলার দরকার ছিল না। তবে কর্নেল প্রায়ই খুনের প্রসঙ্গে তাঁর বিচিত্র মাকড়সাতত্ত্ব আওড়ান। এইসব তত্ত্বটত্ত্ব আমার সয় না। যদি নিছক তত্ত্ববাগীশ হতেন, তাহলে তো বন্ধুত্ব টিকতই না। আসলে উনি একজন ভ্রমণরসিকও বটে। আমার মধ্যেও এই ভ্রমণ-বাতিক আছে প্রচণ্ড। মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে আজকাল বেরিয়ে পড়ি। জঙ্গলে পাহাড়ে সমুদ্রে যাই। কিন্তু কথায় আছে ঃ অমুক যায় বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। গিয়েই পড়তে হয় খুনের পাল্লায়। কর্নেল বলেন—আমার খুনের কপাল। তারপর গোয়েন্দাপ্রবর আর চুপ করে থাকেন না। স্বমূর্তিতে বেরিয়ে পড়েন।

এমনি একটি ঘটনা এখানে বলছি।...

তখন আমি তরাই অঞ্চলের বনেজঙ্গলে ভুতুড়ে চরিত্রের এই সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে টোটো করে ঘুরছি। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, পিঠে পয়েন্ট দুশো পঞ্চাশ মার্কা ম্যাগনাম অ্যান্ড ম্যাগনাম রাইফেল বেঁধে শুধু ঘোরা আর হন্যে হওয়া। সামনে কোনো বধ্য জানোয়ার দেখলেও রাইফেল তাক করার উপায় নেই। আমার বিদঘুটে সঙ্গীটি অমনি কাঁধে থাবা হাঁকড়ে কড়া দৃষ্টিতে তাকান। অবাক লাগে। এই বুড়ো বয়সে ভদ্রলোক অমন দৈত্যের মতো জোর পেলেন কোথায়... আর মোটে এক ফ্লাস্ক চা ও কয়েকটা রুক্ষ বিস্কুট গিলে তিনি কখনো হামাগুড়ি খেয়ে, কখনো বুকে হেঁটে, কখনো লাফ দিয়ে হীরাকুণ্ডার জঙ্গল পাহাড় তোলপাড় করে ফেলেন। উদ্দেশ্য এক দুর্লভ জাতের পাখির আস্তানা আবিষ্কার। বাইনোকুলার, ক্যামেরা আর কী সব আজগুবি যন্ত্র ওঁর সঙ্গে রয়েছে। প্রত্যেকটাই বিশেষ মডেলের এবং বিদেশী জিনিস। আমাকে ক্লান্ত দেখলেই উনি একটু হেসে বলেন—ডার্লিং জয়ন্ত, সামনের ওই পাহাড়টা দেখছ—ওটার সানুদেশে একটা জলের ঝর্না আছে। সেখানে গিয়ে আমরা বসব এবং বিশ্রাম করব।

এমন করে সেই স্যাঁতসেঁতে সেপ্টেম্বর মাসের এক বিকেলে তিনি আমাকে এমন এক জায়গায় তুললেন, যা সেই বিশাল জঙ্গলে এক আশ্চর্য বস্তু।

প্রথমেই থ বনে গেলুম, যখন দেখলুম একফালি চমৎকার পিচের রাস্তায় আমরা এসে পড়েছি। রাস্তাটা অবিশ্বাস্য লাগছিল। সারাদিন কোথাও যেখানে সভ্যতার এতটুকু চিহ্ন দেখিনি, সেখানে যেন আলাদিনের জাদু-পিদিমের কারচুপিতে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি এই চমৎকার সভ্যতা সৃষ্টি করে বসলেন। আমি হাঁ করে

তাকিয়ে আছি দেখে উনি বললেন—জয়ন্ত, এই জঙ্গলে আরো অনেক আশ্চর্য জিনিস তোমাকে দেখব। চলে এস।

রাস্তাটা সংকীর্ণ। ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে উত্তরে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু উনি আমাকে আরও অবাক করে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করলেন। বুঝলুম, সেই উডডাক নামক দুর্লভ প্রজাতির পাখিটি—যাকে অনুসরণ করে সারাটি দিন কেটে গেল, আবার তাকে দেখতে পেয়েছেন। পাখিটার স্বভাব বড় অদ্ভুত। খুব জোর উড়তে পারে না এবং বার বার উঁচু গাছের মগডালে বসে পড়ে। সেইসঙ্গে বারকতক ডেকে নিজের অস্তিত্বও ঘোষণা করে। আমার বন্ধুর মতে, বেচারা সঙ্গিনীর খোঁজে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, এবার যখন উনি দৌড়লেন, বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। এই রাস্তা ছেড়ে আর একচুল নড়তে রাজি নই।

তারপর দেখলুম, উনি হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া খাদের দিকে চলেছেন। সবখানেই ঝোপঝাড় আর উঁচুগাছের জঙ্গল। একটু পরে ওঁকে হারিয়ে যেতে দেখলুম। ভেবেছিলাম, পিছু ফিরে আমাকে ডাকবেন—কিন্তু একবারও পিছু ফিরলেন না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন আমি রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরালুম এবং বিকেলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চোখ রাখলুম। সেই সকালে বনদ্ফতরের বাংলো থেকে বেরোবার পর এতক্ষণ অব্দি এই সৌন্দর্যের দিকে তাকাবার সুযোগ পাইনি। মনও ছিল না। পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর চূড়া ছুঁয়ে সূর্য নরম গোলাপী রোদ ছুড়ে দিচ্ছে আমার দিকে। উত্তরের পাহাড়টা ন্যাড়া। তার ধূসর পাথুরে চেহারা খুব শান্ত আর অমায়িক দেখাচ্ছে। কেউ বলে না দিলেও মনে হল, খুব সম্ভব ওদিকে আর একটু এগোলেই নেপালের সীমানা পড়বে।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নামল। ধূসর হয়ে উঠল সব আলো। এবার একটু উদ্বিগ্ন হলুম। বুড়ো তো এখনও ফিরলেন না। আমাদের এখন সাত মাইলের বেশি পথ ভেঙে বাংলোয় পৌঁছতে হবে। আর পথ মানে কী? পথটথের কোনো ব্যাপার নেই। তার ওপর জন্তুজানোয়ার বেমক্কা হানা দিতে পারে। রাইফেল আর টর্চ অবশ্য আছে সঙ্গে। কিন্তু আচমকা কিছু ঘটলে তা কাজে লাগাতে পারব কি না বলা কঠিন।

দিনের আলো খুব শিগগির ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছিল আমার। হঠাৎ মনে পড়ল, ওঁর সঙ্গে তো কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই! সচরাচর কিছু জন্তু ঠিক এই সময় রাতের শিকারের বউনিতে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা যতই থাক, নিরস্ত্র মানুষের পক্ষে কি এমন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হচ্ছে? তাছাড়া, গাছপালার ওপর এখন অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। উডডাকটা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। আর চুপ করে থাকা গেল না। মরিয়া হয়ে ডাক দিলুম—কর্নেল! কর্নেল-সায়েব! আমার ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। কিন্তু কোনো সাড়া এল না।

এমন মানুষ কর্নেল যে বোকার মতো এখনও পাখির পিছনে ঘুরছেন, মনে হয় না। নাকি উনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন? পথ হারাবার সম্ভাবনা ওঁর খুবই কম। কারণ এই অরণ্য এলাকার প্রতি ইঞ্চি যে ওঁর চেনা, তার প্রমাণ আজ দুদিন ধরে পেয়ে যাচ্ছি। তবে কি উনি পা ফসকে খাদে পড়ে গেছেন? ভাবতেই গা শিউরে উঠল। রাস্তার যেখানটা দিয়ে উনি নেমেছেন, সেখানটা বেশ ঢালু হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছিল, ওদিকে গভীর খাদ আছে। কিন্তু দেখতে দেখতে অন্ধকার এত ঘন হয়ে উঠল যে সেপথে আমার পক্ষে যাওয়া এখন অসম্ভব। এতক্ষণে বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল।

আবার মরিয়া হয়ে হাঁক দিলুম—কর্নেল! কর্নেল-সায়েব! আবার পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে ডাকটা মিলিয়ে গেল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না! রাস্তাটা অস্বাভাবিক নির্জন। এতক্ষণ ধরে কোনো মানুষ বা গাড়িও আসেনি। টর্চটা বের করে উপরে নিচে চারপাশে আলো ফেলে আর একটা হাঁক দিলুম—কর্নেলসায়েব! তবু কোনো সাড়া নেই। এবার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উত্তরের দিকে রাস্তা ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়লুম। এসময় কেউ আমাকে দেখলে ঠিক পাগলই ভাবত।

কিছুটা এগিয়ে রাস্তা পাহাড়ের দেয়াল পাশে নিয়ে এবার পশ্চিমে ঘুরেছে। তারপর পূর্বে মোড় নিয়েছে। যেখানে পাহাড়টা শেষ হয়েছে, তার ওপাশে কিছু সমতল কিছু উঁচু ঘন ওকবনে ঢাকা খানিকটা জমি দেখা গেল। তার পিছনে একটা টিলা আকাশে মাথা তুলেছে। সেখানে একটা আলো লক্ষ্য করলুম। আলোটা দেখামাত্র সাহস বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে টের পেলুম, আসলে এতক্ষণ কারো সাহায্য পাব আশা করেই এই সিকি মাইল পথ দৌড়ে এসেছি। ওকবনের দিকে আলো ফেলে দেখলুম, একফালি এবড়োখেবড়ো সরু পথ চলে গেছে টিলাটার দিকে। আলোটা যে ইলেকট্রিক, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু ওকবনের রাস্তার ধারে কোনো খুঁটিখাটা নেই। তাই মনে হল, নিশ্চয় টিলার ওদিকে কোনো বড় রাস্তা আছে, যেখান থেকে আলোর সংযোগটা ঘটেছে।

আপাতত যে কোনো একজন মানুষ আমার দরকার। তাকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। এ এলাকার কোনো জায়গাই আমার চেনা নয়। সেজন্যেই এমন কাকেও দরকার, যে এলাকাটা ভালভাবে চেনে।

ওকজঙ্গলটা ঢালু হয়ে নেমে আবার টিলার দিকে উঠেছে। প্রায় দৌড়ে পিচের রাস্তা থেকে নেমে ওই জঙ্গলের রাস্তায় গেলুম। তারপর জঙ্গলটা আমাকে গিলে নিল। খুব সরু রাস্তা—মনে হল, প্রাইভেট রোড। বড় বড় পাথর বসিয়ে কোনরকমে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেন।

এই পথটুকু পেরোতে খুব বেশি সময় লাগল না। তারপর দেখলুম, আমি মোটামুটি ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি। রাস্তাটা ঘুরে টিলার গায়ে উঠেছে। এবং আন্দাজ দেড়শো থেকে দুশো ফুট উঁচুতে একটা বাড়ি আবছা

দেখা যাচ্ছে। ওই বাড়ির একটা জানলাতেই আলোটা দেখা যাচ্ছে। বাকি অংশ অন্ধকার।

হাঁফাতে হাঁফাতে যখন ওই দেড়শো বা দুশো ফুট উঁচুতে বাড়িটার গেটে পৌঁছেছি, তখন বড় রাস্তার দিকে যেন গাড়ির শব্দ শুনতে পেলুম। একঝলক আলোও গাছপালার মাথায় শিসিয়ে উঠল। তারপর মিলিয়ে গেল। তাহলে রাস্তায় অপেক্ষা করলেও চলত।

যাই হোক, যখন এসে পড়েছি, স্থানীয় লোকের সাহায্যই ভাল হবে। গেট খুলে লনে দাঁড়ালুম। একটু ইতস্তত করলুম। নিশ্চয় অনধিকার প্রবেশ করছি। আবছা যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, বাড়ির মালিক শৌখিন এবং পয়সাওলা মানুষ। নিশ্চয় কোনো শৌখিন পুঁজিপতির শৈলাবাসে হানা দিতে যাচ্ছি। লোকটা ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেবে না তো? আরেকটা ভয় অবশ্য ছিল—তা কুকুরের। কিন্তু গেটে টর্চের আলো ফেলেও কোনো কুকুর গর্জাল না যখন, তখন বাড়িতে কোনো কুকুর নেই তা নিশ্চিত।

মরিয়া হয়ে এগোলুম। নুড়িবিছানো রাস্তায় আমার গামবুট দেবে যাচ্ছিল। শব্দ হচ্ছিল জোর। কিন্তু কোনো লোকের সাড়া পেলুম না তখনও।

সামনে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ির ওপর বারান্দা দেখতে পেলুম। তিনটে হাল্কা চেয়ার রয়েছে। বারান্দাভর্তি অজস্র টব। টবে গাছপালা আছে। আলো ফেললেও কেউ ধমক দিয়ে তেড়ে এল না। অথচ একটা ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দা থাকায় ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না। আমি বারান্দায় ইচ্ছে করে জুতোর শব্দ তুললুম। তারপর কাশলুম। তবু কোনো সাড়া নেই। ব্যাপার কী?

এবার একটু ইতস্তত করে ইংরিজিতে বলে উঠলুম—কেউ আছেন কি স্যার?

তবু কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকলুম। তবু জবাব নেই। তখন খুব জোরে বাঁদিকে আলোজ্বলা ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিলুম।

এতক্ষণে মেয়েলি গলার চাপা ভিতু ধরনের সাড়া এল—কে?

তখন খানিকটা রাগ হয়েছে আমার। অদ্ভুত ব্যাপার তো! এই সবে সন্ধ্যা হল। এরি মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো হচ্ছিল? একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বললুম—বাঘ ভালুক নই, একজন বিপন্ন মানুষ। দয়া করে বেরোবেন কি?

পরিষ্কার কথা ভেসে এল—না।

—কী আশ্চর্য। আপনি না বেরোন, কোনো পুরুষমানুষকে ডেকে দিন।

—কোনো পুরুষমানুষ নেই এখন।

—সে কী! আপনি একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কে আপনি?

—আপনি কে?

পাল্টা প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেলুম। ঠিকই তো! নিজের পরিচয়টা আগে দেওয়া উচিত। কণ্ঠস্বর ভদ্র ও বিনয়ী করে বললুম—দেখুন আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী। কলকাতা থেকে এসেছি। বিখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের একজন সাংবাদিক।

—আমি তো কোনো ভি আই পি নই। আমার কাছে কী চান?

—আহা! কথাটা শেষ করতে দিন! আমি এসেছিলুম হীরাকুণ্ডা ফরেস্ট বাংলোয়। শিকারের হবি আছে, তাই। আমার সঙ্গে এসেছিলেন প্রখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর এবং হত্যাসংক্রান্ত অপরাধবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার...

বাধা এল।—কী বললেন?

—কর্নেল সরকার।

—হত্যা না কী বললেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি খুনটুনের ব্যাপারে শৌখিন গোয়েন্দাগিরি করেন।

—এখানে কেউ খুন হয়নি! আপনারা চলে যান এখান থেকে।

—আহা, কথাটা আগাগোড়া তো শুনবেন! কর্নেল একটু আগে জঙ্গলে হারিয়ে গেছেন। খুঁজে পাচ্ছি না, তাই...

—মিসিংস্কোয়াডে খবর দিন না! হীরাকুণ্ডা টাউনশিপের থানায় চলে যান। মাত্রা তিন মাইল রাস্তা!

—আপনি তো ভারি অদ্ভুত! দরজাটা খুলে আগে সবটা শুনুন!

—আপনি যে চোরডাকাত নন, তার প্রমাণ কী?

—প্রমাণ? ভীষণ খাপ্পা হয়ে পকেটে হাত ভরলুম। তারপর আমার সরকারি প্রেসকার্ড এবং অফিসের পরিচিতিপত্র (ছবিসমেত) বের করে বললুম—এই কার্ডদুটো দেখুন। দরজা ফাঁক করুন, ফেলে দিচ্ছি।

—ওপাশে জানলা খোলা আছে, ফেলে দিন!

—কী অদ্ভুত! বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিন না। আমার টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল যে।

—বারান্দা আর ওদিকের ঘরের কানেকশান কাটা। আলো জ্বলছে না।

—কাটা মানে।

—হ্যাঁ, কেউ কেটে দিয়েছে! বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর ফের শোনা গেল—আমিও আপনার মতো বিপন্ন।

একলাফে নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে কার্ডদুটো ভিতরে ছুড়ে দিলুম। তারপর বারান্দায় ফিরলুম। বললুম—এবার বিশ্বাস হল?

দীর্ঘ দুটি মিনিট চুপচাপ থাকার পর দরজাটা একটু ফাঁক হল তারপর একটি শরীরের ওপরের দিকটা একটুখানি উকি মারল। টর্চের ব্যাটারি সত্যি ফুরিয়ে এসেছিল। তাই চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

মহিলাটি ডাকলেন—আসুন!

আমি প্রায় হুড়মুড় করে ভিতরে গেলুম। অমনি উনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঘরে একটা উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলছে। ওঁর দিকে তাকিয়ে আমার চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে গেল। এক আশ্চর্য সুন্দরী যুবতী আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু মুখে কেমন চাপা উদ্বেগ, চেহারা বেশ খানিকটা বিস্রস্ত, চুল এলোমেলো, শাড়ির ওপর একটা ড্রেসিং গাউন চড়ানো আছে—কিন্তু ফিতে খোলা। তাহলেও বোঝা গেল, উনি শুয়ে ছিলেন না—সম্ভবত ঘরের মধ্যে শ্রমসাপেক্ষ কোনো কাজ করছিলেন এতক্ষণ। সেই শ্রমের চিহ্ন ওঁর কপালে চিবুকে ও নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘামে প্রতিভাত হচ্ছে। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে উনি বললেন—বসুন মিঃ চৌধুরী।

বসলুম। ততক্ষণে কর্নেলের কথা চাপা দিয়ে এই যুবতীর সম্পর্কে একটা তীব্র কৌতূহল এসে পড়েছে। কে ইনি? এমন একা কেন? কোনো লোকজন আয়া পরিচারিকা বা চাকরবাকর কেউ নেই। তার ওপর ওপাশের ঘরের ও বাইরের বারান্দায় নাকি কেউ আলোর তার কেটে রেখেছে। তারের কথা ভাবতে গিয়ে আমার চোখে পড়ল কোনার টেবিলে একটা ফোনও রয়েছে। ফোনটা দেখে আশ্বস্ত হলুম। তারপর বললুম—আমার ব্যাপার নিয়ে আপাতত আর কিছু বলতে চাইনে, কারণ, মনে হচ্ছে বিপদ আপনারাই বেশি। কী হয়েছে বলবেন কি? আর ইয়ে আপনার পরিচয় এখনও আমি পাইনি কিন্তু!

যুবতী সোফার অন্যদিকটায় বসে পড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি এ বাড়ির একজন মানুষ। আমার নাম মিসেস আরাধনা সিং। এটা আমাদের শৈলাবাস বলতে পারেন। মধ্যে মধ্যে স্বামীর সঙ্গে এখানে এসে থাকি।

বাধা দিয়ে বললুম—কিন্তু আপনি এখন একা কেন?

একটু ইতস্তত করার পর আরাধনা বললেন—আপনি একজন সাংবাদিক জেনেই আমার সাহস হল। সব কথা খুলে বলতে কোনো সংকোচের কারণ দেখছিনে। মিঃ চৌধুরী, আপনি শিলিগুড়ির বিখ্যাত টিম্বার্‌ মার্চেন্ট মিঃ শৈলেশ সিংয়ের নাম কি শোনেননি? সেই যে একবার নিউজপেপারে ওঁর নামে খবর বেরিয়েছিল।

তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। শৈলেশ সিং গতবছর নিজের জীবন বিপন্ন করে এক আন্তর্জাতিক স্মাগলিং র‍্যারেট পুলিশকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জনসাধারণ খবরের কাগজে এই অমিতসাহসী নেপালি ভদ্রলোকের কীর্তিকাহিনী কয়েকটি কিস্তিতে পড়েছিল। সেই শৈলেশ সিং! আর ইনি তাঁর স্ত্রী? অবাক হলুম। কাগজে মিঃ সিংয়ের ছবি দেখেছিলুম মনে আছে। কিন্তু তিনি তো প্রৌঢ়! আর আরাধনা সিংয়ের বয়স বড় জোর তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে!

শুধু বললাম—কী আশ্চর্য!

আরাধনা বললেন—আশ্চর্য নয়, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। যে র‍্যাকেট উনি ভাঙতে সাহায্য করেছিলেন, তার সব লোক মোটেও ধরা পড়েনি। তারাই সেই থেকে ওঁর পিছনে লেগে আছে। অনেকবার একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছেন। যেমন আজকের ঘটনা।

ওঁকে থামতে দেখে বললুম—থামবেন না প্লিজ, বলে যান।

আরাধনা এরপর যা বললেন, শুনে আতঙ্কে শরীর কাঠ হয়ে গেল। হাত ঘেমে রাইফেলটা পিচ্ছিল হয়ে উঠল।...

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে এই ঃ শৈলাবাসটা ক'মাস আগে শৈলেশ কিনেছেন। একজন বিদেশি প্ল্যান্টার ছিলেন এটার মালিক। অনেক খরচা করে একটা ফোন ও ইলেকট্রিক লাইনও টেনে এনেছিলেন বাড়িটা অব্দি। যাই হোক, নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে সভ্যতার সবরকম সুখসুবিধা এখানে রয়েছে। কেনার পর মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে শৈলেশ এখানে এসে কাটিয়ে যান। সঙ্গে আরো দুজন আসে—পরিচারিকা লতা আর বাবুর্চি-কাম-ভৃত্য রঘুবীর। এবার এসেছেন গতকাল বিকেলে। একটা ল্যান্ডমাস্টার গাড়ি করেই শৈলেশ এখানে আসেন।

...আজ বিকেলে, তখন বেলা আড়াইটে—আচমকা একটা জিপ আসে। তারপর জনাচার সশস্ত্র লোক জিপ থেকে দৌড়ে আসছে দেখে এঁরা দরজা বন্ধ করে দেন। শৈলেশ জানালার ফাঁক দিয়ে রিভলবারের গুলি ছোড়েন। তারাও কয়েকবার গুলি ছোড়ে। দেয়ালে লাগে। তারা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। তখন তারা বারান্দার ইলেকট্রিক লাইন আর ফোন লাইনটা কেটে রেখে চলে যায়।

...ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর শৈলেশ দরজা খোলেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, ওদিকের ঘরে লতা আর রঘুবীর ছিল, তাদের কোনো পাত্তা নেই। তাহলে কি ওদের তারা খুন করে গেল? অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন শৈলেশ হীরাকুণ্ডা থানায় যাবেন বলে পিছনের গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলেন। আরাধনা অবাক হলেন দেখে যে স্বামী তাঁকে ফেলে পাগলের মতো একা গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

......আরাধনা গাড়ির পেছনে-পেছনে কিছুদূর ছুটে যান এবং চেঁচামেচি করেন। কিন্তু শৈলেশকে যেন ভূতে পেয়েছিল। একা এই জঙ্গলে অসহায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে চলে গেলেন।

......আরাধনা অগত্যা কী আর করেন। প্রতিমুহূর্তে স্বামীর ফেরার প্রতীক্ষায় কাটাচ্ছেন। অথচ ভদ্রলোক এখনও ফিরলেন না...

ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষণ আতঙ্কে চুপচাপ থাকার পর আমি শুধু বললুম—আশ্চর্য তো! মিঃ সিং আপনাকে এমনি করে একা ফেলে রেখে গেলেন?

আরাধনা করুণ মুখে বললেন—উনি বরাবর ওইরকম খামখেয়ালি আর গোঁয়ার। ঝোঁক উঠলে দেবতাদেরও সাধ্য নেই ওঁকে কেউ ম্যানেজ করে।

—কিন্তু আপনাকে একা ফেলে? বলে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম।

আরাধনার চোখে জল দেখা যাচ্ছিল। এবার দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।—আমার ওপর ওঁর তো কোন মায়া-মমতা নেই মিঃ চৌধুরী। আমি ওঁর শখের পোশা জানোয়ার মাত্র। আপনি জানেন না, আমি কীভাবে কাটাচ্ছি।

বুঝলুম, ভদ্রমহিলা এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ গেছে, এবার তার বিস্ফোরণ ঘটছে। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরের ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ছে। সেটাই তো স্বাভাবিক। একজন ধনী প্রৌঢ় তাঁর মেয়ের বয়সী এক মহিলাকে নিতান্ত শখ অথবা স্রেফ উপভোগ ছাড়া আর কেন্নই বা বিয়ে করবেন? কিন্তু যে মানুষ অমন দেশপ্রেমিক তিনি একটু মানবপ্রেমিক হলে কী ক্ষতি ছিল?

আরাধনা মুখ নামিয়ে হু-হু করে কাঁদছেন। কী বলে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পেলুম না। কর্নেল বুড়ো এখন পাশে থাকলে চমৎকার ম্যানেজ করতে পারতেন! তিনিই বা কোথায় উধাও হয়ে রইলেন?

চুপচাপ বসে ঐ কান্না শোনা কঠিন। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—মিসেস সিং। প্লিজ! এ অবস্থায় কেঁদে শুধু মনোবল হারানো। আপনি শান্ত হোন! আমি যখন এসে পড়েছি, তখন কোনো চিন্তা করবেন না।

আমার কথা শুনে মুখ তুললেন আরাধনা। কোত্থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে শান্তভাবে বললেন, আপনাকে ভগবান আমার জন্যে পাঠিয়েছেন মিঃ চৌধুরী। এতক্ষণ আপনি না এলে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করে বসতুম!

ব্যস্তভাবে একটা কিছু বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ বাইরে বাতাসের শনশন শব্দ শোনা গেল। তারপর একমাত্র খোলা জানালাটা জোরে নড়ে উঠল। (ওই জানলাটা খুলে রাখার কারণ যে বাইরের কোনো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তা ততক্ষণে বেশ টের পেয়ে গেছি।) আরাধনা দ্রুত উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন—প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আজকাল ওই ঝড়টা ওঠে। পাহাড়ী আবহাওয়া বড্ড খামখেয়ালি! দেখুন না, হয়তো বৃষ্টিও শুরু হবে।

বাইরে চাপা শনশন শব্দটা বাড়তে শোনা যাচ্ছিল। কর্নেলের জন্যে এবার উদ্বেগ জাগল মনে। বেঘোরে প্রাণ খোয়ালেন না তো হটকারি গোয়েন্দাবর? এইসব পাহাড়ী ঝড়বৃষ্টি যে কী সাংঘাতিক, তাও তো ওঁর অজানা নয়। সেপ্টেম্বর মাসে একটু বৃষ্টিতেই পাহাড়ে বড় বড় ধস নামে। আমার শরীর আবার শিউরে উঠল।

আরাধনা তখন সামলে উঠেছেন। অনেকটা সপ্রতিভ দেখাচ্ছে ওঁকে। বললেন—কিচেন আর ডাইনিং বারান্দার ওপাশে। সেই লাঞ্চের পর এখনও একফোঁটা চা বা কফি খাওয়া হয়নি। মিঃ চৌধুরী কীভাবে মাননীয় অতিথির সৎকার করব, জানি না।

আমরা পরস্পর ইংরিজিতেই কথা বলছি। আরাধনার মুখের গড়নে পর্বতকন্যার আদল। মিশনারিদের দৌলতে বহুকাল আগে এসব পাহাড়ে সভ্যতা ও ইংরিজি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আরাধনার ইংরিজিতে বিলিতিয়ানার ছাপ এত স্পষ্ট যে মনে হল নির্ঘাত কনভেন্টে পড়া মেয়ে। আমার ইংরিজি এদিকে এমন ভারতীয়, কহতব্য নয়।

ওঁর কথা শুনে চা-কফির নেশা মাথায় চড়ে। গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠে বললুম—আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে কিচেনে গিয়ে অনায়াসে চা-কফির ব্যবস্থা করা যায়!

আরাধনার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। বললেন—হ্যাঁ, আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে। আর আমার ভয় করার কিছুই নেই। চলুন, যাওয়া যাক্।

বলে হঠাৎ ঘুরে একটা টেবিলের দিকে এগোলেন আরাধনা।—এক মিনিট। মোমবাতি নিই। কারেন্ট বন্ধ হলে এগুলো কাজে লাগে। তাই রাখা আছে।

দরজা খুলে বেরোলুম দুজনে। মধ্যেকার দশফুট বাই পনের ফুট খোলা বারান্দামতো জায়গায় পা দিতেই ঝড়ের ধাক্কা লাগল শরীরে। টর্চ জ্বেলে দেখলুম, ওপাশের ঘর অর্থাৎ ডাইনিং-কাম-কিচেনের দরজা বাইরে থেকে শুধু আটকানো আছে মাত্র।

আরাধনা ততক্ষণে আলোকিত বেডরুমের দরজাটা লক করে দিয়েছেন। মহিলা বুদ্ধিমতী কোনো সন্দেহ নেই।

ডাইনিং ঘরটা বেডরুমের ডবল। ওপাশে কিচেন ও কাউন্টার। গ্যাসলাইনও রয়েছে দেখলুম। আরাধনা উনুনটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন—ঠিক আছে। গ্যাসলাইনটা ওরা নষ্ট করে যায়নি।

আমি ডাইনিং টেবিলে মোমবাতির সামনে আরাম করে বসলুম। গ্যাসের নীল আগুনে আরাধনা কেটলি চড়িয়ে দিলেন। তারপর কাববোর্ড খুলে কাজে ব্যস্ত হলেন। মোটামুটি ডিনারও খাওয়া যাবে—এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে আমি কর্নেল ও সব বিপদের কথা বেমালুম ভুলে গেলুম, আর ঠিক তখনই জোর বৃষ্টির শব্দ কানে এল। ছাদের ওপর দড়বড় করে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তারপর কাছাকাছি বাজ পড়ল। তারপরই শুরু হল মেঘগর্জন। বাড়িটা ওই তুমুল প্রাকৃতিক তাণ্ডবে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল।

কর্নেল গোল্লায় যাক—মনে মনে একথা বলে টেবিলে রাখা রাইফেলটা তুলে একবার দেখে নিলুম তৈরি আছে কি না। তারপর তাকালুম আরাধনার দিকে। ওঁর মুখের একটা পাশে মোমের আলো পড়েছে। ফরসা নিটোল গাল আর ঠোঁটের অংশ দেখা যাচ্ছে। গাউনের কিছুটা সরে ওঁর বুকের একটা দিকও চোখে পড়ছে। মনে হল, ব্রেসিয়ার পরেন না আরাধনা। আজকাল এ ফ্যাশান এদেশে চালু হয়েছে—যদিও আমাদের গ্রামের মেয়েরা এবং আগের দিনে তো অনেককেই, দারিদ্র্য শ্রম ইত্যাদি কারণে ব্রেসিয়ার পরতেন না। আরাধনার

দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলুম। সেই সময় উনি ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। মিষ্টি হেসে বললেন—একই সঙ্গে অল্পস্বল্প ডিনারটাও সেরে নেওয়া যাক। কী বলেন?

সানন্দে জবাব দিলুম—অবশ্যই।

এরপর টেবিলে কয়েক প্রস্থ খাবার এল এবং তার ফাঁকে ফাঁকে কথা চলতে থাকল দুজনের।

—মিঃ চৌধুরী কি বিবাহিত?

—না।

—কবে বিয়ে করবেন?

—ভেবে দেখিনি।

—ঝড়টা একটু কমেছে মনে হচ্ছে না?

—মনে হচ্ছে!

—বৃষ্টি কিন্তু জোর হচ্ছে। নির্ঘাত ধস ছাড়বে সবখানে।

—যা বলেছেন!

—মিঃ চৌধুরী, তার মানে আমরা একেবারে বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব! বুঝতে পারছেন? যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিন্তু! (হাসি)

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশের কী আছে? আমার ভাঁড়ারে প্রচুর খাবার আছে। আর সঙ্গিনী হিসাবে নিশ্চয় আমি খুব একটা অযোগ্য নই?

—মোটেও না, মোটেও না! (নার্ভাস হয়ে হাসছিলুম)

—আজকের রাতটা কিন্তু আপনাকে একটা বড় কাজ দেব।

—নিশ্চয়ই তো! ঠিকই তো!

—আপনার স্মার্টনেসটা কিন্তু চলে গেছে মিঃ চৌধুরী।

—ও, হ্যাঁ। মানে আমি ব্যাপারটা ভাবছি!

—কী ব্যাপার?

—আপনার এই বিপদ। ওদিকে আমার সেই কর্নেল ভদ্রলোক...

—ধরে নিন না, আমরা ধসের ফলে বিচ্ছিন্ন। কিছু করার নেই।

—তা যা বলেছেন।

—ওকি! আপনি তো কিছু খাচ্ছেন না!

—না, না। খাচ্ছি তো!

—খান। মাঝে মাঝে আমাদের ভীষণ স্বার্থপর হয়ে যাওয়া ভালো। এতে এক রকম স্যাডিজম আছে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

—এই সময় বাড়ির কাছাকাছি কোথাও ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে আরাধনা ছিটকে সামনের চেয়ার থেকে চলে এসে আমার পাশে

শসলেন। তারপর টেবিলে মুখ রেখে ঝুঁকে পড়লেন। আঁতকে উঠলুম। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি? দুহাতে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলুম—মিসেস সিং। মিসেস সিং!

আরাধনা সোজা হয়ে বসে কড়া চোখে বললেন—কে মিসেস সিং? আমি আরাধনা—জাস্ট এ লোনলি গার্ল! আমার কেউ নেই, কিছু নেই!

ওরে বাবা! এ যে যথার্থ হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। ভদ্রমহিলা অমন ভয়ানক ঘটনার পর নিশ্চয় তলে তলে মানসিক বিকৃতিতে ভুগছিলেন—এবার সেই বিকৃতিটা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে কোনো ভুল নেই। আমি ওঁর পিঠে হাত রেখে বললুম—আপনি নিশ্চয় অসুস্থ বোধ করছেন!

—করছি। প্লিজ, আমাকে ওঘরে নিয়ে চলুন।

এমন ক্লান্ত বিপন্ন কণ্ঠস্বরে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু ওঁর খাদ্য অর্ধভুক্ত পড়ে রইল যে!

অগত্যা ওকে সাহায্য করতে হাত বাড়ালুম। কিন্তু একেবারে অবশ শরীরে আমার কাঁধে ভেঙে পড়লেন। তারপর দেখি, গড়িয়ে পড়ছেন, তখন ওঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনার একটা সোফায় শুইয়ে দিলুম। চোখ বুজে পড়ে রইলেন। টেবিল থেকে জলের গ্লাস নিয়ে যেই কাছে গেছি, উনি চোখ খুললেন। তারপর বললেন—

—আমি কোথায়?

—আপনারই বাড়িতে। মানে...

আরাধনা আমাকে কথা বলতে দিলেন না। একটা হাত বাড়িয়ে রোগা আদুরে গলায় বললেন—আপনি আমাকে ধরে রাখুন না প্লিজ। বড় ভয় করছে।

আহা বেচারা! মায়ায় গলে গিয়ে এবং লোভে তো বটেই আরাধনার মাথাটা তুলে আমার উরুর ওপর রাখলুম। কোনো আপত্তি এল না। বরং এবার মিঠে হুকুম হল—কপালে হাত বুলিয়ে দিন না প্লিজ!

আড়ষ্ট ও কাঁপন্ত হাতে ওঁর সুন্দর কপালে হাত বুলোতে থাকলুম। বাইরে ঝড়বৃষ্টি তখনও থামেনি। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। বাড়িটা কেঁপে উঠছে। জীবনে এমন অদ্ভুত রাত আর একটাও আসেনি।

হঠাৎ আরাধনা এক কাণ্ড করে বসলেন। দুহাত নিজের মাথার উপর দিয়ে বাড়িয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরলেন। তারপর আমার মাথাটা টেনে নামালেন। তারপরই আমার ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলেন। চুমু খাওয়া—বিশেষ করে এই আশ্চর্য সুন্দরী যুবতীর ঠোঁটের চুমু, নিশ্চয় এক দুর্লভ সৌভাগ্য; কিন্তু মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় ব্যাপারটা আমাকে হতচকিত করে ফেলল। আরাধনা কিন্তু পাগলের মতো আমার ঠোঁটটা দিয়ে কেলেঙ্কারি শুরু করেছেন ততক্ষণে।

তার ফলে অনিবার্যভাবে শারীরিক উত্তাপ জাগছিল আমার। একটু পরে

আরাধনা ধনুকের মত বেঁকে আমার দিকে ঘুরলেন এবং উঠে বসলেন। তারপর বুকে মাথা গুঁজে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। এতক্ষণে আমার ভুলটা ভাঙল।

না—এ কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এক অতৃপ্ত যুবতী, স্বামী প্রৌঢ় ও গোঁয়ার, আজকের এই মারাত্মক ঘটনা, তারপর এই নির্জন পরিবেশে আমার মতো এক রাইফেলধারী যুবক—এই উপাদানগুলো মিলেমিশে যা ঘটা উচিত তাই ঘটেছে। বন্যায় ভেসে যেতে একটুকরো খড়কুটো পেলেই তা আঁকড়ে ধরা মানুষের স্বভাব।

আমি পরম স্নেহ ও প্রেমে ওর মুখটা দুহাতে তুলে একটি এক মিনিটের চুমু দেওয়ার পর বললুম—আরাধনা লক্ষ্মীটি, শান্ত হও। চলো আমরা কফিটা নিয়ে বরং বেডরুমে যাই।

আরাধনা উঠল। এখন সে আমার প্রেমিকা ছাড়া আর কী! কফির ট্রে নিয়ে আমরা দুজনে বেডরুমে ফিরে গেলুম। দরজাটা ভেতর থেকে আটকানো হল।

সেফায় পাশাপাশি এবার দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ আরাধনা বলল—চৌধুরী, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কলকাতা যেতে চাই।

বললুম—বেশ তো।

—বেশ তো নয়। কথা দাও, আমাকে নিয়ে যাবে!

—দিলুম।

—এই শৈলেশ লোকটা নিজেই আসলে সেই স্মাগলিং র‍্যাকেটের অন্যতম নেতা, চৌধুরী তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। ওর বিশ্বাসঘাতকতায় এখন দলের বাকি লোকেরা—যারা ফেরারী হয়েছিল, প্রতিশোধ নিতে খেপে গেছে। আমি এই শয়তানের পাল্লায় পড়ে শেষ হয়ে গেছি। আমাকে বাঁচাও, তুমি।

—তা আর বলতে? তবে কর্নেল...

—ড্যাম ইওর কর্নেল। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি চৌধুরী! তোমাকে দেখামাত্র টের পেয়েছি, সারাজীবন যাকে খুঁজছি, সে এই! তুমি আমাকে ফেলে যাবে না তো?

—পাগল! আমিও তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আরাধনা।

—ওঃ চৌধুরী! কী ফাইন ছেলে তুমি! চলো, এবার শুয়ে পড়া যাক্।

হ্যাঁ, বিছানায় যাবার জন্য তখন আমি খুব ব্যস্ত। তবে আসল কারণ, কেন হঠাৎ যেন ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু সবে সে আমার হাত ধরে বিছানায় টেনে নিয়ে গেছে, আমি প্যান্ট-শার্ট খুলতে শুরু করেছি, হঠাৎ বাইরে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আরাধনার মুখে চমক লক্ষ্য করলাম। তারপরই কাদের পায়ের ধুপ-ধুপ শব্দ ভাসল কাঠের পাটাতনে। এবং দরজায় ধাক্কা পড়ল। কে ভারী গলায় ডাকতে থাকল—আরাধনা! দরজা খোল!

আরাধনা আমার দিকে ইশারা করল—চুপ!

সে কী! নিশ্চয় ওটা মিঃ সিংয়ের গলার আওয়াজ। আমি ব্যস্তভাবে চাপা গলায় বললাম—তোমার স্বামী এসেছেন যে!

আরাধনা ফিসফিস করে বলল—আমার স্বামীর গলা আমি চিনি। ও অন্য কেউ। কক্ষনো দরজা খুলবে না। বরং তুমি জানলার ফাঁক দিয়ে একবার গুলি ছুঁড়ে জানিয়ে দাও যে আমরা নিরস্ত্র নই।

দরজায় দমাদ্দম কয়েক জোড়া পায়ের লাথি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। দরজাটা ভেঙে যাবে মনে হল। ওরা যেই হোক, ঘরে এলে সকলে আমাকে নিয়েই পড়বে তাতে কোনো ভুল নেই। অতএব আমি একলাফে জানালা ফাঁক করেই রাইফেলের তিনটে গুলি পর পর ছুড়ে বসলুম। আওয়াজ হল প্রচণ্ড এবং তক্ষুনি লাথি-মারা বন্ধ হল। বাইরে চাপা স্বরে ওরা কথা বলছে। আমি বাকি দুটো গুলিও ঝোঁকের বশে জানালা দিয়ে ছুড়লুম। তারপর পকেট থেকে আবার পাঁচটা কার্তুজ বের করে রাইফেলটা তৈরি রাখলুম।

আর কোনো আওয়াজ নেই এবার। সাবধানে জানলা ফাঁক করে পর্দার একটুখানি তুলে দেখি, সম্ভবত জনা তিন লোক দৌড়ে গেটের ওপাশে চলে গেল। তারপর গাড়ির আলো জ্বলে উঠল। গাড়িটা তক্ষুনি বৃষ্টির মধ্যে জঙ্গলের দিকে নেমে যেতে দেখলুম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ঘুরে দেখি, আরাধনার ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে। আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র সে হেসে উঠল—চমৎকার শিক্ষা হয়েছে। আর ওরা হামলা করতে আসবে না। এসো, শুয়ে পড়া যাক।

এই রহস্যময়ী যুবতীর পাশে রাত কাটানো এবং বিপদের সম্ভাবনা—দুইয়ে মিলে আমাকে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন দেখাল। কিন্তু শেষ অব্দি ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল। আর বাগ মানাতে পারলুম না। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি কোন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পাশের সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরতে চাইলুম—কিন্তু তাকে যেন খুঁজেই পেলুম না।

চোখ খুলে দেখি ঘরভরা আলো। অভ্যাসমতো ঘড়ি দেখলুম—সাড়ে আটটা! কী প্রচণ্ড না ঘুমিয়েছি। তারপর সব মনে পড়ল। হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। ঘরে কী একটা তীব্র গন্ধ। পাশে আরাধনা নেই। ডাকলুম তাকে। কিন্তু কোনো সাড়া পেলুম না। উঠে গিয়ে দেখি দরজাটা বাইরে থেকে আটকানো। অমনি অজ্ঞাত ভয়ে শিউরে উঠলুম আবার ডাকাডাকি করলুম। কিন্তু সাড়া নেই।

ব্যাপার কী? আমাকে আটকে রেখে কোথায় গেল সে? হতাশ হয়ে সিগারেট জ্বাললুম। দেশলাই কাঠিটা মেঝের কার্পেটে অন্যমনস্কভাবে ফেলেছি। তাই সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছাইদানিতে ফেলার জন্যে হেঁট হলুম। অমনি খাটের তলায় চোখ গেল। খাটের তলায় কে উবুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তার মুখটা একেবারে থেঁতলানো। ধড়ছাড়া। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভয়ে-উৎকণ্ঠায় প্রায় পাগল হয়ে গেলুম। দরজায় লাথি মেরে মেরে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে ফেললুম। বাজখাঁই চিৎকার করে ডাকাডাকি করলুম—বাঁচাও, বাঁচাও, কে কোথায় আছ, বাঁচাও! সেই বিকট আর্তনাদ কয়েকমাইল দূর থেকে লোকের শোনা উচিত ছিল। কিন্তু শোনার মতো কেউ ছিল না হয়তো। এরপর জানলাগুলোও ভাঙার চেষ্টা করলুম। রাইফেলের নল রড়ে টোল খেয়ে গেল দেখে ক্ষান্ত হলুম। বোঝা গেল, এই বাড়িটা মজবুত করেই বানানো হয়েছে।

এতসব তুমুল হুলুস্থুলের পর স্বভাব ক্লান্তি ও হতাশা আসে। তখন একটা জানলায় মুখ রেখে তাকিয়ে রইলুম গেটের দিকে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবী ঝকমক করছে। আকাশে কোথায়ও মেঘের চিহ্ন নেই। এমন একটা চমৎকার দিনে মুণ্ডুকাটা লাশের সঙ্গে বন্দী থাকতে হল আমাকে—এর চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা কল্পনা করা যায় না। এক ধুরন্ধর মায়াবিনীর ফাঁদে পড়ে আমি অবশেষে কী বোকামি করেছি ভেবে আফসোস হতে থাকল। কিন্তু এখন তো আর মাথা খুঁড়েও কোনো লাভ হবে না।

হঠাৎ মাথায় একটা যুক্তি খেলল। আমার পকেটে তো এখনও অনেকগুলো কার্তুজ রয়েছে। অন্তত গোটা পাঁচ পর পর খরচ করা যাক্ না, যদি কাঠের দেওয়ালের কোনো অংশে একটা ফাটল ধরাতে পারি। তারপর অবশ্য এক টুকরো ধারালো কিছু দরকার। তাই ব্যস্ত একোনা ওকোনা হাতড়ালুম। লোহার কোনো জিনিস, কিংবা তেমন জুতসই কিছু পাওয়া গেল না। খাটের তলায় উঁকি মারবার সাহস নেই। ওই মুণ্ডুকাটা বীভৎস লাশ আবার চোখ মেলে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেই সময় মাথায় একটা কথা এল। আচ্ছা, খুন যা দিয়ে করা হয়েছে, অর্থাৎ মার্ডার উইপনটা কি লাশের কাছে রেখে যায়নি খুনী? ওটা দিয়ে নিশ্চয় কাজ হবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। অনেক সাহসে ফের খাটের তলায় উঁকি দিলুম। এবার লাশটা ভালো করে দেখা হয়ে গেল। গায়ের রঙ ফর্সা, বেঁটে মোটাসোটা একটা লোক, পরনে খুব দামি স্যুট, টাই রয়েছে। সম্ভবত বাটন হোলে আস্ত একটা গোলাপ গোঁজা ছিল, সেটা বগলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে নার্ভ শক্ত হয়ে গেল। লাশটা টেনে বের করলুম। মুণ্ডুটা একটু তফাতে নাক গুঁজে পড়েছিল। সেটাকেও বাঁহাতে চুল ধরে টেনে আনলুম। তারপর লাশটা চিত করে মুখটা ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিলুম। এসময় আমাকে নিশ্চয় একটা ভয়ঙ্কর পিশাচ দেখাচ্ছিল।

লোকটার খোলা চোখে আতঙ্ক ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন। আঙুলের চাপে চোখের পাতা বুজিয়ে দিলুম। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর এবার অস্ত্রটার খোঁজে খাটের তলায় উঁকি দিতেই সেটা চোখে পড়ল। একটা

[illegible] ভোজালি দেখা গেল। খুনী ওটা আমার হিসেবমতোই রেখে গেছে দেখছি! হাত বাড়িয়ে সেটা নিতেই কেমন যেন উষ্ণতা ভর করল আমার রক্তে। এসময়ে যাকে খুশি আমি খুন করতে পারতুম!

যাক্, তাহলে এবার দেয়াল কেটে বেরিয়ে পড়ার অসুবিধে নেই। ভোজালি [illegible] করে এনে দেখি, সেটার গায়ে চাপ চাপ জমাট কালো রক্ত শুকিয়ে আছে। লাশেরও অবস্থা একই রকম। উত্তেজনার ঘোরেও বুঝতে পারলুম যে খুনটা এখানে হয়নি। অন্য কোথাও খুন করার পর লাশটা এভাবে এনে রাখা হয়েছিল। নিশ্চয় কোনো মতলব ছিল খুনীর কিংবা খুনীদের।

রাইফেলের গুলি খরচ করার আগে ভোজালিটা কাজ দেয় কি না দেখতে [illegible] হল। কিন্তু কয়েক জায়গায় কোপ বসিয়ে দেখলুম, অসম্ভব। সামান্য খোঁচের দাগ ছাড়া আর কিছু ঘটছে না। রাইফেলের একটা মাত্র বুলেট সহজেই [illegible] ফাটল ধরাতে পারে। কয়েকটা ফাটল একই জায়গায় পাশাপাশি সৃষ্টি হলে তখন ভোজালি ব্যবহার করলে কাজ হতে পারে।

তাই রাইফেলটা নিয়ে কোণের একজায়গায় তাক করলুম। কোণটা যেহেতু জোড়ের জায়গা, ফাটল সহজেই হবে। রাইফেলের সেফটি ক্যাচ তুলে ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিতে যাচ্ছি, অমনি এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। সোফাসেটের ওদিকে ফোনটা মিঠে স্বরে ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল।

সে কী! শয়তানীটা যে বলেছিল ফোনের লাইন কাটা!

নিশ্চয় মিথ্যে বলেছিল তাহলে। ফোনটা সমানে বাজতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর রাইফেলটা রেখে ফোনটা ধরলুম। আমার কণ্ঠস্বর নিশ্চয় কেঁপে গেল।—হ্যালো! হ্যালো!

এবার দ্বিতীয় চমক এল। আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছি? হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। এ যে প্রত্যক্ষ মিরাকল! অন্যপ্রান্ত থেকে পরিষ্কার ভেসে আসছে চেনা একটা কণ্ঠস্বর। —হ্যালো, জয়ন্ত নাকি! গুড মর্নিং ডার্লিং, জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি!

আমি থ বনে শুনে যাচ্ছি। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—নাকি তাঁর ভূত কথা বলছে? না—না, এ অবিশ্বাস্য! আমি এখানে আছি, তাই বা কেমন করে জানলেন উনি?

—ডার্লিং, বুঝেছি! তুমি এ বুড়োর ওপর রীতিমতো খাপ্পা হয়েছ। সেটা খুবই স্বাভাবিক। ইয়ে—শোন, আমি—মানে আমরা শিগগির গিয়ে পড়ছি। ভেবো না। আর দেখ, আমরা না পৌঁছনো পর্যন্ত—ধরো জাস্ট পনের মিনিট সময় খুব সাবধানে থাকবে। আমার গলা না শুনলে কিংবা আমাকে না দেখলে কোনো দরজা খুলবে না। কেমন? ছাড়ছি?

এবার অনায়াসে খাপ্পা হওয়া যায় গোয়েন্দাপ্রবরের প্রতি। রেগে ওঠাও স্বাভাবিক আমার পক্ষে। এতসব যে জানে, সে কেন এখনও বেলা ন'টা অব্দি

এখানে আমাকে উদ্ধার করতে এল না? অদ্ভুত কারবার তো বুড়োর! অথচ আসার সময় কত ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসছিল।

ডাঁট দেখিয়ে গম্ভীর অন্যরকম গলায় বললুম—হ্যালো, হ্যালো! শুনুন—আপনি কাকে চান। এখানে জয়ন্ত বলে কেউ নেই। হ্যালো...হ্যালো!

কখন ফোন রেখে দিয়েছেন গোয়েন্দামশাই, আর আমি সমানে অতগুলো কথা বলে গেলুম! রেগে সশব্দে ফোনটা আমিও রাখলুম। কিন্তু লোকটা কি সত্যি কোনো মন্ত্রতন্ত্র জানেন? আমি তো মাত্র 'হ্যালো' বলেছি দুবার—তাতে উনি কীভাবে টের পেলেন যে আমিই ফোন ধরেছি?

তাহলে কি যে রহস্যময় ফাঁদে আমি বোকার মতো পা দিয়েছিলুম তারই কোন আভাস হঠাৎ কাল বিকেলে উনি পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তাই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে উধাও হয়েছিলেন?

খুব সম্ভব, তাই। রহস্যের ইশারা পেলে বরাবর ওঁর ওই বাতিকগ্রস্ত আচরণ আমি লক্ষ্য করেছি। মনে হল, কাল রাস্তার পশ্চিমের জঙ্গলে বা খালের ওদিকে হঠাৎ কীভাবে একটা রহস্যময় পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলেন কর্নেল। এ ছাড়া, এই অদ্ভুত ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

এতক্ষণে আশ্বস্ত হতে পেরেছি। সিগারেট ধরিয়ে লাশটিকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলুম। কে এই ভদ্রলোক? আরাধনাই বা আসলে কে? কেন একে খুন করা হল? আরাধনাই কি খুন করেছে? সেটা অসম্ভব। ওর এত সাহস বা জোর নেই, বুদ্ধিতে যত খল সে হোক না কেন। আর রাতের ঝড়বৃষ্টিতে সেই মোটর গাড়িতে আসা আগন্তুকেরাই বা কারা? তাদের দরজা খুলল না কেন আরাধনা? তারা কি তার শত্রু?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হলুম। নিহত ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি, ষাটের কম। মাথায় টাক আছে অল্প। চুলে পাক ধরেছে। খুব শৌখিন মানুষ, তার পরিচয় স্পষ্ট। সেই গোলাপটা কুড়িয়ে নিলুম। শুঁকে দেখলুম। গন্ধটা বাসি হলেও চমৎকার। লোকটার পকেট হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ সংযত হলুম।

সর্বনাশ! অমন একজন ঘুঘু গোয়েন্দার সাহচর্যে এতকাল কাটিয়েও আমার এতটুকু শিক্ষা হয়নি দেখছি! আমি একের পর এক সাংঘাতিক কাজ করে বসে আছি এতক্ষণ, এতটুকু ফলাফল ভাবিনি! এ একটা রীতিমতো খুন—হত্যাকাণ্ড! আর আমি লাশের গায়ে হাত দিয়েছি, টেনে বের করেছি, মুণ্ডটা এনে জোড়া লাগিয়েছি, ভোজালিটা বের করেছি, শেষ অব্দি গোলাপটাও স্থানচ্যুত করেছি বা ছুঁয়েছি! এতগুলো বুদ্ধিহীন কাজের ফলে প্রকৃপক্ষে অনেক মারাত্মক সূত্র হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলোর একটামাত্র পেলেও সেই বৃদ্ধ ঘুঘুটি এবং পুলিশের কাজে লাগত। এবার নিজের প্রতি রাগে-দুঃখে অস্থির হলুম। আমি এমন ভ্যাবাকান্ত হয়ে পড়লুম কেন? নিজের প্রশ্নের একটা জবাব নিজে অবশ্য দেওয়া যায়, দরজা বাইরে থেকে আটকানো দেখেই লাশ আবিষ্কার করার পর আমার

মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নির্ঘাত এটাই সবকিছুর কারণ। লাশের সঙ্গে নিজেকে বন্দী দেখেই বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারিনি।

এখন আর পস্তে লাভ নেই। আড়ষ্টভাবে জানালার কাছে গেলুম। কর্নেল সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাহলে কি হত্যাকারীরা আবার ফিরে আসবে?

জানলায় উঁকি মেরে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। উজ্জ্বল রোদে গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের তলায় পরিষ্কার নজর চলছে। কেউ বন্দুক তাক করলেও এখন দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না! গেটের ওপাশে পাহাড়টা আস্তে আস্তে নেমে গেছে। তারপর কিছু সমতল কিছু ঢালু জমিতে ওকবনটা রয়েছে। বাড়িটা উঁচুতে থাকায় অতদূর অব্দি এবড়ো-খেবড়ো প্রাইভেট রোডটার অনেকখানি নজর চলে। ওপথে কাকেও দেখলুম না।

মিনিট যে এত লম্বা হতে পারে, কল্পনাও করিনি। পনের মিনিট নয়—যেন পনেরটা ঘণ্টা চলে গেল। তারপর দূরে পশ্চিমে গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা গেল। উত্তেজনায় চোয়াল শক্ত হয়ে এল। তারপর ওকবনের রাস্তায় একটা জিপ দেখতে পেলুম। জিপটা যখন ফাঁকা জায়গায় এল, কর্নেলের টুপি ও সাদা দাড়ি চোখে পড়ল। এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুড়োর! ওখান থেকেই সে আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে হাত নাড়ছেন।

গাড়িটা গেটে উঠে এল। সেই মুহূর্তে আমার পিছনের দিকের কোনো একটা জানলায় তিনবার ঠুকঠুক করে আওয়াজ উঠে থেমে গেল। ততক্ষণে কর্নেলের ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেছে বাইরের বারান্দায়—হ্যাল্লো জয়ন্ত ডার্লিং! গুড মর্নিং! তারপর দরজার তালা ভাঙল কেউ। ম্যাজিকের মতো এক আঘাতেই তালাটা পড়ে যেতে শুনলুম।

পর্দা সরিয়ে প্রথমে ঢুকলেন কর্নেল, তারপর দুজন পুলিশ অফিসার। ঢুকেই কর্নেল অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠলেন—মাই গড! এ কী ব্যাপার জয়ন্ত! তাহলে......

কথাটা অসমাপ্ত রেখে উনি পুলিশ অফিসারের দিকে ঘুরলেন। একজন অফিসার এগিয়ে সাবধানে লাশের পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লেন। অন্যজন গম্ভীর মুখে বললেন—তাহলে বেচারা শৈলেশ সিং সত্যি খুন হয়ে গেলেন!

কর্নেল লাশটা দেখার পর আমার দিকে তাকালেন।—লাশটা নিয়ে নিশ্চয় তুমি টানাটানি করেছ, জয়ন্ত?

—করেছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

—হুম! সাক্সেনা, আসুন, আমরা আগে অন্যান্য ঘরগুলো একবার দেখে নিই। ততক্ষণ মিঃ প্রসাদ, তাঁর কাজ সেরে ফেলুন। ওই আপনাদের লোকজন বোধহয় এস পড়ল।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বারান্দায় গেলুম কর্নেলের সঙ্গে। কর্নেল আমার একটা হাত নিয়ে একটু স্নেহ প্রকাশ করেই ছেড়ে দিলেন। একদল পুলিশ কনস্টেবল আর অফিসার দৌড়ে এলেন।

বাড়িটা ঘিরে ফেলার পর কর্নেল আর মিঃ সাক্সেনা ডাইনিং ঘরটায় ঢুকলেন—তাঁদের পিছনে আমি। দরজাটা খোলা ছিল। কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—দরজাটা খেলা কেন, বলতে পারো জয়ন্ত?

মাথা দোলালুম। এখনও তো কিছু জিগ্যেস করছেন না গোয়েন্দাবর। করলে তখন সব বলা যাবে। কিন্তু এ দরজাটা তো আরাধনা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল! এটা খুলে রাখল কে?

ডাইনিং টেবিলে রাতের যা সব অভুক্ত খাবার ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে। কিন্তু কোণের একটা সোফা কেউ টেনে একটু সরিয়ে রেখেছে মনে হল। সাক্সেনা খুঁটিয়ে সব জায়গা পরীক্ষা করছেন। কর্নেল কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ফিরে এসে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন—ইয়ে জয়ন্ত, বাথরুমটা কি বেডরুমের সংলগ্ন?

জবাব দিলুম—জানি না। মানে কাল আমি আদৌ বাথরুমে যাইনি।

বুড়ো ঘুঘু চতুর হাসলেন।—হুম!

—হুম কী! সত্যি বলছি! আমি ওসব ব্যাপার ভুলেই বসেছিলুম!

—স্বাভাবিক মনে হয় না।

—আপনি তো এখনও কিছু শোনেননি আমার কাছে!

—পরে শুনব, ডার্লিং! এখন—এস, আমরা বেডরুমে ফিরে যাই। মিঃ সাক্সেনা কী মনে হচ্ছে বলুন তো?

সাক্সেনা বিশৃঙ্খল সোফার কাছে কী দেখছিলেন। বললেন—খুব রহস্যময় কেস, কর্নেল! আমার মাথায় যেন কিছুই ঢুকছে না।

কর্নেল হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে ফের বেডরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে মিঃ প্রসাদ আর জনা তিন অফিসার ব্যস্তভাবে আলোচনা করছিলেন। কর্নেলকে দেখে প্রসাদ বললেন—আপনার ইয়ং ফ্রেন্ড লাশটাকে মনে হচ্ছে খাটের তলা থেকে টেনে বের করেছেন। আর—খুনটা এখানে—ম্যানে এ ঘরে হয়নি।

—দ্যাটস রাইট। বলে কর্নেল ওদিকে বাথরুমের দিকে এগোলেন। বাথরুমটা আমি অন্যমনস্কভাবে রাতে বা আজ সকালেও দেখেছি—কিন্তু ওদিকে এগোবার ইচ্ছে হয়নি কিংবা ভয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, পর্দা তুলতেই না জানি কী বিপদে পড়ে যাব।

কর্নেল এক ঝটকায় পর্দাটা তুললেন। তারপর আচমকা পকেট থেকে রিভলবার বের করে গর্জে উঠলেন—কে আছ? হাত তুলে বেরিয়ে এস!

ঘরের সবাই অবাক। প্রসাদ ও দুজন পুলিশও রিভলবার তাক করে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া এল না। কর্নেল বললেন—দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ আছে। তার মানে কেউ ঢুকেছে, বেরোয়নি।

প্রসাদ ব্যস্ত হয়ে একজন পুলিশকে বললেন—দেখুন তো, বাইরের দিকে পালাবার কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি।

পুলিশটি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ওদিকের জানালা থেকে তার সাড়া পাওয়া গেল।—না স্যার! জানলা ভাঙা নেই। তাছাড়া বাথরুমের জানলাটা খুব ছোট্ট।

কর্নেল বললেন—তাহলে দরজাটা ভাঙতে হয় মিঃ প্রসাদ! এসব ব্যাপারে মনে হল মিঃ সাক্সেনা খুব সুদক্ষ। ওঁকেই ডাকুন!

মিঃ সাক্সেনা হাসিমুখে এগিয়ে এসে একটা অদ্ভুত হাতুড়ির মতো জিনিস দিয়ে বারকতক বিশেষ একটা জায়গায় ঘা দিলেন। তারপর বললেন—একটু সময় লাগবে, কর্নেল। ইন্টারলকিং সিস্টেমের ঝামেলা এই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য দরজাটা খুলে ফেললেন সাক্সেনা। তারপর কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন—মাই গুডনেস! আরাধনা এখানে পড়ে আছেন।

অমনি আমি আর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। সবাইকে ঠেলে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বাথরুমের মেঝেয় কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে সেই রহস্যময়ী যুবতীটি! মুহূর্তে আমার সব অবিশ্বাস ঘুচে গেল। ওর প্রতি আবার মমতায় ও প্রেমে ব্যাকুল হয়ে পড়লুম। তাহলে আরাধনা আমাকে সত্যি আটকে রেখে পালায়নি। রাতে বাথরুমে ঢুকেছিল, তারপর নিশ্চয় একটা কিছু ঘটেছিল! বেচারাকে মিথ্যে সন্দেহ করছিলুম! এমন কি ওর স্বামীর লাশও যে এই খাটের তলায় আছে, নিশ্চয় তা সে জানত না!

ওকে ধরাধরি করে তুলে এনে বিছানায় শোয়ানো হল। কর্নেল নাড়ি দেখে বললেন—অজ্ঞান হয়ে আছে! মিঃ সাক্সেনা, আপনাদের ডাক্তারকে কি ফোন করা হয়েছে?

প্রসাদ বললেন—হ্যাঁ। এ ঘর থেকেই একটু আগে আমি ফোন করেছি। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন!

ততক্ষণে ওর চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। ছাদ নিচু, তাই শিলিং ফ্যান ছিল না ঘরে। কোনায় একটা টেবিল ফ্যান ছিল। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। তাই আমরা রাতে ফ্যান চালাইনি। এখন ফ্যানটা চালানো হল। এসব সেবাশুশ্রূষা চলতে চলতে ডাক্তার এসে পড়লেন। তিনি প্রথমে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে আরাধনার দিকে এগোলেন। বললেন—সুইসাইড কেস নাকি? ওরে বাবা! হীরাকুণ্ডে আবার জোড়া লাশ পড়ল? মিঃ সাক্সেনা, মনে হচ্ছে—স্বামীকে খুন করে এই মহিলা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কিসে বুঝলেন বলুন তো?

—তাছাড়া আর কী হবে! বলে ডাক্তার বিছানায় বসে আরাধনার নাড়ি নিলেন প্রথমে। ওঁর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। চোখের পাতা ফাঁক করে

দেখলেন। তারপর স্টেথিসকোপে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হার্টের অবস্থা পরীক্ষা করে বললেন—স্ট্রেঞ্জ! এবং ঠোঁট ফাঁক করে দাঁত বন্ধ দেখে ফের বললেন—স্ট্রেঞ্জ!

কর্নেল সকৌতুকে বললেন পটাসিয়াম সায়ানাইড নাকি?

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—নাঃ! যা হবার তাই হয়েছে। স্বামী খুন—স্ত্রী আতঙ্কে মূর্চ্ছা গেছে!

কর্নেল হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমাকে নিয়ে ডাইনিং ঘরে ঢুকলেন। ঘরে পুলিশ রয়েছে জনা দুই। তারা গল্প করছে নির্বিকারভাবে। আমরা কোনার দিকে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম। পাশে জানলাটা খোলা। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—কাল বিকেলে তোমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে...

বাধা দিয়ে বললুম—থাক্। আর শুনে কাজ নেই! আপনার সঙ্গে জীবনে আর কোথাও যাব ভেবেছেন?

কর্নেল চাপা গলায় সকৌতুকে বললেন—আশা করি, কাল রাতটা তোমার ভালই কেটেছিল। এ জন্যে তুমি এ বুড়োকে ধন্যবাদ দেওয়া দূরের কথা, শাসাচ্ছো! এমন সৌন্দর্য তোমার বরাতে কখনও কি জুটত ভেবেছ?

কপট ক্রোধে বললুম—ছাই! সৌন্দর্য না বিভীষিকা!

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।—হুম! বিভীষিকাই বটে। ঠিকই বলেছ জয়ন্ত। তা, আমার ব্যাপারটা শোন।

—আপনি আমার ব্যাপারটা শুনবেন কি না!

—আরে, তোমার তো সবই জানি।

—জানেন! কে বললে আপনাকে?

—আরাধনা রাত্রে ফোনে...না, ভুল বলা হচ্ছে। আমি হীরাকুণ্ডা টাউনশিপের এক জায়গা থেকে ওকে ফোন করেছিলুম—তখন রাত জাস্ট বারোটা। তখন ও সব বলল আমাকে।

—আমার কথার জবাব দিন এবার। প্রথম প্রশ্ন ঃ আপনি ওকে চিনতেন তাহলে?

—না।

—তাহলে ওকে ফোন করলেন মানে?

—আমাকে তো বলতেই দিচ্ছ না।

—দেব। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আরাধনা আমাকে ফোন লাইন কাটা বলেছিল। কেন?

—সে জবাব ওর কাছে নিও।

গম্ভীর হয়ে বললুম—বেশ, তাই নেব। কিন্তু আবার বলে দিচ্ছি, আর কক্ষনো আপনার সঙ্গে...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—সবুর বৎস, সবুর। কাল বিকেলে রাস্তার পশ্চিম

দিকের জঙ্গলে আমাকে কিছুক্ষণ বাক্‌শক্তিরহিত হতে হয়েছিল! তা না হলে কি তোমার ডাকে সাড়া দিতুম না ভাবছ? আমার যে সে কী অবস্থা, বোঝাতে পারব না। বুঝতে পারছি, তুমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ—এমন কি তোমার গলায় পাগলামির প্রত্যক্ষ লক্ষণ ফুটে উঠছে। অথচ তখন আমার টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই। তারপর মনে হল, তুমি আমার খোঁজে নেমে আসছ। ভাবলুম, এই রে! এখন জয়ন্ত এসে পড়লেই বিপদ। নির্ঘাত সে ডাকতে ডাকতে আমার কাছে এসে পড়বে এবং...

—পাখিটা পালিয়ে যাবে! অদ্ভুত!

—আরে না না! পাখি কোনো ব্যাপারই নয়। এবার মুখ বুজে শুনে যাও। লক্ষ্মীটি, প্রশ্ন করে লক্ষ্যভ্রষ্ট করো না।

মুখ বুজে রইলুম। তখন কর্নেল তাঁর নিরুদ্দেশের ঘটনাটি স্বভাবমতো বিস্তৃত করে শোনালেন। এবং তা হল মোটামুটি এরকম ঃ

রাস্তার পশ্চিমের ঢালু জঙ্গলে নেমে যাওয়ার পর কর্নেল আচমকা একটা দড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়েন। ভাগ্যিস তক্ষুনি দড়িটা ধরে ফেলেছিলেন। তা না হলে নিচের অতল খাদে পড়ে মারা যেতেন। দড়িটা টানটান অবস্থায় একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। খুব সাধারণ দড়িই বটে, মজবুত লতা পাকিয়ে তৈরি। স্থানীয় লোকেরা এই এক ইঞ্চি ব্যাসের শক্ত দড়ি দিয়ে খাদ থেকে বন্যায় আটকে পড়া গাছের গুঁড়ি টেনে তোলে। প্রতি বর্ষায় খাদে বন্যায় জল ঢোকে এবং বড় বড় গাছ ভেসে খাদে আটকে যায়। তখন ওই দড়ি বেয়েই তারা নেমে যায় খাদে। তারপর গাছের ডালপালা কেটে গুঁড়িটা মজবুত করে বেঁধে দেয়। অবশেষে অনেকে মিলে টেনে ওপরে তোলে।

...কর্নেল তাই ভেবেছিলেন। সম্ভবত পাহাড়ীরা কোনো গাছের গুঁড়ি এভাবে আটকে রেখেছে। বেলা পড়ে আসায় তারা চলে গেছে। পরদিন সকালে এসে টেনে তুলবে। কিন্তু অবাক হয়ে উনি লক্ষ্য করলেন, দড়িটা কাঁপছে। জঙ্গলের প্রবাদ—'কিছু নড়াচড়া করতে দেখলেই হুঁশিয়ার হও।' কর্নেল সাবধানে এগিয়ে দেখলেন, দড়িটা খাদে সটান নেমে গেছে। কিন্তু অসংখ্য খাঁজ, চাতাল আর ধাপ থাকায় তলাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তাছাড়া তখনই ঘন অন্ধকার জমে গেছে খাদে। অথচ দড়িটা মাঝে মাঝে ভীষণ কাঁপছে।

রহস্যভেদী ঘুঘু বৃদ্ধটি তখন অকুতোভয়ে নিচের একটা চাতালে গিয়ে দাঁড়ালেন। অমনি নিচে কাদের আবছা কথাবার্তার শব্দ কানে এল। তারপর মনে হল, শব্দটা ক্রমশ উঠে আসছে ওপরদিকে। এর একটিই ব্যাখ্যা হয়। তা হল, কারা উঠে আসছে খাদ থেকে। এবং নিশ্চয় এই চাতালের ওপাশের ধাপ দিয়ে খাদে ওঠানামা করা যায়। কর্নেল কী করবেন ভাবছেন। সেই সময় আমি তাঁকে ডাকতে শুরু করেছি। সাড়া দিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন—জয়ন্ত, শিগগির এসে মজা দেখে যাও! কিন্তু তখনই নিচে কাদের আর্তনাদ শোনা গেল। অমনি

বুদ্ধিমান গোয়েন্দামহোদয় রহস্য আঁচ করে ফেললেন। ঘাপটি পেতে সেই লোকগুলোর অপেক্ষায় রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন লোকের মাথা দেখা গেল চাতালের একপাশে। কর্নেল লুকিয়ে পড়লেন একটা পাথরের আড়ালে। দেখলেন ওরা মোটেও সাধারণ পাহাড়ী লোক নয়। তিনজনই প্যান্ট-শার্ট পরা এবং সশস্ত্র। একজনের কাছে বন্দুকও আছে। তারা যে শিকারী নয়, তা এক নজরেই বুঝেছিলেন কর্নেল। আরো বুঝলেন, যখন ওদের একজন বলল—কাজটা ঠিক হল না। শেষ করে দিয়ে আসাই উচিত ছিল। ফিরে যাব নাকি? অন্য একজন বলল—রাতেই মারা পড়বে। চলে এস। খুব জ্বালিয়েছে—এবার একটু-খানি রয়েসয়ে মরতে দাও না বাবা! একথায় তিনজনে হো-হো করে হেসে উঠল।

...কর্নেল তো হতভম্ব। ওরা কথা বলতে বলতে চলে গেল ওপরে রাস্তার দিকে। ভয় হল, বেচারা জয়ন্তটা ওরকম খুনে লোকের মুখোমুখি পড়তে যাচ্ছে। নির্ঘাত কোনো বিপদ ঘটে যাবে। একবার ভাবলেন, জয়ন্তের কাছে যাবেন—আবার ভাবলেন, নিচের কারা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে—আগে তাদেরই বাঁচাবেন। ইতিমধ্যে নিচের জঙ্গলে সন্ধ্যার আবছায়া দ্রুত এসে সব কিছু অস্পষ্ট করে দিচ্ছিল। সিদ্ধান্ত ত্বরিতে নেওয়া দরকার। উনি জয়ন্তের উদ্দেশেই ওপরে উঠলেন। ওর সাহায্য দরকার মনে হয়েছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! রাস্তায় জয়ন্তের টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে উত্তরে পাহাড়টার গায়ে রাস্তায় টর্চের আলো দেখতে পেলেন। বুঝলেন, জয়ন্ত কোথাও চলেছে। তখন অগত্যা নিজের টর্চের সাহায্যে নিচে নামতে থাকলেন।

...খাদে নেমে কর্নেল শিউরে উঠলেন। সেই দড়িতে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ডান ও বাঁ পা বেঁধে উল্টোদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের একটা পা ভীষণ জোরে নড়াচড়া করছে। দুজোড়া হাতও প্রচণ্ড নড়ছে। তাদের চেঁচাবার ক্ষমতাও তখন ফুরিয়ে গেছে। মুখ কেবল অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ হচ্ছে।

...অনেক কষ্টে কর্নেল আবার ওপরে উঠলেন। তারপর দড়িটা কোথায় বাঁধা আছে, খুঁজে বের করলেন। তারপর দড়িটা ধরে এক টুকরো পাথরের পিছনে উবুড় হয়ে শুলেন। এবং ছুরি দিয়ে সাবধানে ওটা কেটে দিলেন। আচমকা ঝাঁকুনি লাগল। হাতে দড়িটা কেটে বসে গেল। বুকে একটু চোটও লাগল। কিন্তু তবু ছাড়লেন না দড়ি। আস্তে আস্তে ঢিলে দিতে শুরু করলেন। যখন দেখলেন, দড়িটা একেবারে ঢিলে হয়ে গেছে, তখন ছেড়ে দিলেন।

...নিচে নেমে গিয়ে কর্নেল দেখলেন, খাদভর্তি নরম বালির ওপর দুটিতে পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে ভেবেছিলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন, অজ্ঞান হয়নি। তবে কথা বলার ক্ষমতা নেই। নড়াচড়াও করতে পারছে না।

...সাবধানী গোয়েন্দাবর ওদের এক একে বয়ে অনেকটা দূরে একটা

আড়ালমতো জায়গায় শুইয়ে জল খাওয়ালেন নিজের বোতল থেকে তারপর ওদের ওই অবস্থায় রেখে চলে এলেন। তিন মাইল পথ প্রায় দৌড়ে যেতে বুড়োর একটুও নাকি কষ্ট হয়নি। মিলিটারির পুরনো ঘুঘু। ওসব অভ্যেস বিলক্ষণ আছে। হীরাকুণ্ডা টাউনশিপে পৌঁছে থানায় খবর দিলেন। পুলিশকে সেই লোক তিনটের কথা বললেন না কিন্তু। ওটা তো ওঁর তুরুপের তাস। নিজে বেসরকারি ঝানু গোয়েন্দা, তাই সব রহস্যভেদ নিজের বুদ্ধিতে করাই ওঁর স্বভাব। যাই হোক, পুলিশ কথামতো অ্যামবুলেন্স ও দমকল পাঠিয়ে সে রাতে বিস্তর তোলপাড় করল। পাহাড়ী খাদটা আলোয় উত্তেজনায় হল্লায় জমাট হল। তখন বৃষ্টি আর তুলকালাম পাহাড়ী দুর্যোগ চলেছে। ততক্ষণে বেচারারা অজ্ঞান হয়ে গেছে আবার। ওদের ঝড়জলের মধ্যে হীরাকুণ্ডায় আনা হল এবং হাসপাতালে দেওয়া হল।

...এদিকে কর্নেল জয়ন্তের কথা ভেবে তখন উদ্বিগ্ন। হঠাৎ মনে পড়ল, যে পাহাড়ে সম্ভবত জয়ন্তের টর্চের আলো দেখেছেন, তার ওদিকেই একটা নির্জন বাড়ি আছে। বাড়িটার সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা ছিল। কোন এক কাঠের ব্যবসায়ীর নাকি শৈলাবাস। খোঁজ-খবর নিয়ে বাকিটা জেনে নিলেন। ইতিমধ্যে হাসপাতালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির জ্ঞান ফিরেছে। তারা বলেছে, শৈলেশ সিংয়ের তারা পরিচারক ও পরিচারিকা। হীরাকুণ্ডায় শৈলেশ সিংয়ের একটা বাড়ি আছে। আজ সকালে সাহেবের সঙ্গে তারা গাড়িতে সেখানে যায়। মাইজি আরাধনা দেবীর শিলিগুড়ি থেকে সোজা ওখানে পৌঁছবার কথা ছিল দুপুর নাগাদ। সেই মতো লাঞ্চ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মাইজি দুটো অব্দি পৌঁছলেন না দেখে সায়েব ওদের থাকতে বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। তারপর আচমকা তিনজন বন্দুকবাজ লোক হানা দেয়। ওরা তাদের ধরে নিয়ে যায় খাদে এবং ওইভাবে ঝুলিয়ে রাখে। কেন? তা জানে না রঘুবীর বা লতা।

...তখনও ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছে। এসব সময় আচমকা ধস ছাড়ে। তাই সকাল অব্দি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। পুলিশ অত ঝামেলা পোহাতে যাবে কেন? সকাল হোক, তখন 'দেখা যায়েগা সবকুছ!' এই হল থানা অফিসারের বক্তব্য।

...কিন্তু কর্নেল জয়ন্তের জন্য উদ্বিগ্ন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, চণ্ডীপাহাড়ের শৈলাবাসে ফোন থাকা কি অসম্ভব? কারণ, বিজলি তার যে গেছে, তা লক্ষ্য করেছেন আগে। তখন কর্নেল স্থানীয় এক্সচেঞ্জে রিং করলেন। নাম্বার পাওয়া গেল। কিন্তু অপারেটার জানাল, লাইন গড়বড় হয়েছে। একেবারে ডেড। তখন রাত্রি নটা। হীরাকুণ্ডায় ঝড়জলের মধ্যে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠলেন কর্নেল। কিন্তু ঘুম এল না। রাত দশটার পর আবার মরিয়া হয়ে এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করলেন। এবার অপারেটার অবাক হয়ে বলল—লাইন ইজ অল-রাইট। বাত্

কিত্তিয়ে! ফোনের ওপার থেকে স্ত্রীলোকের মিঠে স্বর ভেসে এল।—হ্যালো! শৈলেশ বলছ? কোথায় তুমি? এখানে এসে দেখি, সব হাট করে খোলা। কেউ নেই ব্যাপার কী?

...আরাধনা নিশ্চয় অবাক হল, যখন শুনল শৈলেশ সিং নয়—অন্য কেউ গম্ভীর গলায় কথা বলছে! যাই হোক, জয়ন্তের হদিস মিলল। আরাধনা জানাল, হ্যাঁ—আশ্রয়প্রার্থী ও অতিথি বাবুজী নাক ডাকিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছেন। কর্নেল ওকে ডেকে দিতে নিষেধ করলেন। ঘুমোক বেচারা। এখন জাগালে বেমক্কা কর্নেলের শ্রাদ্ধ করে ছাড়বে!

—হ্যাঁ, আরাধনাকে তাদের পরিচারক-পরিচারিকার কথা কর্নেল কিছু জানাননি। উনি যে রহস্যভেদী ঘুঘু! তুরুপের তাসটি সারাক্ষণ হাতের চেটোয় লুকিয়ে রাখা অভ্যাস। সময়মতো ঝেড়ে সবার আক্কেল গুড়ুম করে দেবেন কিনা!

এই হল কর্নেলের বিবরণ। তবে এর ফাঁকে কতখানি তথ্য উহ্য কিংবা গুহ্য রেখেছেন, আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁর মুখ দেখে, তার আঁচ পাওয়াও দুঃসাধ্য। অমন নিরীহ সরল মুখ যার, সে যে কী ধুরন্ধর, আমি ছাড়া খুব কম লোকই জানে।

কথা শেষ করে কর্নেল বললেন—হুম! জয়ন্ত ডার্লিং! এবার তোমার কাহিনীটি আগাগোড়া শোনা যাক। অবশ্য, তোমার রোমান্সের মিঠে এপিসোডটুকু বাদ দিলে এ বুড়োর মনে খুব কষ্ট হবে। না—না, অত মুখ রাঙা করা লজ্জার কোনো কারণ নেই বৎস। আমি মনে মনে তোমার চেয়েও যথেষ্ট যুবক সম্ভবত। নাও, স্টার্ট!

আমি আগাগোড়া খুঁটিয়ে আমার পর্বটি শোনালুম। শোনার পর কর্নেল বললেন—তুমি খুনীকে ধরার মারাত্মক কিছু সূত্র হয়তো নষ্ট করেছ, জয়ন্ত। আই এগ্রি হাতের ছাপগুলো নষ্ট হয়েছে। এমন কি...

ওঁকে থামতে দেখে বললুম—আর কী?

কর্নেল হঠাৎ সোজা হয়ে বললেন—আচ্ছা জয়ন্ত, তুমি যখন শুতে যাও, তখন কি ঘড়ি দেখেছিলে?

—নিশ্চয়। ঠিক নটা দশে আমি শুয়ে পড়ি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। অবশ্য একটু ইতস্তত করে হেসে বললুম—আপনাকে লুকোব না। মহিলাটির সঙ্গে একই শয্যায় ছিলুম। কিন্তু গোড়ার দিকটা মনে পড়ছে—কী কী করেছি, বাকিটা মনে নেই।

—হুম! এখন সবটা ফোরেন্সিক টেস্টের উপর নির্ভর করছে। জয়ন্ত, শুধু জেনে রাখো, এ একটা অদ্ভুত মার্ডার কেস!...বলে কর্নেল হাই তুলে অভ্যাসমতো বুকে ক্রস আঁকলেন।...

আরাধনার কথায় যে গোলমাল আছে, তা আমি বুঝতে পারছিলুম। আমাকে ও বলছিল, ২৩ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পরশু সকালে এসেছে স্বামীর সঙ্গে। অথচ রঘুবীর লতার কথামতো এটা মিথ্যে হয়ে যায়। গতকাল দুপুর দুটো অব্দি ও পৌঁছায়নি দেখেই নাকি শৈলেশ সিং ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যান। তারপর ওঁর মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া গেলো ওঁর খাটের নিচেই। কিম্বিদম?

আরাধনা কর্নেলকেও কিছু খুলে বলেনি। শুধু আমার কথাটা বলেছিল আমি নাকি ঝড়বৃষ্টিতে ওখানে আশ্রয় নিয়েছি। অস্যার্থ?

আরাধনা পতিনিন্দা করছিল আমার কাছে। তবে সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আমার মতো অচেনা বা সদ্যচেনা যুবকের সঙ্গে তার আচমকা প্রেমাবেশ এবং নির্দ্বিধায় এক শয্যায় শুয়ে পড়া! সে কি এতে অভ্যস্ত? তার মানে সে কি তথাকথিত সোসাইটি গার্ল অথবা নিছক বারবনিতা? অবশ্য অধুনা বিদেশে ও স্বদেশে উচ্চবিত্ত উচ্ছৃংখল পরিবারে মেয়েদের এই অনাচারই কালচার। সেক্স ছাড়া কথা নেই তাদের অনেকের। কিন্তু আরাধনার ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কী?

সেদিনই হীরাকুণ্ডা ফরেস্ট বাংলোয় লাঞ্চ খেয়ে ঝিমোচ্ছি। এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ সাক্সেনা এলেন নিজে। সঙ্গে এক সিভিলিয়ন পোশাকধারী ভদ্রলোক। তাঁকে দেখেই কর্নেল বেড়ালের মতো বিছানা থেকে লাফ দিয়ে চেঁচালেন—বাই জোভ! কী মারাত্মক যোগাযোগ! যেখানে গোয়েন্দা, সেখানেই খুন এবং সেখানেই ফোরেনসিক এক্সপার্ট? হ্যালো ডঃ পট্টনায়ক! এ যে অবিশ্বাস্য!

দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় হাসতে হাসতে কর্নেলের হাতে হাত মেলালেন। মিহি গলায় শুধু বললেন—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো!

ইনিই তাহলে সেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক! ব্যস, এবার তাহলে তুলকালাম শুরু হবে দুই বন্ধুতে। ওই অধ্যাপক ভদ্রলোকের খ্যাতি নাকি আন্তর্জাতিক। আমার এবার আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। শুধু চুপচাপ দেখে যাই।

কিছু সময় পরস্পর এটা ওটা কথা বলার পর এসে পড়ল শৈলেশ সিংয়ের হত্যাকাণ্ড। ডঃ পট্টনায়ক বললেন—ইনিই তাহলে জয়ন্তবাবু? আরে! আপনি তো দেখছি নেহাত বাচ্চা! জার্নালিস্টমহলে আপনার এত সুনাম শুনে ভেবেছিলুম হয়তো আমাদের বয়সী বুড়ো-টুড়ো কেউ হবেন! এ যে অবিশ্বাস্য!

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন—না, জয়ন্তকে শিশু বললেনও আমার আপত্তি হবে না। তবে ভীষণ রোমান্টিক চ্যাপ। আর রোমান্সের আঁচ পেলো তো কথা নেই। ওর দ্রবীভূত হয়ে যেতে দেরি সয় না!

কথাটা নিঃশব্দে হজম করতে হল। কারণ সামনে দুজন বাইরের লোক। ডঃ পট্টনায়ক বললেন—আজকালকার ইয়ং ম্যানরা অন্য রকম হবে না? যুগ বদলাচ্ছে যে! যাক্ গে, শুনুন কর্নেল। আমি গত রাত্রে বৃষ্টির আগে এখানে

দৈবাৎ এসে পড়েছি কাঠমাণ্ডু থেকে। হীরাকুণ্ডায় আমার এক ভাগ্নী থাকে। আজ সকালে বেরিয়েছিলুম নেহালকোটা প্রপাত দেখতে। দুপুরে শুনলাম, কে একজন খুন হয়েছেন। অভ্যাস যাবে কোথায়? তক্ষুনি গিয়ে মিঃ সাক্সেনার কাছে হাজির হলুম।

কর্নেল সকৌতুকে বললেন—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানবে, তাতে অবাক হব না। নিশ্চয় সেই পোর্টেবল ল্যাবরেটরিটিও সঙ্গে রয়েছে যথারীতি?

—তা আর বলতে! এখন রেজাল্টগুলো শুনে যান. এক ঃ শৈলেশ সিংয়ের মৃত্যুর কারণ নিকোটিন-ঘটিত বিষ। মৃত্যুর পর পুলিশকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তার মুণ্ডুটা কাটা হয়েছে। দুই ঃ বেডরুমে কারা কফি খেয়েছিল। একটা কাপের তলায় সামান্য মর্ফিয়ার গুঁড়ো পাওয়া গেছে।

বাধা দিয়ে কর্নেল বলে উঠলেন—সর্বনাশ! দ্যাটস রাইট। জয়ন্তকে কেউ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল।

বললুম—আরাধনা ছাড়া আবার কে?

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—তিন ওখানে যতগুলো জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে—তা মোট দু ভাগ করেছি। ঝড়বৃষ্টির সময়কার ছাপ আর ঝড়বৃষ্টির পরের ছাপ। ঘরে ও বাইরে সব ছাপই নেওয়া হয়েছে. দেখলুম, ঝড়বৃষ্টির সময় অন্তত জনা তিনচার লোক লন থেকে বারান্দায় হেঁটেছে। কিছু ছাপ ডাইনিং রুমে, কিছু বেডরুমে পাওয়া গেছে। ঝড়বৃষ্টির পরের ছাপ শুধু একজনের। সে ডাইনিং রুমে ঢোকেনি। বেডরুমে গেছে এবং বেরিয়ে এসেছে। চার ঃ বাথরুমের দরজার হাতলে আরাধনা দেবী ছাড়াও অন্তত একজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

ডঃ পট্টনায়ককে থামতে দেখে কর্নেল বললেন—শৈলেশ সিংকে কোথায় খুন করা হয়েছে বলে মনে করেন?

—কিচেন বা ডাইনিং খুঁজেছি। কোথাও বিষাক্ত জিনিস পাইনি। ডাইনিং রুমের মেঝে টেবিল সব পরীক্ষা করেছি। সন্দেহজনক কিছু নেই। তাই আমার ধারণা, ওঁকে বাইরে কোথাও খুন করে বাংলোয় আনা হয়েছিল। তারপর সম্ভবত খাটের তলায় ঢুকিয়েই ছোরা চালানো হয়। তখন তো রক্ত জমাট। রাইগর মরটিস শুরু হয়েছে। অর্থাৎ দেহ শক্ত হতে লেগেছে।

—ছোরা চালানোর সময়টা আন্দাজ করেছেন কি?

—হ্যাঁ। আমার ধারণা, রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে।

আমি শিউরে উঠলুম। তখন আমি মরফিয়ার নেশায় কাঠ। আর নিশ্চয় ওই শয়তানীটা স্বামীর লাশে দিব্যি ভোজালি চালিয়েছে! কী সর্বনেশে মেয়ের সঙ্গে না ঢলাঢলি করেছি!

কর্নেল বললেন—ঝড়বৃষ্টির পরে অন্তত দুজন বেডরুমে ঢুকেছিল! তাই না ডঃ পট্টনায়ক?

—হ্যাঁ।

ততক্ষণে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লেগেছে। যতবার রাতের দৃশ্যটা ভাবছি, মগজের ভিতর ঠাণ্ডা আঙুল পড়ছে কার। আমাকে মরফিয়া খাইয়েছিল! সর্বনাশ! তাই আমার অত ঘুম পাচ্ছিল! ওই লাবণ্যময় মুখের আড়ালে কী নিষ্ঠুরতা!

বাইরে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালুম। একটা পাহাড়ের গায়ে এই ফরেস্ট বাংলো। চারদিকে ছড়ানো থরে-বিথরে প্রকৃতির ঐশ্বর্য! এখন আমার চোখে শুধু মায়াবিনী আরাধনার চেহারা ভেসে উঠছে। অত সুন্দর মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি! দেখিনি অমন আশ্চর্য যৌবন আর মধুময় শরীর। সেই শরীরের স্পর্শ ভোলা যায় না। অথচ ঘৃণায় মনটা তেতোও। অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

চমক ভাঙল জিপের শব্দে। দেখি, মিঃ সাক্সেনা আর ডঃ পট্টনায়ক চলে গেলেন। কর্নেল লনের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলেন। এবার ডাকলেন—ডার্লিং! শিগগির তৈরি হয়ে নাও, আমরা বোরোব।

বললুম—রক্ষে করুন গোয়েন্দামশাই! আর উডডাকের পিছনে দৌড়বার সাধ্যি আমার নেই। আপনি যান, আমি ক্লান্ত।

কর্নেল এসে আমার হাত ধরে সবিনয়ে বললেন—আহা হা, তুমি তো অমন বেরসিক ছিলেন না জয়ন্ত! হল কী তোমার? প্লিজ, কথা শোন। আজ তোমাকে সত্যি এক আশ্চর্য জিনিস দেখাব!

—কাল তো অত্যাশ্চর্য দেখিয়ে ছেড়েছেন। আর দেখতে চাইনে।

কর্নেল আমাকে ছাড়লেন না। বিস্তর সাধাসাধির পর নরম হলুম। দুজনে পোশাক বদলে নিয়ে বেরোলুম। রাইফেলটা নিতে দিলেন না। বললেন—এবেলা আমরা হীরাকুণ্ড টাউনশিপে যাব। দেখবে, পৃথিবীতে এখনও অসংখ্য বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সারাপথ ছেলেভুলানো ধরনের কথায় আমাকে তুষ্ট করতে করতে বৃদ্ধ সঙ্গীটি টাউনশিপে পৌঁছলেন। তখন বিকেল হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কর্নেল হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। একবারে ধূলিসাৎ যাকে বলে। আমি তাকিয়ে ওঁর দুর্দশা দেখছি, উনি হাত বাড়িয়ে করুণ মুখে বললেন—ওঃ জেসাস! আমি...এবার সত্যি গেছি! প্রিয় জয়ন্ত, আমাকে ওঠাও। ও হো হো হো! একেবারে কম্পাউন্ড্ ফ্র্যাকচার নির্ঘাত।

আমি অবাক। এমন ঝকঝকে পিচের রাস্তা, সারাদিনের উজ্জ্বল রোদে একেবারে শুকনো খটখটে। পা ফস্কাবার কোন কারণই থাকতে পারে না। অথচ বুড়ো হোঁচট খেলেন কী ভাবে?

হাসতে হাসতে টেনে দাঁড় করালুম। কিন্তু উনি সমানে কাতরাচ্ছেন। তাহলে নিশ্চয় সত্যি সত্যি জোর চোট লেগেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। এ যাবৎকাল এই ষাট বছরের মানুষটিকে কোথাও আছাড় খেতে দেখিনি—কতবার কত

বিদঘুটে পাহাড় ভেঙে বাচ্চাদের মতো ওঠানামা করেছেন। তাঁর এ দুর্বিপাক ঘটল কেন?

ওঁকে সাবধানে ধরে চেঁচিয়ে দূরের এক টাঙাওয়ালাকে ডাকলুম। সে এলে দুজনে ধরাধরি করে ওঁকে ওঠানো হল। তারপর টাঙাওলাকে বললুম—শিগগির কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো। সবচেয়ে বড় ডাক্তার যিনি—তাঁর কাছে।

একটু পরে ঘোড়ার গাড়িটা একটা বাড়ির সামনে থামল। আমি লাফ দিয়ে নেমে দরজায় কড়া নাড়লুম। একটি মেয়ে বেরিয়ে বলল—ডক্টরসাব হাসপাতালসে আভিতক নেহি ঘুমায়া।

—কব্ লোটেগা বাতাইয়ে?

—আধাঘণ্টা পন্দের মিনাট বাদ!

—তো ডিস্পেনসারি খুল দিজিয়ে। পেসেন্ট হ্যায়। হামলোক ওয়েট করেগা।

মেয়েটি প্রৌঢ়া। মনে হল পরিচারিকা হতে পারে। সে আমাকে এবং গাড়ির যন্ত্রণাকাতর রোগীকে দেখে নিয়ে অদৃশ্য হল। তারপর পাশের ডাক্তারখানার দরজা খুলে দিল। টাঙাওলার সাহায্যে কর্নেলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলুম। তারপর অপেক্ষা করতে থাকলুম।

সেই সময় কর্নেল অস্ফুট স্বরে বললেন—জল খাব, জয়ন্ত।

উঠে গিয়ে ভেতরের দরজায় ডাকলুম—জেরা শুনিয়ে না!

সেই প্রৌঢ়া এল। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। বললুম—এক গেলাস জল দিজিয়ে না মাইজী। পেসেন্ট পিনা মাংতা।

সে জল এনে দিল। চলে যাচ্ছিল, এমন সময় কর্নেল তাকে ডাকলেন—শুনিয়ে মাইজি!

এরপর দুজনের মধ্যে যে কথা হল, তা এই ঃ

...এই ডাক্তারবাবুর তো ভারি নামডাক। তাই না? জরুর। এঁর চেয়ে বড় ডাগদার আর এ তল্লাটে নেই। বিলাইতি পাস ডাগদার বলেই তো সরকারি মহলে অত খাতির। হাসপাতালে ভি ডাগদারবাবু আছেন। কিন্তু খুব কঠিন বেমার হলে তখন আমাদের ওনাকে তলব করা চাই।...হুম, তা শুনেছি বটে! সেইজন্যেই তো ওঁর জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। তা মাইজি, খুব বড় বড় পেসেন্ট হরবখত নিশ্চয় ওঁর কাছে আসেন?...তা আর আসবেন না! অনেক আসেন। নিশ্চয় গাড়িওয়ালা পেসেন্ট তাঁরা!...জরুর! এই কালই তো এক বড়া আদমী গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন! ডাগদারসাব ওনার চিকিৎসা করলেন। কিন্তু বেচারা!...কেন, কেন?...বেচারা বেঁহুশ হয়ে গেল আচমকা। তখন আমাদের দিলওয়ালা ডাগদারসাব ওনাকে নিজের গাড়ি করে হাসপাতালে, নাকি ওনার বাড়ি, কোথায় যেন রেখে এলেন।...বাঃ, খুব উপকারী মানুষ তো?...জরুর। উনি নিজে ভি তাই বলেন—মানবকা সেবা ভগওয়ানকা...আচ্ছা মাইজি, তাহলে উনি

মেয়েলোকেরও চিকিৎসা করেন? মানে আমার এক বহিন অনেকদিন থেকে ভুগছে।...তাকে জরুর নিয়ে আসবেন।...মাইজি, তাহলে প্রতিদিন মেয়ে রোগীও অনেক আসে?...আলবাৎ আসে।...কাল আমার এক ভাইঝি শুনলুম এখানকার কোন ডাক্তার-কে দেখিয়ে গেছে। কেমন চেহারা, বলুন তো?...খুব খুপ-সুরত! বয়স বেশি নয়। টকটকে ফরসা রঙ।

প্রৌঢ়া পরিচারিকা একটু কেমন-কেমন হাসল—হঁউ বুঝেছি। আপনার ভাইঝিই বটে। কাল কখন এসেছিল সে?

—তা আন্দাজ বেলা আড়াই-তিন হবে।

—গেল কখন?

—তিন-সাড়ে তিন বাজে তখন।...

—হেঁটে নাকি গাড়ি চেপে এসেছিল?

—না না, হেঁটে এসেছিল। টাঙা চেপে চলে গেল।

—তখন বুঝি ডক্টরবাবু সেই বেঁহুশ রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন?

প্রৌঢ়া এতক্ষণে সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকাল। তারপর বলল—আমার কাজ আছে। আপ লোক বৈঠিয়ে।

—শুনিয়ে মাইজি, শুনিয়ে! উও বড়া পেসেন্ট আদমি ভি মেরা আপনা আদমি হ্যায়, আপ নেহি জানতি!

—কুছ দরকার নেহি। জাননেকা ক্যা ফায়দা?

—পুছতা হ্যায়, উসকো কোন টাইমমে ডক্টরসাব পঁহুচা দিয়া, আপকী মালুম হ্যায়?

—ম্যায় নেহি জানতি!

বলে প্রৌঢ়া চলে গেল। কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—এই পাহাড়ী মেয়েগুলো বড্ড সরল থাকে আজীবন। উত্তর ভারতের ওই রাজাধিরাজ হিমালয়ের শাসনের নমুনা এটা! জয়ন্ত, আশা করি তুমিও এইসব পাহাড়ী সারল্যের সঙ্গে সুপরিচিত? আর এই সারল্যই ওদের গোঁয়ার করে।

—আপনার ব্যথাটা কোথায় গেল?

কর্নেল পা দুটো ঝেড়ে সোজা রেখে বললেন—মাই গুডনেস! কী ম্যাজিসিয়ান ডাক্তার দেখছ জয়ন্ত? চেম্বারে ঢোকার পরই সব সেরে গেল যে! একি, একি!

বলে উনি হঠাৎ উঠে মেঝেয় পায়চারি কিংবা মার্চ শুরু করলেন। আমি হতভম্ব। উনি এবার আমার হাতটা ধরে এক টান দিলেন।

—কুইক জয়ন্ত! পা যখন সেরে গেছে ডাক্তার আসার আগেই, মিছিমিছি ফিয়ের টাকা খরচ করার মানে হয় না। এসো, চুপিচুপি কেটে পড়া যাক্।

বলেই উনি আমাকে প্রায় লুফে নিয়ে পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা হরণের মতো মুহূর্তে রাস্তায় পৌঁছলেন। তারপর এক টাঙাওয়ালাকে থামিয়ে বললেন—লাফ দিয়ে ওঠ জয়ন্ত। এক মুহূর্ত দেরি নয়।

টাঙাওয়ালা বলল—কাঁহা যাইয়েগা সাব?

কর্নেল গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন—চণ্ডীপাহাড়।

শৈলেশ সিংয়ের সেই সৌন্দর্য ও বিভীষিকায় ভরা বাংলোয় ফের যেতে আমার কৌতূহল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু গরজ দেখালুম না। টাঙাটা রাস্তায় বিদায় দিয়ে আমরা উৎরাই-চড়াই ভেঙে শালবনে পৌঁছলুম। তখন কর্নেল একটু হেসে বললেন—জয়ন্ত কি অবাক হচ্ছ?

—পাগল? পাগলদের কাজে অবাক হয় কে?

—আমাকে তুমি পাগল বলছ, জয়ন্ত? কর্নেল করুণ মুখে তাকালেন।

—তাছাড়া কী?

উনি সস্নেহে আমার একটা হাত ধরে হাঁটতে থাকলেন। শালবনটা পেরোনো অব্দি মুখ খুললেন না। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে মুখ তুলে টিলার গায়ে বাংলোটা লক্ষ্য করলুম। অস্বাভাবিক নির্জন হয়ে আছে। পুলিশ কাজ শেষ করে চলে গেছে বোঝা গেল। এখন আর পাহারার দরকার মনে করেনি। কর্নেল বললেন—তুমি আমাকে অনায়াসে এখন প্রশ্ন করতে পারো, ডার্লিং। আমার চমৎকার মুড এসে গেছে। আহা, পশ্য পশ্য বৎস, বাংলোর গায়ে বিকেলের গোলাপি রোদ পড়ে কী স্বর্গীয় বস্তু না প্রকট হচ্ছে! এই বাড়িটি যদি আমার হত! হুম্ জয়ন্ত! প্রশ্ন করতে পারো!

—মাথায় কিছু আসছে না এখন!

—জানতে ইচ্ছে করছে না যে আজ সকালে অত দেরি করে তোমাকে উদ্ধার করতে গেলুম কেন?

—উঁহু।

কর্নেল হাসতে হাসতে এগোলেন। বাংলোর গেট খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলুম। কর্নেল আমাকে নিয়ে বাড়িটার পিছন দিকে গেলেন। ওদিকে বুকসমান উঁচু বেড়া আর তার ওপাশে ঢালু হয়ে জঙ্গল নেমে গেছে। মনে হল, ওদিকটা গেটের দিকের মতো খাড়া নয় তাই সোজা গাড়ি চালিয়েও নামা যায়। অবশ্য গাড়ির রাস্তা ওদিকে নেই। একজায়গায় কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটু দুমড়ে বসে কী সব পরীক্ষার পর অস্ফুট স্বরে বললেন—ও. কে.! জয়ন্ত, তোমার মনে হচ্ছে না, এই বেড়া গলে কেউ ঢুকেছিল এপাশে?

ভালো করে দেখে বললুম—হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে।

কর্নেল কাঠের বেড়ার পাশেই একজায়গা থেকে হঠাৎ কী একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলেন। তারপর দ্রুত সেটা পকেটে পুরলেন।

বললুম—কী ওটা?

কর্নেলকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বেড়াটা সেই সন্দেহজনক জায়গায় উনি গলিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। জবাব দিলেন না। অবশেষে হাঁটু দুমড়ে ওপারে

গালেও গেলেন। আমি ওভাবে না গিয়ে বেড়াটার ধরে ডিঙিয়ে ওপারে গেলুম। তারপর ফের বললুম—কী ওটা বলছেন না যে?

কর্নেল ভীষণ গম্ভীর। মাটিতে ঝোপঝাড়ে কী যেন খুঁজছেন। আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না।

এতে নিশ্চয় রাগ হল আমার। বললুম—অত গোয়েন্দাগিরির কী আছে? যা বোঝবার, তা তো এখন বোঝাই গেছে।

কর্নেল শুধু তাকালেন আমার দিকে।

বললুম—আজ সকালে যে ডাক্তারবাবুটিকে পুলিশ এনেছিল এবং আপনার আজব পা মচকানি সারাতে যার চেম্বারে ঢুকেছিলেন, তিনিই যে খুনী, তাতে আর গোলমালটা কোথায়? প্রৌঢ়া পরিচারিকার যা জবানী তাতে স্পষ্ট এটা বোঝা যায়।

কর্নেল বললেন—হুম! বলে যাও।

উৎসাহে বলতে থাকলুম—রঘুবীর আর লতার জবানবন্দী স্মরণ করুন। গতকাল দুটোর পর শৈলেশ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। এবার প্রৌঢ়ার কথা মনে করুন। ওই সময় শৈলেশ ওই ডাক্তারের ওখানে যান।

—কেন?

—এটা অবশ্য আমার থিওরি। আরাধনার সঙ্গে ডাক্তারের অবৈধ সম্পর্ক আছে। শৈলেশ স্ত্রীর দেরি দেখে একটা কিছু নিশ্চয় অনুমান করেছিলেন এবং ডাক্তারের বাড়ি হানা দেন। ওই সময় আরাধনা সেখানে ছিল। তারপর যেভাবে হোক, বিষ খাইয়ে শৈলেশকে ওরা মারে। তারপর ডাক্তার শৈলেশের লাশটা ফেলতে যান। কিন্তু হঠাৎ সম্ভবত তার মনে হয় যে এটা রিস্কের ব্যাপার হবে। তাই সে লোক পাঠিয়ে রঘুবীর-লতাকে সরায় ওখান থেকে। তারপর বডিটা বেডরুমে খাটের নিচে রেখে আসে। এবং পরে আরাধনা যায়। অবশ্য আরাধনা জানত না বডিটা কোথায় আছে। সে ডাক্তারের অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে আমি গিয়ে পড়ি। আমাকে সে কফিতে মরফিয়া খাইয়ে এবং ভুলিয়ে শুইয়ে রাখে। তারপর আসুন ডাঃ পট্টনায়কের যুক্তিতে! ঝড়জলের পর অন্য কেউ বেডরুমে ঢুকেছিল। সে ওই ডাক্তার ছাড়া আর কে? তারপর আরাধনার সঙ্গে নিশ্চয় হঠাৎ কোনো কারণে ঝগড়া হয়। সম্ভবত বডিটা নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে ঝগড়া। হয়তো ওভাবে বডিতে ছুরি চালানো পছন্দ করেনি আরাধনা। যাই হোক, তখন ডাক্তার ওকে বাথরুমে আটকে দেয়। ও সেখানে মানসিক যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ডাক্তার কাজ সেরে চলে আসে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এইমাত্র যে জিনিসটা পকেটে পরলেন, তা ডাক্তারের পোশাকের টুকরো। বেড়া গলাতে গিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল!

কর্নেল হো-হো করে বেদম হাসলেন। তারপর বললেন—ব্রাভো! চমৎকার! কিন্তু ডার্লিং, তোমার এই অনবদ্য তত্ত্ব-শৃঙ্খলটির তিনটে জায়গা এত দুর্বল কহতব্য নয়।

—বলুন, কোথায়?

—প্রথম রঘুবীর লতাকে যারা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে আসছিল, তারা কিন্তু যা বলেছিল—আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তা প্রতিহিংসার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। দগ্ধে দগ্ধে মারতে চেয়েছিল ওদের। কেন?

—হয়তো ওরা ডাক্তার ও আরাধনার ষড়যন্ত্র টের পেয়েছিল, তাই।

—তার জন্যে দগ্ধে মারার মোটিফটা মেলে না। আশা করি, শৈলেশ সিংয়ের সে স্মাগলিং চক্র ফাঁস করার কথা তুমি ভোলনি!

—বেশ। দ্বিতীয় দুর্বল জায়গার কথা বলুন।

—দ্বিতীয় : একজন ডাক্তার যদি খুনী হয়, সে নর্ম্যালি অ্যান্ড সাইকলজিক্যালি এমন একটা পদ্ধতি বেছে নেবে—যা কারো মনে সন্দেহ উদ্রেক করবে না। নিকোটিন প্রয়োগ একটা আকস্মিক পদ্ধতি। কেন সে ওই রিস্ক নেবে? সে ধীর পদ্ধতিতে এগোবে। কারণ, কাকেও রোগে ভুগিয়ে মেরে ফেলা তার পক্ষে খুবই সহজ। ধরা যাক্, তোমার তত্ত্ব অনুসারে হঠাৎ শৈলেশ সিং গিয়ে পড়ে স্ত্রীর ব্যাপারে ঝামেলা বা ঝগড়া বাধিয়েছিলেন। তাহলে তাকে বিষ প্রয়োগ করবে কী ভাবে? সেখানে অবস্থা ও পরিবেশ আত্মীয়তামূলক হওয়া দরকার নয় কি? স্বেচ্ছায় কিছু না খেলে বিষ দেবার সুযোগ কোথায়?

—কিন্তু শৈলেশ সিং গিয়েছিলেন তা তো ঠিক?

—সম্ভবত ঠিক।

—তাহলে বলব, ঝগড়া করেননি। অভিনয় করেছিলেন—মানে, চেপে গিয়েছিলেন এবং...

—তাহলেও শৈলেশের সাইকলজিক্যাল প্রসঙ্গ এসে পড়ে। স্ত্রীকে ওখানে আবিষ্কার করার পর তাঁর পক্ষে কি হাসিমুখে বাক্যালাপ করা সম্ভব? ভেবে দেখ জয়ন্ত, এটা কি স্বাভাবিক কারো পক্ষে? যার জন্য বেচারা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে এক প্রণয়ীর বাড়ি দেখে মানুষ কী করবে?

চুপ করে থাকলুম। গোলমালে ফেলে দিলেন বুড়ো ঘুঘু!

—এবার তৃতীয় দুর্বলতা শৈলেশ সিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড—যা পুলিশের নথিতে রয়েছে। ইদানীং শৈলেশ সবসময় শত্রুর ভয়ে কাটাতেন। কয়েকবার তাঁর প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হয়েছিল শিলিগুড়িতে। দৈবাৎ বেঁচে যান। যাদের নামে উনি ডায়রি করে রেখেছেন, তাদের নাম শুনলে চমকাবে, জয়ন্ত।

—চমকাব না, বলুন।

—রঘুবীর ও লতার নামে।

—অথচ ওঁদের ঘরে পুষছিলেন। বৎস জয়ন্ত, শৈলেশ সিং খুব মহৎ লোক ছিলেন না। রঘুবীর ও লতাও খুব সহজ মানুষ নয়। আমার ধারণা, ওদের উনি বাধ্য হয়ে সব জেনেও পুষছিলেন। ওরা তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করে আসছিল। ওরা শৈলেশের সব গুপ্ত তথ্য জানত। শৈলেশ কেন স্মাগলিং চক্র ভাঙলেন, তাও ওরা জানত।

—তাহলে কি ওদের মারতেই এই বাজে মরসুমে চণ্ডীপাহাড়ের বাংলোয় এসেছিলেন?

—তাই মনে হচ্ছে।

—সেই লোকগুলো তাহলে কারা?

—ভাড়াটে গুণ্ডা হতে পারে। পুলিশ শিগগির তাদের খুঁজে বের করবে। আবার স্রেফ ওর দলের লোকও হতে পারে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে নিপাত করে উনি চুটিয়ে কারবার চালাচ্ছিলেন—সে খবর পুলিশ জানে। ধরার জন্য ওঁত পেতেও ছিল।

—আমি বাংলোয় থাকার সময় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কারা তাহলে হামলা করেছিল? কারা আরাধনার নাম ধরে ডেকেছিল?

—হয়তো একই বাহিনী। তাছাড়া আবার কারা হতে পারে? এবং আরাধনাও সম্ভবত একই চক্রের মেয়ে। তাই নেতার হুকুম তামিল করে এসে দলের মক্ষিরানীর সঙ্গে আড্ডা দিতে চেয়েছিল। চমৎকার জমত নিশ্চয়। মাঝখানে তুমি গিয়ে পড়ে বাগড়া দিলে। আরাধনা বেচারাও তোমাকেই কাজে লাগাল—তোমারই দিক থেকে কোনো বিপদ আসার আশঙ্কায়। তুমি যে খবরের কাগজের লোক!

—আমাকে মরফিয়াটা বেশি দিলেই পারত!

—সে সাহস তখন আর কোথায়? প্রথমত তোমার কাছে রাইফেল। দ্বিতীয়ত, সদ্য একটা খুন হয়েছে। আবার দ্বিতীয় খুনের ঝামেলা পোহানো কি সহজ নার্ভের ব্যাপার?

কর্নেল কয়েকমুহূর্ত থেমে কী ভাবার পর ফের বললেন—আমার ধারণা জয়ন্ত, অবশ্য নিছক ধারণাই আপাতত—শৈলেশের ওই লোকগুলো কোনোভাবে টের পেয়েছিল যে একটা গোলমাল ঘটেছে কোথাও। কিংবা এমনও হতে পারে যে আরাধনাই ওদের জন্যে ভয় পেয়েছিল।

—তাহলে পালাল কেন? জানলা খুলে আলো জ্বেলে অপেক্ষা করছিল কার?

—হুম! বেড়ে বলেছ। নিশ্চয় সে কারো অপেক্ষা করছিল।

—কারো নয়, ডাক্তারের। লাশটা সামলাতে হবে তো!

—হ্যাঁ, বিলক্ষণ।

—আপনি যাই বলুন, এবার কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে—ডাক্তার খুনী না হয়ে যায় না।

—কিন্তু....বলে কর্নেল পকেটে হাত পুরলেন।

আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠলুম।—কর্নেল! আজ যখন আপনারা বাংলোয় পৌঁছান, আমি বেডরুমের ওই জানলায় কয়েকবার কাকে টোকা দিতে শুনেছিলুম। বলতে ভুলেছি।

শুনেই কর্নেল দৌড়ে এবার আমার কায়দায় বেড়া ডিঙিয়ে সেই জানলাটার কাছে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকলুম। ওখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কী সব পরীক্ষার পর ফিরে এলেন। তারপর বললেন—চলো! বেলা পড়ে আসছে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে। ফেরা যাক্।

বলে উনি জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালেন। বললুম—ওদিকে রাস্তা কোথায়? রাস্তা তো উল্টো দিকে!

—আহা, চলে এস না। এই যে পায়ে চলা পথটাও কি দেখতে পাচ্ছ না জয়ন্ত! নাঃ, তুমি বড্ড গোলমাল করে দাও সব!

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে বিরক্ত প্রকাশ পেল। তাই ওঁকে চুপচাপ অনুসরণ করলুম। উনি ভীষণ জোরে হাঁটছেন এবার। সঙ্গ ধরতে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। ঘন ঝোপঝাড়, কোথাও উঁচু উঁচু গাছপালা আর ছোটবড় পাথর—তার ফাঁকে একফালি পায়েচলা রাস্তা এতক্ষণে নজরে পড়ল। মিনিট পনের চলার পর নিচের উপত্যকাটা নজরে এল। সেখানে তখন আলো জ্বলজ্বল করছে। প্রশ্ন না করে পারলুম না—ওটা আবার কোন্ জায়গা?

কর্নেল জবাব দিলেন—হীরাকুণ্ডা টাউনশিপ।

অবাক হলুম।—সে কী! হারীকুণ্ডা এত কাছে হবে কেন?

—জয়ন্ত, তোমার দিকভুল হয়েছে। হীরাকুণ্ডা চণ্ডীপাহাড়ের ঠিক নিচের উপত্যকায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। কিন্তু ভাল রাস্তা দিয়ে পৌঁছতে হলে পশ্চিমে দুমাইল তারপর উত্তরে একমাইল ঘুরে যেতে হয়। আর পায়ে হেঁটে কেউ যেতে চাইলে সটান এ পথে নাকের ডগাতেই চণ্ডীপাহাড়! চলে এস। এবার একদমে নামলেই বাজারে পৌঁছে যাব।

আমরা রাস্তায় নেমে ফের টাঙা করলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোথায় গন্তব্য জিগ্যেস করলুম না। দশমিনিট পরে এক জায়গায় কর্নেল টাঙা রুখতে আদেশ দিলেন। আমরা নামলুম। এ এলাকাটা ধনীদের বলেই মনে হচ্ছিল। অসমতল মাটির ওপর এখানে-ওখানে সুন্দর সব বাংলোবাড়ি—একেবারে ইংল্যান্ডের পাড়াগাঁর ছবি যেমন দেখেছি। কর্নেল অভ্যাসমতো আমার একটা হাত নিয়ে এগোলেন। বাঁদিকে উঁচুতে একটা বাড়ির গেটে পৌঁছলুম। মনে হল, এটা তাহলে কর্নেলের সেই বন্ধুর বাড়ি, যেখান থেকে গতরাতে চণ্ডীপাহাড়ের বাংলোয় ফোন করেছিলেন।

গেটের ওপর ঘন লতাপাতার ঝাঁপি। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি, লনে জনা পাঁচছয় পুলিশ বসে ও দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সবাই সশস্ত্র। কর্নেল এগিয়ে যেতেই একজন দৌড়ে এল। চিনতে পারলুম তক্ষুনি। সেই মিঃ প্রসাদ। করমর্দন করে প্রসাদ বললেন—আপনার অপেক্ষা করছি স্যার! মিঃ সাক্সেনা এক্ষুনি ফোনে জানতে চাইছিলেন, আপনি এসেছেন কি না।

কর্নেল বললেন—মিঃ প্রসাদ, আগে আমাকে ফোনের কাছে নিয়ে চলুন! হাই দা বাই—কর্ত্রীঠাকুরানীর কুশল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিও আপনার অপেক্ষা করছেন!

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—জয়ন্ত, তুমি তাহলে ড্রইংরুমে একটু বসো। তারপর রহস্যময় হেসে ফের বললেন—তেমন কম্পানিয়ন পেয়ে গেলে আলাপও কোরো। আমার সামান্য দেরি হতে পারে। কেমন? তোমার জন্য গরম কফি পাঠাতে বলছি।

কৌতূহল চেপে রাখা আমার অভ্যেস নয়। কোনো রিপোর্টার কৌতূহল চেপে রাখে না। কিন্তু যেন ক্রমশ আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছিল। এটা যে থানা বা কোনো অফিস নয়, তা স্পষ্ট! এ একটা প্রাইভেট বসতবাড়ি এবং অবশ্যই কোনো ধনী মানুষের। তাছাড়া এক কর্ত্রীঠাকুরানীর উল্লেখও করা হয়েছে। ব্যাপারটা কী?

মিঃ প্রসাদ ড্রয়িংরুমটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে কর্নেলকে নিয়ে অন্য ঘরে ঢুকলেন। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, মেঝেয় সুদৃশ্য কার্পেট পাতা। সাজানো গোছানো আধুনিকতম পরিবেশ। একজন পরিচারক দাঁড়িয়ে যেন আমারই অপেক্ষা করছিল। সে সেলাম দিয়ে ওপাশের দরজার পর্দা তুলে কাকে কী বলল। তারপর বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনার উৎকৃষ্ট সোফায় আরাম করে বসলুম।

হাল্কা আলো জ্বলছিল ঘরে। সিগারেট ধরিয়ে নানান ছাইপাঁশ ভাবছি, চোখ ছাইদানির দিকে—হঠাৎ মিঠে সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলুম। চাপা এবং হাসিতে ভিজে সেই স্বর।—হ্যালো চৌধুরী!

তাকিয়েই আমার বুকে খিল ধরে গেল। স্বপ্ন—আবার সেই অত্যদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেছি! আরাধনা আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। জাদুকর বুড়োর এই আজব ভেলকি দেখে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম।

আরাধনা একেবারে পাশে গা ঘেঁষে বসে পড়ল। তারপর কাঁধে হাত রেখে বলল—তুমি নিশ্চয় আমার ওপর খুব রাগ করেছ, চৌধুরী! প্লিজ—প্লিজ, অমন করে তাকিও না! আমার বড্ড ভয় করছে।

মুহূর্তে ওর অলৌকিক সুন্দর শরীরের স্পর্শ আমাকে সব ভুলিয়ে আবার প্রেম ও কামনার আবেগে ভাসিয়ে দিল। বললুম—তোমার ওপর রাগ করে থাকা যায় নাকি? কিন্তু এ হেঁয়ালির মানে কী?

—হেঁয়ালি! কিসের হেঁয়ালি?

—তোমাকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি?

—না তো! কেন গ্রেফতার করবে?

কোন জুতসই কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম—গতরাতে তুমি আমাকে আফিয়া খাইয়েছিলে কেন?

হাসল আরাধনা।—উপায় ছিল না। তবে তোমার কোনো ক্ষতি আমি

চাইনি। ওই সামান্য ডোজে কেমন চমৎকার ঘুমটা হল, সেজন্যে আমাকে তুমি বকশিশ দাও বরং!

—কেন আমাকে ঘুম পাড়ানোর দরকার হল?

—জেগে থাকলে বা হঠাৎ জেগে গেলে তুমি নিশ্চয় হইচই বাধিয়ে বসতে। কারণ, তোমার বিছানার তলা থেকে একটা ডেডবডি বের করা হত এবং...

—এবং তার গলাকাটা হত! বিদ্রূপ করে বললাম কথাটা।

আরাধনা তার সুন্দর সোনালি হাতে আমার হাত নিয়ে বলল—চৌধুরী, সবটা না জেনে আমার ওপর অবিচার করো না। আমি সত্যি এত অসহায়!

—বেশ, বলো।

—সব কথা তোমাকে কর্নেলসায়েব বলবেন। ও-প্রসঙ্গ আর আমার তুলতে ইচ্ছে করছে না চৌধুরী। উঃ! কাল যা গেছে, তা একটা বীভৎস দুঃস্বপ্ন!

ও চুপ করে থাকল। একটু পরে বললুম—ফোনের তার কাটা বলেছিলে কেন?

—এই কারণে। তুমি ফোনে বাইরে যোগাযোগ করতে, সেইজন্যে। তখন বাইরের কেউ এসে পড়ুক, তা আমি চাইনি।

—মিঃ সিংকে কে খুন করেছে?

আমার এই সোজা ও বেমক্কা প্রশ্ন শুনে সে চোখ নামাল। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। তারপর হঠাৎ আমার কাঁধে মুখ গুঁজে দিল, চাপা কান্না শুরু হল।

এর মধ্যে ছলনা ও ছেনালি থাকা সম্ভব—আবার এটা সত্যিকার আবেগও হতে পারে—ধাঁধায় পড়ে আমি বিব্রত হলুম। তবু অমন সৌন্দর্যময়ী যুবতী মেয়ের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আমার মতো যুবককে শেষ অব্দি দ্রবীভূতই করল। এবং একটা হঠকারিতাও এল আমার মধ্যে। দুহাতে ওর ভিজে মুখটা তুলে গোটাকয় চুমু খেয়ে নিতে দেরি করলুম না। বিবেককে বললুম, এই সৌন্দর্যের সাতখুন মাফ। এ যদি প্রহরে-প্রহরে কাটা মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে, তাও সওয়া যায়। সৌন্দর্যের খাতিরে জঘন্যতম পাপকেও আমি বিলকুল ক্ষমা করে দিতে পারি!

আরাধনা ফিসফিস করে বলল—আমাকে তুমি বাঁচাও চৌধুরী। এখুনি এখান থেকে নিয়ে পালাও। এরা আমাকে এবার টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

রুদ্ধশ্বাসে বললুম—কারা আরাধনা, কারা?

ও জবাব দেবার মুহূর্তে ভেতরের দরজার দিকে একটা শব্দ হল। তারপর ট্রে হাতে একজন পরিচারিকা এল। সে ট্রেটা রেখে চলে গেল। তখন নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কফি তৈরি করতে থাকল আরাধনা।

সে ইতিমধ্যে একটু সরে বসেছিল। এবার কফির পেয়ালা হাতে সামনের সোফায় চলে গেল। মুখোমুখি আমরা কফি খেতে থাকলুম। অন্তত তিনটে মিনিট কোনো কথা বললুম না কেউ।

ফের যখন কথা বলতে যাচ্ছি, বাইরের দরজা দিয়ে প্রথমে ঢুকলেন কর্নেল, তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা—বয়স আন্দাজ চল্লিশ বিয়াল্লিশের কম বা বেশি নয়, স্নিগ্ধ কিন্তু ম্রিয়মাণ চেহারা, ভিজে চোখ, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। তারপর ঢুকলেন ডঃ পট্টনায়ক, মিঃ সাক্সেনা, মিঃ প্রসাদ এবং আরো কিছু পুলিশ অফিসার। সবার শেষে ঢুকলেন সেই ডাক্তার, যাঁকে সকালে চণ্ডীপাহাড়ের বাংলোয় দেখেছি এবং যাঁর কাছে কর্নেল পা মচকানি সারাতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তারটির বয়স পঞ্চাশের মধ্যে, বেশ হাসিখুশি গোলগাল চেহারা। ঢুকেই সবাইকে 'নমস্তে' করলেন।

দুজন পরিচারককে দেখলুম চেয়ার সাজিয়ে দিতে। তারপর তারা তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল এবার আমার ও আরাধনার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। তারপর আমার উদ্দেশে বললেন—জয়ন্ত, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পরলোকগত হতভাগ্য মিঃ শৈলেশ সিংয়ের বউদি মিসেস সিং, এ হচ্ছে জয়ন্ত চৌধুরী—কলকাতার নিউজডেলি সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার। সাংবাদিকমহলে অশেষ খ্যাতি এ বয়সেই অর্জন করেছে।

আমরা পরস্পর নমস্কার করলুম। তারপর আর সবাই বসে পড়লে আমিও বসলুম। আরাধনা গম্ভীর হয়ে নখ খুঁটতে থাকল।

গাম্ভীর্যময় ও স্তব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হল। তারপর দেখলুম, মিঃ প্রসাদ একজন পরিচারককে ইশারা করলেন, সে ঘরে উজ্জ্বল আলোগুলো সুইচ টিপে জ্বেলে দিল।

কর্নেল বললেন—কোনো ভূমিকার দরকার নেই। আমরা এই বৈঠক ডেকেছিলুম মিঃ শৈলেশ সিংয়ের মর্মান্তিক পরিণামের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। কথামতো সবাই এসে পড়েছেন। এখন আমি একে একে কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করব। আশা করি, তাঁরা সত্যিকার জবাবটিই দেবেন। মিঃ সাক্সেনা। আপনার স্টেনো ভদ্রলোক তৈরি?

সাক্সেনা মাথা দোলালেন। দেখলুম পিছনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নোটবুক ও পেন্সিল হাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একেবারে তৈরি। কথা শুরু হলেই পেন্সিল চালাতে ইতস্তত করবেন না—এমনি ভঙ্গি।

কর্নেল বললেন—আমি প্রথমে ডক্টর মহেন্দর শর্মাকে প্রশ্ন করতে চাই।

ডাক্তার শর্মা গম্ভীর হয়ে বললেন—করুন। জানলে বলব, নয় তো না।

—ডঃ শর্মা, শৈলেশ সিং গতকাল দুপুরে ঠিক ক'টায় আপনার কাছে গিয়েছিলেন?

—দুটো পাঁচ-টাচ হবে। সঠিক কাঁটায় কাঁটায় বলতে পারব না। তবে দুটো বেজেছিল সবে, গিয়েই তো শুয়ে পড়লেন। বললেন—খুব অসুস্থ বোধ করছেন...

—হুম! মারা যান ক'টায়?

—যাবার ঠিক তিন মিনিটের মধ্যেই।

—কোত্থেকে আসছেন বলেছিলেন?

—ডঃ শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন—কতবার বলব? এসব কথা তো পুলিশকে ইতিমধ্যে বলেছি।

কর্নেল সবিনয়ে বললেন—প্লিজ ডঃ শর্মা! জবাব দিন।

—কোত্থেকে আসছেন, সে সব কিছু বলেননি। বেশি কথা বলারই ফুরসৎ পাননি। কোনরকমে গাড়ি চালিয়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়ে যান।

মিঃ সাক্সেনা চণ্ডীপাহাড়ের বাংলো থেকে ডঃ শর্মার বাড়ি মোটরে ম্যাক্সিমাম স্পিডে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগতে পারে?

মিঃ সাক্সেনা, একটু ভেবে জবাব দিলেন—পনের মিনিট।

—ডঃ শর্মা, নিকোটিন খাওয়ার পর কি কেউ পনের মিনিট গাড়ি চালিয়ে এসে আপনার ঘরে ঢুকবার ফুরসৎ পায়? ভেবে বলবেন কিন্তু!

ডঃ শর্মা খাপ্পা হয়ে বললেন—বার বার বলছি যে আমি এসব ব্যাপারে কিছু জানিনে! আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার কর্তব্য ছিল, তাঁকে বাংলোয় তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। দিয়েছিলুম।

—ডঃ শর্মা! এটা অস্বাভাবিক। কারণ, আপনি জেনেশুনে একটা ডেডবডি পৌঁছে দিয়েছেন বলছেন! আপনি সরকারের একজন আস্থাভাজন ডাক্তার। বরং তখনই পুলিশকে জানানোই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না কি?

—ছিল। কিন্তু...

—বলুন!

ডঃ শর্মাকে একটু বিব্রত দেখাল। তারপর হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে গেলেন। বললেন—মিসেস সিং ফোনে আমাকে একটা অনুরোধ করায়...

আরাধনা তীব্র প্রতিবাদ জানাল—না, আমি ফোন করিনি। তখন এ বাড়িতে সবে পৌঁছেছি জাস্ট দুটো দশে। দিদিকে জিগ্যেস করুন।

—আশ্চর্য! অথচ মিঃ সিংয়ের মৃত্যুর পরই আমি যখন পুলিশকে জানাবার জন্য ফোনের কাছে গেলুম, ফোন বাজল। এক মহিলা নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস সিং বলে। উনি...

কর্নেল বললেন—আপনাকে টাকার লোভ দেখালেন?

ডঃ শর্মা খেপে গিয়ে বললেন—না!

তবে?

—বললেন যে মিঃ সিং স্যুইসাইড করার জন্য বিষ খেয়েছেন। আপনি চলে আসুন চণ্ডীপাহাড়ের বাংলোয়। আমি বললুম, সে কী! মিঃ সিং তো আমার এখানে—নাও হি ইজ ডেড। তখন মহিলাটি কান্নাকাটি করে বললেন, আমাকে ঘরে লক করে রেখে এই কাণ্ড করেছেন। প্লিজ ডঃ শর্মা, এ জানাজানি হলে স্ক্যান্ডাল ছড়াবে। আপনি আমার অনুরোধটা রাখুন। ওকে এই অবস্থায় এখানে পৌঁছে দিন।

—হুম, তারপর?

—আমি পৌঁছে দিলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, বাংলোয় জনপ্রাণীটি নেই। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেল। এভাবে ডেডবডি নিয়ে গাড়িতে আবার ফেরার রিস্ক নিতে পারলুম না। তখন বডিটা বাংলোয় বারান্দায় নামিয়ে রেখে পালিয়ে এলুম। যাক শত্রু পরে পরে।

—তারপর, ফিরে গিয়ে কী করলেন?

—ফিরে গিয়ে দেখি (আরাধনাকে দেখিয়ে) ওই মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু উনি নিজের পরিচয় লুকিয়ে ছিলেন। বলেননি যে উনি মিসেস সিং। বললেন—হজম হয় না, পেটের গোলমাল, ওষুধ চাই।

—ওষুধ বা প্রেসক্রিপশান দিলেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর পুলিশকে জানাবার কথা ভাবলেন না?

—না। আমি ও ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা ভাল মনে করলুম না।

—ঠিক আছে। এবার আমি প্রশ্ন করব মিসেস আরাধনা সিংকে।

আরাধনা সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল—অবশ্যই।

—আপনি শিলিগুড়ি থেকে হীরাকুণ্ডা এলেন কেন?

—মিঃ সিং হঠাৎ অসময়ে চলে এলেন। আমার সন্দেহ হল—কোনো বিপদে ঝুঁকি নিচ্ছেন। আমি সব সময় ওঁকে চোখের সামনে রাখতুম। তাই...

—যাক্ গে। পৌঁছলেন দুটো দশে। কেমন? মিসেস সুচেতা, কী বলেন?

সুচেতা সিং মাথা দোলালেন—হ্যাঁ, আরাধনা এসেই শৈলেশের কথা জিগ্যেস করল। ও এসেছে কি না আমিও জানতুম না। এলে তো আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না!

কর্নেল বললেন—আপনি এ বাড়ি থেকে হঠাৎ ডঃ শর্মার কাছে হজমের ওষুধ নিতে গেলেন কেন মিসেস আরাধনা?

—এ বাড়ি থেকে ডিরেক্ট যাইনি। প্রথমে হাঁটাপথে বাংলোয় গেলুম। বাংলোয় কেউ নেই। তখন ওই পথেই ফিরে এলুম। তারপর পথে আসতে আসতে হঠাৎ ডঃ শর্মার বাড়ির সামনে দেখি, আমাদের ল্যান্ডমাস্টার গাড়িটা রয়েছে। তখন দৌড়ে ওখানে চলে গেলুম। ডাক্তারের পরিচারিকা বলল যে একজন অসুস্থ লোক ওই গাড়িতে এসেছিল। তাকে কোথায় নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছেন ডাক্তার। আমি খুব গোলমালে পড়ে গেলুম। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। ডাক্তার ফিরলে তাই ওঁকে কিছু খুলে বলা সঙ্গত মনে করলুম না।

—নাকি আপনি তখন যা জানার জেনে ফেলেছেন কোনো সূত্রে এবং তাই আরো স্পষ্টভাবে জানতে এসেছিলেন? তাছাড়া...

—মোটেও না।

—একটা কিছু গোপন করছেন, মিসেস আরাধনা।

—না!

—আপনি এসেছিলেন মিঃ সিংয়ের গাড়ি থেকে একটা জিনিস সরাতে।

—মিথ্যা! বলে উত্তেজিতা আরাধনা উঠে দাঁড়াল।

তাকে ইশারায় বসতে বললেন কর্নেল। তারপর বললেন—হুম, আপনি ডাক্তারের বাড়ি থেকে কোথায় গেলেন?

—বাংলোয়।

—কোন্ পথে?

—ওই হাঁটা রাস্তায়।

—তারপর?

—গিয়ে দেখলুম, বারান্দায় মিঃ সিংয়ের বডি রয়েছে। আমি অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর বডিটা বেডরুমে টেনে ঢোকালুম।

—দরজা খোলা ছিল?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—ভয় পেয়ে ভাবলুম, আমাকেই স্বামী হত্যার দায়ে পড়তে হবে। তাই বডিটা খাটের নিচে লুকিয়ে রাখলুম। ঠিক করলুম রাতে ওটা উত্তরের খাদে গড়িয়ে ফেলে দেব। আশা করি, বাংলোর উত্তরের খাদটা দেখেছেন। নিচে একটা নদী রয়েছে।

—হুম। রাতে কারা গিয়ে আপনাকে ডাকছিল বলুন। কেন ডাকছিল?

—ওরা মিঃ সিংয়ের লোক। নিশ্চয় কিছু আঁচ করে খোঁজ নিতে গিয়েছিল।

—আপনার নাম ধরে ডাকছিল। এর কারণ?

—ডাকছিল আমার দাদা।

—কী নাম? কোথায় থাকেন তিনি?

—নাম মিঃ রাজময় রানা। থাকেন নেপালে। হীরাকুণ্ডায় ওঁর একটা ফার্ম আছে।

মিঃ সাক্সেনা এসময় বলে উঠলেন—ওঁকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কর্নেল। তবে ওঁর সঙ্গী দুজন বেপাত্তা। মিঃ রানাই রঘুবীর আর লতাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন খাদে। রঘুবীর বলেছে, রানাসায়েবই মিঃ সিংয়ের পয়লা নম্বর দুশমন। উনি দলবল নিয়ে মিঃ সিংকে খুন করতে যান বাংলোয়। ওঁকে না পেয়ে ওদের নিয়ে যান। মিঃ সিং রানাসায়েবকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেই এখানে আসেন গতকাল। বেচারার দুর্ভাগ্য! নিজেই খতম হয়ে গেলেন!

আমি বললুম—তাহলে রঘুবীর-লতা মিঃ সিংকে নয়, রানা-সায়েবকেই ব্ল্যাকমেইল করত? কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন—না জয়ন্ত! আমার থিওরিটা শোন! ওরা নিজেদের মনিবকেই

ব্ল্যাকমেইল করত। তাই রানাসায়েবের বোন অর্থাৎ আরাধনা দাদাকে অনুরোধ করেছিল, ওদের খতম করতে। রানাসায়েব কিংবা আরাধনাকেও ওদের ব্ল্যাকমেইল করার সম্ভাবনা ছিল। অন্তত রানাসায়েব তাই ভেবেছিলেন বলে বোনের প্রস্তাব মেনে নেন।

মিঃ সাক্সেনা বললেন—সম্পূর্ণ সত্য, কর্নেল। আপনার থিওরি অভ্রান্ত। রঘুবীর আর লতা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায়।

কর্নেল বললেন—এবার এক জটিল রহস্যে ভরা কেসের ভাইটাল অংশে আলোকপাত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আরাধনা দেবীর মানসিক অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে দাদা। দুজনেই একটা দুষ্টচক্রের দুই নেতা। পরস্পর ঘোর শত্রু, অথচ কেউ কাকেও টিট করতে পারছে না—টিট না করলেও শান্তি নেই। পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে থাকতেও পারছে না, তাহলে চোরা ব্যবসায়ে লোকসান হয়। এদিকে মাঝখানে বিব্রত রানাসায়েবের বোন।

আরাধনার দিকে তাকালুম। সে এবার নতমুখে নিঃশব্দে কাঁদছে।

কর্নেল বললেন—কিন্তু আরাধনা চাননি স্বামীর ক্ষতি হোক। তিনি গতিক বুঝে স্বামীকে বাঁচাতেই ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এবার আমি প্রশ্ন করব, ডঃ পট্টনায়ককে।

ডঃ পট্টনায়ক তাকালেন।

—আচ্ছা ডঃ পট্টনায়ক, নিকোটিন খওয়ার কতক্ষণ পরে মৃত্যু হয়?

—সেটা মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা পার্সোনাল কন্সটিটিউশনের ওপরও নির্ভর করে কিছুটা। আমি অনেক কেসে দেখেছি, সবচেয়ে মারাত্মক বিষ দিলেও কেউ কেউ একঘণ্টা মোটামুটি চলৎশক্তিসক্ষম থাকে। ইতিহাসে রাশিয়ার প্রখ্যাত রাসপুটিনের কথা আমরা জানি। বিষে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হত না। তবে মিঃ সিংয়ের স্টমাকে যা দেখেছি, মনে হচ্ছে—ডোজ খুব ভাইটাল ধরনের ছিল না। নিশ্চয় কোনো আনাড়ির কাজ। ভয়ে ভয়ে একটুখানি মিশিয়ে কেটে পড়েছিল যেন। হয়তো তক্ষুনি চিকিৎসা হলে ওঁকে বাঁচানোও যেত। কিন্তু উনিও কী ভাবে ব্যাপারটা আঁচ করে গাড়ি চালিয়ে ডাক্তারের কাছে যান। ওটাই ওঁর মৃত্যুর কারণ। এর ফলে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়েছিল এবং হার্ট আক্রান্ত হয়েছিল।

—ডঃ পট্টনায়ক, মিঃ সিংয়ের ক্ষেত্রে খুব ভেবে বলুন—বিষপানের পর কতক্ষণ তাঁর সক্রিয় থাকা অর্থাৎ গাড়ি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল?

একটু ভেবে নিয়ে ডঃ পট্টনায়ক বললেন—বড় জোর পাঁচ মিনিট।

—কিন্তু বাংলো থেকে আসতে সবচেয়ে কম সময় লাগে পনের মিনিট।

হ্যাঁ। আমার ধারণা, উনি এখানে কাছাকাছি কোথাও বিষে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডঃ শর্মার বাড়ি থেকে ধরুন আড়াই মিনিট মোটরের পথ। বাকি আড়াই মিনিট

গাড়িতে ওঠা, স্টার্ট দেওয়া এবং গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তারখানায় ঢোকায় খরচ হয়েছে।

এসময় হঠাৎ আরাধনা একটা পিস্তল তুলে চেঁচিয়ে উঠল—রাক্ষসী! ডাইনী! শয়তানী!

মিঃ সাক্সেনা আমাদের পাশেই ছিলেন। তক্ষুণি ওর হাতের পিস্তলটা ধরে ফেললেন। দেয়ালে গুলি লাগল। তারপর আরাধনা মূর্ছিতা হল।

ওদিকে আরেক দৃশ্য। কর্নেল মিসেস সুচেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবার গুলির শব্দ হল। তারপর কর্নেলকে দেখলুম ওঁর হাত মুচড়ে একটা পিস্তল কেড়ে নিচ্ছেন।

পুলিশ অফিসার পিছন থেকে মিসেস সুচেতাকে ধরে ফেললেন। কর্নেল বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন—মিঃ সাক্সেনা, মিঃ শৈলেশ সিংয়ের মার্ডারারকে গ্রেফতার করুন।

আমার চোখের সামনে মিসেস সুচেতাকে ধরে নিয়ে পুলিশ অফিসারারা বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব।

ডঃ শর্মা ততক্ষণে আরাধনার শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়েছেন। কর্নেল বললেন—মিঃ সাক্সেনা, রঘুবীর আর লতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে রানাসায়েবের বোনকেও আপনার গ্রেফতার করা উচিত।

মিঃ সাক্সেনা হাসলেন।—দ্যাটস ওকে, কর্নেল। মিঃ প্রসাদ, বি রেডি!

আরাধনার জ্ঞান ফিরল একটু পরেই।

কর্নেল আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণ মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। লনের খোলামেলায় দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কর্নেল বললেন—প্রশ্ন করো, জয়ন্ত।

কী প্রশ্ন? আর কোনো প্রশ্ন নেই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আরাধনার জন্যে কষ্ট হচ্ছে? কী করব বলো? আইনের চোখে সৌন্দর্যের কোনো নিষ্কৃতি নেই।

এ সময় ডঃ পট্টনায়ক এসে গেলেন। হ্যালো কর্নেল! আমি বোকা বনে গেছি।

কর্নেল বললেন—মোটেও না। আপনিই তো ধরিয়ে দিলেন খুনীকে।

—কী ভাবে?

—পাঁচ মিনিটের জমাখরচ হিসেব করে।

—মাই গুডনেস!

—হ্যাঁ। এই বাড়ি থেকে ডঃ শর্মার বাড়ির দূরত্ব যা—তাতে ওই হিসেবটা মিলে যায়।

—ঠিকই বলেছেন।

এবার কর্নেল তাঁর পকেট থেকে একটুকরো দামি শাড়ির পাড়ের অংশ বের

করে বললেন—এটা অবশ্য একটা ক্লু। বাংলোর বেড়ায় আটকে ছিল। মিসেস সুচেতার এক পরিচারিকাকে তখন দেখাতেই বলল—হ্যাঁ, ও রকম পাড়ের শাড়ি একটা মাইজি পরেন বটে!

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না।—কর্নেল, কেন বৌদি দেওরকে বিষ খাইয়ে খুন করলেন?

কর্নেল বললেন—শৈলেশ সিং প্রথমে এসে বৌদির কাছে ওঠেননি। আমরা রঘুবীরদের বিবরণমতো জানতে পেরেছি যে তিনি চণ্ডীপাহাড়ের বাংলোয় ওঠেন। তারপর স্ত্রীর দেরি দেখে বেরিয়ে পড়েন। শ্যালকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছেন, তাই প্রথমে ওখানে গিয়ে স্ত্রীর খোঁজ না করে বউদির কাছে যান। বউদি তখন যে উদ্দেশ্যেই হোক, দেবরটিকে বিষ খাইয়ে দেন। একটা কিছু টের পেয়ে শৈলেশ ছিটকে বেরিয়ে যান ডাক্তার শর্মার কাছে। ওদিকে তখন আরাধনা দাদার বাড়ি অপেক্ষা করছে। দাদা ফেরার পর আরাধনা তার কাছে জানতে পারে, শৈলেশ বাংলোয় নেই। তখন সে তাঁর বউদির বাড়ি খোঁজ নিতে যায় এবং শোনে যে হঠাৎ অসুস্থতার জন্য তিনি কোনো ডাক্তারের কাছে গেছেন।

বাধা দিয়ে বললুম—কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য কী?

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে এবং বুকে ক্রস এঁকে বিড়বিড় করে কী বললেন। আমি ফের 'কী' বলতেই উনি হাসলেন।—সেটা এখনও বুঝতে পারিনি জয়ন্ত। আশা করি, কালকের মধ্যেই জেনে ফেলব। চলো, এখন আমার এক বন্ধুর শরণাপন্ন হওয়া যাক। তার গাড়িতে আমাদের ফরেস্ট বাংলোয় ফিরতে হবে। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।...

সকালে সবে চা খাচ্ছি, কর্নেল পাখির ফটোগুলো বাছাই করছেন, এমন সময় মিঃ সাক্সেনা এলেন। কর্নেলের প্রথম প্রশ্ন শোনা গেল—শৈলেশ সিংয়ের গাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া গেছে মিঃ সাক্সেনা?

মিঃ সাক্সেনা হতভম্ব হয়ে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু...

—নিশ্চয় ডঃ শর্মার বাড়ির পিছনের খাদে এবং ভাঙাচোরা অবস্থায়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু...

—এটাই স্বাভাবিক, মিঃ সাক্সেনা। এমন মজার কেস কখনও দেখিনি। ডঃ শর্মা প্রণয়িনী সুচেতাকে বাঁচাতে সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই করবেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু বলব, এ বড় অদ্ভুত কেস। ডঃ শর্মা ভালবাসেন বিধবা সুচেতাকে, সুচেতা নিজের দেওরকে। দেওরটি ভালবাসেন মক্ষিরানী আরাধনাকে। সুতরাং শেষ অবধি সুচেতা প্রণয়ী ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। কেন? না—ঈর্ষায় ততদিনে অন্ধ প্রতিহিংসা জেগেছে সুচেতার মনে। এই ডাক্তারটি আসলে হাঁদারাম গবেট।

—তাছাড়া আরেকটি বড় মোটিভ পাওয়া গেছে, কর্নেল। শৈলেশ সিং আয়কর ফাঁকি দিতে এক বিরাট সম্পত্তি বউদির অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন। স্ত্রী যেহেতু তাঁর শত্রু রানাসাহেবের বোন, তাকে কখনও মনে মনে বিশ্বাস করতে পারেননি।

কর্নেল বললেন—তাহলে মোটিভ হিসেবে এটাই মুখ্য, বলব। এই কেসে আপাতত বিভিন্ন অপরাধের মূল আসামী সংখ্যা হল সর্বসাকুল্যে চারজন। তাই না? আরাধনা ও রানাসায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুনের মোডাস অপারেন্ডি তৈরি, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ, প্ররোচনা ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে মূল খুনীকে সহায়তা। আর মিসেস সুচেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ডেলিবারেট মার্ডার। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে হত্যা। তাই না?

—হ্যাঁ, কর্নেল।

—একেই বলে পাপচক্র।...বলে কর্নেল একটু হাসলেন। বাই দা বাই, সুচেতাদেবীর সাহসের জন্য কিন্তু আমি প্রশংসাই করব। গতরাত্রে বারোটার পর ডঃ শর্মাকে নিয়ে পাহাড়ী বাংলোয় হাজির হওয়াটা অবশ্য সহজ। কিন্তু তারপর যা করেছেন, ভাবা যায় না। আরাধনাকে ডেকেছেন কান্নাজড়ানো গলায়। আরাধনার মাথার ঠিক ছিল না। দরজা খুলেছে। বাইরে শর্মা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সুচেতা ঘরে ঢুকেছেন। কথায় কথায় ওকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ শর্মা ঢুকে ক্লোরোফর্মে ভেজা রুমাল বেচারা আরাধনার মুখে চেপে ধরলেন। তারপর তাকে অজ্ঞান করে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন। তখন সুচেতা মানবী ছিলেন না। প্রতিহিংসা ও স্বার্থ মিলে স্রেফ দানবী হয়ে গেছেন। লাশের গলা কেটে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন যে এটা বিষ প্রয়োগ খুন নয়—গলাকাটার ব্যাপার এবং এজন্যে দায়ী আরাধনা। সে তার দুর্ধর্ষ দাদার সাহায্যে এটা করেছে।

—কিন্তু ওকে বাথরুমে ঢোকালেন কেন? আর বিছানায় ঘুমন্ত জয়ন্তবাবুকেই বা রেহাই দিল কেন, বোঝা যাচ্ছে না।

—ডবল খুনের মনোবল ছিল না! তাই জয়ন্ত বেঁচে গেল।

আমি আঁতকে উঠলুম—ওরে বাবা!

কর্নেল হেসে বললেন—ডঃ শর্মা নিশ্চয় আলো ফেলে জয়ন্তের অবস্থা আঁচ করেছিলেন—তাছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। মরফিয়ার ঘুমে কতকগুলো স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে থাকে মুখে। অভিজ্ঞ ডাক্তার একবার দেখলেই তা টের পান। ঘরে অত কাণ্ড হল, অথচ জয়ন্ত জাগছে না—এতেই তো ডাক্তারের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আর আরাধনাকে বাথরুমে ঢোকানোর কারণ আরাধনাকে সরাসরি খুনী না করে খুনের হুকুমদাত্রী প্রতিপন্ন করা। ওঁরা ভেবেছিলেন যদি আদালত অবিশ্বাস করে বসে যে আরাধনার মতো বাইশ-তেইশ বছরের অমন মেয়ের পক্ষে শক্তিমান এক পুরুষের মুণ্ডুটা স্রেফ এস্পার ওস্পার করা অসম্ভব!

তাই নয় কি? কাজেই সে লোক দিয়ে খুন করিয়েছে এবং যেন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বাথরুমে ঢুকে ওই লোকের সাহায্যে দরজা লক করিয়েছে। বেডরুমে স্বামী খুনের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের তো এমনি অবস্থাই হয়—হয় বেঁধে রাখে খুনীরা, নয়তো পাশের ঘরে আটকে রাখে। ডাক্তার ও সুচেতা এই চিরাচরিত প্রথা প্রয়োগ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ওইসব কেসে যেমন হয়ে থাকে, এখানেও তাই ঘটেছে অর্থাৎ স্ত্রীই খুন করিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে এই কৌশল নিয়েছে।

মিঃ সাক্সেনা বললেন—আপনি দেখছি, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন। চমৎকার যুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু সকালে আবার সুচেতা বাংলোয় গেলেন কেন?

—হত্যাকারীর মনস্তত্ত্ব। হত্যার জায়গায় আবার যাওয়ার এক প্রচণ্ড টান থাকে। অবশ্য উনি জানালায় টোকা দিয়ে টের পেতে চেয়েছিলেন যে ঘরের ঘুমন্ত লোকটি জেগেছে নাকি। ভাগ্যিস জয়ন্ত আমার পরামর্শে সাবধান ছিল। জানলা খোলেনি। তাহলে পিস্তলের গুলিতে বেচারা...

আবার আঁতকে উঠে বলুম—যথেষ্ট হয়েছে কর্নেল! বাপস্।

কর্নেল নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন—হ্যাঁ। সুচেতা জয়ন্তকে সাবাড় করতেই গিয়েছিল। পেল না, তাই।

আর ঘরে থাকতে পারলুম না। বেরিয়ে এসে রোদে উজ্জ্বল সুদৃশ্য লনে দাঁড়ালুম। হাল্কা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল। বিশাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সামনে মনে মনে নতজানু হয়ে বললুম—প্রকৃতি আমাদের ক্ষমা কোরো।

ম্যাকবেথের ডাইনীরা

সেদিন আতঙ্কটা কাটতে বেশ সময় লাগল। কিন্তু আমার মুখে তার ছাপটা যেন লেগে ছিল। তাই রাতে যখন ফরেস্ট বাংলোয় দুজনে মুখোমুখি বসে আছি, কর্নেল হঠাৎ বললেন জয়ন্ত, তোমার কষ্টটা বেশ টের পাচ্ছি।

বললুম—কষ্ট? কিসের কষ্ট?

কর্নেল হাসলেন।—লুকিও না জয়ন্ত। কষ্ট নয়? এলে মনের সুখে বেড়াতে, আর পড়ে গেলে খুনোখুনির মধ্যে। দেখ ডার্লিং, আমার কপালের সংসর্গদোষ এটা। তবে আই অ্যাসিওর ইউ, আর কিছু ঘটবে না।

—ঘটবে না তার গ্যারান্টিও নেই।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে আবার হাসতে হাসতে বললেন—তা নেই। তবে

আমারও জায়গাটা আর ভাল লাগছে না। তেতো মনে হচ্ছে। এটা প্রতিবার কিন্তু হয়—ফ্রাঙ্কলি বলছি জয়ন্ত। খুনের ঝামেলা চুকে গেলেও অনেকদিন মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই বলছিলুম।

উনি থামলেন দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। বললুম—কলকাতা ফিরতে এখনই রাজি আছি।

হাত তুললেন কর্নেল। —না। ফিরে গেলে তো আরও খারাপ লাগবে। তার চেয়ে, বরং অন্য কোথাও যাওয়া যাক্।

—বেশ তো। চলুন, কোথায় যাবেন।

একটু ভেবে নিয়ে কর্নেল বললেন—বরমডিহির নাম শুনেছ?

—শুনেছি।

—বিহারে ছোটনাগপুর এলাকায় এত ভালো জায়গা আর নেই। চলো। কাল সকালে আমরা রওনা হই।

খুব ভালো লাগল প্রস্তাবটা। কিন্তু শুয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলুম। সেখানে গিয়েও আবার কোনো খুনোখুনিতে পড়ব না তো?

কর্নেলের মনে কি কোনো অলৌকিক শক্তি আছে? হঠাৎ সেই সময় ওঁর নাক ডাকা থেমে গেল। তারপর শুনলুম—ভারী গলায় উনি বলছেন—ডার্লিং জয়ন্ত, কথা হচ্ছে—মানে, আই অ্যাসিওর ইউ—যদি বরমডিহিতে দৈবাৎ কোনো কাণ্ড ঘটে, আমরা তাতে জড়াবো না। আশা করি, তেমন কিছু ঘটবেও না।

কোনো জবাব দিলুম না। কোনো গ্যারান্টিও তো নেই।

কর্নেল যা বলেছিলেন, তা সত্যি। কোথাও বেড়াতে যেতে হলে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী এলাকায় বরমডিহির মতন ভালো জায়গা খুব কমই আছে। চারদিকে ছড়ানো হিলক শ্রেণীর পাহাড়, মাঝখানে এই সবুজ উপত্যকা ঘিরে বয়ে যাচ্ছে সুন্দর সোনালি বালির এক নদী—যার স্থানীয় নাম মেনখা বা মেনকা। আমার বন্ধুটির বয়স ষাটের ওধারে। তবু দেখেছি ভোর পাঁচটায় উঠে মাঠ থেকে দাড়ি ও টুপিতে প্রচুর শিশির নিয়ে ঘোরেন। এখন অবশ্য শরৎকাল। হরগৌরী হোটেলের দোতালার ব্যালকনিতে পাহাড় পেরিয়ে লালচে রোদ এসে পড়ার অনেক আগে বেরিয়ে যান এবং ফেরেন যখন, তখনও আমি ঘুমোচ্ছি দেখে পাছে জেগে যাই, হালকা পায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বনজ নানান খুঁটিনাটি জিনিস যেমন মাকড়সার জাল, ঘাসের কুটো, পাখির গু ইত্যাদি পরিষ্কার করতে থাকেন। তাঁর ভদ্রতাবোধের তুলনা নেই। তেমনি রসবোধও চূড়ান্ত। এবং তিনিই জানেন যে আমি তখন শুয়ে চোখের ফাঁকে তাঁর দুর্দশার ব্যাপারগুলো দেখে মুখ টিপে হাসছি, এবং তাঁর বাইনাকুলারের ব্যর্থতা-সফলতার শতাংশ কষছি,

এবং তাঁর জাদুকার ক্যামেরার অন্ধকার ঘরে কতগুলো খেচর প্রাণী উল্টোভাবে অবস্থান করছে জানতে উৎসুকও হয়েছি।

কারণ, আমার দিকে না ঘুরেই উনি মৃদু ও মিঠে গলায় বলতে থাকেন— হয়ে, জয়ন্ত ডার্লিং, আশা করি আজ তোমাকে সেই দুর্লভ প্রজাতির উডডাকের ছবি দেখাতে পারব, এবং কিছু লাল হিমালয়ান মিনিভেটেরও। অবশ্য বিহারের এই গরম জায়গায় এখন ওদের এসে পড়াটা রহস্যময়। তবে মাইডিয়ার ইয়ং ম্যান, এবার বরমডিহিতে তার চেয়ে রহস্যময় ব্যাপার আমি সম্প্রতি দেখছি।

আমি চোখ বুজে ফেলি। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মুখে রহস্য শব্দের পৃথক তাৎপর্য আছে এবং আমার উদাসীনতা টের পেলে উনি আরও স্নেহকাতর হয়ে পড়বেন, জানি। ফলে আরো খানিকটা আভাস দেবেন।

ঠিক তাই। উনি একটু কেসে এবং দরজার দিকে সরে গিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে বলেন, 'ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর কথা তোমার মনে পড়ছে জয়ন্ত? এইরকম একটা পাহাড়তলির মাঠে, ধরো, গতকাল সন্ধ্যায় এসে যদি বলাবলি করত হোয়েন শ্যাল উই মিট এগেন, থানডার লাইটিং অর ইন রেন...এবং ঠিক তখনই আমি কাছাকাছি গিয়ে পড়লে...

এবার থাকা যায় না। বলে উঠি—'কর্নেল তাহলে বরমডিহির ভূত সত্যি দেখলেন?

'বাছা জয়ন্ত,' বলে মাথা দোলান উনি।...'এই হরগৌরী হোটেলের মালিক পশুপতিবাবু তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছেন। ভূত এখানে কোথায়? সে ছিল নাইনটিন ফোরটি টুতে বার্মার জঙ্গলে। সেভেনটিনথ চীনাবাহিনীর অধিনায়ক মার্কিন জেনারেল স্টিলওয়েলের সঙ্গে তখন পালাচ্ছি চিনডুইনের দিকে, জাপানের ফোরটিনথ ডিভিসান তাড়া করেছে।'

গতিক দেখে চেঁচিয়ে উঠি—'কর্নেল, কর্নেল! প্লিজ!' আসলে বার্মা ফ্রন্টের যুদ্ধ সম্পর্কে ওঁর নস্টালজিয়া প্রচুর থাকলেও এভাবে আমাকে খেল্যাতে মজা পাচ্ছেন, জানি। তাই মূল কথার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। আমি ব্যাকুলভাবে বলি, 'ম্যাকবেথের ডাইনীদের কথা বলুন!'

কর্নেল সরে এসে আমার বিছানার কাছে চেয়ারটায় বসে পড়েন। একটু হাসেন। 'খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সামনে সব ব্যাপার আলোচনা করতে বরাবর আমি ভয় পাই, বাছা জয়ন্ত! দোহাই তোমার, তিলকে তাল করে ফেলো না!'

বলি—'পাগল না মাথাখারাপ? আমি তো এখানে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে আসিনি! আপনার সঙ্গে নিছক বেড়াতে এসেছি। আই অ্যাসিওর। এখন, সেই ডাইনীদের কথা বলুন।'

'ডাইনীদের চেয়েও একটা ভয়ানক ব্যাপার এখন এই হোটেলেই ঘটেছে, বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কিছুই টের পাওনি এখনও। সেটা আরও রহস্যময়।'

এবার উঠে বসি।—'কী? কী হয়েছে বলুন তো?'

কর্নেল খুব শান্তভাবে বলেন—'গত রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হল বজ্রবিদ্যুৎসহ। আশ্চর্য জয়ন্ত, আশ্চর্য! ডাইনীরা যা বলেছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফলে গেল। শুধু ভুলটা আমারই—বেরিয়ে গিয়ে একবারও দেখে এলুম না কী ঘটছিল। আসলে ওদের কথা মনেই ছিল না।'

বিরক্ত হয়ে বলি—'কিন্তু হলটা কী?'

'মার্ডার। খুন।' নিষ্পলক তাকিয়ে জবাব দেন উনি।

—'আবার খুন! কোথায় খুন হল? কে খুন হল? এই হোটেলে?' পায়ে চটি গলিয়ে উঠে দাঁড়াই। হা ঈশ্বর! আবার খুনের পাল্লায় পড়লুম!

হাত তুলে উনি বলেন—'বাছা জয়ন্ত, একটু ধৈর্য ধরো। পশুপতিবাবু পুলিশকর্তাদের নিয়ে ব্যস্ত এখন। তবে শিগগিরই এসে পড়বেন ওপরে। আমাকে ওঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস। আর ইয়ে—তোমাকেও অফিসাররা কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। যা জানো বলবে। কিন্তু...আশ্চর্য জয়ন্ত, সত্যি এ বড় আশ্চর্য!'

ওঁর অদ্ভুত আচরণে রাগ হল।...'কর্নেল, আসছি।' বলে দরজার দিকে এগোই।

উনি চাপা হেসে ওঠেন। হাসিটা কেন যেন যান্ত্রিক মনে হয়।...

হরগৌরী হোটেল একটা টিলার ওপর। ঘুরে-ঘুরে নিচের বড় রাস্তা থেকে একফালি প্রাইভেট রাস্তা এসে সমতল বিশাল লনে উঠেছে। হোটেলের দুটো ভাগ। একটা উত্তরে অন্যটা দক্ষিণে। পূর্বে গেট, মাঝখানে সুদৃশ্য লন ও বর্ণাঢ্য পুষ্পসমাবেশ, পশ্চিমে একতলা টানা ডাইনিং হল, স্টোর ও কিচেন দুটো দালানকে যুক্ত করেছে। বরমডিহির সবচেয়ে অভিজাত হোটেল এটি এবং প্রবাসী বাঙালির সম্পত্তি।

নিচে নেমে দেখি লাল টুপিপরা কনস্টেবলের ভিড়, পুলিশের গাড়ি, ফিতে ধরে মাপজোক চলেছে দক্ষিণের বাড়িটায়। একতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোনার ঘরটায় তাহলে সত্যি কেউ খুন হয়েছে রাতারাতি।

আমরা আছি উত্তরের বাড়িতে। কিন্তু দোতলায় ব্যালকনি থেকে কিছু দেখতে না পাবার কারণ লনের একসার ইউক্যালিপটাস গাছ। তাছাড়া কোনো শব্দও ওবাড়ি থেকে এলে শোনা কঠিন, প্রাঙ্গণের মাপ সোজাসুজি অন্তত পঞ্চাশ গজ এবং প্রচণ্ড জোরে পূর্বের বাতাস বইছে।

লনের ইউক্যালিপটাস সারি পেরিয়ে যেতেই এক ভোজপুরী পালোয়ান পুলিশ আপত্তিকরভাবে লাঠি তুলে গর্জায়—'মাৎ যাইয়ে উধার। যানেকা মানা হ্যায়

ভ্যানিটিতে লাগল। কিন্তু পকেটে পরিচিতিপত্র নেই আমার কাগজের! এ ব্যাটা রিপোর্টার কী মাল বুঝবে বলে মনে হয় না। ডাইনে তাকাই। ডাইনিং

নটা পর্যন্ত কর্ডন করে রেখেছে। তখন বিনীতভাবে ভোজপুরীটিকে প্রশ্ন করি—'ক্যা হুয়া স্যার?'

স্যার শুনেও শালা গলল না। খৈনি ডলতে ডলতে ঘড়ঘড় করে কিছু বলে। তখন অগত্যা ফিরে আসি সিঁড়ির দিকে। আশ্চর্য, উত্তরের ব্লকের আবাসিকরা সবাই রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য—সম্ভবত ঘর ছেড়ে নড়েনি। কোনো বেয়ারার পাত্তা নেই। ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবার কথা যে বনমালীর, তাকে বারকতক ডাকাডাকি করে ফিরে আসি ঘরে।

কর্নেল তখনও একইভাবে বসে আছেন। আমাকে দেখে হেসে বলেন,—তোমাকে বলা উচিত ছিল জয়ন্ত, বরমডিহি পুলিশ খবরের কাগজ পড়ে না। এস, এস। মুখটুখ ধুয়ে ফেলো বরং। তারপর দুজনে বাইরে কোথাও গিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে ফেলব। এঁরা আজ অরন্ধন ব্রত পালন করবেন মনে হচ্ছে।'

ততক্ষণে আমার সব মনে পড়ে গেছে। দক্ষিণের ব্লকের নিচের তলায় পূর্ব-দক্ষিণের ঘরে চারটি মেয়েকে থাকতে দেখেছিলুম না! আমাদের আসার আগেই ওরা এসেছিল। চারটি হাসিখুশি স্মার্ট কলকাতার মেয়ে। কর্নেল বুড়ো তো সবার সঙ্গেই আলাপ জমাতে ওস্তাদ। তাঁর কাছেই শুনেছিলুম, ওরা এক বিখ্যাত সওদাগর কোম্পানির স্টেনো কেরানি রিসেপসনিস্ট পি এ বাহিনী। ছুটি নিয়ে বরমডিহির রূপসুধা-টুধা পান করতে এসেছে। হায় তৃষ্ণার্ত সব ঠোঁট এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা!

কিন্তু সেই চারটির মধ্যেই কি কোনোটি গেল? মোটাসোটা গোলগাল বেঁটে শ্যামলা রঙের সেই চঞ্চলা নাকি হাল্কা ছিপছিপে নিটোল ইরানি জাদুকরীটি কিংবা পুরুষ-পুরুষ একটু গম্ভীর একটা পুরু ঠোঁট গুরুনিতম্বিনী, অথবা সেই খিলখিল হাসি মিষ্টিমুখ মেমসায়েব?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বলেন—'আমি যুবক নই তোমার মতো। কিন্তু জয়ন্ত, এই হত্যাকাণ্ড আমাকে অন্য একটা দিক থেকে বিচলিত করেছে। সৌন্দর্য যখন আতঙ্কের ছায়ায় ঢাকা পড়ে, তখনকার মতো বীভৎস দৃশ্য কিছু থাকতে নেই। খুব ভয় পাওয়া সুন্দর মানুষকে লক্ষ্য করেছ কি কখনও? এক্ষেত্রে সেই বীভৎসতার পরিচয় তুমি পাবে। ঈশ্বর রক্ষা করুন আমাকে—আর ওই দৃশ্য দেখতে চাইনে। কিন্তু শ্রীমতী চিত্রিতার লাশ দেখেও কীভাবে যে এখনও নার্ভ ঠিক রেখে কথা বলছি বা শান্ত আচরণ করছি, আমি জানি না। সত্যি বল তো জয়ন্ত, কেন আমি একটুও উত্তেজিত হচ্ছি না? আমি কর্নেল সরকার—ওরা বলে, রহস্যজগতের মুকুটহীন সম্রাট, সব বাজে কথা জয়ন্ত! সব চালাকি আর তোষামুদি! নিছক ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র। কারণ, আমি একটু আগে যা দেখে এসেছি, তাতে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। কেমনভাবে এটা সম্ভব হল? হাউ দ্যাট হ্যাপন্‌ড্‌?'

'প্রথমে বলুন—কোন মেয়েটি খুন হয়েছে?'

'তুমি যাকে কিম্পুরুষ বলে আড়ালে ঠাট্টা করেছিলে সেদিন।'

'কী আশ্চর্য! তাকে কে খুন করল? ওর বন্ধুরাই নয় তো?'

'আশ্চর্যের কারণ অন্যখানে। চিত্রিতার লাশটা তার খাটে বেঁকে-দুমড়ে পড়ে রয়েছে। বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ফুলে ঢোল, একটা সূক্ষ্ম দু'সেন্টিমিটার চেরা দাগ আছে নখের গোড়ায়। চোখের তারা ফেটে বেরিয়ে রয়েছে। জিভ দাঁতের চাপে কেটে গেছে। দেখলে মনে হয়, গলা টিপে খুন করা হয়েছে ওকে। অথচ ফরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ মহাপাত্র—উনিও দৈবাৎ এখানে বেড়াতে এসেছেন, বলেছেন—গলায় কোনরকম দাগ নেই। এক হতে পারে আচমকা কিছু দেখেটেখে ভয় পেয়ে মারা পড়েছে। দুই—বিষাক্ত কিছু ইনজেকশান করা হয়েছে। যেহেতু অন্য কোথাও সিরিঞ্জের ছুঁচের দাগ দেখা যাচ্ছে না, ডঃ মহাপাত্রের ধারণা, কড়ে আঙুলের ওই দাগটা সম্ভবত ইনজেকশানের চিহ্ন। কিন্তু তাতেও কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না উনি। দাগটা ওভাবে চেরা হল কেন? ছুঁচের দাগ তো গোল হবে!'

'চিত্রিতার তিন বন্ধু কী বলছে? তারা তো একই ঘরে ছিল।'

'সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। রুমটা ডরমিটরি চারসিটের। আগামী পরশু অব্দি বুক করেছিল ওরা। অথচ গতরাত্রে ঝড়বৃষ্টির ঠিক এক ঘণ্টা আগে মানে রাত আটটা নাগাদ সন্ধ্যা, শ্রীলেখা আর বেবি ওফফে সেলিনা হঠাৎ চেক-আউট করে চলে যায়। বেয়ারা বা বয়দের মতে, গতকাল কী নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল। যাবার আগেও নাকি তিনজনে খুব শাসিয়ে যায় চিত্রিতাকে দেখে নেবে বলে। ঘনশ্যাম নামে বয়টা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছে বলছে।'

'তাহলে ওদের তিনজনকেই পুলিশ গ্রেফতার করবে।'

'একজ্যাক্টলি। সম্ভবত হাওড়া স্টেশনেই ওদের ধরে ফেলবে পুলিশ। কারণ রেডিওবার্তা চলে গেছে যথারীতি। গাড়ি হাওড়া পৌঁছচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। কিন্তু...'

'কিন্তু কী কর্নেল?'

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুটি হতাশভাবে মাথা দোলালেন।...'কিন্তু মার্ডার উইপন বা যা দিয়ে খুন করা হয়েছে, তা কী হতে পারে? জয়ন্ত, আমি যুক্তিবাদী মানুষ। ভূতপ্রেত তন্ত্রমন্ত্র ডাইনী এসবে আমার একতিল বিশ্বাস নেই। কিন্তু ফরেন্সিক পরীক্ষায় যদি মার্ডার উইপেনটা কী ছিল, বের না করা সম্ভব হয়, তাহলে কি আমাকে ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাস করতে হবে?'

'কর্নেল, কর্নেল! আপনি তখন ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর কথা বলছিলেন!'

'হ্যাঁ! সেটাই অদ্ভুত ব্যাপার, জয়ন্ত। গতকাল সন্ধ্যায় যখন আমি তোমাকে বিদায় দিয়ে নদীর ওপারে গেলুম, তখন ব্যাপারটা দেখি। ওই ক্যামেরাটা জীবজন্তুদের পায়ে চলার পথের পাশে একটা গাছে ফিক্সড রেখে শাটারের সঙ্গে কয়েক রিল সুতো টান টান করে পথের ওপর বিছিয়ে রেখেছিলুম। উদ্দেশ্য

স্পষ্ট। কোনো জানোয়ার ওপথে এলেই তার পায়ে লেগে সুতোয় টান পড়বে, অমনি শাটার তার কাজ করবে অর্থাৎ তার ছবি উঠি যাবে ফিল্মে। পদ্ধতিটা অটোমেটিক। একবার শাটার টেপা হলেই ফিল্ম গুটিয়ে যাবে, নতুন ফিল্ম আসবে লেন্সের সামনে। দৈবাৎ সুতো ছিঁড়ে না গেলে এভাবে অনেকবার অনেক জন্তুর ছবি তোলা সম্ভব। তবে মজার কথা, ক্যামেরাটা অদ্ভুত। এতে প্যারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা আছে। এর ইলেকট্রনিক সিসটেম অন্ধকারেও ছবি তুলতে পটু। আলো ছাড়া ছবি হয় না। কিন্তু আলোর মাত্রা আছে জয়ন্ত। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুসারে তার দৃশ্যতা অদৃশ্যতার ব্যাপার আছে। আমাদের জীবচক্ষে অনেক আলোক দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু...'

বাধা দিই।...'প্লিজ, প্লিজ! ম্যাকবেথের ডাইনী!'

'হুম্। ক্যামেরা তৈরি রেখে ফিরে আসছিলুম। নদীর চড়ায় কাশঝোপ আছে দেখেছ। একটা কাশঝোপের আড়াল থেকে কাদের চাপা কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। থমকে দাঁড়ালুম। আমার টর্চের আলো ওরা দেখতে পায়নি—কারণ পাড়ের ঝোপ থেকে নিচে চরে নামা অব্দি আলো পায়ের কাছে ফেলছিলুম। ওদিকটায় নাকি হ্যামাড্রায়াড সাপের রাজত্ব। তো—থমকে দাঁড়াতেই টের পেলুম ওরা কারা। চাপা গলায় ওরা কথা বলছিল। ইতিমধ্যে সাদা বালির চরে তারার আলো পড়ে চকচক করছে, আর ততক্ষণে আমার চোখে দৃষ্টিও অন্ধকারে দিব্যি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—দেখলুম ডরমিটরির সেই মেয়েরা তিনজন। ওরা একটা কিছু পরামর্শ করছে মনে হল। তারপর ওরা হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়েই ঝড়বৃষ্টির কথা তুলল। একজন বলল—ঠিক এখানেই। হ্যাঁ এখানেই। তারপর তিনজনে চলতে থাকল। একটু পরেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওদের হারিয়ে ফেললুম। কিন্তু তখন ম্যাকবেথের ডাইনীদের কথা মনে পড়ে গেছে আমার। হোয়েন শ্যাল উই মিট এগেন—থানডার লাইটনিং অর ইন রেন? অদ্ভুত জয়ন্ত, অদ্ভুত!'

আমার ধারণা ছিল, কর্নেল সরকার খুনের গন্ধ পেলেই তো হামলে পড়েন, কাজেই যাঃ, আমাকে একজন চমৎকার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হারিয়ে একা ঘুরতে হবে! কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, উনি পুলিশের ওদিকে পা বাড়ালেন না।

বাইরে গিয়ে একটা ওয়েসাইড আমব্রেলা কাফেতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলুম। তারপর বেলা একটা অব্দি পাহাড় বনবাদাড় চষে বেড়ালুম। পাতালেশ্বরীর ভূর্গভস্থ মন্দির, আদিবাসী রাজা পিনচা আকসুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, পবিত্র ঝরনা, বাবা মুক্তকচ্ছানন্দের আশ্রম, অনেক কিছু দেখা হল। আমার বৃদ্ধ বন্ধু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে তাঁর সাম্প্রতিক হবি ওরিনথোলজি বা পক্ষীতত্ত্ব নিয়েও ওই ক'ঘণ্টা যা বকবক করলেন, তাতে তাঁর পল্লব-গ্রাহীতায় তাক লেগে গেল। বলাবাহুল্য, তার ফাঁকে বাইনাকুলার ও ক্যামেরার কাজও তিনি টুকটাক সেরে গেলেন। অবশেষে আমরা গেলুম মেনকা

নদীর চরে। মাথার ওপর জোরালো সূর্য থাকায় চড়ার বালিতে অদৃশ্য ধোঁয়া টের পাচ্ছিলুম! কিন্তু উনি দমলেন না। কাশঝোপগুলোর পাশে হঠাৎ বিভ্রান্তের মতন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকলেন, গতিক দেখে কিনারায় একটা হলুদ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। এক জায়গা থেকে ওঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'জয়ন্ত, কুইক।'

ওঁকে কয়েক মিনিটের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলুম। ডাক শুনে এগিয়ে দেখি, খড়খড়ে একটা কাশঝোপের বৃত্ত যেখানে, হাঁটু গেড়ে উনি সেখানে কিছু দেখছেন। আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত এবং ক্লান্ত। উঁকি মেরে বললুম—'বুঝেছি! হাড়ে গোয়েন্দাগিরির পোকা গিজগিজ করছে যার, তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখিত—খুবই দুঃখিত স্যার। এ সব আর রোদে পোষাবে না আমার। আমি চললুম। হে প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ, অ রিভোয়া!'

'জয়ন্ত, জয়ন্ত। এক মিনিট। এই সেই তিন ডাইনির রেঁদেভু।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আপনি কী ক্লু পেতে চান এখানে?'

'বিরক্ত হয়ো না, ডার্লিং! প্লিজ! দেখে যাও, সামথিং ইজ রেকর্ডেড হেয়ার।'

'কাল রাতে প্রচণ্ড ঝড়জল হয়ে গেছে কর্নেল, মাইন্ড দ্যাট।'

'সেটাই তো একটা ফ্যাক্টর। ঝড়জলের আগে যারা এখানে এসে কিছু জল্পনা করছিল, তাদের পায়ের দাগ আমি মোটেও খুঁজিনি। ঝড়জলের পরে কেউ এসেছিল নাকি, তাই দেখছি। এবং জয়ন্ত, পশ্য পশ্য, হাউ নেচার রেকর্ডস দা হিউম্যান অ্যাকটিভিটিজ!'

'হুঁ কর্নেল, জুতোর ছাপ মনে হচ্ছে।'

'দ্যাটস রাইট। ছাপগুলো লক্ষ্য করো। একই সাইজের একই রকম নকশা। তার মানে একজনই এসেছিল। বৃষ্টি থামে রাত একটা নাগাদ। সকালে রোদ পড়ার আগেই এখানকার মাটি যা শোষক, সবটুকু সিক্ততা উবে যেতে বাধ্য। কাজেই, আমরা সিদ্ধান্ত রাত একটা থেকে ভোর ছটার মধ্যে কোনো এক সময় কেউ এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেন?'

আমি কোনো কথা বললুম না। রোদ অসহ্য লাগছিল। কর্নেল নিজের মনেই ফের বলতে থাকলেন—'ডঃ মহাপাত্রের ধারণা, উনি একজন ডাক্তারও বটে, চিত্রিতার মৃত্যু হয়েছে ঝড়জল যখন চলছিল, তখন। অর্থাৎ রাত এগারটা থেকে একটার মধ্যে। তাহলে...'

এবার বলে উঠলুম—'তাহলে তিন ডাইনির পক্ষে চিত্রিতাকে হত্যা করা তো অসম্ভব। কারণ, ওদের গাড়ি বরমডিহি স্টেশন ছেড়ে যাবার কথা রাত নটায়। পুলিশ ওদের কচুও করতে পারবে না দেখবেন।'

গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন গোয়েন্দাপ্রবর। টুপি খুলে সস্নেহে টাককে কয়েক সেকেন্ড বায়ু সেবন করিয়ে তারপর বললেন—'পুলিশের ধারণা, চিত্রিতাকে

ওরা বিষ খাইয়ে মারার ব্যবস্থাটা আগেই সেরে গিয়েছিল। কিন্তু ডঃ মহাপাত্র বলছেন—বিষটা দিল কিসে? রাতে খায়নি চিত্রিতা। ক্রিন বারণ করা ছিল। বিকেল থেকে সে বেরোয়নি, ঘরেই সারাক্ষণ ছিল—এ হচ্ছে হোটেলের বয়দের সাক্ষ্য। এখন রইল তরল কিছু আহার্য—অর্থাৎ জল, চা বা কফি। চা-কফি হোটেল থেকে সরাসরি দেওয়া হয়। বাকি রইল জল। গ্লাসের জল পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে। তবে ডঃ মহাপাত্রের মতে—জলটা চমৎকারই আছে। কোনো রঙবদল ঘটেনি। আপাতদৃষ্টে বিশুদ্ধ। অবশ্য পরীক্ষার ফলাফলে কী বেরোয় কে জানে! কিন্তু জয়ন্ত, কড়ে আঙুলের ব্যাপারটা তাহলে কী?'

'কর্নেল, চললুম! জ্বলে যাচ্ছি একেবারে।'

চিন্তিত মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ এগোলেন।

আমরা একটা মাদ্রাজি হোটেলে খাওয়া সেরে হরগৌরীতে ফিরলুম, তখন আড়াইটে। ফিরে দুজনে স্নানটা সেরে নিলুম। তারপর আমি শুয়ে পড়লুম। দেখলুম, কর্নেল বাথরুমে ঢুকলেন ক্যামেরা আর ওয়াশ-ডেভালাপ করার সরঞ্জাম নিয়ে। ওটাই তিনি ডার্করুম করে ফেলেছেন অদ্ভুত ওঁর কাজকারবার!

সেদিন রাতেই হরগৌরী আবার সচল হয়ে উঠল। কর্নেল তাঁর অভ্যাস মতো জঙ্গলে ক্যামেরা পেতে রেখে এসেছেন, ঘুমিয়ে ছিলুম বলে আজও ডাকেননি আমাকে। ডিনার খেতে ডাইনিং হলে গিয়েছিলুম। দেখলুম, প্রত্যেকটি মুখে উদ্বেগের ছাপ রয়েছে। দক্ষিণের ব্লক থেকে অনেকেই কেটে পড়েছে। নিচের পূর্ব-দক্ষিণ কোনার ডরমিটরির দরজায় তালা এঁটে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আমরা দুজনে অন্যদের মতো ফিসফিস করে আলাপ করছিলুম। বিষয় ঃ পশুপতিবাবু। হোটেলের একটা বদনাম হল। বেচারা ঘাবড়ে গেছেন।

খেয়ে আমরা লনে নামলুন। আজ রাতটা পরিষ্কার। আকাশে তাজা নক্ষত্র ঝকমক করছে। সেই সময় পশুপতিবাবু এলেন।...'কর্নেল সরকার, ক্ষমা চাইতে এলুম।'

কর্নেল ওঁর একটা হাত নিয়ে বললেন—'কেন, কেন? ক্ষমা চাওয়ার কী আছে?'

'খুব অসুবিধে হল আপনার। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি তাবৎ লোকজন আপসেট হয়ে পড়েছিল। বুঝতেই পারছেন, ওদের সব হাজারটা কুসংস্কার!'

'কুসংস্কার!' কর্নেল একটু চমকালেন যেন।

'বছর দুই আগে অবিকল একইভাবে একজন মারা যায় ও-ঘরে।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ স্যার! এক মাদ্রাজি ব্যবসায়ী এসে ও-ঘরে উঠেছিলেন। তখন ডরমিটরি ব্যবস্থা ছিল না। ডবলবেড রুমই ছিল ওটা। ভদ্রলোক সিঙ্গলরুম নেননি। কারণ,

পরদিন ওঁর পার্টনার আসার কথা ছিল নাকি। যাই হোক, ভুতুড়ে ঘর বলে বদনাম রটল। তখন ওটা ডরমিটরি করে ফেললুম।'

'একই সিম্পটম মৃতদেহে ছিল?'

'আজ্ঞে। তবে এঁর কড়ে আঙুলটা ফোলা, ওঁর ছিল চিবুকটা ব্লাডারের মতন ফোলা।'

'পুলিশকে আপনি বলেছেন একথা?'

'বলেছি। পুলিশ ওসবে পাত্তা দিল না। ডঃ মহাপাত্র অবশ্য আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু শেষে বললেন—নেহাত কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে। কিন্তু...' হঠাৎ চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। আবহাওয়া এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আমার কেমন খটকা লাগল।......

কর্নেলকে সে-রাত্রে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে টের পেলুম, উনি ব্যালকনিতে পায়চারি করছেন আর অভ্যাসমতো চুরুট টানছেন।

আমার ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে সাতটায়। বেড-টি খাওয়ার পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি গোয়েন্দামহোদয় ফিরেছেন এবং যথারীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাকড়সার জাল, ঝুল ইত্যাদি জিনিস গভীর নিষ্ঠায় ব্রাশ দিয়ে সাফ করছেন।

মুখ না ঘুরিয়ে উনি বলেন, 'জয়ন্ত, আশা করি চমৎকার ঘুমিয়েছ।'

'চমৎকার! কিন্তু আপনার সম্ভবত বড্ড একটা খারাপ রাত্রি গেছে।'

'দ্যাটস রাইট, ডার্লিং।'

'কেন কর্নেল?'

'পশুপতিবাবু কী একটা চেপে গেলেন কাল রাতে—তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে?'

'নাঃ!'

'হ্যাঁ। জাস্ট অ্যান আইডিয়া! মেয়ে চারটির ব্যাপারে মনে হচ্ছে কিছু একটা জানেন। বলবেন ভেবেই আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন—কিন্তু কী ভেবে আর বললেন না।'

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর আমি ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। কর্নেল ঢুকলেন তাঁর ডার্করুমে। ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ ওঁর চাপা উত্তেজনাসঙ্কুল কণ্ঠস্বর শুনলাম—'জয়ন্ত, জয়ন্ত, ডার্লিং!'

উঠে গেলুম। দেখি ওঁর হাতে সদ্য ওয়াশকরা একটা ছবির প্রিন্ট। ছবিটা দেখেই চমকে উঠলুম। 'আরে এ যে দেখছি পশুপতিবাবু! আশ্চর্য! জায়গাটা সেই নদীর চড়ার কাশবন না? ওখানে কী করছেন ভদ্রলোক?'

কর্নেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন—'ক্যামেরাটা আজ কাশবনের দশমিটার দূরে হলুদ গাছটায় রেখেছিলুম। কিন্তু, কী হরিবল দৃশ্য! হাতে টর্চ...পশুপতিবাবু।'

বলেই আবার উনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন এবং দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি হাঁ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফের

ব্যালকনিতে চলে গেলুম। প্রকৃতি ছাড়া মানুষের এমোশান আর কেই বা প্রশমিত করতে পারে?......

আজ বড্ড একা হয়ে গিয়েছিলুম। গোয়েন্দামহোদয় ফের একা বেরিয়েছিলেন। আমাকে ডেকে যাননি বলে অভিমানে চুপচাপ শুয়েছিলুম। তো উনি ফিরলেন একবারে লাঞ্চের সময়। আমরা দুজনেই নিজ নিজ কারণে গম্ভীর। ডাইনিং হলে পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনিও দেখলুম, বেজায় গম্ভীর।

বিয়ারের গ্লাস শেষ করে হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন—'হ্যালো ডঃ মহাপাত্র! আরে মিঃ প্রসাদ যে! হ্যালো হ্যালো হ্যালো!'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বড় দরজায় জনা তিনচার পুলিশ অফিসার আর ধূসর স্যুটপরা লম্বা-চওড়া সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কর্নেলের দিকে সমবেত ভঙ্গিতে বাও করছেন।

আমার পরিচয় করিয়েও দিলেন কর্নেল। তার-পর আমরা বেরোলুম। দলটা এগোল সেই অকুস্থলের দিকে। প্রৌঢ় গুঁফো পুলিশ সুপার মিঃ প্রসাদকে দেখলুম কর্নেল সাহেবকে প্রচণ্ড সমীহ করে চলেছেন। হঠাৎ এই সদলবলে বকেয়া অভিযানের পিছনে কি আমার ধুরন্ধর সঙ্গীটির হাত আছে?

ডরমিটরির ভেতর ঢুকলুম আমরা। চার কোনায় চারটে সিঙ্গল খাট, চারটে টেবিল, একটা ড্রেসিং টেবিল, আর পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে একটা বিশাল চমৎকার সাদা নকশাকাটা ফুলদানি রয়েছে। তাতে মিইয়েপড়া বাসি ফুলের একটা তোড়া রয়েছে। পাতার ঝাঁপি দিয়ে সুন্দর সাজানো হয়েছিল সেটা। এখন মৃত্যুর চাপা গন্ধে তারা ঘর ভরে দিয়েছে। নসিয়ায় আক্রান্ত করার পক্ষে পরিবেশটা খুব উপযুক্ত।

পাশেই যে খাটটা, সেখানেই চিত্রিতার লাশ ছিল। এখন শূন্য পড়ে আছে। কর্নেল চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখার পর সেই খাটের কাছে গেলেন। খুব খুঁটিয়ে কী সব দেখলেন। তারপর ফুলদানিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ওঁর দৃষ্টিতে তীব্র একটা সন্দেহ জ্বলজ্বল করতে দেখলুম।

ডঃ মহাপাত্র বললেন—'এনিথিং অ্যাবসার্ড?'

কর্নেল ঘুরে হাসলেন—কিন্তু কিছু বললেন না। সেখান থেকে সরে আবার ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত হলেন কিছুক্ষণ। আবার ফুলদানিটার কাছে গেলেন। ওঁর চোখে এবার একটা সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ডঃ মহাপাত্র এবার সকৌতুকে বললেন—'কর্নেল সরকারের মতে ফুলদানিটা নিশ্চয় একটা চমৎকার অ্যান্টিক দ্রব্য!'

মিঃ প্রসাদ মন্তব্য করলেন—'মনে হচ্ছে জাপানি ফুলদানি!'

এর ফলে পশুপতিবাবু ফুলদানির ইতিহাস শোনাতে শুরু করলেন। কর্নেলের তাতে কান আছে মনে হল না। তিনি হাঁটু দুমড়ে চিত্রিতার খাটের নিচে কী

দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—'হুম! এরকম আধখানা ব্লেড দিয়ে মেয়েরা নখ কাটতে পটু।' তারপর পকেট থেকে একটা আতস কাচ বের করে মেঝে দেখতে দেখতে ফের বললেন—'কড়ে আঙুলটাই কি কেটে ফেলেছিল চিত্রিতা? হুম, দ্যাটস রাইট। রক্তের কয়েকটা ক্ষীণ ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। আর নখের কুচিও দেখছি অজস্র।'

এবার উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। হঠাৎ পশুপতিবাবুর মুখোমুখি গিয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন—'ইয়ে, পশুপতিবাবু—আপনি গতরাত্রে এবং আগের রাত্রে ঝড়জলের পর নদীর চড়ায় গিয়েছিলেন কেন?'

ভদ্রলোক আচমকা প্রশ্নে অমনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠলেন—'আ—আ—আংটি খুঁজতে স্যার!'

আমরা সবাই অবাক। কর্নেলের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল।... 'হুম্। তাই বটে। নিশ্চয় পাননি?'

'না—না স্যার।'

মিঃ প্রসাদ বলে উঠলেন—'তাহলে কি ওই তিনজনের জবানবন্দী সত্যি?'

কর্নেল জবাব দিলেন—'নিখাদ সত্যি মিঃ প্রসাদ। আংটিটা শ্রীলেখার—একটা এনগেজমেন্ট রিং। এই নিয়ে ওদের বিবাদ বা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল চিত্রিতার সঙ্গে। চিত্রিতা ওদের ফার্মের পারচেজ অফিসার সুব্রত রুদ্রকে ভালবাসত কিন্তু শ্রীলেখার সঙ্গে সুব্রতের এনগেজমেন্ট হওয়ায় সে মনে নিশ্চয় দুঃখ পেয়েছিল। তবে তার জন্য শ্রীলেখার ক্ষতি করতে সে চায়নি। শুধু দুষ্টুমি করে ওর আঙুল থেকে সম্ভবত ঘুমিয়ে থাকার সময় আংটিটা খুলে নেয় এবং কোথাও লুকিয়ে ফেলে। বোকা মেয়ে চিত্রিতাকেই তিনজনে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে। কিছু বাদানুবাদ হয়েও ছিল। কিন্তু পরশু সন্ধ্যায় নদীর চড়ায় শ্রীলেখা সন্ধ্যা আর বেবি কী পরামর্শ করছিল? বলছিল—এখানে, হ্যাঁ—এখানেই। কী সেই রহস্য?

পশুপতিবাবু ফ্যাঁচ করে হেসে বলে উঠলেন—'সে আমারই পরামর্শে স্যার। বোর্ডারদের ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যেস নেই। কিন্তু ম্যাঞ্জার হলেও ওরা সব মেয়ের বয়সী। তাই নিজে খোঁজখবর নিচ্ছিলুম। তো, ওদের ঝগড়াঝাঁটি শুনে বেমক্কা ব্যাপারটা জিগ্যেস করে বসেছিলুম। ওরা অবশ্য অফেন্ডেড হয়নি। বলল—একটা দামি আংটি হারিয়ে গেছে. তো স্যার, আমি দেখতুম—ওরা আসা-অব্দি নদীর চড়াতেই ঘোরাঘুরি করে বেশি। তাই মাথায় যা এল, বলে দিলুম, বিকেলে নদীর চড়ায় গিয়ে তো আপনারা দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন, তখন হারায়নি তো? শুনেই তিনজনে তক্ষুনি চলে গেল। তখন সূর্য ডুবছে সবে। খোঁজাখুঁজি করে ফিরল যখন, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। যাই হোক, শ্রীলেখা এসে আমাকে বলে গেল—পাওয়া যায়নি। ওর ধারণা, নিজেদেরই কেউ সরিয়ে রেখেছে। তারপর তো স্যার, বুঝতেই পারছেন—স্ত্রীলোকের বিসংবাদ। সাত

তাড়াতাড়ি তিনজনে ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেল। গিয়ে দেখি চিত্রিতা চুপচাপ একা বসে আছে। রাতে খাবে না বলল। আমি খুব কষ্ট পেলুম, স্যার। মেয়েটি নিশ্চয় চুরি করেনি। ওরা বিকেলে নদীর চড়াতেই হারিয়েছে। তাই যতক্ষণ ঝড়জল হল, ঘুম আর কিছুতেই এল না। চিত্রিতা খুব সরল চমৎকার স্বভাবের মেয়ে ছিল!'

কর্নেল বললেন—'তাহলে আপনি আর থাকতে না পেরে ঝড়জল থামামাত্র বেরিয়ে পড়লেন?'

'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু খুঁজে পেলুম না। ফিরে এসে দেখি, চিত্রিতার ঘরের দরজা বন্ধ। আলো নেই। তাই আর ডাকলুম না। আহা, তখন যদি জানতে পারতুম যে দরজা ভেজানো আছে, আর হতভাগিনী খাবি খাচ্ছে!'

'কিন্তু রাতে ফের কেন গেলেন নদীর চরে?'

কাঁচুমাচু সলজ্জ মুখে বললেন পশুপতিবাবু—'দিনের বেলা সময়ও পাইনি—আর ওভাবে খোঁজাখুঁজি করব লোকের সামনে—কে কী ভাববে, তাই রাতেই গিয়েছিলুম।'

কর্নেল মুখ টিপে বললেন।...'ইয়ে পশুপতিবাবু, আপনি তো এখনও ব্যাচেলার!'

সবাই হেসে উঠল। আমি মনে মনে বললুম—লোকটির আলুর দোষ আছে প্রচণ্ড। বোঝাই যায়, পুরুষালি চেহারার বিশাল মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

পশুপতিবাবু আরও লাজুক হেসে বললেন—'চিত্রিতাকে আমি কিছুতেই চোর ভাবতে পারিনি! তাই স্যার, গত রাতে যখন কিছুতেই ঘুম এল না। অস্থির হয়ে পড়লুম. আহা বিদূষী মেয়েটি মরে গিয়েও দোষী হয়ে থাকবে? তখন ঝোঁকের মাথায় ফের বেরিয়ে পড়লুম খুঁজতে। বরাবর এই ঝোঁকটা আছে, স্যার।'

কর্নেল হেসে চাপা গলায় বললেন—'ব্যাদার একটা অবসেসনের ব্যাপার। আংটি আমাদের পশুপতিবাবুর কাছে একটা বাজিধরার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ডু ইউ ফিল ইট ডঃ মহাপাত্র?'

ডঃ মহাপাত্র সায় দিলেন মাথা নেড়ে। কর্নেল এবার করলেন কী, ফুলদানির ফুলের তোড়াটা তুলে জানালার ধারে রাখলেন। তারপর নিজের ডানহাতের আঙুলগুলোয় খুঁটিয়ে কী দেখে নিয়ে হাতটা পুরে দিলেন ফুলদানির ভিতরে এবং আমাদের তাজ্জব করে দিয়ে একটা ঝকঝকে সুন্দর সাদা পাথর বসানো সোনার আংটি বের করলেন। সবাই ঝুঁকে পড়লুম সেদিকে। তাতে খুদে হরফে কী নামটাই খোদাই করা আছে। খালি চোখে পড়া গেল না। আংটিটা কিন্তু কর্নেল জানলার ধারে রেখে গর্জে উঠলেন বেমক্কা—'খবর্দার, কেউ ছোঁবেন না। পশুপতিবাবু, ডেটল চাই শিগগির। হাত ধোব।'

তক্ষুনি ডেটল আর জল আনা হল। ভাল করে হাত ধুয়ে কর্নেল এবার একটু হাসলেন। ডঃ মহাপাত্র ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে তখনও তাকিয়ে রয়েছেন।

তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে মনে হল। গোঁফটাও তিরতির করে কাঁপছে বেড়ালের মতো।

গোয়েন্দাপ্রবর পকেট থেকে যথারীতি চুরুট বের করে জ্বাললেন। বুঝলাম—এবার বেশ রিলাক্সিং মুড এসে গেছে ওঁর। হঠাৎ ডঃ মহাপাত্র লাফিয়ে উঠলেন—'কর্নেল সরকার! ইউরেকা, ইউরেকা! তারপর কর্নেলকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলেন।...ওঃ হাউ ওয়ান্ডারফুল! আমি ভাবিনি ব্রাদার, একবারও এদিকটা ভাবিনি!'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গী বৃদ্ধ ঘুঘু বললেন—'হ্যাঁ—ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মিঃ প্রসাদ, তাহলে আপনার কেসের হত্যাকারীকে এবার গ্রেফতার করুন।'

মিঃ প্রসাদ হন্তদন্ত হয়ে পশুপতিবাবুর দিকে এগোতেই কর্নেল মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বললেন—'না মিঃ প্রসাদ! দি মার্ডারার ইজ দেয়ার।' আঙুল তুলে যে দিকটা দেখালেন, আমরা অবাক। দেয়ালের ওদিকে কোনো মানুষই যে নেই। গা শিউরে উঠল। এই প্রাক্তন যোদ্ধাটি ডাইনীদের কথা বলেছিলেন! কোনো অদৃশ্য ডাইনিকে কি তিনি গ্রেফতার করতে বলছেন?

হতভম্ব হয়ে মিঃ প্রসাদ বললেন—'কাকে গ্রেফতার করব, কর্নেল?'

কর্নেল ফের আঙুল তুলে বললেন—'ওই ফুলদানিটাকে। হ্যাঁ, হি ইজ দা মার্ডারার। ওটাকে সাবধানে কিছুতে মুড়ে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিন।'

ডঃ মহাপাত্র উসখুস করছিলেন কিছু বলার জন্যে। এবার ফাঁক পেয়ে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ। ফুলদানিটাই খুনী। ওর ভেতরে যে জল রয়েছে, তাতে কয়েক লক্ষ কোটি প্যাথোজেন গিজগিজ করছে। কাটা আঙুল ডুবিয়ে চিত্রিতা ওতে আংটি লুকোতে গিয়েই নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। চিত্রিতার শরীরে প্যাথোজেন পাওয়া গেছে। কিন্তু আমিও একটু ভাবিনি যে...'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন—'ব্যাপার একসময় একটা মেডিকেল জার্নালে পড়েছিলুম। মিয়ামি স্কুল অফ মেডিসিনের দুই বিজ্ঞানী ডেভিড ট্যাপলিন আর প্যাটিওয়া মারস্‌জ মিয়ামির হাসপাতালে সারজিক্যাল ওয়ার্ডে কিছু অদ্ভুত ডেথকেস নিয়ে তদন্ত করেন। সামান্য অপারেশন, অথচ দেখা যাচ্ছিল পেসেন্টরা একের পর এক অদ্ভুতভাবে মারা যাচ্ছে। এই রহস্য নিয়ে বিস্তর গোয়েন্দার মাথা ঘুরে গেল। অবশেষে ওই দুই ভদ্রলোক আবিষ্কার করলেন যে একটি ফুলদানিই যত কাণ্ডের জন্যে দায়ী। তার জলে পাওয়া গেল বিপজ্জনক জীবাণু প্যাথোজেন। প্রতি মিলিমিটার জলে দশ মিলিয়ন করে প্যাথোজেন কলোনি গড়ে উঠেছে দেখা গেল। তার মধ্যে ছটা স্পেসি বড় সাংঘাতিক, মানুষের রক্তের সঙ্গে একটু সংযোগ ঘটলেই বারোঘণ্টার মধ্যে অ্যাকশন শুরু হয়। মৃত্যুর লক্ষণ একই রকম। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অথবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে মনে হয়

আপাতদৃষ্টে। পশুপতিবাবু আমাকে আগের দিন বলেছিলেন, এক মাদ্রাজি ব্যবসায়ীও বছর দুই আগে এঘরে একইভাবে মারা পড়েন। শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল এবং মিঃ প্রসাদকে খবর দিয়েছিলুম আসতে। মাদ্রাজি ভদ্রলোকের চিবুকের কাছটা ফোলা ছিল বলেছেন পশুপতিবাবু। বোঝাই যায়, বেচারার ইনফেকসন ঘটেছিল দাড়িকাটার পর। চিবুকে কেটে গিয়েছিল একটুখানি। তারপর যে-কোনোভাবে ফুলদানিটার সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং প্যাথোজেন সংক্রামিত হয়।...'

কিছুক্ষণ পরে ঘরে গিয়ে আমার প্রথম কাজটাই হল, ফুলদানিগুলো বের করে বাইরে হঠানো। কিন্তু তখন কর্নেল ফিরে এলেন। আমার কাণ্ড দেখে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকানোর পর বললেন, 'বাছা জয়ন্ত, ওই ফুলগুলো আমি স্পেশাল ফরমাসে আনিয়েছিলুম। এসব পাহাড়ী অর্কিডের গুচ্ছে সাজানো চমৎকার নীল ক্রিসেন্থিমাম ফুল এখানে সহজে মেলে না। তাছাড়া, ধৈর্য ধরে আমার সুপরিণত ঘিলুর কিঞ্চিৎ অবদান গ্রহণ করো। ফুলদানির জল প্রতিদিন আমি নিজের হাতে পাল্টাই এবং সবরকম অপকারী জীবাণুনাশক লোশন দু-চার ফোঁটা গুলে দিই। চিত্রিতার ঘরের জাপানি ফুলদানির জল একপক্ষকাল সম্ভবত পাল্টানো হয়নি বলেই প্যাথোজেন গজিয়েছে। কাজেই, তুমি ডার্লিং, এই অপকর্মটি কোরো না।'

তারপর একটু কেশে এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন—'আজ তোমাকে সেই হিমালয়ান মিনিভেট আর দুর্লভ উডডাকের দেশে নিয়ে যাব। শিগগির পোশাক পরে ফেলো। আজকের বিকেলটা বেশ সুদৃশ্য মনে হচ্ছে। কোনো ভ্রমণবিলাসীই ঘরে বসে থাকবে না। ডার্লিং তোমাকে আজ ডমরুপাহাড়ের চুড়ো থেকে সূর্যাস্তও দেখাব—আই প্রমিজ।......'

আমি বাধ্য ছেলের মতো ফুলদানি দুটো ঘরে এনে রাখলুম।

স্বর্গের বাহন

॥ এক তসবির কে লিয়ে ॥

সেবার জানুয়ারি মাসে জাহানাবাদের ঐতিহাসিক নিজামত-কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেন্দ্রীয় প্রত্নদফতরের হাতে গেলে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় যখন সেই খবর চোখে পড়ার মতো করে প্রথম পাতায় বেরুল, তখন একটু অবাক লেগেছিল। তারপর আরও অবাক হলাম, যখন পত্রিকার চিফ অফ দা নিউজ

ব্যুরো তারক গাঙ্গুলি আমাকে জাহানাবাদ ঘুরে এসে একটি জাঁকালোগোছের রেপোর্টাজ লেখার ফরমাস করলেন। হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে গাঙ্গুলিদা দাঁতে পাইপ কামড়ে বললেন, "কী বুঝলে?"

"জাহানাবাদ ঘুরে এসে কিছু লিখতে হবে।"

"শুধু ঘোরা নয়, পর্যবেক্ষণ করতে হবে।" গাঙ্গুলিদা পাইপের ডগায় জ্বলন্ত লাইটার ঠেকিয়ে বললেন। "একজন ভাল রিপোর্টার হতে গেলে এটাই প্রথমে দরকার।"

"পর্যবেক্ষণ, গাঙ্গুলিদা?"

"পর্যবেক্ষণ।" ধোঁয়ার ভেতর গাঙ্গুলিদা প্রতিধ্বনি তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, ব্যাপারটা যথেষ্ট জোরালো করার জন্য ইংরিজিতে উচ্চারম করলেন, "কিন অবজার্ভেশন।"

শ্বাস ছেড়ে বললাম, "কর্নেলও ঠিক এই কথা বলেন।"

গাঙ্গুলিদা ভুরু কুঁচকে বললেন, "হু ইজ দ্যাট ফেলা?"

"আমার ফ্রেন্ড-ফিলসফার-গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।"

গাঙ্গুলিদা হাসলেন। "তাই বলো! সেই সান্তা ক্লজ বুড়ো? কেমন আছেন ভদ্রলোক? অনেকদিন আর কোনো সাড়া পাচ্ছি না। শখের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে ধর্মকর্মে মন দিলেন নাকি?

"না। এখনও গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে পাখি-প্রজাপতি অর্কিড ক্যাকটাসের পেছনে।"

গাঙ্গুলিদা আর আমার কথায় কান দিলেন না। গম্ভীর হয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "ওক্কে মাই বয়! উইশ য়ু গুড লাক।"

অফিস থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় নেমেছি, তখন রাগ-দুঃখ-অভিমান-হতাশায় আমার মন ভারাক্রান্ত। সবে স্পেশাল রিপোর্টার পদে প্রমোশন পেয়েছি। একখানা সাংঘাতিক রাজনৈতিক স্কুপ কাগজে ঝেড়ে দিল্লি অব্দি কাঁপিয়ে দেবার ফিকিরে রাজনেতিক মহলে ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ বিনিমেঘে বজ্রাঘাতের মতো এই মামুলি অ্যাসাইনমেন্ট। তাও অন্য কোথাও যেতে হলে কথা ছিল। সেই ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুর জাহানাবাদ! শুনেছি নবাবী আমলে সেখানে নাকি দেশের রাজধানী ছিল। পরের যুগে ইংরেজরা স্থানটিকে লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধশালী বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু ইংরেজরাও তো সেখানে বেশিদিন পা রাখেনি। রাজধানী সরিয়ে এনেছিল কলকাতা শহরে। আসলে কোনো জনপদ, তা যতই সমৃদ্ধশালী হোক, যখন নিজের ভেতর থেকেই পচ ধরতে শুরু করে, তখন আর স্বয়ং ঈশ্বরও তার পতন রোধ করতে পারেন না। জাহানাবাদ কবে মরে হেজে গেছে। এখন সে নিতান্ত গোরস্থানে পরিণত। সাদা কথায় প্রেতপুরী। কিছু-কিছু রোমান্টিক স্বভাবের মানুষ আছেন, যাঁরা এইসব প্রেতপুরী আর কবরখানায় নাক গলাতে ভালবাসেন, তাঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক।

ইদানীং আবার এই এক হাওয়া উঠেছে, মাটির তলায় যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নাকি হাজার-হাজার বছরের পুরনো, কিংবা নিদেনপক্ষে গুপ্তযুগের! জাহানাবাদের মাটি খুঁড়ে তেমন কিছু পাওয়া গেলেও কথা ছিল। সেখানে বড়জোর নবাব-টবাব লোকেদের কবর আর বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কী আছে? আমাকে সেখানে এভাবে ঠেলে দেওয়ার মানে জ্যান্ত অবস্থায় কবরে পাঠানো। অতীত—যা মরে হেজে গেছে, তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই—জীবন্ত বর্তমানই আমার প্রিয়, কারণ আমি তার মধ্যে হাঁটছি, শ্বাস নিচ্ছি, তার কাছ থেকে পাওনা আদায় করছি। বর্তমান আমার রক্তে আছে। আর কি না আমাকে জোর করে কবরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে—গাঙ্গুলিদার এ নিশ্চয় কোনো চক্রান্ত। কারও কাছে আঁচ করে থাকবেন আমি একটা পলিটিকাল স্কুপ করতে চলেছি, তাই আমাকে সে-ক্রেডিট থেকে বঞ্চিত করে এই উদ্ভুট্টে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাচ্ছেন। আমি কি জানি না গাঙ্গুলিদা আমার প্রমোশনে খুশি হননি? আলবাৎ জানি। চিৎপুর রেলইয়ার্ডের ওয়াগানব্রেকারদের ব্যাপারে যে স্টোরিটা করেছিলাম, ম্যানেজিং এডিটর প্রশান্ত চ্যাটার্জির নেকনজরে পড়ার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট এবং আমার প্রমোশনের একমাত্র কারণ ছিল সেই নেকনজর। আর গাঙ্গুলিদা কিনা চোখ নাচিয়ে বলেছিলেন, "করে দিলাম, জয়ন্ত! খাইয়ে দিও।"

কিছুক্ষণ পরে অভিমান আর হতাশাটা চলে গেল এবং যা বাকি রইল, তা রাগ। রাগ এলে নাকি আমার মুখে আগুনজ্বলা ভাব থাকে না, কাঁচা উচ্ছের রস গেলার ভাবটাই ফুটে ওঠে। চিফ রিপোর্টার মধুদা কথাটা বলেছিলেন একবার। কারণ তিনি রোজ নাকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাডসুগার কমাতে ওই বস্তুটি পান করেন। কাজেই তিনি ব্যাপারটা বোঝেন। যাই হোক, আমি গাঙ্গুলিদার মুণ্ডুপাত করছিলাম। বারবার ওঁর হাত-পা বেঁধে জাহানাবাদের কবরে ঢোকাচ্ছিলাম। আর সেই সময় কেউ বলে উঠল, "কবর কারুর-কারুর পক্ষে নিরাপদ জায়গাও হতে পারে, ডার্লিং!"

চমকে উঠে দেখলাম, যাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমের কোনার দিক থেকে একটা অদ্ভুত খুরপি হাতে নিয়ে আমার ফ্রেন্ড-ফিলসফার-গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এগিয়ে আসছেন। সাদা গোঁফ-দাড়ির মধ্যিখানে ওঁর অসম্ভব শক্তিশালী সরু-সরু দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড দেহটিতে তখনও গার্ডেনিং উর্দি চড়ানো। সুতরাং বুঝতে পারছিলাম, ছাদের 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ড' থেকে সদ্য অবতরণ করেছেন।

ডাইনে মোড় নিয়ে বাথরুমে অদৃশ্য হলেন। তারপর ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে করে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল সোফা টেবিলে। তাকে আজ একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সম্ভবত প্রভু-ভৃত্যে কিছু নিয়ে মনকষাকষি হয়ে থাকবে এবং তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছি, এ ব্যাপারটা ঘটে আসছে।

তবু সেই ষষ্ঠীই বহাল আছে বা কর্নেল তার 'বাবামশাই'-পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

"কবরকে বিপজ্জনক জায়গা মনে করা হয়।" আমার বৃদ্ধ বন্ধু পুনঃপ্রবেশ করলেন। সোফার দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "কারণ বাইবেলে বলা হয়েছে, বিহোল্ড্! হোয়েন দা ডেডস আর অ্যাওয়েকন্ড্, দা এভিল আওয়ার বিগিনস। ডার্লিং, তবু কবর কোনো-কোনো জীবিত মানুষের পক্ষে ভ্রমণের জন্যও আদর্শস্থান হতে পারে। বিশেষ করে যদি তা ঐতিহাসিক গোরস্থান হয়। চিয়ার আপ, জয়ন্ত! চিয়ার আপ!"

ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, "কী আশ্চর্য! আপনি কি থটরিডিং শিখেছেন যে—"

হাত তুলে কর্নেল বললেন, "দরকার দেখি না। আশা করি তুমি লজিক-শাস্ত্রের নাম শুনে থাকবে।"

"কলেজে আমার পাঠ্য ছিল।" একমুঠো স্ন্যাক্স তুলে নিয়ে বললাম। "কিন্তু এক্ষেত্রে তা অবান্তর। আমি আপনার এ ঘরে যখন ঢুকি, তখন আপনি ছাদে। তাছাড়া ঘরে ঢোকার পর আমি এমন কিছু বলিনি ষষ্ঠীকে, কিংবা বললেও আপনার পক্ষে শোনা সম্ভব ছিল না যে আমি কবর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। অতএব হয় আপনি টেলিপ্যাথি নয়তো থটরিডিংয়ের সাহায্যে আমার ভাবনাটা টের পেয়েছেন।"

কর্নেল হাসিমুখে পট থেকে কফি ঢাললেন। তারপর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "জয়ন্ত, প্রবাদ আছে, ময়রা নাকি সন্দেশ খায় না। অন্তত বরাবর তোমার ব্যাপারে লক্ষ্য করে আসছি যে কাগজের লোক হয়েও কাগজে যা ছাপা হয়, সে-সম্পর্কে তোমার ঔৎসুক্য কম। আজ তোমাদের এবং আরও অন্যান্য কাগজে খবর বেরিয়েছে, জাহানাবাদের ঐতিহাসিক নিজামতকেল্লা কেন্দ্রীয় প্রত্নদফতরের হাতে গেল। সুতরাং এবার সেখানে ট্যুরিস্ট ব্যুরো একটি পর্যটন-ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।...ওয়েট, ওয়েট! বলতে দাও আমাকে। এই খবর থেকে আমার পক্ষেও সিদ্ধান্ত নেওয়া সোজা যে ট্যুরিস্ট দফতর এবার পর্যটকদের দৃষ্টি অকর্ষণের জন্য খবরের কাগজে প্রচুর বিজ্ঞাপন দিতে থাকবেন। সেই বিজ্ঞাপনের লোভে সব কাগজই ওঁদের খুশি করার জন্য রিপোর্টার পাঠিয়ে খুব জাঁকালো রেপোর্টাজ ছাপবে। আর—"

বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু কবরের চিন্তাটা কীভাবে—"

কর্নেলও বাধা দিয়ে বললেন, "ওই দেখ, ছাদ থেকে নামবার সিঁড়ি। নামবার সময় আমার চোখে পড়ল তোমার মুখে ভীষণ তিতিবিরক্ত ভাব। তারপর আমার চোখ গেল ওই টেবিলে। ফোন ডাইরেক্টরিটা তলা থেকে ওপরে উঠে এসেছে এবং ফোনটাও উল্টোভাবে বসানো রয়েছে। সুতরাং তুমি কোথাও টেলিফোন করছিলে। তার চেয়ে বড় কথা, তুমি আমার কাছে এমন অসময়ে

এসেছ।" কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন। "সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখন তোমার অফিসে থাকার কথা। অথচ তুমি অফিস থেকে হন্তদন্ত আমার কাছে এসে তেতোমুখে টেলিফোন করেছ। নিশ্চয় শেয়ালদা স্টেশনে জাহানাবাদ-গামী ট্রেনের সময়গুলো জানতে চেয়েছিলে। আসলে আমার খুলির ভেতর প্রাকৃতিক কম্পিউটারটি খুব দ্রুত কাজ করে, ডার্লিং!" কর্নেল হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন ফের, "যাই হোক, কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে। গরম কফি মানুষের এনার্জি বাড়ায়।"

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "কিন্তু কবরের কথাই ভাবছিলাম, তার মানে নেই!"

"আছে।" কর্নেল তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "এই অ্যাসাইনমেন্টে তুমি খুশি হওনি। আর সত্যিই জাহানাবাদে অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গার তুলনায় কবরের সংখ্যা বেশি। নিজামতকেল্লার ভেতরই এক বিশাল কবরখানা। এমতাবস্থায় যিনি তোমাকে এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, তাঁকে তোমার মনে-মনে কবরে পাঠানোই স্বাভাবিক। সদ্য প্রমোশনের পর সব সাংবাদিকই চাইবেন জব্বর বা চমকপ্রদ কিছু এক্সক্লুসিভ স্টোরি করে বুঝিয়ে দিতে যে, যোগ্য লোককেই প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। ডার্লিং! মানুষের আশা-আকাঙক্ষা সনাতনকাল থেকে অনেকখানি ছকবন্দি। যাই হোক, তুমি কফি খেয়ে নাও। মেঘ না চাইতেই জলের মতো তুমি এসে গেছ। নইলে তোমার অফিসে একবার ফোন করব ভাবছিলাম।"

"কী ব্যাপার?"

"কাকতালীয় যোগ মনে হলেও ব্যাপারটা তা নয়।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন। "চলো, একটু ঘুরে আসা যাক। ছটায় যাব বলে কথা দিয়েছি।"

আমার বৃদ্ধ বন্ধু যখন কোনো প্রশ্নের জবাব দেন না, তখন বুঝতে পারি, উনি কোনো বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শুধু জেনে নিয়েছিলাম কোথায় যেতে হবে। উনি আস্তে বলেছিলেন, "পার্ক স্ট্রিট। পার্ক স্ট্রিট।" পার্ক ট্রিট ধরে এগিয়ে মুনলাইট হোটেলের কাছে ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেলাম। মিনিট কুড়ি লাগল জ্যাম ছাড়তে। একটু এগিয়ে গেলে কর্নেল বললেন, "বাঁদিকের রাস্তাটা।" রাস্তাটা গলি বলাই ভাল। শীতের দিনে পাঁচটা বাজতে না বাজতে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সবখানে আলো জ্বলে উঠেছে। এই গলিটা একেবারে অন্ধকার আর নিঝুম। লোডশেডিং বলে মনে হচ্ছিল না। কারণ সব বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছিল। সম্ভবত এই গলির স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো বহুকাল ধরে অদৃশ্য। পুরসভা তো থেকেও নেই। একটু পরে কর্নেল গাড়ি থামাতে বললেন। বাঁদিকে একটা বাড়ির গেটের মাথায় যথেষ্ট জঙ্গল এবং তা থেকে অত্যদ্ভুত হলুদ ফুলের মতো একটু আলো জুগজুগ করছে। সেই আলোয় জীর্ণ গেটের ডানদিকে একটুকরো মার্বেল ফলকে "জাহানাবাদ প্যালেস" লেখা আছে দেখে চমকে উঠলাম।

কর্নেল বললেন, "এস।"

গেটের কাছে যেতেই যেন মন্ত্রবলে গরাদ দেওয়া প্রকাণ্ড কপাট একটু ফাঁক হল। কিন্তু কোনো দারোয়ানকে সেলাম দিতে দেখলাম না। একজন প্রৌঢ় এবং বহুব্যবহৃত স্যুট-টাইপরা ভদ্রলোক যেন অপেক্ষা করছিলেন। করমর্দন এবং অভ্যর্থনা করে আমাদের নিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটি হলঘরের ভেতর কাঠের সিঁড়িতে জীর্ণ কার্পেট পাতা রয়েছে। দোতলার একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক একটু কাশলেন। ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে উর্দু ভাষায় কেউ কিছু বলল। তখন পর্দা তুলে ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে আদাব দিলেন। তারপর আমাদের ভেতরে যেতে ইশারা করলেন।

ঘরের ভেতর গদিআঁটা ইজিচেয়ারে এক বৃদ্ধ বসে টেবিলল্যাম্পের আলোয় কী একটা বই পড়ছিলেন। কর্নেল আদাব দিলেন। কিন্তু উনি উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনই করলেন। কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জাহানাবাদের নবাব মির্জা মোহাম্মদ বসির খানকে দেখে নবাব-সংক্রান্ত মোহ চলে গিয়েছিল। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো চেহারা। পরনে ঢিলা পাজামা-কোর্তা, শ্যাওলা রঙের শাল জড়ানো। রোগা, সিড়িঙ্গে গড়নের মানুষ। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো। নাকটা অসম্ভব খাড়া। এইরকম চেহারার মানুষ মুসলিম মহল্লায় অসংখ্য দেখেছি।

নবাবসাহেব মৃদু হেসে কর্নেলকে ইংরাজিতে বললেন, "শুনেছি আপনি কফির ভক্ত?"

"বলতে পারেন। তবে এইমাত্র কফি খেয়ে বেরিয়েছি।"

নবাবসাহেব একটু হাসলেন। "আমার কফি খাওয়া ডাক্তারের বারণ। এই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। ফরিদ, যাও—কফি লাকে আও। জলদি! ঔর শুনো, দরওয়াজা বাহারসে বন্ধ্ করকে যাও।"

ফরিদসাহেব নামে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করলে বুকটা ধড়াস করে উঠল। নবাবসাহেব গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বললেন, "এই বাড়িতে নাকগলানে স্বভাবের লোক আছে। হুট করে এসে ঢুকে পড়বে।"

কর্নেল বললেন, "তাহলে শুরু করুন, নবাবসাহেব!"

নবাবসাহেব আগের মতো চাপা গলায় বললেন, "তখন টেলিফোনে আসল কথাটা বলতে পারিনি বলেই আপনাকে এ গরিবখানায় ডেকেছিলাম কর্নেল! যাই হোক, সেই কথাটাই বলে ফেলি।"

উনি আমার দিকে একবার তাকালে কর্নেল বললেন, "জয়ন্তের সামনে বলতে বাধা নেই। আপনি বলুন।"

নবাবসাহেব বললেন, "আমার ছোট ভাই মির্জা নাসির খাঁয়ের কথা আপনাকে বলেছি। সে গত জুন মাস থেকে পাগল হয়ে গেছে, তাও বলেছি। কিছুদিন

আগে নাসির হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। গতকাল আমার বোন শামিম-আরা বেগমের চিঠি পেয়েছি। নাসিরকে নাকি সে কেল্লাবাড়ির পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।"

"জাহানাবাদে থাকে আপনার বোন?"

"হ্যাঁ সে বিধবা। দুটি যমজ মেয়ে আছে। এখনও বিয়ে দিতে পারেনি তাদের। বুঝতেই পারছেন, সরকারি বৃত্তি বন্ধ হওয়ার পর আমাদের পরিবার কী দুর্দশায় কাল কাটাচ্ছে।" নবাবসাহেব বদ্ধ দরজার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "এতদিনে আমার সন্দেহ হয়েছে, শামিম-আরার স্বামী জর্জিস খাঁকে কে খুন করেছিল—"

"খুন করা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। দু বছর আগে আমাদের কেল্লাবাড়ির পারিবারিক কবরখানায় তার লাশ পাওয়া যায়। তার মাথার পেছনদিকে ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, লাশটা পাওয়া যায় ভোরবেলা। জর্জিসের দুই যমজ মেয়ে কবরখানায় ফুল দিতে গিয়েছিল তাদের দাদামশাই অর্থাৎ আমার বাবার কবরে। যাই হোক, পুলিশ সেই খুনের কোনো কিনারা করতে পারেনি।"

"জর্জিসসাহেব কবরখানায় কেন গিয়েছিলেন, জানা যায়নি?"

"না। সেটাই তো অদ্ভুত লাগে। অবশ্য সে ছিল আমাদের তখনকার নিজামত ট্রাস্টের বেতনভোগী কেয়ারটেকার। কিন্তু এটুকু বোঝা গিয়েছিল, সে রাত্রে কবরখানায় ঢোকে এবং আততায়ী তাকে খুন করে পালায়।"

"আপনার কাকে সন্দেহ হয়েছে বলছিলেন?"

নবাবসাহেব আবার ফিসফিস করে বললেন, "নাসিরই হয়তো খুন করেছিল। ভগ্নীপতিকে খুন করার ধাক্কায় সে পাগল হয়ে গেছে শেষপর্যন্ত।"

"কেন তিনি ভগ্নীপতিকে খুন করবেন?"

নবাবসাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, "নাসির বরাবর বাউণ্ডুলে স্বভাবের মানুষ। সে বেশিদূর লেখাপড়া শেখেনি। নেশাভাং খেত। টোটো করে বেড়াত সবসময়। জাহানাবাদে কিছুদিন দিদির কাছে, আবার কিছুদিন এখানে আমার কাছে—এই করে থাকত। খারাপ লোকেদের সঙ্গেই তার ছিল যত মেলামেশা।"

"জর্জিসসাহেব খুন হওয়ার সময় নাসির কোথায় ছিলেন?"

"জাহানাবাদে বোনের বাড়িতে।"

"কিন্তু ভগ্নীপতিকে খুন করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?"

নবাবসাহেব করুণ হাসলেন। "সেটা খুঁজে বের করার জন্যই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, কর্নেল!"

"কিন্তু এতকাল পরে?"

নবাবসাহেব উঠে বন্ধ দরজার কাছে গেলেন। এতক্ষণে দেখলাম, কপাটে একটা 'ম্যাজিক আই' রয়েছে। সেখানে চোখ রেখে বাইরেটা দেখে নিয়ে এসে তারপর নিজের আসনে বসলেন। বললেন, "আমার বোনের চিঠিতে একটা অদ্ভুত কথা লেখা আছে। নিজামতকেল্লার কবরখানায় ভূতপ্রেতের উপদ্রবের কথা সবাই জানে। শামিম-আরা লিখেছে, ইদানীং প্রায় প্রতি রাত্রে সে জানলা থেকে কবরখানায় কাউকে চলাফেরা করে বেড়াতে দেখে। শামিম-আরা খুব সাহসী মেয়ে। একরাত্রে সে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই মূর্তিটা যেন কবরে ঢুকে গেল।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "কবরে ঢুকে গেল কীভাবে, তা লেখেননি আপনার বোন?"

"না।" নবাবসাহেব গম্ভীর হলেন আরও। "আপনি তার মুখেই সব শুনতে পাবেন। শামিম-আরা তত পর্দা মানে না। লরেটোর ছাত্রী ছিল। আমাদের পরিবারের দুর্ভাগ্যের কথা কী আর বলব? প্রিভিপার্স বন্ধ হওয়ার পর আমরা প্রায় ফকির হয়ে গেছি। নইলে জর্জিসের সঙ্গে ওর কি বিয়ে হত? জর্জিস ছিল আমাদেরই কর্মচারী। অবশ্য সেও গ্র্যাজুয়েট ছিল। লখনউ থেকে কলকাতায় পড়তে এসে আত্মীয়তাসূত্রে আমাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছিল। বিশ্বাসী এবং আপনজন হিসেবে তাকে জাহানাবাদ নিজামতকেল্লার কেয়ারটেকার পদে নিযুক্ত করা হয়।

"আপনার বোনেরও কি সন্দেহ যে তাঁর স্বামীকে তাঁর ছোট ভাই-ই খুন করেছেন?"

নবাবসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "না, না। শামিম-আরা তেমন কিছু লেখেনি। ওর চিঠিতে শুধু দুটো ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ঃ রাতবিরেতে কবরখানায় জলজ্যান্ত ভূত দেখা। দুই ঃ পাঁচিলের ওপর পাগলা নাসিরকে দেখা। এই থেকেই আমার সন্দেহ কবরখানায় একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে।"

আমি বলে উঠলাম, "গুপ্তধন নয় তো?"

নবাবসাহেব হেসে ফেললেন। "ওসব জিনিস গল্পে উপন্যাসে থাকে। —আপনারা বোধ করি জানেন না, মুসলিমদের কবরে নগ্ন মৃতদেহ ঢাকার জন্য তিনটুকরো সাদা থান কাপড় অর্থাৎ যাকে বলা হয় কাফন, তা বাদে আর কিছু রাখা ইসলামি শরিয়ত অনুসারে হারাম—নিষিদ্ধ। তা গর্হিত পাপ। আমাদের বংশের যা ইতিহাস, তাতে গুপ্তধনের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। তা যদি থাকেও, কবরে থাকবে না।"

কর্নেল বললেন, "মৃতদেহের হাতে আংটি বা গলার হার।"—বাধা দিয়ে নবাবসাহেব বললেন, "না। সব খুলে নেওয়া হয়। যে অবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়, সেই অবস্থায় সে কবরে যাবে। শুধু নগ্নতাজনিত লজ্জানিবারণে ওই কাফনে তাকে ঢেকে দেওয়া হবে। নইলে মৃত ব্যক্তির অনন্ত নরক।"

এতক্ষণে ফরিদসাহেব দরজা খুলে নিজেই ট্রেতে করে কফি নিয়ে ঢুকলেন। নবাবসাহেব বললেন, "ফরিদ আমাকে ছেড়ে যায়নি। নইলে আমাকে বোনের কাছে চলে যেতে হত। আমার স্ত্রী বহু বছর আগে মারা গেছেন। দুই ছেলে বিদেশে মেম বিয়ে করে সংসার পেতেছে। তারা আর বুড়ো বাবাকে একটা চিঠিও লেখে না। এক মেয়ে। সে থাকে কুয়েতে স্বামীর সঙ্গে। বছরে একবার আসে। সেই টাকাকড়ি পাঠায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই যে সুপ্রিম কোর্ট অব্দি মামলা লড়ে হেরে গেলাম, তার সব খরচ আমার মেয়ে নার্গিস-আরাই যুগিয়েছিল। নইলে আমার সাধ্য ছিল না। নিন, কফি খান আপনারা। ফরিদ, তুমি একটু বাইরে নজর রাখো। হারামজাদা আজ সকাল থেকে আমার ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে কী মতলবে, কে জানে!"

ফরিদসাহেব বেরিয়ে গেলে কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এই হারামজাদাটি কে?"

"বিড্ডু খাঁ। আমাদের নিজামতকেল্লার একজন সহিসের বংশধর। আমাদের কলকাতার এই বাড়িতে সে বাবুর্চির কাজকর্ম করে। নাসিরকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। নাসিরের খাতিরেই তাকে বহাল রাখা হয়েছিল। নইলে ওই চোর-চোট্টা দাগাবাজকে কবে জুতো মেরে বিদায় করে দিতাম।"

"বিড্ডু কি এখনও আছে আপনার কাছে?"

নবাবসাহেব তারিয়ে তারিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। বললেন, "বেহায়ার মতো পড়ে আছে। কবে ছাড়িয়ে দিয়েছি, যেতে চায় না। পা ধরে কান্নাকাটি করে। অগত্যা কী করব বলুন? আর ফরিদও বলল, একজন বাবুর্চি তো দরকার। বিড্ডু যখন বিনাবেতনে থাকতে চাইছে, থাক। ও অবশ্য রাঁধেও খাসা।"

কর্নেল কফিটা দ্রুত শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন, "দু-বছর আগের এক হত্যারহস্যের কিনারা এতদিন পরে করতে পারব কি না জানি না। তবে এই সুযোগে ঐতিহাসিক জাহানাবাদ আমার দেখা হবে. আমার দিক থেকে সেটাই লাভ।"

নবাবসাহেব কর্নেলের হাত ধরে বললেন, "আমার বোন খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সেজন্যই আপনার সাহায্য চেয়েছি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এক্ষেত্রে পুলিশের কাছে যাওয়ার মতো কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ তার হাতে নেই। অথচ সে আশঙ্কা করছে যেন শিগগির তার জীবনে আবার সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে।"

কর্নেল একটু অবাক হলেন। "শামিম-আরা তাই লিখেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ! পাগলা নাসিরকে দেখার পর তার আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে।"

"নাসির তো ওঁর সহোদর ভাই! তাহলে সে—"

নবাবসাহেব জিভ কেটে ঈষৎ লজ্জিতভাবে বললেন, গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমারই দোষ। নাসির আমার আর শামিম-আরার বৈমাত্রেয় ভাই। আমার

বাবার দুই স্ত্রী। নাসিরের মা ছোটিবেগম আর আমাদের মা ছিলেন বড়িবেগম। নাসিরের জন্মের পর তার মা মারা যান। সেইজন্যেই তো বিড্ডু তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, "যা জানা গেল, আপাতত এই যথেষ্ট। চলি নবাবসাহেব!"

নবাবসাহেব সিঁড়ির মাথা অব্দি আমাদের এগিয়ে দিয়ে বললেন, "কোনো অসুবিধে হবে না আপনার। সে বন্দোবস্ত করেই রেখেছি।" বলে নিচে ঝুঁকে ডাকলেন, "ফরিদ! ফরিদ! কাঁহা হ্যায় তুম?"

সিঁড়ির নিচে থেকে সাড়া এল, "হাম ইঁহা নবাবসাব!"

"যো খত্ লিখকে দিয়া তুমকো, কর্নিলসাহাবকো দে দো। ঔর উনলোগোঁকো গেটতক্ পঁহুছা দো।"

"জী নবাবসাব!"

হলঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফরিদসাহেব। আদাব করে কর্নেলকে খামে-আঁটা একটা চিঠি দিলেন। তারপর আমাদের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চুপচাপ গেট বন্ধ করে চলে গেলেন।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি, হঠাৎ একটা বেঁটে মোটাসোটা গুঁফো লোক গাড়ির পাশে এসে ঝুঁকে বলে উঠল, "সাব! শুনিয়ে সাব! শুনিয়ে!"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তুমি বিড্ডু খাঁ?"

সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব দিয়ে বলল, "জী হাঁ সাব! হামি বিড্ডু আছি। একঠো বাত বলব সাব, কুছু মনে করবেন নাই।"

"না, না। বলো বিড্ডু, কী বলবে?"

"বড়া নবাবসাবের কথা বিশোয়াস করবেন না, সাব। ছোটা নবাবসাবকো উন্হি দাওয়া পিলাকে পাগল বনা দিয়া স্রিফ্ এক তসবির কে লিয়ে।"

"তসবির?"

"জী হাঁ। পিকচার সাব, পিকচার।" বলেই বিড্ডু হঠাৎ আবছা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। তারপর গিয়ার টেনে অ্যাকসিলেটারে পায়ের চাপ দিলাম। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে আড়চোখে দেখালম গোয়েন্দাপ্রবর চোখ বন্ধ করে আছেন। দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট।...

॥ গোরস্তানে এক দর্জি ॥

নিছক একটা তসবির অর্থাৎ ছবির জন্য কেউ কাউকে পাগল করে দিয়েছে এবং কীভাবে তা করেছে, সে নিয়ে আমার মাথাব্যথার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের কাগজের চিফ অফ দা নিউজ ব্যুরো শেষ পর্যন্ত নিছক ওই ছবির জন্যই আমাকেও পাগল করে ছাড়বেন, কল্পনা করিনি। "রেপোর্টাজ যে ছাপা হবে, তার সঙ্গে ছবি থাকবে না সে কী কথা? তোমার সঙ্গে আমাদের স্টাফ

ফটোগ্রাফার রামবাবুও যাচ্ছেন।" রাত দশটায় ফোনে গাঙ্গুলিদা এই দুঃসংবাদ দিয়েছিলেন।

তা, রামবাবু—রামকুমার হাটি মানুষ হিসেবে অমায়িক এবং ভদ্র। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনীগুলোতে পুরস্কার পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে নামী ফটোগ্রাফার। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে এমন বিরক্তিকর আর সবতাতে নাকগলানো মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তার চেয়ে বড় বিপদ, ওঁর অবিরাম বকবকম। কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

বেগতিক দেখে ভেবেছিলাম ওঁকে কর্নেলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেব, কিন্তু কর্নেলের উদ্দেশ্যে রামবাবু মুখ খুললেই দেখি, কর্নেল ঝটপট চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ধ্বংসস্তূপের ভেতর হেঁটে চলেছেন এবং কিছুদূর অনুসরণের পর রামবাবু থমকে দাঁড়িয়ে অগত্যা ক্যামেরা তাক করছেন কোনো গম্বুজ বা মিনারের দিকে।

এতে কিছুক্ষণের জন্য রামবাবুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিলাম। কারণ রামবাবু ফটো তুলতে বড্ড সময় নেন।

আমরা উঠেছিলাম নিজামতকেল্লার একপ্রান্তে একটা একতলা বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা ঘরে। এই বাড়িটায় নবাবসাহেবের বোন শামিম-আরা বেগম বাস করেন। এ বাড়িটার বয়স বেশি নয়। জাহানাবাদ এস্টেটের ট্রাস্টিবোর্ড কেয়ারটেকারের থাকার জন্য বছর তিরিশ আগে বানিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটুকরো করে খোলা বারান্দা আছে। দক্ষিণে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পোড়ো জমির ওধারে নিচু পাঁচিলে ঘেরা নবাব পরিবারের বংশানুক্রমিক গোরস্তান। প্রচুর গাছপালা আছে সেখানে। পশ্চিম ও উত্তর দিক জুড়ে বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। তবে সবটাই ধ্বংসস্তূপ নয়। কোনো কোনো অংশ এখনও গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ ও মিনারওয়ালা মসজিদও অক্ষত আছে। তার ওধারে গঙ্গানদী বয়ে যাচ্ছে। এই নিজামতকেল্লার পশ্চিমের দেয়াল পুরোটাই বুকে টেনে নিয়েছে।

শামিম-আরা পর্দা মানেন না। কিন্তু রামবাবু সহাস্যে ওঁর দিকে ক্যামেরা তাক করলে নিষেধ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামবাবুকে স্বগতোক্তি করতে শুনেছিলাম, "ভাবা যায় না। ভাবা যায় না। লাইফে অ্যাদ্দিনে সত্যিকারের বেগম দেখলাম।"

শামিম-আরার যমজ কন্যা দুটিকে কিছুক্ষণ আগে পেছন থেকে একপলকের জন্য দেখেছিলম। ওরা কবরখানায় ঢুকেছিল। সম্ভবত দাদামশাইয়ের কবরে ফুল দিতেই যাচ্ছিল। কিন্তু কোন পথে ওরা বাড়ি ফিরল হদিস করতে পারিনি।

কর্নেল ফিরে এলেন প্রাতঃভ্রমণ সেরে, তখন আটটা বাজে। রামবাবু ওঁর পেছন পেছন বেরিয়েছিলেন। মসজিদের ফোটো তোলার সময় আমি সুযোগ বুঝে ঘরে ফিরে বই নিয়ে বসেছিলাম। জাহানাবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি জানা

দরকার। তাই খান দুই বই সঙ্গে এনেছি কর্নেলের পরামর্শে। কর্নেলের সম্ভাষণে বই বুজিয়ে রেখে বললাম, "রামবাবুকে কোথায় রেখে এলেন?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "সম্ভবত কবরে।"

কবর-টবর শুনলেই বুক ধড়াস করে ওঠে। "সর্বনাশ!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল বাইনোকুলার এবং তাঁর সেই অত্যদ্ভুত ক্যামেরা—যা রাতের আঁধারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ, টেবিলে রেখে বললেন, "সর্বনাশের কিছু নেই, জয়ন্ত! গেলে হয়তো দেখবে, রামবাবু কবরের লোকগুলোর গ্রুপফোটো তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁরা সবাই অবশ্য হোমরা-চোমরা এবং কেউ কারো চেয়ে কম যান না। তাই একটু ঝামেলা হলেও হতে পারে। প্রত্যেকেই চাইবেন ফোটোতে যেন সামনের সারিতে..."

কর্নেলের কথা শেষ না হতেই রামবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে এসে ঢুকলেন এবং ধপাস করে তাঁর বিছানায় বসে বললেন, "একটু জল।"

আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কালো বোর্ডে চকে আঁকা মূর্তির মতো রামবাবুর চেহারা। চোখের তারা ঠেলে বেরুচ্ছে। হাঁপাচ্ছেন ফোঁস ফোঁস শব্দে। কোনার টেবিলে রাখা জগ থেকে ঝটপট এক গ্লাস জল এনে দিলাম। রামবাবু ঢকঢক করে জলটা গিলে সুস্থ হলেন। তারপর বললেন, "সাংঘাতিক জায়গা! ওঃ! আর একটু হলেই কী যে ঘটত ভাবা যায় না।"

কর্নেল বললেন, "কী ঘটত বলুন তো রামবাবু?"

রামবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেটের প্যাকেট বের করছিলেন। বললেন, "তা অবশ্য জানি না। শুধু বলতে পারি আমি জোর বেঁচে গেছি। দিনদুপুরে একেবারে চোখের সামনে—ঔঃ! ভাবা যায় না! ভাবা যায় না!"

রামবাবুর কথা বলার এই ঢঙটার জন্যই আমার বিরক্তি লাগে। বললাম, "আহা, ব্যাপারটা খুলে বলবেন তো!"

কর্নেল এই সময় মেঝের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলেন। দেখলাম, উনি একই ভঙ্গিতে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন। তারপর বারান্দা থেকে নেমে পোড়ো জমিটা পেরিয়ে কবরখানার দিকে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। অস্বস্তিতে গা শিরশির করছিল। রামবাবুর দিকে ঘুরে রাগ করে বললাম ফের, "ধুর মশাই! আপন মনে কী বিড়বিড় করছেন? বলুন তো কী হয়েছে?"

রামবাবু দুপাশে মাথা দুলিয়ে বললেন, "জানি না! সত্যি জানি না! জয়ন্ত, তুমি কি কখনও দেখেছ, কবর ফাঁক করে আস্ত মড়া প্রকাণ্ড গিরগিটির মতো ঢুকে যাচ্ছে?"

"আপনি দেখেছেন?"

"হুঁউ দেখেছি। জাস্ট বিশ বাইশ ফুট দূরে।" রামবাবু গলার স্বর চাপলেন। "তোমাকে বলব কী জয়ন্ত, এ জিনিস স্বপ্নেও দেখা যায় না। স্বপ্নেও অনেক

উল্টো জিনিস দেখা যায় বটে। দেখে বর্ণনা দেওয়াও যায় না অনেক সময়। তবে এইমাত্র যা দেখে এলাম, আমি ইন ডিটেলস বর্ণনা করতে পারি। হ্যাঁ—তুমি বলবে, আমার হাত কলমে খোলে না, ক্যামেরায় খোলে। তাহলে কেন আমি ক্যামেরায় ধরে রাখিনি? জয়ন্ত, তুমি তো জানো, সেবার কৃষকমজুর পার্টির নেতা মনোরঞ্জনবাবুকে স্ট্যাব করার মোমেন্টেও আমার মাথার ঠিক ছিল এবং সেই ঘটনা ছবিতে ধরে ফেলেছিলাম। কাজেই, আমার নার্ভ শক্ত। তুমি আমাকে আর যাই ভাবো, আশা করি ভিতু ভাবতে পারবে না। কিন্তু এ দৃশ্য তো অবাস্তব। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।..."

রামবাবুর ঝরনা খুলে গেছে। আপাতত বন্ধ করার কোনো উপায় নেই ভেবে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, কর্নেল কবরখানায় দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে কিছু দেখছেন। একটু পরে মুখ তুলে এদিকে ঘুরলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকলেন। তখন পোড়ো জমিটার ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলাম।

কাঠের ছোট্ট ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম চারদিকে অসংখ্য কবর। তার ভেতর কোনো কোনোটা সাদা বা কালো পাথরের এবং বেশিরভাগই লাইমকংক্রিটের। অনেক কবরের মাথায় খাড়া একটুকরো দেয়াল। দেয়ালে ফলক আঁটা। ফলকে ফার্সি এবং ইংরেজি হরফে মৃতের নাম ও জন্মমৃত্যুর তারিখ লেখা আছে। কিছু কবরের ওপর ছোটো ছোটো থামে চাপানো খুদে গম্বুজও আছে। কবরখানায় গাছপালা প্রচুর। ফুলের গাছও যথেষ্ট । কর্নেলের কাছে পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। কারণ কবরগুলোর ফাঁকে প্রচুর ঝোপ আর ইট বা পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। কর্নেল যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে প্রকাণ্ড একটা কাঠমল্লিকার গাছ। অজস্র শাদা ফুল ফুটে আছে এবং অজস্র ফুল ছড়িয়ে রয়েছে কবরগুলোতে। কর্নেলের কাছে গিয়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমি ভাবতে পারিনি উনি কিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে গিয়েই যা দেখলাম আমারও রামবাবুর মতো অবস্থা হল। গলা শুকিয়ে গেল। মাথা ঘুরতে থাকল। একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে রাখলাম।

একটা কালো পাথরের কবরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা লোক। তার মাথার পেছনটা একেবারে থ্যাতলানো। চুলে চাপচাপ রক্ত। লোকটার পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। একটা পায়ে হাল্কা রবারের চটি কোনোভাবে আটকে আছে, অন্য পা খালি। সে কালো পাথরের কবরটা দুহাতে আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে আছে এবং তার পা দুটো নিচে ঝুলছে।

কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "জয়ন্ত! তুমি শিগগির গিয়ে বেগমসায়েবাকে খবর দাও। আর বলো, উনি যেন এখনই থানায় কাউকে দিয়ে খবর পাঠান, কবরখানায় একটা খুন হয়েছে। দেরি কোরো না! যাও।"

রামবাবুর মতোই উর্ধশ্বাসে ফিরে গেলাম। তারপর ঘরে ঢুকে ভেতরের

দরজার কড়া নাড়লাম কাঁপাকাঁপা হাতে। রামবাবু আপন মনে তখনও বিড়বিড় করছিলেন। আমাকে দেখে কিছু বললেন সম্ভবত। কী বললেন আমার মাথায় ঢুকল না। তবে দেখলাম, এতক্ষণে নিজের জুতোর দিকে ওঁর চোখ গেছে এবং "এ কী! এত লাল রঙ লাগল কোথায়" বলে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজা খুলে এক পরিচারিকা মৃদু স্বরে বলল, "বলিয়ে সাব!"

জলদি বেগমসায়েবাকো খবর দো! জরুরি বাত হ্যায়।"

বেগমসায়েবা তার পেছনেই ছিলেন। এগিয়ে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে ভদ্রতাসূচক আদাব দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "কী হয়েছে জয়ন্তবাবু?"

"কবরখানায় কেউ খুন হয়ে পড়ে আছে। কর্নেল কাউকে থানায় খবর দিতে বললেন।"

শামিম-আরা চমকে উঠেছিলেন। তারপর ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। মৃদুস্বরে পরিচারিকাকে কিছু বললেন। মেয়েটি চলে গেল ভেতরে। তখন শামিম-আরা পা বাড়িয়ে বললেন, "চলুন তো দেখি!"

রামবাবু বারান্দার নিচে ঘাসে জুতো ঘষে সাফ করতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের লক্ষ্যও করলেন না। কবরখানায় কর্নেলের কাছে পৌঁছেই শামিম-আরা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর নিহত লোকটিকে দেখেই বলে উঠলেন, "হায় খোদা! এ যে দেখছি তাহের দর্জি!"

কর্নেল বললেন, "তাহেরমিয়া কোথায় থাকেন?"

শামিম-আরা আঙুল দিয়ে কবরখানার পূর্বদিকটা দেখিয়ে বললেন, "ওদিকে প্যালেসের আস্তাবল ছিল। কয়েকটা ঘর এখনও আস্ত আছে। সেখানে একটা ঘরে তাহের থাকে। কিন্তু কবরস্তানে ও কেন এসেছিল?"

কর্নেল বললেন, "এই দেখুন রক্তের দাগ। পূবদিক থেকে এদিকে এসেছে। তার মানে তাহের মিয়াকে আঘাত করার পর উনি আহত অবস্থায় এদিকে ছুটে এসেছিলেন। ছুটেই এসেছিলেন। কারণ রক্তের দাগ থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। এসে এখানে পড়ে গেছেন এবং মৃত্যু ঘটেছে।"

শামিম-আরা যে খুব শক্ত মনের মহিলা, তা বুঝতে পারছিলাম। কর্নেল রক্তের দাগ অনুসরণ করলে তিনিও এগিয়ে গেলেন। আমিও টাটকা এবং রক্তাক্ত মড়ার কাছে একা দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষপাতী নই। ওঁদের পেছন-পেছন গেলাম।

পূর্বসীমানার নিচু দেয়ালের এধারে দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন, "মনে হচ্ছে এখানেই আচমকা তাহের মিয়ার মাথায় পেছন থেকে শক্ত কোনো জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। হুঁ—এই যে ওঁর একপাটি চটি পড়ে আছে। যাই হোক, পুলিশ আসুক।"

শামিম-আরা আস্তে বললেন, "আমার স্বামীকেও ঠিক একইভাবে খুন করা হয়েছিল।"

"কোথায় ওঁর ডেডবডি পড়ে ছিল, জানেন?"

"জানি। আসুন, দেখাচ্ছি।" শামিম-আরা এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। যেতে যেতে বললেন, "তখন গ্রীষ্মকাল। ভোরবেলা আমার মেয়েরা ওদের দাদামশাইয়ের কবরে ফুল দিতে এসে তাদের বাবাকে ঠিক ওই অবস্থায় দেখতে পায়।"

ডানদিকে একটা সিমেন্টের কবর দেখিয়ে বেগমসায়েবা বললেন, "এটা আমার বাবার কবর। আর এই যে দেখছেন কালো পাথরের কবর, এখানে আমার স্বামীর লাশ পড়ে ছিল।"

কর্নেল বললেন, "সে-রাতে আপনার স্বামী বাড়ি ছিলেন না?"

"ছিলেন। ওঁর অভ্যাস ছিল খুব ভোরে উঠে গঙ্গার ধারে নিজামতি মসজিদের চত্বরে নমাজ পড়া। ওখানে কেউ নমাজ পড়তে যায় না। তাছাড়া মসজিদটা পড়ো-পড়ো অবস্থায় আছে।" শামিম-আরা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললেন, "তো সেদিন তাই ভেবেছিলাম। একটু বেলা হলে আমার মেয়েরা কবরখানায় এল ফুল দিতে। তারপর..."

শামিম-আরা হঠাৎ চুপ করলেন। কর্নেল বললেন, "তাহের মিয়ার বাড়িতে কে আছে?"

"আর কেউ নেই। তাহের একা থাকত। ওর বিয়ে হয়েছিল। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। বউটা রোগে ভুগে মারা যায়। তারপর আর বিয়ে করেনি। আসলে তাহেরের বরাবর একটু রাগী স্বভাব। স্বার্থপর, একানড়ে যাকে বলে। এমন লোককে কে মেয়ে দিতে চাইবে?"

আমরা নিহত তাহেরের কাছে ফিরে এলাম। এতক্ষণে দেখলাম, একটু তফাতে গম্বুজওয়ালা উঁচু প্রাচীন একটা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শামিম-আরার যমজকন্যা। দেখে সত্যি চোখ ঝলসে গেল। মুখের গড়ন যাই হোক, এমন আশ্চর্য গায়ের রঙ আমি কখনও দেখিনি। দুই বোনই মায়ের মতো শাড়ি পরে আছে। দুজনের চেহারা হুবহু এক। বয়স আঠারো-উনিশের মধ্যে বলেই মনে হল। শামিম-আরা ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন কাছে এবং চাপা স্বরে সম্ভবত বকে দিলেন। তখন ওরা বিষণ্ণভাবে চলে গেল।

শামিম-আরা আমাদের কাছে এসে একটু হেসে বললেন, "আমার স্বামী বলতেন, 'তোমাদের বংশের জান খুব শক্ত।' ঠিকই বলতেন। ওই যে দেখলেন, খুনখারাপি দেখেও ভড়কায়নি। দিব্যি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে দেখছিল।"

কর্নেল বললেন, "কবরখানায় আসতেও ওরা বোধ করি ভয় পায় না?"

শামিম-আরা বললেন, "এটা মুসলিমদের একটা ধর্মীয় সংস্কার আসলে। কবরখানাকে কোনো মুসলিম ভয়ের জায়গা বলে মনে করে না। বরং ভয় পাওয়ার সময় কবরখানাকেই নিরাপদ মনে করা হয়। প্রত্যেক মুসলিম বিশ্বাস করে, বিপদে পড়ে কবরখানায় ঢুকলে মৃত মুসলিমদের আত্মা তাকে বাঁচাবে। এই অদ্ভুত সংস্কার অন্য ধর্মের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয়।"

"বুঝেছি। সেজন্যে অনেক মুসলিম পরিবারকে দেখেছি বাড়ির উঠোনেই কবর দেন প্রিয়জনদের।"

আমি বললাম, "তাই তো! কলকাতার তিলজলা এলাকায় আমার এক মুসলিম বন্ধুর বাড়ির উঠোনে তার বাবা-মায়ের কবর দেখেছি।"

কর্নেল বললেন, "বেগমসায়েবা, থানায় কাকে পাঠিয়েছেন খবর দিতে?"

শামিম-আরা বললেন, "আবুর যাওয়ার কথা। আমি গিয়ে বরং দেখি, মিনা ওকে পাঠাল নাকি।"

শামিম-আরা চলে গেলেন ব্যস্তভাবে। কর্নেল নিহত তাহের দর্জির দিকে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে কী দেখতে থাকলেন। এই সময় রামবাবু এসে পড়লেন হন্তদন্ত হয়ে। তাঁর হাতে ক্যামেরা। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, "সর্বনাশ! সর্বনাশ! একী দেখছি?"

বললাম, "রামদা গিরগিটির মতো একটা মড়াকে কবরে ঢুকতে দেখেছিলেন। তখন এই ডেডবডিটা দেখতে পাননি?"

রামবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "না তো! এ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! ওরে বাবা! এ কোথায় এসেছি আমরা? এ যে দেখছি মানুষ খুন! জয়ন্ত, ও জয়ন্ত, খুলে বলো তো ব্যাপারটা কী? আমার যে কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না!"

বলে ঝটপট ডেডবডির চারদিকে ঘুরে পটাপট শাটার টিপে কয়েকটা ছবি তুলে ফেললেন। কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন, "রামবাবু, আপনি ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা কোথায় দেখেছিলেন বলুন তো?"

রামবাবু বিচলিতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন। তারপর মাথা চুলকে বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না কর্নেল স্যার! একবার মনে হচ্ছে, শুঁটকো ডেডবডিটাকে ওই গম্বুজওয়ালা কবরে ঢুকতে দেখেছি—আবার মনে হচ্ছে, ওইখানটাতে। সঠিক মনে পড়ছে না।"

রামবাবু গম্বুজওয়ালা কবরটার দিকে কয়েক পা এগিয়েও গেলেন। কিন্তু বোধ করি, ভয় পেয়েই আর এগোতে পারলেন না। কর্নেল ভুরু কুঁচকে আবার পুবের পাঁচিল অব্দি গেলেন। তারপর দেখলাম, উনি কবরে কবরে চক্কর মেরে বেড়াতে শুরু করলেন। আমার গা ঘুলোচ্ছিল রক্ত দেখে! রামবাবুকে বললাম, "চলুন রামদা! পুলিশ যখন আসবে, আসুক। কর্নেলের এসব অভ্যাস আছে। উনি থাকুন। আমরা ঘরে গিয়ে বসি।"

রামবাবু সায় দিয়ে পা বাড়িয়ে বললেন, "চলো। আমারও অবস্থা শোচনীয়। এখন যদি এক কাপ গরম চা-ফা না পাই, কেলেঙ্কারি হবে। জয়ন্ত, আমার মনের অবস্থা এবার ভেবে দেখ। আমি যে তখন রঙ-টঙ ভেবে জুতো ঘষে সাফ করলাম, তা আসলে রক্ত। মানুষের রক্ত! ঔঃ! ভাবা যায় না—সত্যি, ভাবা যায় না!"

বেগমসায়েবার সেই পরিচারিকা মিনা ওপাশের খিড়কিতে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন

মুখে কবরখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। রামবাবু তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, "ওগো বিবিঠাকুরুন! একটুখানি—মানে থোড়া চায় পিলানে সেকো গি?"

মিনা বিশুদ্ধ বাংলায় বলল, "বসুন। করে দিচ্ছি।" তারপর সে বাড়িতে ঢুকে গেল।

এই গণ্ডগোলের সময় হাসতে ইচ্ছে করে না। তবু রামবাবু হাসিয়ে ছাড়লেন। বললাম, "রামদা, বিবিঠাকুরুন ব্যাপারটা কী?"

রামবাবু বারান্দায় উঠে বললেন, "মাথায় এসে গেল আর কী! তবে আশ্চর্য ব্যাপার দেখ জয়ন্ত, এরা দিব্যি বাংলা জানে তো! বোঝাই যায় না নবাববাড়ির লোকেরা বাংলায় কথা বলে!"

বললাম, "এতে অবাক হবার কী আছে? আর সে নবাবী তো নেই। এখন সাধারণ মানুষ হয়ে গেছেন। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। এই বাড়িটা দেখেও বুঝতে পারছেন না?"

রামবাবু চেয়ারে বসে বললেন, "তা তুমি ঠিক বলেছ। এতক্ষণে খেয়াল হল তাই তো ভাবছিলাম, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন নেই, মেঝেতে জাজিম বিছানো নেই, একেবারে গেরস্থ হাবভাব। অথচ লখনউতে সেবার এক নবাববাড়ির ছবি তুলতে ঢুকে তো চক্ষু ছানাবড়া হয়েছিল।" বলে ভেতরের দরজার দিকটা দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "তবে খাওয়া-দাওয়াতে একটু নবাবী গন্ধ টের পেয়েছিলাম রাত্রে। এখন ব্রেকফাস্টে কী দ্যায় দেখা যাক।...রামবাবু লখনউ নবাববাড়ির খাওয়ার সঙ্গে তুলনা শুরু করলেন।

একটু পরে মিনা দরজা খুলে দু কাপ চা নিয়ে এল। চা রেখে মৃদুস্বরে বলল, "বুড়োসায়েবকে চা পাঠিয়ে দেব, নাকি ওঁকে ডাকবেন?"

বললাম, "পাঠিয়ে দিতে পারো। উনি খেতে আপত্তি করবেন না।"

মিনা যেতে যেতে ঘুরে বলল, "আধঘণ্টার মধ্যে নাশতা তৈরি হয়ে যাবে। বেগমসায়েবা জানতে চাইলেন আপনাদের খুব খিদে পেয়েছে নাকি। তাহলে একটু করে সেমাই খেয়ে নেবেন।"

একটু হেসে বললাম, "আমার খিদে পায়নি। রামদা আপনার নিশ্চয় পেয়েছে?"

রামবাবু হাত নেড়ে তেতোমুখে বললেন, "এখন আধঘণ্টা চা ছাড়া গলা দিয়ে কিছু নামবে না। মনে হবে রক্ত খাচ্ছি!"

মিনা চলে গেলে বললাম, "রক্ত তরল পদার্থ। চাও—"

কথা কেড়ে রামবাবু ফ্যাঁচ করে হাসলেন। "তোমার মাইরি সবসময় ফক্কুরি। কর্নেল স্যারের কথা আলাদা। উনি গোয়েন্দা-টোয়েন্দা মানুষ। আচ্ছা জয়ন্ত, এখানে যে খুনখারাপি হবে, কর্নেল স্যার নিশ্চয় আভাস পেয়েছিলেন। কী বলো?"

আমার জবাব না পেয়ে বললেন, "কিন্তু লোকটা কে জানতে পেরেছ? বেগমসায়েবা তো গিয়েছিলেন দেখতে। কী বললেন?"

"ভদ্রলোকের নাম তাহের মিয়া। উনি একজন দর্জি।"

রামবাবু নড়ে উঠলেন হঠাৎ। "জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ঔঃ! আমি রক্তের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, জয়ন্ত! তার মানে, কবর থেকে একটা শুটকো মড়া দর্জি ভদ্রলোককে মেরে রক্তারক্তি করে কবরে ঢুকছিল, ঠিক সেই সময় আমার চোখে পড়ে যায়। ভাবা যায় না, জয়ন্ত! ভাবা যায় না!"

এই সময় আমার চোখে পড়ল, কবরখানার ভেতর খাকি পোশাকপরা লাল টুপিওয়ালা কিছু লোক ঢুকেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, পুলিশ এসে গেছে। প্রকাণ্ড চেহারার এক পুলিস অফিসার কর্নেলের সঙ্গে খুব হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছেন। রামবাবু বেরিয়ে এসে দেখে বললেন, "আমি যাই। আমার যাওয়া কর্তব্য। তুমিও এস জয়ন্ত! আমরা যে যা জানি, সব বলব।"

রামবাবুকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে বললাম, "প্লিজ রামদা! চুপচাপ বসুন তো! কর্নেল আমাদের গার্জেন। উনি যা বলবেন, আমরা তাই করব!"

রামবাবু একটু ভেবে সায় দিলেন। "হুঁ ঠিক, ঠিক বলেছ। কর্নেল স্যার যদি বলেন, তবেই আমার বলা উচিত যে আমি কবরে একটা জ্যান্ত মড়া ঢুকতে দেখেছি। নইলে মুখই খুলব না। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ভাবো, জয়ন্ত! গোরস্তানে একজন দর্জিকে একটা মড়া—ঔঃ! ভাবা যায় না!"

রামবাবু আপন মনে বকবক করতে থাকলেন।...

॥ মার্ডার উইপন আবিষ্কার ॥

নিজামতকেল্লার কবরখানায় কিছুক্ষণ খুব ভিড় হয়েছিল। পুলিশ ভিড় হটিয়ে না দিলেও মনে হচ্ছিল ওরা এমনিতে বড় নিস্পৃহ। একটু দেখেই কেটে পড়ল সবাই। পুলিসের মতে তাহের মিয়া দর্জি স্মাগলারদের হাতে খুন হয়েছেন।

সীমান্ত এলাকা। তাই এখানে স্মাগলারদের বড় ঘাঁটি। তাদের পিছনে রাজনৈতিক মদত থাকায় পুলিশ নাকি কিছু করতে পারছে না। ইদানীং তাহের দর্জির নামও পুলিশের খাতায় উঠেছিল। বিদেশী সিন্থেটিক কাপড়চোপড়, ঘড়ি আর ছোটখাট ইলেকট্রনিক যন্ত্র পদ্মা পেরিয়ে এ তল্লাটে আসে এবং জাহানাবাদ থেকে তা কলকাতা চালান যায়। তাহের মিয়া নিশ্চয় কিছু দামি মাল হজম করে ফেলেছিলেন। সেই নিয়ে গণ্ডগোল ঘটে থাকবে এবং রাগের বশে ওঁর মাথায় ইট-টিট মেরে পালিয়েছে কেউ।

সেই ইটটা অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও কবরখানায় অজস্র ইট পড়ে আছে। বডি মর্গে চালান করে পুলিশ অফিসার রথীশ ভদ্র আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে গেলেন। যাবার সময় কর্নেলকে বলে গেলেন, "এ আপনার স্যার মশা মারতে কামান দাগা হবে। এস পি সায়েব গতকাল রেডিও মেসেজে আপনার কথা বলেছিলেন। তবে আমি আপনাকে বলছি, এমন খুনোখুনি এ

তল্লাটে স্মাগলার আর অ্যান্টিসোস্যালদের ভেতর আকছার লেগে আছে। আমরা বলি, "মর তোরা নিজেরা-নিজেরা কাটাকাটি করে। যদুবংশ ধ্বংস হোক। বেঁচে যাই আমরা।"

অবশ্য কর্নেলের সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাহায্য উনি যথাসাধ্য করবেন, সে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলেন।

বললাম, "কর্নেল, জর্জিস খাঁ সাহেবের বডি তো একইভাবে কবরখানায় পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের সে-সম্পর্কে বক্তব্য কী? উনিও কি স্মাগলারদের সাথে জড়িত ছিলেন?"

রামবাবু তেতোমুখে বললেন, "আমাকে যে মুখ খুলতে দিলেন না। নইলে জিগ্যেস করতাম, স্মাগলারদের ঘাঁটিটা কি কবরের ভেতর?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "জিগ্যেস করলে আপনার কী বিপদ হত জানেন রামবাবু? পুলিশ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। উল্টে আপনাকে জেরার চোটে জেরবার হতে হত। যাই হোক, আপনাকে একটা বিষয়ে আবার মনে পড়িয়ে দিই। নিজামতকেল্লার ভেতর কোথাও কোনো পাগল দেখলে যেন তার ছায়া মাড়াবেন না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছিলেন বটে!" রামবাবু নড়ে বসলেন। "কিন্তু সকালে অতক্ষণ তো ঘোরাঘুরি করলাম। ছবিও তুললাম অনেক। কোনো পাগল-টাগল তো দেখলাম না!"

কর্নেল বললেন, "এস জয়ন্ত, গঙ্গার ওদিকটায় ঘুরে আসি। রামবাবু, আপনি যাবেন, নাকি বিশ্রাম করবেন?"

রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। "পাগলের কথা মনে করিয়ে দিলেন।" হাসতে হাসতে বললেন, "একা থাকি আর কোন পাগল এসে আমাকে একা পেয়ে মেরে রেখে যাক! চলুন, আর আমি আপনাদের সঙ্গ ছাড়ছি না।"

আমরা নিজামতকেল্লার ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। শীতের মিঠে রোদ্দুরে হাঁটতে আরাম পাচ্ছিলাম। কিন্তু জনহীন ধ্বংসপুরীর এখন দিনদুপুরেই কেমন ভয়-জাগানো রূপ। হয়তো খুনখারাপির প্রতিক্রিয়ায় আমারই মনের ভুল। যতবার পা ফেলছি, মনে হচ্ছে যেন ততবার একটু করে এগিয়ে আসছে আমারই অদৃশ্য এক আততায়ী। এই বিদঘুটে অনুভূতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ নয়। এদিকে রামবাবুর চাউনি দেখে মনে হচ্ছে, উনি পাগল খুঁজতে খুঁজতে হাঁটছেন। কিংবা সেই শুঁটকো জ্যান্ত মড়াটা পিছু নিয়েছে কি না দেখার জন্য বারবার পিছনেও ঘুরে দেখে নিচ্ছেন। কর্নেলের চোখে যথারীতি বাইনোকুলার। নিশ্চয় পাখিটাখির ডাক শুনে খোঁজাখুঁজি করছেন।

গম্বুজ ও মিনারওয়ালা বিশাল মসজিদের কাছে গিয়ে হঠাৎ লম্বা পা ফেলে কর্নেল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রামবাবু চমকানো স্বরে 'সর্বনাশ' বলে দৌড়ুলেন সেদিকে। আমিও রামবাবুকে অনুসরণ কলরাম।

রামবাবু একটা খাড়া দেয়াল এবং মসজিদের মাঝখানে গলির ভেতর ঢুকে বলে উঠলেন, "ওই যে কর্নেল স্যার!" তারপর খাড়া দেয়ালের একটা ফোকর গলিয়ে ঢুকে গেলেন। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা খোলা চত্বর। তার ওধারে গাছের ফাঁকে গঙ্গার জল ঝিকমিক করছে। রামবাবু গঙ্গা দেখেই হাসিমুখে ঘুরে হাত-ইশারায় আমাকে ডাকলেন। তারপর মনে হল উনি গঙ্গার ছবি তুলতেই যাচ্ছেন। চত্বরের শেষপ্রান্তে ধ্বংসস্তূপ আর গাছপালা। রামবাবু সেখানে উধাও হয়ে গেলে আমি ফোকর গলিয়ে ঢুকে গেলাম চত্বরে।

কিন্তু গঙ্গার ধারে পৌঁছে আর রামবাবু বা কর্নেল কাউকে দেখতে পেলাম না। নির্জনে একা কোনো ঐতিহাসিক জায়গায় গেলে এমনিতেই কেমন গা ছমছমকরা এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। তার ওপর খুনখারাপির টাটকা স্মৃতি মনে জ্বলজ্বল করছে। নিজেকে ভীষণ একা লাগল। ডাকলাম, "রামদা, রামদা!"

কোনো সাড়া পেলাম না। আরও কয়েকবার ডেকে একটা গাছের নিচে প্রকাণ্ড এক লাইমকংক্রিটের চাবড়ার ওপর হতাশভাবে বসে পড়লাম। ভাবলাম, রামবাবু যেখানেই থাকুন, আমার খোঁজে এদিকেই ফিরে আসবেন। কর্নেলের কথা অবশ্য আলাদা। হয়তো এবেলার মতো কোনো পাখির পেছনে ঘোরাঘুরি করেই কাটিয়ে দেবেন। স্নানাহারের কথা মনেও থাকবে না।

সবে সিগারেট ধরিয়েছি, পেছনে পায়ের শব্দ হল। বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। কিন্তু ঘুরে দেখি, সেই যমজ বোন আসতে আসতে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। একজনের ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি, অন্যজন গম্ভীর। চোখে চোখ পড়লে তারা কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব দিল।

আমিও আদাব দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আসুন, আসুন! আলাপ করা যাক!"

হাস্যমতী সঙ্গিনীর কাঁধ ধরে ঠেলে নিয়ে এল। তারপর বলল, "আপনি সাংবাদিক—তাই না?"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ। আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী।"

"জানি। আমরা দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় আপনার নাম দেখেছি।"

আরও অবাক হয়ে বললাম; "বলেন কী! আপনারা বাংলা পড়তে পারেন?"

গম্ভীর বোনটি ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, "কেন পারব না? আমরা তো এখানকার বাংলা স্কুলে পড়েছি।"

হাস্যমতী বলল, "আমরা উর্দুও জানি। বাংলাও জানি। একটু-আধটু ইংরেজিও জানি।"

"আপনাদের কার কী নাম এখনও জানি না কিন্তু।"

হাস্যমতী বলল, "আমার নাম রুন্না। আমার আপার নাম—সরি, দিদির নাম মুনা।"

"আপনাদের দেখে একবয়সী মনে হয়!"

রুনা বলল, "হবেই তো! মুনা আমার চেয়ে আধঘণ্টার বড়।" বলে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মুনা ভুরু কুঁচকে ইশারায় তার বেহায়া বোনটিকে ভর্ৎসনা করল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করল না। বললাম, "আপনারা বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছেন?"

রুনা বলল, "আমাদের আপনি-আপনি করছেন কেন? তুমি বলুন। কর্নেলসায়েব তো সকালে দেখামাত্র তুমি বললেন! কর্নেলসায়েব কোথায় গেলেন?"

একটু হেসে বললাম, "হারিয়ে ফেলেছি ওঁকে।"

মুনা আস্তে বলল, "আপনি এখানে কতক্ষণ আছেন জয়ন্তবাবু?"

"বেশিক্ষণ নয়। কেন?"

"আমার ছোটমামাকে দেখেছেন এখানে?"

রুনা বলল, "উনি চিনতে পারবেন না দেখলেও।"

বললাম, "নিশ্চয় পারব। ছোটনবাব নাসির খাঁকে না দেখে থাকলেও চিনতে হয়তো অসুবিধে নেই। কারণ শুনেছি উনি পাগল হয়ে গেছেন।"

"মুনা বলল, "দেখেননি, তাই না?"

"না। আপনারা কি তাঁর খোঁজেই এসেছেন?"

রুনা চাপা স্বরে বলল, "প্লিজ জয়ন্তবাবু যেন মায়ের কানে না ওঠে। মা যদি জানতে পারেন, আমরা ছোটমামাকে খুঁজে বেড়াই, মেরে ফেলবেন একেবারে।"

মুনা দুঃখিতভাবে বলল, "ছোটমামাকে মাঝেমাঝে দেখতে পাই দূর থেকে। কিন্তু সেখানে এসে আর খুঁজে পাই না। একটু আগে বাড়ির ছাদ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম, ওই পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।"

পাঁচিলটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে বললাম, "কিন্তু উনি তো শুনেছি পাগল। তাছাড়া তোমাদের বাবাকে নাকি উনিই—"

দুই বোন একসঙ্গে বলে উঠল, "না। আমরা বিশ্বাস করি না।"

"বেগমসায়েবা বিশ্বাস করেন?"

"মায়ের মাথায় বড়মামা ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।" মুনা রাগের সঙ্গে বলল। "বড়মামা কলকাতায় বসে খালি কলকাঠি নাড়ছেন।"

"একটা কথা জিগ্যেস করি। কলকাতায় তোমাদের বড়মামার বাড়িতে বিড্ডু নামে একটা লোক থাকে।"

কথা কেড়ে রুনা বলল, "হ্যাঁ। বিড্ডু প্যালেসের বাবুর্চি ছিল। এখনও সে আছে নাকি?"

"আছে। তোমরা বড়মামার কাছে যাও না বুঝি"।

"দু বছর যাইনি। বাবা মরে যাওসার পর আর কোথাও যাওয়াই হয় না।" রুনা জিগ্যেস করল ফের, "বিড্ডুর কথা বলছিলেন। কী ব্যাপার?"

"বিড্ডু চুপিচুপি বলছিল, বড়নবাব ছোটনবাবকে একটা ছবির জন্য ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছেন।"

কথাটা বলে দুই বোনের মুখের দিকে নজর রাখলাম। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। রুন্না একটু হাসল। "সকালে কর্নেলসায়েবও এই কথা বলছিলেন। শুনে গিয়ে মাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মা খুব বকাবকি করে বললেন, বিড্ডু মিথ্যাবাদী, চোর, দাগাবাজ"।

"বিড্ডু বলছিল, একটা তসবিরের জন্যে কী গণ্ডগোল হয়েছিল। তো তোমরা তেমন কোনো ছবি ছবির কথা কি শুনেছ?"

মুনা বলল, "কর্নেলসায়েবও তাই জিগ্যেস করছিলেন। কিছু বুঝতে পারিনি তখন।" বলে সে বোনের দিকে ঘুরল। "আচ্ছা রুন্না, আমার এখন মনে হচ্ছে, বিড্ডু সেই ছবিটার কথা বলেনি তো?"

রুন্না বলল, "ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি।"

মুনা আমার দিকে ঘুরে চাপা স্বরে বলল, "ওদিকে একটা বাড়ি ছিল, তার নাম ছিল খাজাঞ্চিখানা। ট্রেজারি। ছোটবেলায় শুনেছি, সেখানে ইটপাটকেল সরালে নাকি মোহর পাওয়া যেত আগের দিনে। বাবা এই কেল্লাবাড়ির কেয়ারটেকার হওয়ার পর সেখানে একটা পুরনো সিন্দুক খুঁজে পেয়েছিলেন।"

রুন্না ঝটপট বলল, "আমরা দেখিনি। নানী—মানে আমার মায়ের মা গল্প করতেন, সিন্দুকে অনেক বাঁধানো ছবি ছিল। প্যালেস ভেঙে পড়ছিল, তখন ছবিগুলো আমার নানীর শ্বশুর......"

মুনা কথা কেড়ে বলল, "তাঁকে সবাই বলত গুন্নুনবাব। তিনিই ছবিগুলো সিন্দুকে ভরে খাজাঞ্চিখানায় রেখেছিলেন।"

রুনা বলল, "সব ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাবা রান্নাঘরে জ্বালানি করতে দিয়েছিলেন। একটা ছবি মোটামুটি আস্ত ছিল। সেখানা বাইরের ঘরে—আপনারার যে ঘরে আছেন, সেই ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন বাবা।"

জিগ্যেস করলাম, "কিসের ছবি?"

মুনা বলল, "বোররাখের।"

"বোররাখ্ কী?"

রুনা বলল, "আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ধর্মের প্রফেট সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন খোদার কাছে—জানেন তো? তখন ওঁকে এক দেবদূত—আমরা বলি ফেরেশ্‌তা, ওই বোররাখে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বোররাখ্ হল একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া, কিন্তু তার মুখ সুন্দরী মেয়ের। মাথায় লম্বা চুল আর একটা তাজ পরানো। তাজ কী জানেন তো? আপনারা যাকে বলেন মুকুট।"

মুনা বলল, "বাবার কাছে শুনেছি, ছবিটা দিল্লির মোগল বাদশাহাদের হারেম ছিল। বাদশাহ আলমগীর—মানে ঔরঙ্গজিব তো খুব ধর্ম মানতেন। ইসলামে জীবজন্তুর ছবি আঁকা বারণ। তাই ছবিটা উনি ফেলে দিয়েছিলেন। আমার নানার বংশের এক নবাব সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই নিজামতকেল্লার প্যালেসে টাঙিয়ে রেখেছিলেন।"

বললাম, "তাহলে খুব পুরনো ছবি! তা ছবিটার কী হল?"

"বলছি।" মুনা ঢোক গিলে বলল। "ছবিটা সেবার বড়মামা এসে দেখতে পেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। মা বললেন, ছবি তো নিয়ে গিয়ে বেচে দেবেন আপনি। এ ছবির অনেক দাম পাওয়া যাবে। আমার মেয়েদের—"

সলজ্জভাবে মুনা থামলে রুনা বলল, "বলতে লজ্জা কী রে আপা? আমাদের বিয়ের জন্য টাকা লাগবে। তাই মা বললেন আমি তো সম্পত্তির কানাকড়ি পাইনি। সবই আপনারা দু ভাই মিলে বেচে টাকা নিয়েছেন। ছবিটা আমাকে দেবেন না? তাই শুনে বড়মামা বললেন, ঠিক আছে। তবে সাবধান, নাসির জানতে পারলে দাবি করবে।"

মুনা বলল, "বড়মামা চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে—সঠিক মনে পড়ছে না, ছবিটা কীভাবে চুরি গিয়েছিল। তার কিছুদিন পরে—"

রুনা বলল, "তিন মাস পরে। মার্চে বড়মামা এসেছিলেন আমার মনে আছে। আমরা স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম না তখন?"

মুনা বলল, "হ্যাঁ—মে মাসে পরীক্ষা হল। সেই সময় ছবিটা চুরি গেল। পরের মাসে—"

"১৬ জুন।" রুনা ধরা গলায় বলল। "বাবা মার্ডার হয়েছিলেন ওইদিন ভোরে।"

হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, "তোমরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করো?"

দুই বোনই অবাক হয়ে তাকাল। তারপর একসঙ্গে বলল, "কেন?"

"এমনি জিগ্যেস করছি। কবরখানার কাছে তোমাদের বাড়িটা। তাই জানতে ইচ্ছে করছে, কখনও ওখানে ভূতপ্রেত দেখেছ নাকি?"

মুনা ও রুনা পরস্পর তাকাতাকি করছিল। তারপর মুনা গম্ভীর মুখে বলল "কবরখানায় একজন জিন থাকে শুনেছি। জিনেরা তো ভূতপ্রেত নয়। কোরান শরিফে আছে, খোদা মানুষকে মাটি থেকে আর জিনকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন। জিনেরা থাকে আকাশে অন্য এক দেশে।"

রুনা বলল, "অন্য কোনো প্ল্যানেটে থাকে ওরা। পৃথিবীতে আসে মাঝেমাঝে। তখন জায়গাটা আলো হয়ে যায়। মা বলছিলেন, যে জিনটা কবরখানায় থাকে, সে কোনো দোষ করে জিনমুল্লুক থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছে। কোনো-কোনো রাতে মা দেখেছেন, কবরখানায় আলোর ছটা ঝলমলিয়ে ওঠে।"

ওদের সরলতা দেখে অবাক হলাম না। বরং মুগ্ধ হওয়ার মতো অপাপবিদ্ধ সরলতা। একটু হেসে বললাম, "তোমরা কখনও দেখনি? নাকি দেখেছ?"

রুনা বলল, "পরশু রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ শীত। তাই জানলা বন্ধ ছিল। বাথরুমে যাব বলে আপাকে ডাকলাম। আপা বলল, মাকে ওঠা—নয়তো মিনাকে ওঠা। মায়ের যা ঘুম! তাই মিনাকে ডেকে ওঠালাম। মিনা মেঝেয় শুয়ে থাকে। কিন্তু সুইচ টিপে দেখি, লোডশেডিং। জাহানাবাদে

লোডশেডিং খুব কম হয়। তো মিনা মোম জ্বালবার জন্য দেশলাই হাতড়াচ্ছে। আমি দরজা খুলেছি। বাথরুম তো উঠোনের ওধারে। ঘরের বারান্দাটা বেশ উঁচু। হঠাৎ পাঁচিলের ওধারে কবরখানার দিকে আলোর ছটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মিনা মোম জ্বেলে বেরিয়ে সেও অবাক হল—দুজনেই বুঝলাম কবরখানায় জিনটা বেরিয়েছে।" রুন্না খিলখিল করে হেসে উঠল। "ভয়ে আর বাথরুম যাওয়াই হল না।"

মুনা বলল, "ভোরে নানার কবরে ফুল দিতে গিয়ে দেখি একখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে শুকনো পাতা পুড়ে ছাই হয়ে আছে। জিনের ছটা লাগলে সব পুড়ে ছাই হয় যে!"

রুন্না কী বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছে, এই সময় ধ্বংসস্তূপের পেছন থেকে এবং ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন রামবাবু। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "পালাও জয়ন্ত! পালাও! পাগল ইট নিয়ে দৌড়ে আসছে!" তারপর আর দৃকপাত না করে চত্বর দিয়ে দৌড়ে দেয়ালের সেই ফোকর গলিয়ে উধাও হলেন।

হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। মুনা ও রুন্না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রামবাবুকে পালাতে দেখছিল। রামবাবু অদৃশ্য হলে দুজনে মুখ তাকাতাকি করে রামবাবু যেদিক থেকে এসেছেন, সেইদিকে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল।

ডাকলাম, "মুনা! রুন্না! তোমরা যেও না!" কিন্তু ওরা কথা কানে নিল না। তখন উদ্বেগে এবং সাবধানে সেদিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। স্তূপটা পেরিয়ে দেখি, দুই বোন হনহন করে এগিয়ে চলেছে। গঙ্গার একেবারে পাড়েই একটা প্রকাণ্ড দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকেও বিরাট ধ্বংসস্তূপ এবং আগাছা। একটা টিলার মতো দেখাচ্ছে জায়গাটি। সেই দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় কিছুক্ষণের মধ্যে একটা মূর্তি এসে দাঁড়াল। ধূসর আকাশের পটে ছেঁড়াখোঁড়া প্যান্ট আর তেমনি নোংরা ছেঁড়া একটা পাঞ্জাবি তার পরনে। মাথায় একরাশ চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। পাগলই বটে। অর্থাৎ পাগলাদের ওই চেহারাটি পেটেন্ট বলা যায়। তবে এই পাগলের হাতে একটুকরো আধলা ইট দেখে আর পা বাড়াতে ভরসা হল না।

দুই বোন নিচে থেকে চিৎকার করে ডাকছিল, "মাম্মুজান! মাম্মুজান!" তাদের কণ্ঠস্বরে কান্না ছিল। কিন্তু পাগল নাসির খাঁ ভাগ্নীদের দিকে ভুলেও তাকাতে যেন রাজি নন। সম্ভবত তিনি উঁচু জায়গায় উঠে রামবাবুকেই খুঁজছেন।

একটু পরে পূর্বদিকে ঘুরে কোথাও হয়তো পলাতক ফোটোগ্রাফার ভদ্রালোককেই দেখতে পেলেন। কারণ তখনই হুঙ্কার দিয়ে সেদিকে নামতে শুরু করলেন। আম উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম ঝোপের আড়ালে।

মুনা ও রুন্না "মাম্মুজান" বলে ডাকতে ডাকতে অদৃশ্য হল। রামবাবু যদি

ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারেন, দরজা এঁটে দিলে পাগল নাসির খাঁয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবেন। এ মুহূর্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, মুনা-রুন্নার বাবা জর্জিস খাঁ এবং তাহের দর্জি ইটের আঘাতেই মারা পড়েছেন! আর সেই ইট মেরেছে এই নাসির খাঁই।

হ্যাঁ, জর্জিস সাহেবের মৃত্যুর সময় নাসির পাগল ছিলেন না, তা ঠিক। তবে রাগের বশে ইট ছুড়ে মারা সুস্থ মানুষের পক্ষেও তো সম্ভব। সুস্থ অবস্থায় যে ইট ছুড়ে মারে, পাগল হয়ে গেলে সে ইট আরও জোরে ছুড়েই মারবে।

যুক্তিটা আমার খুব মনঃপূত হল। গরিব হয়ে যাওয়া নবাব পরিবারে পূর্বপুরুষের সংগৃহীত কোনো প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি এবং পরিণামে খুনোখুনি হয়ে যেতেই পারে—কারণ সেই ছবিটার দাম নিশ্চয় বহু টাকা। বিশেষ করে আমেরিকার বাজারে পুরনো পেন্টিং বেচবার মওকা পেলে লক্ষপতি হবার চান্স আছে। কর্নেলকে এবার সূত্রগুলো ধরিয়ে দেওয়া দরকার। অথচ উনি খালি পাখি পাখি করেই আরেক পাগল।

কর্নেলের খোঁজে গঙ্গার পাড় ধরে হাঁটতে থাকলাম। সেই টিলার মতো ধ্বংস স্তূপ বুকে-নেওয়া বিশাল দেয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে বাঁদিকে একটা গলিপথ পাওয়া গেল। দুধারে ভাঙাচোরা দুটো বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গলিটার একেবারে শেষে একপলকের জন্য কাউকে চোখে পড়ল, যার মাথায় টুপি আছে এবং মুখে দাড়িও। চেঁচিয়ে ডাকলাম, "কর্নেল! কর্নেল!" তারপর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম গলিপথে।

একটা বিশাল খোলামেলা চত্বরে পৌঁছুলাম। দেখলাম কর্নেল হনহন করে হেঁটে চলেছেন। চত্বরের শেষে গিয়ে ওঁকে ডাকতেই উনি শুধু ইশারায় আমাকে অনুসরণ করতে বললেন। একটা ভাঙা ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে ওদিকের আরেকটা দরজা পার হয়ে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

আমরা মুনা-রুন্নাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। কিন্তু দৃশ্যটা সত্যি অবাক হবার মতো। পাগল নাসির খাঁয়ের হাতে ইটটা এখনও আছে এবং রামবাবু তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে ক্যামেরা তাক করে তাঁকে ইশারায় পোজ নিতে নির্দেশ দিচ্ছেন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে যমজ বোন দুটি ছবি তোলা দেখছে।

কর্নেল ও আমি এগিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলে। রামবাবু, নাসির খাঁ কেউই আমাদের গ্রাহ্য করলেন না। একটা কামান মাটির স্তূপ থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। সেই কামানের কাছে নাসির খাঁকে দাঁড়াতে ইশারা করলেন রামবাবু। তখন নাসির খাঁ হাতের ইটটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে সেই নির্দেশ পালন করলেন। রামবাবু মুচকি হেসে বললেন, "ওক্কে! রেডি!"

উনি ক্যামেরার শাটার টিপেছেন, সেই সময় নাসির খাঁ ঘুরে কর্নেল ও আমাকে দেখলেন। দেখামাত্র ওঁর মুখে প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ পড়ল। অস্ফুট স্বরে

দুর্বোধ্য কিছু বলে উনি দৌড়ে গিয়ে কবরখানায় ঢুকলেন। তারপর কবরখানার দক্ষিণের নিচু পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

রামবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, "পাগল বশ করার পক্ষে ক্যামেরার চেয়ে মোক্ষম আর কিছু নেই। ঔঃ, ভাবা যায় না—বুদ্ধিটা মাথায় না এলে কী ঘটে যেত। আমি দর্জি ভদ্রলোকের মতো এখানে—ঔঃ, ভাবা যায় না।"

বললাম, "ব্যাপারটা খুলে বলুন তো রামদা!"

রামবাবু একগাল হেসে বললেন, "দৌড়ুতে গিয়ে গোলোকধাঁধায় পড়েছিলাম। এখানে এসেও চিনতে পারছিলাম না কোন্ পথে যাব। তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ততক্ষণে সিধে নাকবরাবর এসে পড়েছে পাগলা নবাব। ইট তুলতেই ক্যামেরা তাক করে ধরলাম। অমনি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "তসবির খিঁচো।"

হঠাৎ চোখে পড়ল, কর্নেল নাসির খাঁয়ের ফেলে যাওয়া ইটের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে কী দেখছেন। তারপরই আবিষ্কার করলাম আধলা ঝামা ইটটাতে জমাটবাঁধা রক্ত রয়েছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল।......

॥ কবরখানার এক বাসিন্দা ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রামবাবু কলকাতা ফিরে গেলেন। কর্নেল সেই 'মার্ডার উইপন'—ঝামা ইটের টুকরোটা আতস কাচের সাহায্যে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলেন। সেই সময় মুনা-রুন্নার কাছে শোনা 'বোররাখ'-এর ছবির ব্যাপারটা বললাম ওঁকে। কবরখানার সেই জিনটির কথাও বললাম—যে নাকি মহাকাশের কোন গ্রহের প্রাণী এবং ফেরারি হয়ে পৃথিবীতে অজ্ঞাতবাসে আছে। এও বললাম, "সেই গ্রহের পুলিশ এসে আসামিকে গ্রেফতার করলে দারুণ ব্যাপার হবে—কী বলেন? জিন-পুলিশেরা মানুষ-পুলিশ থেকে নিশ্চয় বেশি তেজী। তাদের বন্দুক-পিস্তল থেকে গুলির বদলে সম্ভবত লেসার রশ্মি বেরোয়।"

কর্নেল আমার রসিকতায় একটুও হাসলেন না। ইটটাকে হাতে নিয়ে বেরুলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম, সেটাকে ছুড়ে পোড়ো আগাছার জমিতে ফেলে দিলেন। বললাম, "এ কী করলেন! মার্ডার উইপন ফেলে দিলেন কেন?"

কর্নেল ঘরে ঢুকে মুচকি হেসে বললেন, "তুমি অবভাস-তত্ত্ব কাকে বলে জানো, জয়ন্ত?"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "তত্ত্ব-টত্ত্ব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু হাতে মার্ডার উইপন পেয়েও—"

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, "অবভাস-তত্ত্ব অনুসারে হোয়াট অ্যাপিয়ারস ইজ নট রিয়্যাল—যা প্রতীয়মান, তা বাস্তব নয়। যেমন ধরো, রেললাইনে দাঁড়িয়ে

দূরের দিকে তাকালে মনে হবে দুটো লাইনের ব্যবধান কমতে কমতে ক্রমশ একত্র মিশে গেছে। কিন্তু বস্তুত তা নয়। দুটো লাইন সমান্তরাল থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত।”

“বুঝলাম। ইটটা মার্ডার উইপন নয়, বলছেন তো?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে বললেন, “ইটটাতে রক্ত লেগেছিল এবং সেটা নাসির খাঁয়ের হাতে ছিল, এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নাসির সাহেব তাহের মিয়া খুন হওয়ার পর কোনো একসময় কবরখানায় ঢুকেছিলেন। এছাড়া আরও একটা তথ্যও অনুমান করা চলে। হাতে এই ইটটা উনি তুলে নিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয় কাউকে মারার জন্যে?

রামবাবুকে নয় তো? রামবাবুও তো কবরখানায় ঢুকেছিলেন এবং—”

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, “তাহলে রামবাবু তাই বলতেন। উনি নাকি কোন কবরের ভেতর একটা শুঁটকো মড়াকে গিরগিটির মতো ঢুকে যেতে দেখেছিলেন। ব্যাপারটা যাই হোক, বোঝা যায় নাসির খাঁকে রামবাবু দেখেননি। তার মানে, তাহের মিয়া খুন হবার সময় থেকে রামবাবুর কবরখানায় ঢোকার সময় পর্যন্ত নাসির খাঁ এবং অন্য একটা লোক সেখানে ছিল।”

“তাহলে সেই লোকটাই তাহের দর্জির খুনী!”

“নিশ্চয় করে বলার মতো তথ্য হাতে নেই ডার্লিং!” কর্নেল একটু হাসলেন। “কেসটা তুমি যতটা সহজ ভেবেছিলে, হয়তো তা নয়।”

“কিন্তু ছবিটার কথা বিজ্জুও বলেছে। এদিকে মুনা-রুনাও যা বলল, তাতে মনে হয় ওই ছবির জন্যই এই খুনোখুনি। আপনি বেগমসায়েবাকে জিগ্যেস করছেন না কেন?”

কর্নেল সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন, “শীতের সময়ও ভাত-ঘুমের অভ্যাসটা না ছাড়তে পারলে ভবিষ্যতে তোমাকে ভুগতে হবে, জয়ন্ত! উঠে পড়ো। আমরা বেরুব।”

করুণ মুখ করে বললাম, “আপনি তো পাখি-প্রজাপতির পেছনে ঘুরবেন। আমি খামোকা গিয়ে কী করব?”

কর্নেল আমাকে টেনে ওঠালেন। “পাখি-প্রজাপতি নয়, অর্কিড। জাহানাবাদে একসময় প্রচুর আমবাগান ছিল। এই নবাবদেরই অনেক বাগান ছিল। সেই সব বাগানের আমের কথা শুনলে জিভে জল আসবে তোমার। কী সব নাম! কহিতূর, বেগমখোশ, বাদশাভোগ, শাদুল্লা! যাই হোক, তুমি নিশ্চয় জানো, আমগাছে একজাতের অর্কিড থাকে। এই শীতের সময় সেই অর্কিডের ফুল ফোটে। জয়ন্ত, তুমি শুনলে অবাক হবে যে এদেশে আমও যেমন বিদেশি গাছ, তেমনি ওই অর্কিডও বিদেশি।”

কর্নেলও রামবাবুর চেয়ে কোনো অংশে কম যান না। তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হল কেল্লাবাড়ির বাইরে পৌঁছে নহবতখানা নামক প্রাচীন দেউড়ির বাইরে

সদরদরজায় গিয়ে। একটা সাইকেল রিকশো ডেকে তাতে উঠে বসলাম দুজনে। তারপর কর্নেল রিকশোওলাকে বললেন, "রোশনিবাগ।"

জাহানাবাদকে একটা পুরনো গঞ্জ বলাই ভালো। কিন্তু যেদিকে তাকাই, খালি ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। তার মাঝে মাঝে নতুন বা পুরনো ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল রিকশোওলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। টুরিস্টদের ব্যাপারে রিকশোওলা তেতোমুখে জানাল, ইদানীং ট্যুরিস্ট আসা একেবোরে কমে গেছে। কারণ এ তল্লাটে খুনখারাপি, ছিনতাই আর চুরিডাকাতির উপদ্রব বেড়ে গেছে। গত শীতের মরসুমে যাও কোনো-কোনো দিন কিছু ট্যুরিস্ট দেখা গেছে, এবার তাও দেখা যাচ্ছে না। এলে তারা গাড়ি চেপে আসে এবং কিছুক্ষণ থেকেই ফিরে যায়। তবে এবার নাকি সরকার কেল্লাবাড়ির ভার হাতে নিয়েছেন। রিকশোওলা আশা করছে, টুরিস্টদের ভিড় হতেও পারে। আসলে জাহানাবাদে রাত কাটানোর জায়গা নেই। সরকার যদি ট্যুরিস্ট লজ তৈরি করেন, তাহলে ভাল হয়।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "কে যেন খুন হয়েছে আজ, জানো নাকি?"

রিকশোওলা বলল, "সে তো তাহের দর্জি। কেল্লাবাড়ির কবরখানায় খুন হয়েছে। আসলে কী জানেন স্যার? তাহের ছিলো মাগলার। কবরখানায় মাগলাররা মাল লুকিয়ে রাখে। সেই নিয়ে কী ঝগড়া। শেষে জানেই মেরে দিল।"

"শুনেছি নবাবদের এক জামাইও নাকি কবরখানায় খুন হয়েছিলেন।"

রিকশোওলা এক কথায় বলে দিল, "ওই মাগলারি কারবার।"

"তিনিও স্মাগলার ছিলেন নাকি?"

রিকশোওলা খি খি করে হাসল। "এই যে দেখছেন জাহানাবাদে যত লোক, তার অর্ধেক মাগলার।" বলে সে রিকশোর গতি কমিয়ে জানাল, আমরা রোশনিবাগ এসে গেছি।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "রিকশোওলা, তোমার নামটা কী ভাই?"

"আমার নাম স্যার রশিদ।"

"রশিদ, তুমি গিয়াসুদ্দিন সাহেবের বাড়ি চেনো?"

রশিদ রিকশোওলা রিকশোর ব্রেক কষে একটু চিন্তাভাবনা করে বলল "গিয়াসুদ্দিন তো দুজন আছে। এক গিয়াসুদ্দিন তো সেই নহবতখানার কাছে থাকে। তবে রোশনিবাগে—হ্যাঁ, হ্যাঁ! আপনি তাহলে স্যার গিয়াসুদ্দিন পাঠানের কথা বলছেন।"

"তাঁর ছেলে কলকাতায় জাহানাবাদের বড়নবাবসাহেবের কাছে থাকেন। ফরিদ তাঁর নাম।"

রিকশোওলা হাসল। "তাই বলুন! ফরিদ পাঠানের বাবা গিয়াসুদ্দিন। ঠিকই ধরেছি। আসুন, বাড়ি দেখিয়ে দিই।"

সে রিকশোটা রাস্তার ধারে রেখে আগাছাভরা জমির ভেতর পায়ে চলা

পথে আমাদের নিয়ে চলল. একটা প্রাচীন মসজিদের পাশে একতলা জরাজীর্ণ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে আমাদের আদাব দিলেন। তাঁর মাথায় সাদা টুপি, পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। রশিদ রিকশোওলা বলল, "আপনারা ফিরে যাবেন তো স্যার?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। তুমি অপেক্ষা করো গিয়ে।"

রিকশোওলা চলে গেলে বিস্মিত বৃদ্ধ বললেন, "আপলোক কাঁহাসে আতা, সাব?"

কর্নেলও উর্দুতে বললেন, "কালকাত্তাসে। আপকা আওলাদ ফরিদসাব হামলোগোঁকা জানপহচান আদমি। তো উনহিনে বাতায়া, কী—"

গিয়াসুদ্দিন সাহেব একটু হেসে বললেন, "আইয়ে, আইয়ে! তশরীফ ফরমাইয়ে!"

কর্নেল কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, "শুকরিয়া!" তারপর দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হল, তা এরকম :

"নিজামতকেল্লায় বেড়াতে আসার সাধ ছিল বহুদিনের। তো ফরিদসাহেব বলেছিলেন আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন নবাবসাহেবের বোনের বাড়িতে। যাই হোক, ফরিদসাহেবই বলেছেন, তাঁর বাবার খোঁজ নিয়ে যেতে, তিনি কেমন আছেন। সেজন্যই এলাম আপনার কাছে। আপনার সব কুশল তো?"

"আমার আর কুশল! কোনোরকমে বেঁচে আছি। ফরিদ আমার খোঁজ নিতে বলেছে শুনে অবাক লাগছে। সে তো ভুলেও আমার নাম করে না। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না।"

"সময় পান না আসলে।"

"ফরিদের আশা আমি করি না। আমি তাকেও খরচের খাতায় ধরেছি। জাভেদ যেমন গেছে, তেমনি ফরিদও গেছে। দুজনেই নিপাত্তা হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছি। কাজেই ওদের জন্য আমার কোনো দুঃখ-বেদনা নেই।"

"জাভেদ কে?"

"আমার ছোট ছেলে। হঠাৎ একদিন সে নিপাত্তা হয়ে গেল তো গেলই। পুলিশকে জানালাম। কোনো ফল হল না। লোকে বলে হয়তো স্মাগলারদের পাল্লায় পড়েছিল। মেরে গুম করে দিয়েছে।"

"কতদিন আগে সে নিখোঁজ হয়েছে?"

"প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল।"

"জাভেদসাহেবের বয়স কত ছিল?"

"পঁয়ত্রিশ হবে। খুব জোয়ান, শক্ত সমর্থ চেহারা ছিল তার। স্বভাবে ফরিদের একেবারে উল্টো। তবে আপনি ফরিদের চেনা লোক। আপনাকে গোপন করব না, জাভেদের নাম পুলিসের খাতায় উঠেছিল।"

"কেন?"—

"জাভেদ খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুন-ডাকাতি-মারদাঙ্গা এইসব করে বেড়াত। নিজের ছেলে। বেশি কী আর বলব, বলুন। তবে কি না বাপের মন। কষ্ট হয়!"

বৃদ্ধ গিয়াসুদ্দিন চোখ মুছে বললেন, "এভাবে দাঁড়িয়ে কথা না বলে দয়া করে ভিতরে এসে বসুন। অন্তত একটু চা খেয়ে যান গরিবের বাড়িতে।"

কর্নেল বললেন, "ক্ষমা করবেন। আমাদের খুব তাড়া আছে। চলি। তবে ফরিদসাহেবকে বলব—"

গিয়াসুদ্দিন বাধা দিয়ে বলল, "ছেড়ে দিন। আমি ওদের দয়ার প্রত্যাশী নই।"

রিকশোয় উঠে চাপা স্বরে বললাম, "ফরিদসাহেবের বাবার কথা কোথায় শুনলেন?"

কর্নেল গুম হয়ে কী ভাবছিলেন। আনমনে বললেন, "বেগম-সায়েবার কাছে।"

"জাভেদের কথাও নিশ্চয় বেগমসায়েবা বলেছেন?"

"হুঁ।" বলে কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "রোখকে! রোখকে!" তারপর রিকশো থামলে নেমে দাঁড়ালেন। পার্স বের করে বললেন, "ঠিক আছে রশিদ! তুমি এস। আমরা এবার পায়ে হেঁটে একটু ঘরব।"

রশিদ রিকশোওলা দশ টাকার নোট পেয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে সেলাম ঠুকল। তারপর হুঁশিয়ার করে দিল। আমরা ছিনতাই বা ডাকুর পাল্লায় পড়তে পারি বলেই। আজকাল নাকি সন্ধ্যার মুখে লোকেরা একদোকা ঘুরতে সাহস পায় না।

সে চলে গেলে কর্নেল বাঁ দিকে একটা জঙ্গুলে জায়গার দিকে পা বাড়ালেন। জিগ্যেস করলাম, "এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? অর্কিডের খোঁজে বুঝি?"

কর্নেল হাসলেন। "ঠিক ধরেছ, ডার্লিং! ওই বিশাল আমগাছটার দিকে তাকালেই তোমার চোখ জ্বলে যাবে।"

চোখ অবশ্য জ্বলে গেল না। তবে লাল অর্কিড ফুলের ঝালরগুলো সত্যিই সুন্দর। কর্নেলের খালি চোখে কিছু দেখে যেন তৃপ্তি হয় না। বাইনোকুলারে চোখ রেখে কিছুক্ষণ ফুলবতী অর্কিডটাকে দেখলেন। তারপর পা বাড়িয়ে বললেন, "ফেরার সময় অন্তত একটা গুচ্ছ সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"অত উঁচু থেকে পাড়া যাবে না!"

কর্নেল উৎসাহে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "আবু নিশ্চয় গাছে চড়তে পারে। অসুবিধে হবে না।"

"আবু! সে আবার কে?"

"বেগমসায়েবার বান্দা।"

"লোকটার নাম শুনেছি—যদিও এখনও তাকে চোখে দেখিনি।"

"দেখেছ।"

"মনে হচ্ছে না তো!"

"দুপুরে তোমার সিগারেট এনে দিল। গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের দরজা খুলে দিল। ডার্লিং, তোমাকে বহুবার বলেছি, ভাল রিপোর্টার হতে হলে একটা জিনিস খুব জরুরি—অবজার্ভেশন। পর্যবেক্ষণ।"

"হ্যাঁ,—গাঙ্গুলিদা বলছিলেন বটে। কিন্তু আবু নামে কোনো লোক—" লাফিয়ে উঠলাম। "মাই গুডনেস! সে তো একটা পুঁচকে ছেলে। আমার সিগারেট এনে দিল যে ছেলেটা।"

"সেই আবু।"

"কী আশ্চর্য! আমি ভাবছিলাম—"

"তুমি ভেবেছিলে আরব্য উপন্যাসের সেই বান্দা আবদালাকে। কারণ মিনাকে তুমি মর্জিনা ধরে নিয়েছিলে!"

"ঠিকই বলেছেন। নবাব-বাদশা বান্দা-বাঁদীদের ব্যাপার কি না।"

"ডার্লিং, আবু ছেলেটি মিনার সহোদর ভাই। ওরা ভাইবোন অনাথা বেগমসায়েবা ওদের আশ্রয় দিয়েছেন।"

জিভ কেটে বললাম, "ছ্যা ছ্যা! আমি আবু-মিনা সম্পর্কে কী সব ভেবে বসে আছি!"

কথা বলতে বলতে আমরা একটা ভাঙা মসজিদের কাছে এসে পড়েছিলাম। তার নিচে একটা জলা। জলার ধারে পৌঁছে কর্নেল বললেন, "সকালে এই জলাটাতে একঝাঁক বুনোহাঁস দেখেছিলাম।" বলে বাইনোকুলার স্থাপন করলেন চোখে।

দিনের আলো কমে আসছে দ্রুত। জলার ধারে হাওয়াটাও এরই মধ্যে ঠাণ্ডাহিম হয়ে উঠেছে। গাছপালার গায়ে দিনমানে যে ফিকে নীল কুয়াশার হাল্কা আলোয়ান চাপানো ছিল, এখন ক্রমশ তার রঙ ঘন নীল হয়ে উঠেছে। কর্নেলের পেছন-পেছন হেঁটে জলার সীমানা পেরিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম, "আপনি কি সত্যি বুনোহাঁস খুঁজছেন, কর্নেল?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে চুরুট ধরালেন। এখন আমরা একটা ঘাসে একটা ঢাকা নিচু বাঁধের ওপর পৌঁছেছি। বাঁধটা জলা ঘুরে ডাইনে বেঁকে গেছে এবং তার ওধারে গাছের ফাঁকে অস্তসূর্যের শেষ আলোয় যা ঝলমল করছে, তা নিশ্চয় গঙ্গা। বাঁধটার বাঁদিকে জলার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। ডান দিকে ধ্বংসস্তূপ, খাড়া দেয়াল, গম্বুজাকৃতি জীর্ণ কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন সুতরাং আমরা ঘুরপথে নিজামতকেল্লার কাছেই ফিরে এসেছি আবার।

কর্নেল বাঁধ থেকে ডানদিকে নেমে গিয়ে বললেন, "সর্বত্র বন্দুকবাজদের অত্যাচারে পাখিরা অতিষ্ঠ। সকালে যে হাঁসের ঝাঁকটিকে দেখেছিলাম তারা মনে হচ্ছে কোনো বন্দুকবাজের তাড়া খেয়েই পালিয়ে গেছে। ঘাসের ভেতর একটা

কার্তুজের খোল পড়ে থাকতে দেখলাম।" বলেই হন্তদন্ত হয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে গেলেন।

জায়গাটা একে তো ঝোপঝাড়ে ভর্তি, তাতে আবার অজস্র ইটের টুকরো পড়ে রয়েছে। পায়ে-পায়ে ঠোক্কর খেতে-খেতে হাঁটছিলাম। বিরক্ত হয়ে বললাম, "এমন করে যাচ্ছি কোথায় আমরা?"

কর্নেল আমার অনেকখানি আগে হাঁটছিলেন। হঠাৎ কাউকে বললেন, "এই যে ভাই! শুনুন, শুনুন।"

এতক্ষণে লোকটাকে দেখতে পেলাম। বেঁটে গোলগাল গড়ন, মাথায় টাক এবং পুরু গোঁফ, পরনে একটা ছাইরঙা আঁটো প্যান্ট আর নীলচে শার্ট, এবং হাতে বন্দুক।

এই তাহলে সেই বন্দুকবাজ। লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে আমাদের দেখছিল। ভাবলাম কর্নেল তাকে বকাবকি করবেন। কারণ আজকাল শিকারের ব্যাপারে আইন-কানুন খুব কড়া।

কিন্তু কর্নেল অমায়িক হেসে জিগ্যেস করলেন, "মারতে পারলেন কিছু?"

লোকটি হাসল। "জী না স্যার! পাখিরাও আজকাল বড্ড চালাক হয়েছে। তা আপনারা কি সরকারি লোক?"

কর্নেল বললেন, "মোটেই না। আমরা ট্যুরিস্ট। নিজামতকেল্লা দেখতে এসেছি।" কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন। "আর কী কী দেখার জিনিস আছে এখানে, বলুন তো ভাই! আপনি যখন স্থানীয় লোক, তখন তো সবই জানেন!"

লোকটি খুব উৎসাহে গাইডের ভূমিকা নিল। জলাটা দেখিয়ে বলল, "এই হল রোশনি ঝিল। নবাব সুজাউদ্দিন এই ঝিলের ধারে প্যালেস তৈরি করেছিলেন। আমরা কিন্তু সেই প্যালেসের ওপর দিয়ে হাঁটছি।" সে প্রচুর হাসল এবং ব্যাপারটা গভীরভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য জুতোর ডগা দিয়ে একটুকরো ইটে আঘাত করল। "আর ওই যে গম্বুজঘর দেখছেন, ওটা কলজেখাকির কবর। কোন আমলে জানি না, নবাবদের এক বিধবা বোন ছিল। রোজ সে মানুষের কলজে খেত। বিস্তর মানুষ মারা পড়েছিল, বুঝলেন স্যার? তখন বুড়ো নবাব মেয়েকে জ্যান্ত কবর দিলেন ওখানে।"

কর্নেল বললেন, "জাহানাবাদে দেখছি খালি কবর আর কবর!"

লোকটি চঞ্চল হয়ে বলল, "জী, তা ঠিক। তবে আপনারা কি নবাবদের কবরখানা দেখতে যাচ্ছেন?"

"কেন? কী আছে সেখানে?"

"খুব জেন্দা কবরখানা স্যার!"

"জেন্দা মানে?"

লোকটি গম্ভীর মুখে বলল, "শোনা কথা। তবে সন্ধ্যা লাগলে আমারও সাহস নেই ওখানে যেতে। সন্ধ্যায় নাকি পুরনো নবাবদের চলাফেরা শুরু হয়।

কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে। সামনে মানুষ পড়লে তার বিপদ। বাইরের লোকের কথা কী বলব স্যার, ছোটনবাবই তো পাগল হয়ে গেছে ডরের চোটে।" বলে সে দাঁড়িয়ে গেল। ভয় পাওয়া গলায় বলল ফের, "আজই তো তাহের নামে এক দর্জির লাশ পাওয়া গেছে ওখানে। রাগের চোটে এমন আছাড় মেরেছে, মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে।"

সে আবার পা বাড়ালে কর্নেল বললেন, "আপনার নামটা কী ভাই?"

"ইদ্রিস। ইদ্রিস আলি। নহবতখানার দেউড়ি দেখেছেন তো?"

"দেখেছি।"

"তার নজদিগে আমার বাড়ি। আমি পঞ্চায়েতের মেম্বার, স্যার।"

"সেই কবরখানাটা কোনদিকে?"

"ওই তো!" সে হাত তুলে উত্তর-পশ্চিম কোণে নির্দেশ করল। তারপর বলল, "আপনারা কি এখন সেখানে যাবেন ভাবছেন? আমি বলি কী, এখন ওখানে না যাওয়াই ভাল। সন্ধ্যা হয়ে এল। তা আপনারা কি কারুর বাড়িতে উঠেছেন?"

'হ্যাঁ।"

"তাহলে কাল দিনেসবরেই দেখে আসবেন। আপনারা কার বাড়িতে উঠেছেন স্যার?"

"স্টেশনমাস্টারের। উনি আমার আত্মীয়।"

ইদ্রিস আলি বন্দুক কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেল। সূর্য গঙ্গার ওপারে অস্ত গেছে ততক্ষণে। কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে একটু হেসে বললেন, "এস জয়ন্ত, আমরা নবাবী গোরস্তানের পাশ দিয়েই ডেরায় ফিরি।"

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "গোরস্তানটা সম্পর্কে অদ্ভুত কুসংস্কার তাহলে এখানে চালু আছে দেখছি!"

"চালু করা হয়েছে।"

"কেন?" বলেই স্মাগলার-চক্রের কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই বললাম ফের, "হ্যাঁ—স্মাগলিংয়ের স্বার্থে। রাতের দিকে সম্ভবত চোরাচালানিরা এসে ওখানে—"

কর্নেল হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "চুপ!" তারপর আমার কাঁধে চাপ দিয়ে আমাকে নিয়ে বসে পড়লেন ঝোপের আড়ালে। তারপর গুঁড়ি মেরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। উনি আমার কাঁধ চেপে গুঁড়ি মেরে চলতে বাধ্য করেছেন। একটু পরে ঝোপের ফাঁকে মাথা তুলে চাপা স্বরে বললেন, "এবার তুমিও দেখতে পারো, ডার্লিং!"

ঝোপের সামনে টানা একটা পাঁচিল। পাঁচিলটা ফুট ছয়েকের বেশি উঁচু নয়। দেখামাত্র বুঝতে পারলাম, নবাবী কবরখানার দক্ষিণ প্রান্তে এসে পড়েছি আমরা।

কবরখানাটা উঁচুতে। যথেষ্ট গাছপালা, ফুলের ঝোপে ভর্তি। তারপর দেখি, সেই ইদ্রিস আলি কবরখানার ভেতর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলেছে। একটু পরে সে বসে পড়ল। আর তাকে দেখতে পেলাম না। বললাম, "কী ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না তো!"

কর্নেল হাসলেন। "তোমাকে সবসময় বলি জয়ন্ত, অবজার্ভেশন—পর্যবেক্ষণ একজন ভাল রিপোর্টারের জন্য জরুরি। তুমি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতে, ইদ্রিস আলি বাংলা বলছে চমৎকার। কিন্তু তার দন্ত্য স জোরালো। তাছাড়া তার উচ্চারণভঙ্গিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য। তুমি ভাবছিলে বাঙালি মুসলিমরা হয়তো জ্যান্তোকে জেন্দা, ভয়কে ডর বলেন। তাই এতটা লক্ষ্য করোনি। জাহানাবাদে প্রচুর মুসলিম আছেন, যাঁদের মাতৃভাষা এখনও উর্দু। তাঁরা অনেকেই চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। কিন্তু সূক্ষ্ম উচ্চারণ-পার্থক্য ধরা যায়। যাই হোক, এই ইদ্রিস আলির চেহারা দেখেও তোমার চেনা মনে হওয়া উচিত ছিল। কারণ কলকাতায় তার দাদাকে তুমি দেখেছ!"

উত্তেজিতভাবে বললাম, "কর্নেল! এই লোকটিই কি তাহলে নিরুদ্দিষ্ট জাভেদ পাঠান?"

"আস্তে!" কর্নেল হুঁশিয়ারি দিলেন। "ওর হাতে যেটা তুমি সাধারণ বন্দুক ভেবেছ, লক্ষ্য করলে দেখতে ওটা একটা রাইফেল। হতভাগ্য পাগল নাসির খাঁয়ের জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, জয়ন্ত!"

॥ ভাঁজকরা একটা কাগজ ॥

শামিম-আরা বেগমের মুখে তাঁর পূর্বপুরুষদের গল্প শুনছিলাম কফি খেতে-খেতে। এমন সময় বাইরে মোটরগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বেগমসায়েবা আবুকে ডেকে বললেন, "দেখে আয় তো বেটা, কে এল।"

আবু পশ্চিমের বারান্দায় বেরিয়ে চাপা স্বরে বলল, "পুলিশ!"

বেগমসায়েবা দ্রুত অন্দরমহলে চলে গেলেন। তারপর পুলিস অফিসার মিঃ ভদ্রের আবির্ভাব ঘটল। কর্নেল তাঁকে খাতির করে বসালেন। তারপর আবুকে বললেন, "দেখ তো আবু, যদি আরেক কাপ কফি আনতে পারো।"

আবু চলে গেলে কর্নেল বললেন, "আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে মিঃ ভদ্র!"

মিঃ ভদ্র একটু হাসলেন। "সদর থেকে মর্গের প্রাথমিক রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন সেকেন্ড অফিসার। আপনার অনুমান সত্য, কর্নেল। তাহের মিয়ার মাথার পিছনে প্রথমে গুলি করা হয়েছিল।"

"রাইফেলের গুলি!"

মিঃ ভদ্র অবাক হয়ে নড়ে বসলেন। "এক্স্যাক্টলি। রাইফেলের বুলেট। প্রথমে গুলি করে মেরে তারপর শক্ত কিছু দিয়ে মাথার পেছনটা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে, যাতে—"

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, "কিন্তু গুলিটা?"

"কানের পাশে হাড়ের খাঁজে আটকে ছিল।"

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে চোখ বুজে বললেন, "কিন্তু জর্জিস সাহেবের মাথায় অবশ্য গুলি করা হয়নি। তাঁকে ইট বা লোহার মুগুর দিয়ে মারা হয়েছিল। তাঁর মর্গের রিপোর্ট তো আপনি দেখেছেন বলছিলেন?"

"হুঁউ। আপনি গিয়ে দেখে আসতে পারেন থানায়"।

কর্নেল একটু পরে চোখ খুলে বললেন, "তাহের মিয়ার খুনী ভেবেছিল পাগল নাসির খাঁয়ের ওপর খুনের দায়টা চাপাবে।"

মিঃ ভদ্র হাসলেন। "আমার খালি অবাক লাগছে, গুলি মাথায় নিয়ে তাহের দর্জি অন্তত দশ মিটার দৌড়ে এল কী করে?"

"দৌড়ে আসেননি—প্রথমে যা ভেবেছিলাম।" কর্নেল বললেন। "গুলি খেয়ে উনি পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ওঁর পা ধরে টেনে আনা হয়েছিল।"

"কেন?"

"এই বাড়ির পুবদিকের সদর রাস্তা থেকে কবরখানার ওই অংশটা সোজা চোখে পড়ে। মাথার খুলি যেভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে, তাতে অন্তত মিনিট পাঁচেক সময় লাগার কথা। কাজেই রাস্তা থেকে কারুর চোখে পড়বে না এমন জায়গায় বডি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়েছিল।

এইসব বীভৎস ব্যাপার দুজনে আলোচনা করছেন নির্বিকার মুখে। আমার গা ঘুলিয়ে উঠেছিল শুনতে-শুনতে। তাই দক্ষিণের খোলা বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরালাম। কিছুটা দূরে পোড়ো জমির ওধারে কবরখানাটা এখন অন্ধকার হয়ে আছে। তাকাতে গা ছমছম করছিল। তবে এখন আর এই গা ছমছম করাটা ভূতপ্রেত বা সেই অন্যগ্রহের পলাতক প্রাণীটির জন্য নয়, জাভেদ পাঠানের জন্য। সে কি এখন রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে? আশ্চর্য সাহস লোকটার, কবরখানায় সে আড়াই বছর ধরে লুকিয়ে আছে!

রামবাবু তাহলে গিরগিটির মতো যে জ্যান্ত মড়াটাকে কবরে ঢুকতে দেখেছিলেন, সে ওই জাভেদই বটে! কিন্তু রামবাবু কেন গিরগিটির সঙ্গে তার উপমা দিলেন মাথায় আসে না। নাকি কবরে ঢোকার সময় জাভেদ শুয়ে পড়ে কাত হয়েছিল—হয়তো ঢোকার জায়গাটা সংকীর্ণ, তাই ওই ভঙ্গিতে ঢুকতে হয়! কিন্তু কথা হল, একটা কবরের ভেতর কতটুকুই বা খালি জায়গা থাকে যে একজন জ্যান্ত লোক দিব্যি আড়াই বছর কাটিয়ে দিতে পারে?...

খোলা বারান্দায় ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। আর ঘরের ভেতর থেকে তখন জাভেদের নাম শোনা যাচ্ছে। তাই ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে পড়লাম। মিঃ ভদ্র কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "জাভেদ শুধু স্মাগলার হলে কথা ছিল। সে এলাকার ডাকাতদের লিড করত। বর্ডার এরিয়ায় এটাই বড় সমস্যা যে পদ্মা পেরিয়ে গেলে আমরা হেল্পলেস। তবে জাভেদ গা ঢাকা দিয়েছিল কনস্টেবল

মোতি সিংকে খুন করার পর। তখনও আমি এ থানায় আসিনি। কনস্টেবল খুন হলে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই তাকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। আমার ধারণা সে পদ্মার ওপারেই থেকে গেছে। কারণ সে জানে, এপারে এলেই তার কী অবস্থা হবে।"

বুঝলাম, কর্নেল ওঁকে জাভেদ ওরফে ইদ্রিস আলির কথা বলেননি। বললেই ভাল করতেন। কবরখানা ঘিরে ফেলে প্রত্যেকটি কবর পরীক্ষা করে দেখলেই ধরা পড়ে যেত, কোন কবরটি তার আস্তানা। কর্নেলের দিকে তাকালে উনি মুচকি হেসে বললেন, "তুমি কি অন্যগ্রহের প্রাণীটিকে দেখতে গিয়েছিলে, জয়ন্ত? আমার মনে হয়, প্রাণীটিকে ডিসটার্ব না করাই ভাল। ওদের শরীর অ্যান্টি-ম্যাটারে তৈরি। সাবধান।"

মিঃ ভদ্র অবাক চোখে তাকালেন। "অন্য গ্রহের প্রাণী! কী ব্যাপার?"

"মিঃ ভদ্র, আশা করি এরিখ ফন দানিকেনের বই পড়েছেন! ওই কবরখানায় নাকি—"

পুলিশ অফিসার হো হো করে হেসে ফেললেন। "বুঝেছি, বুঝেছি। কবরখানার জিনের কথা তো? বেগমসায়েবার স্টেটমেন্টে কথাটা আছে। তবে জেনে রাখুন, জিন-টিন বা অন্য গ্রহের প্রাণীটি আসলে এক ধড়িবাজ স্মাগলার। কবরখানার দিকে আমাদের বরাবর নজর আছে। গতমাসে এক রাত্রে ওখানে হানা দিয়েছিলাম। কাউকে ধরতে পারিনি। তবে কিলো দুই গাঁজার একটা প্যাকেট আর পাঁচটা বিদেশী ক্যালকুলেটার পাওয়া গিয়েছিল। তাড়া খেয়ে ব্যাটাচ্ছেলেরা সেগুলো ফেলে পালিয়েছিল।"

আরও কিছুক্ষণ স্মাগলারদের গল্প করে মিঃ ভদ্র উঠলেন। কর্নেল ওঁকে বিদায় দিতে গেলেন। জিপের গরগর আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেলে গোয়েন্দাপ্রবর ফিরে এলেন। তখন বললাম, "জাভেদ পাঠানের কথাটা ওঁকে জানালেই পারতেন!"

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "চুপ—"

বেগমসায়েবার কাশির শব্দ শোনা গেল। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে চাপা স্বরে বললেন, "এক মুশকিল হয়েছে কর্নেলসায়েব। ছোটকু এসে কখন দাঁড়িয়ে ছিল সদর গেটে। আমার মেয়েরা দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে এনেছে। আমার তো খুব ডর লাগছে—"

"ছোটকু মানে আপনার ছোট ভাই নাসির খাঁ কি?"

"জী হাঁ।"

বেগমসায়েবার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, বিপন্ন বোধ করছেন। কিন্তু কর্নেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বললেন, "আপনাকে আমি বলেছি, ওঁর জন্য একটুও ভাববেন না। এক কাজ করুন। বাড়তি কোনো ঘর আছে কি বাড়িতে?"

"আছে। কিন্তু—"

"আপনাকে উনি পছন্দ নাও করতে পারেন। কিন্তু আপনার মেয়েদের সম্ভবত উনি স্নেহ করেন। মেয়েদের আড়ালে ডেকে বলে দিন, সেই ঘরে ওঁকে বিছানা করে দিক। খেতে চাইলে খেতে দিক। তারপর বাইরে থেকে দরজা আটকে দেবেন আপনি। যেন আর না বেরুতে পারেন।"

বেগমসায়েবা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "সর্বনাশ! তাহলে তো ঘরের ভেতর চেঁচামেচি হুলুস্থুল করবে সব ভাঙচুর করবে।"

"তেমন কিছু করলে আমি তো আছি—ডাকবেন।"

শামিম-আরা ইতস্তত করছিলেন। তখন কর্নেল বললেন, "আপনাকে আমি বলেছি, এখনও বলছি, আপনার স্বামীকে আপনার ছোট ভাই খুন করেননি। নাসির খাঁ সম্পর্কে এই ভুল ধারণা আপনার মাথায় ঢুকিয়েছেন আপনার দাদা বড় নবাবসাহেব। না—তাঁরও দোষ নেই। তাঁকে যা বোঝানো হয়েছে, তিনি তাই বুঝেছেন।"

বেগমসায়েবা কুণ্ঠিতভাবে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগের ভেতর থেকে একটা বই বের করে চেয়ারে আরাম করে বসলেন। একটু হেসে বললাম, "জাহানাবাদের ইতিহাস পড়ে কি এ খুনোখুনির রহস্যের সূত্র মিলবে, ভাবছেন?"

বইয়ের পাতায় চোখ রেখে কর্নেল বললেন, "এ বইটা জাহানাবাদের ইতিহাস নয়, জয়ন্ত! ভারতের ইতিহাস।"

আরও হেসে বললাম, "মিঃ ভদ্র তাহলে ঠিকই বলছিলেন, মশা মারতে কামান দাগা! ভারতের ইতিহাস পড়ে—ওঃ ভাবা যায় না—"

"ডার্লিং, তোমাকে রামবাবুতে পেয়েছে, সাবধান।"

"রামবাবু জিনিয়াস লোক। তিনিও ঠিক বলেছিলেন।"

কর্নেল বইটা টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসে কান খাড়া করে কী শুনে বললেন, "নাঃ, সব ঠিক আছে। নাসির খাঁ ভাগ্নীদের সত্যি খুব স্নেহই করেন। ওই শোনো!"

কান পেতে কিছু শুনতে পেলাম না। বললাম, "শোনার মতো কিছু কানে আসছে না। অবশ্য আপনার কথা আলাদা। আপনার মাথার পেছন দিকেও কান আছে।"

"নাসির খাঁ গুণী লোক। অসাধারণ গাইতে পারেন জানা ছিল না!"

নড়ে বসলাম। "কী আশ্চর্য। আমি ভাবছি ট্রানজিস্টার বাজছে।"

"ট্রানজিস্টারে গানের সঙ্গে বাজনাও থাকে, জয়ন্ত!"

"অনেক সময় নাও থাকতে পারে। খালি গলায় গান গাইতেও শুনেছি অবশ্য।"

কর্নেল বোধ করি বিরক্ত হলেন। আবার বইটা খুলে বসলেন। এই সময় খাদু ছেলেটা এল ভেতর থেকে। তার মুখে মিটিমিটি হাসি। বলল, "মাজী বললেন এখনই খাবেন, না পরে খাবেন?"

কর্নেল বললেন, "অসুবিধে না হলে আধঘণ্টা পরে। মোটে তো আটটা বাজে।"

আবু চলে যাচ্ছিল। জিগ্যেস করলাম, "আবু ভেতরে গান গাইছে কে?"

আবু ফিক করে হেসে বলল, "জী, পাগলানবাব।"

কর্নেল আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকালেন। বললাম, "ঘাট মানছি কর্নেল। তা আবু, পাগলানবাব এত ভাল গাইতে পারেন?"

আবু বলল, "ওরে বাবা! পাগলা হবার আগে কত বড় বড় ফাংশনে গান গাইতেন ছোটনবাব! এইতো গত বছর নবতখানার কাছে ফাংশেন হল। কলকাতা থেকে গাইয়ে এসেছিল। ছোটনবাবও গেয়েছিলেন। সবাই বলল, আমাদের ছোটনবাবের পায়ের কাছে লাগে না কেউ।"

ভেতর থেকে ডাক এলে আবু বিরক্ত মুখে চলে গেল। ছেলেটার একমুহূর্ত অবসর নেই। সবসময় ওকে চর্কির মতো ঘুরে ফরমাস খেটে বেড়াতে হয়।

গানটা থেমে গেল হঠাৎ। আবার গুমোট স্তব্ধতা। শীত ক্রমশ বাড়ছে। দক্ষিণেরও দরজা দুটো বন্ধ করে দিলাম। তারপর বললাম, "এটা কি ভারতের ইতিহাস পড়ার সময়?"

কর্নেল মুখ তুলে একটু হাসলেন। "তুমি নিশ্চয় একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত পর্যটক এবং পণ্ডিত আল-বিরুনির নাম শুনেছ?"

"হয়তো শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ আল-বিরুনি কেন?"

"আল-বিরুনি ছিলেন লুঠেরা বাদশা সেই সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত। গজনীর এই মামুদ শাহ ভারতে হানা দিতে এলে তাঁকেও সঙ্গে আসতে হয়েছিল। সে আমলের রাজাবাদশাহদের ওই স্বভাব ছিল। যেখানেই যাবেন, সঙ্গে সভাপণ্ডিতটি থাকা চাই। তো মামুদ শাহ্ ভারত থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলেন ধনরত্ন। আর পণ্ডিত আল-বিরুনিও পিছিয়ে থাকার পাত্র নন। তিনি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলেন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের অজস্র রত্ন।"

হাসতে হাসতে বললাম, "এমন করে বলবেন না! জ্ঞান কি লুঠের মাল? জ্ঞান অর্জন করার জিনিস।"

কর্নেল কান দিলেন না। বললেন, "মামুদ শাহ যখন হিন্দুদের মন্দির ভেঙে ধনরত্ন লুঠ করছেন, তখন তাঁর সভাপণ্ডিত মন্দিরের ধর্মশাস্ত্রবিদদের কাছে জ্ঞানরত্ন কেড়ে নিচ্ছেন। জয়ন্ত! তুমি ঠিক বলেছ—জ্ঞান লুঠের জিনিস নয়। কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে হলেও একধরনের শক্তির দরকার নয় কি? সেই শক্তির নাম মেধা। মেধার জোর না থাকলে অপরের মেধা করায়ত্ত হয় না। আল-বিরুনি যখন ফিরে গেলেন স্বদেশে, তখন তিনি ভারতীয় মেধায় প্রজ্ঞাবান। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র থেকে শুরু করে অসংখ্য বিদ্যা তাঁর করায়ত্ত। ফার্সিতে পতঞ্জলি-শাস্ত্র অনুবাদ করেন আল-বিরুনি। তারপর লেখেন ভারতের ইতিহাস। তার নাম দেন তারিখ-ই-হিন্দুস্তান।" কর্নেল তাঁর বইটা দেখিয়ে বললেন। "এই সেই তারিখ-ই-হিন্দুস্তানের ইংরেজি অনুবাদ।"

"খুব ভাল। কিন্তু এই বইটা নিয়ে এসে মন দিয়ে পড়ার সঙ্গে জাহানাবাদ-রহস্যের সম্পর্কটা কী।"

"আছে। আল-বিরুনি শুধু পণ্ডিত না, দক্ষ চিত্রকরও ছিলেন। সে আমলে তো ছাপাখানা ছিল না। তাই সব পণ্ডিতকে দক্ষ লিপিকারও হতে হত। পাণ্ডুলিপিকে সাজানোর জন্য তাঁরা ছবিও আঁকতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আল-বিরুনির মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। তার অনুলিপি উদ্ধার করা হয়েছিল। তাতে কোনো ছবি ছিল না। অথচ ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে আল-বিরুনি অনেক ছবিও এঁকেছিলেন।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "ছবির উল্লেখ তাঁর এই বইতে আছে। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্যত্র। আল-বিরুনি লিখেছেন, দেশে ফেরার সময় ক'জন হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি ইসলামধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। প্রফেটের জীবনকাহিনী শোনান তাঁকে। প্রসঙ্গক্রমে প্রফেটের ঈশ্বরসন্নিধানে সশরীরে স্বর্গে যাত্রার কথাও বলেন। তখন হিন্দু পণ্ডিত অবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের প্রফেট স্বর্গে গেছেন কী উপায়ে? আল-বিরুনি তাঁকে একটি ছবি এঁকে বলেন, এই বাহনে চেপে প্রফেট স্বর্গে গিয়েছিলেন।"

উত্তেজিতভাবে বললাম, "বোররাখ্!"

"বোররাখ্।" কর্নেল আস্তে বললেন। "একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত পণ্ডিত আল-বিরুনির নিজের হাতে আঁকা বোররাখের ছবি সেই হিন্দু পণ্ডিতের কাছে থেকে গিয়েছিল। তার নাম ছিল দয়ারাম শাস্ত্রী। শাস্ত্রীজীর এক বংশধর ছবিটি উপহার দেন মোগল বাদশাহ আকবরকে। মোল্লা জাঁহাবাজ খানের লেখা রোজনামচায় এর উল্লেখ আছে। চীনা সিল্কের ওপর আঁকা সেই অসাধারণ ছবিটি অবশেষে বাদশা ঔরঙ্গজেবের পাল্লায় পড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। যাই হোক, তুমি ভাবছ—সেই ছবি সম্পর্কে এত পড়াশুনা করে, এমন কী আল-বিরুনির বইয়ের অনুবাদ যোগাড় করে জাহানাবাদ এসেছি—আমি কি অন্তর্যামী?"

"তাই তো মনে হচ্ছে!"

কর্নেল চোখ বুজে চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, "গতকাল সকালে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে তুমি যখন ট্রেন ফেলের আশঙ্কায় আমার মুণ্ডুপাত করছিলে, তখন আমি বিড্ডুর জন্য ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম পার্ক স্ট্রিট এলাকায় জাহানাবাদ প্যালেসের সেই গলির ভেতর। যাই হোক, বিড্ডুর কাছেই জানতে পেরেছিলাম ছবিটা বোররাখ্ নামে অদ্ভুত প্রাণীর। তখন ট্রেন ছাড়তে আধঘণ্টা দেরি। আবার বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। তুমি তো জানো, আমার প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বে-নৃতত্ত্বে প্রচণ্ড আগ্রহ। কাজেই আমার সংগ্রহে এসব বই প্রচুর। বাড়ি ফিরে মার্কিন চিত্রকলাবিশারদ আর্নল্ড সায়েবের পেন্টিং ইন ইসলাম বইটাতে বোররাখ্ খুঁজলাম। পেয়ে গেলাম। অমনি মনে পড়ে গেল মোল্লা জাঁহাবাজ খানের রোজনামচার কথা। তাতেও পড়েছি আল-বিরুনির আঁকা বোররাখের ছবির কথা। তারপর যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখি, তুমি রামবাবু বেচারাকে খামোকা শাসাচ্ছ।"

"শাসাব কেন? রামবাবুকে আপনার বাড়িতে ফোন করতে বলছিলাম। রামবাবু বলছিলেন, স্টেশনের ফোন সবসময় অকেজো। আমি কেন আসার পথে আপনাকে নিয়ে এলাম না বলে উল্টে রামবাবু আমাকে বকাবকি করছিলেন। কথা হল, আমার তো ড্রাইভার নেই। গাড়ি নিয়ে আপনাকে ইলিয়ট রোড থেকে তুলে না হয় আনলাম। তারপর গাড়িটার কী হবে? রামবাবু তা কিছুতেই বুঝতে চান না। তাছাড়া, স্টেশনে আসার সময় ট্যাক্সিও পাইনি। এসেছি বাসে। অথচ রামবাবু—"

মিনা এসে আদাব দিয়ে বলল, "মাজী বলছেন খানা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন যদি খেয়ে নেন, ভাল হয়।"

কর্নেল বললেন, "ছোটনবাব খেয়েছেন?"

মিনা হাসল। "জী হাঁ। খাওয়াদাওয়া করে ভাগ্নীদের সঙ্গে গল্প করছেন। বোঝাই যায় না, উনি পাগল হয়ে গেছেন। ভাল জামা-কাপড় পরে একেবারে ফিটবাবুটি!"

"কী গল্প করছেন?"

"কী সব আবোল-তাবোল কথা। বোঝা যায় না। মুনা-রুনা পড়েছে বিপদে। উঠে আসতেও দিচ্ছেন না।"

আমি বললাম, "তাহলে আর পাগলামি করল কোথায়?"

মিনা বলল, "পাগল কি সহজে সারে? তবে এখনকার মতো যেন সেরে গেছে।"

আবু এসে দিদিকে তাড়া দিল। মিনা ভেতরে গেল। আবুর হাতে একটা নকশাকাটা সুন্দর কাপড়। কাপড়টা টেবিলে ঢাকা দিয়ে তার ওপর খাবারের প্লেট রাখা হয়। জিগ্যেস করলে আবু সকালে বলেছিল, "একে বলে দস্তরখান।" কর্নেল বলেছিলেন, "খানদানি মুসলিম পরিবারে এই 'দস্তরখান' বিছিয়েই খেতে দেওয়ার রীতি আছে।"

......এখন আবু সেই কাপড়টা ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছিয়ে দিল। সেই সময় একটা ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ দস্তরখানের ভেতর থেকে টুক করে নিচে পড়ল। আবু সেটা লক্ষ্য করল না। দস্তরখান বিছিয়ে দিয়েই সে চলে গেল। ভাঁজকরা কাগজটা কুড়িয়ে নিলাম। কিন্তু সেটা কর্নেলেরও চোখে পড়েছিল। উনি তক্ষুনি আমার কাছ থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন শামিম-আরা বেগম। বললেন, "আবুর কি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। নতুন দস্তরখান বের করে রেখেছি। সেটা না এনে দুপুরেরটাই দিয়ে গেছে। ঝুটোর দাগ লেগে আছে—ধোয়া পর্যন্ত হয়নি!" বলে রুষ্টভাবে ডাকলেন আবুকে।

আবু দরজার পর্দা সরিয়ে সাড়া দিল, "মাজী ডাকছেন?"

"অ্যাই বাঁদর! এই এঁটো দস্তরখান পাততে কে বলল তোকে?" বলে

বেগমসায়েবা টেবিল থেকে কাপড়টা টেনে তার দিকে ছুড়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আজ ঘর সাফ করেছিলি?"

আবু ভয়ে ভয়ে বলল, "বুবু করেছে বিকেলে।"

বেগমসায়েবা মেঝেয় দৃষ্টি রেখে বললেন, "কী নোংরা হয়ে আছে সব! করিস কী তোরা ভাইবোনে? কাল সকালে যেন দেখি ভালভাবে সাফ করেছিস। নইলে দেখাব মজা তোদের! যা, ধোয়া দস্তরখান এনে পেতে দে।"

বেগমসায়েবা এবার একটু হাসলেন। "আপনাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারছি, কর্নেলসায়েব। গরিবের বাড়ি বলে মেহেরবানি করে একটু মানিয়ে নেবেন।"

কর্নেল বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না। আমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।"

বেগমসায়েবা চলে গেলেন ভেতরে। তারপর কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। আমি একটু হাসলাম শুধু। তখন কর্নেলও একটু হেসে আস্তে বললেন, "ভাল রিপোর্টারের জন্য কী গুণ থাকা দরকার বলেছিলাম, জয়ন্ত?"

"অবজার্ভেশন। কিন্তু জিনিসটা কী আগে দেখুন!"

কর্নেল শুধু বললেন, "চুপ।"

রাত দশটায় দেখি, কর্নেল তখনও টেবিল বাতির আলোয় আল-বিরুনির ইতিহাস পড়ছেন। বাইরে কোথাও গেলে আমার ঘুম হয় না। কিছুক্ষণ পরে খুটখাট শব্দ শুনে পাশ ফিরে দেখি, কর্নেল সেই ভাঁজকরা কাগজটা টেবিলে খুলে রেখে ক্যামেরা তাক করে আছেন। কয়েকবার ফ্লাশবাল্ব ঝলক দিল। গোয়েন্দাপ্রবর কয়েকটা ছবিই তুললেন। মশারি থেকে মুখ বের করলে উনি চোখ কটমটিয়ে তাকালেন। তখন বুঝলাম কিছু জিগ্যেস করা বারণ।

ছবি তোলা হয়ে গেলে কাগজটা আগের মতো ভাঁজ করে মেঝেয় ফেলে দিলেন। তারপর ক্যামেরা গুছিয়ে রেখে মশারির ভেতর ঢুকে গেলেন। টেবিলবাতির আলো নিভিয়ে দিলেন হাত বাড়িয়ে। একটু পরে যথারীতি ওঁর নাকডাকা শুরু হল।...

॥ একটি প্রেমপত্রের বয়ান ॥

সকালে উঠে দেখলাম ঘন কুয়াশা চারদিকে। তাতে কর্নেলের প্রাতঃভ্রমণের ব্যাঘাত ঘটেনি। কখন বেরিয়ে গেছেন জানি না। আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যখন রোদ ফুটল, তখন একা বেরিয়ে পড়লাম। একা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই।

তাছাড়া একটু উদ্বেগও হচ্ছিল। ফেরারি দাগি আসামি জাভেদ পাঠানের পাল্লায় পড়েননি তো কর্নেল? অবশ্য কাল তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, সে আমাদের সাধারণ ট্যুরিস্টই ভেবেছে। কিন্তু কর্নেল ওকে বলেছেন, আমরা স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারে উঠেছি—অথচ আমরা আছি বেগমসায়েবার বাড়িতে।

কবরখানা থেকে এটা তো সহজেই তার চোখ পড়তে পারে। কর্নেলের হেঁয়ালি এখনও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। একথা ঠিক, কর্নেলের বুদ্ধিশুদ্ধিতে আমার আস্থা আছে। কিন্তু উনি তো মানুষ। হিসেবে ভুল করতেও পারেন। এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে নিজামতকেল্লার ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে গঙ্গার দিকে হাঁটছিলাম।

গত কালকের চেনা শর্টকাট পথে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, মুনা ও রুনা একটা ভাঙা ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তারা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর রুনা, বলল, "বেড়াতে বেরিয়েছেন জয়ন্তবাবু?"

বললাম, "হ্যাঁ। তোমরা এখানে কী করছ?"

মুনা বলল, "মাম্মুজানকে খুঁজছি।"

অবাক হয়ে বললাম, "সে কী! উনি তো তোমাদের বাড়িতেই ছিলেন।"

রুনা বলল, "আমারই দোষ। মা দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন আমি তো কিছু জানি না। ভোরে উঠে দেখি, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তাই খুলে দিয়েছিলাম। কখন বেরিয়ে গেছেন ছোটমামা। মা খুব বকাবকি করছেন। তাই ওঁকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

কর্নেলের কথাটা মনে পড়ল। বলছিলেন যে নাসির খাঁয়ের জন্য তাঁর ভাবনা হচ্ছে। বললাম, "কাল রাত্তিরে ওঁর গান শুনে মনে হচ্ছিল পাগলামি সেরে গেছে।"

মুনা বলল, "আমরাও তাই ভেবেছিলাম। অনেক রাত্তির অব্দি কথা বললেন—"

রুনা ওর কথা কেড়ে বলল, "সে তো আবোল-তাবোল কথা?"

বললাম, "কী বলছিলেন ছোটনবাব?"

রুনা বলল, "কিছু কি বোঝা যায়? আমি একটুও বুঝতে পারিনি।"

মুনা বলল, "বোঝা যাবে না কেন? বললেন না বোররাখ আস্তাবলে বাঁধা আছে, দেখে আয় তোরা?"

রুনা চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ—বোররাখের কথাও বলছিলেন ছোটমামা।"

মুনা এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "মাম্মুজান! মাম্মুজান!" তারপর বাঁদিকে খাড়া দেয়ালের একটা ফোকর গলিয়ে ঢুকে গেল। তাকে অনুসরণ করল রুনা।

আমিও ফোকর গলিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু তারপর আর দুই বোনকে দেখতে পেলাম না। তবে যেখানে ঢুকলাম, সেখানকার অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম আতঙ্কে। ওপর থেকে প্রকাণ্ড সব লোহার বিম ঝুলে আছে এবং খানিকটা ছাদও কাত হয়ে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে।

প্রাণ নিয়ে পালানোর ভঙ্গিতে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু সর্বত্র একই অবস্থা। এটা একটা বিশাল বাড়ির ভগ্নাবশেষ। তার ভেতর যেখানেই ফোকর

পাচ্ছি, সেই ফোকর গলিয়ে এই ভগ্নপুরী থেকে উদ্ধারের আশা করছি। কিন্তু এ যেন এক গোলোকধাঁধা। কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারছি না। তখন যেদিক থেকে এসেছি, সেদিকে ফিরে গেলাম। তাতে পড়লাম আরও বিপদে। সেই ফোকরটা খুঁজেই পেলাম না আর। এবার চেঁচিয়ে ডাকলাম, "মুনা! রুনা! তোমরা কোথায়"?

আমার সামনে ছাদ ধ্বসে পড়া একটা স্তূপে জঙ্গল গজিয়েছে। দুই বোনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঝোপটার পাশে গেছি, কেউ চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "অ্যাই বেঅকুফ! চিল্লাতা কাঁহে?"

ঘুরে দেখি, পাগল নাসির খাঁ চোখ কটমটিয়ে বেরিয়ে আসছেন ঝোপের পেছন থেকে। আজ পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি আছে বটে, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ধুলো-ময়লা লেগে আছে। ঝাঁকড়া চুলে মাকড়সার জাল আর শুকনো পাতা আটকে আছে।

ঝটপট আদাব দিয়ে বললাম, "আদাব ছোটনবাবসায়েব!"

নাসির খাঁও গম্ভীর মুখে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, "আদাবরস! আদাবরস!"

আমার হিন্দি-উর্দুর জ্ঞান নাকি হাস্যকর। সেটা আবার প্রমাণিত হল। যেই বলেছি, "আপকা দো ভাগ্নী আপকো ঢুড়তা হ্যায়" নাসির খাঁ খিক খিক করে হেসে উঠলেন।

বললেন, "আরে ভাই, বাংলাতেই বলো না কেন? তুমি কি ভাবছ আমি বাংলা জানি না!"

অপ্রস্তুত হেসে বললাম, "আপনার ভাগ্নীরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

নাসির খাঁ বললেন, "বেড়াচ্ছে তা তো দেখছি। বেড়াক না। তাতে আমার কী, তোমারই বা কী?"

বলে দুর্বোধ্য কী সব কথা বিড়বিড় করে আওড়াতে থাকলেন। এই গোলকধাঁধার ভেতর পাগলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। বললাম "চলুন ছোটনবাবসায়েব! বাড়ি ফিরে চলুন। আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আপনার দিদি—"

নাসির খাঁ বাঁকা মুখ করে বললেন, "শাট আপ! দিদি-টিদি চলবে না। আরও কিছু কথা থাকে তো বলো।"

"আমার মনে হয় আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত। কারণ জাভেদ পাঠানকে কাল সন্ধ্যায় কবরখানায় দেখেছি। তার হাতে একটা রাইফেল আছে।"

কথাগুলো বলে ওঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু নাসির খাঁয়ের কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। আমার চোখে চোখ রেখে নির্বিকার তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে অবাক করে চাপা গলায় বললেন, "কত টাকা দেবে বলো?"

"টাকা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকা। আস্তাবলে বোররাখ্ বেঁধে রেখেছি। **টাকা দিয়ে নিয়ে যাও।**"

উত্তেজনা চেপে বললাম, "ঠিক আছে। চলুন।"

"বিশ হাজার।"

"ঠিক আছে। তাই দেব।"

"মরদকা বাত, হাথিকা দাঁত।" নাসির খাঁ পা বাড়িয়ে বললেন। "মাল হাতে পেয়ে তখন এক কমাতে চাইবে, তা হবে না কিন্তু।"

"আমার এক কথা।" বলে ওকে অনুসরণ করলাম। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছিল। কর্নেল যে এমন সময়ে কোথায় পাখি-প্রজাপতির পেছনে টো টো করে বেড়ান—কোনো মানে হয়?

সেই ফোকরটা এতক্ষণে চোখে পড়ল। ফোকর গলিয়ে গলিমতো রাস্তায় কিছুটা হেঁটে ফাঁকা চত্বরে পৌঁছুলাম। নাসির খাঁ আগে হাঁটছিলেন। একটু পরে থমকে দাঁড়ালেন। বললাম, "কী হল?"

নাসির খাঁ কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ এক দৌড়ে বাঁদিকে সেই বিশাল গম্বুজ ও মিনারওয়ালা মসজিদের পেছনে উধাও হয়ে গেলেন। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম, মুনা ও রুনা দৌড়ে আসছে। তাহলে ভাগ্নীদের দেখতে পেয়েই আবার পালিয়ে গেলেন নাসির খাঁ!

কিন্তু এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, নাসির খাঁ হয় সেই হারানো এবং দুর্লভ ঐতিহাসিক ছবির খোঁজ রাখেন, নয় তো সেটা নিজেই লুকিয়ে রেখেছেন।

আস্তাবলে বোররাখ্ বেঁধে রেখেছেন—এর মানে অবশ্য নিজেই আস্তাবলের ওখানে লুকিয়ে রেখেছেন তাই বোঝায়। কিন্তু কিছু লুকিয়ে রাখার বুদ্ধি এই পাগল অবস্থায় কি ওঁর আছে? ধরা যাক, পাগল হওয়ার আগেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। পাগল হওয়ার পর যদি তা মনে পড়ে, তাহলে ছবিটা বের করে প্রকাশ্যে হাতে নিয়ে ঘোরাই তো উচিত ছিল! কারণ উনি গতরাতে ভাগ্নীদেরও এই কথা বলেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, ছবিটার প্রতি ওঁর একটা 'ফিক্সেশন' সৃষ্টি হয়েছে অবচেতনায়।

এইসব জল্পনা-কল্পনা করতে করতে দেখলাম, দুই বোন মসজিদের দিকে ছুটে চলেছে। আমি সেদিকে যাব কি না ঠিক করতে পারলাম না। খিদেও পেয়েছে। বেগমসায়েবার বাড়ির দিকেই পা বাড়ালাম।

গিয়ে দেখি, আবু মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, "নাশতা করবেন না সার? মাজী বললেন, সায়েবদের ডেকে নিয়ে আয়। তাই আপনাদের খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম। বুড়োসায়েব কোথায় সার?"

"তুমি আমাকেই বরং খাইয়ে দাও।" হাসতে হাসতে বললাম। "বুড়োসায়েব যখন ফিরবেন, তখন খাবেন বরং। আমার খিদে পেয়ে গেছে।"

আবুর মুখে তবু হাসি ফুটল না। সে গম্ভীর মুখে চলে গেল ভেতরে। একটু পরে সে তেমনি গুম হয়ে দস্তরখান নিয়ে ফিরে এল। তখন জিগ্যেস করলাম, "কী আবু? শরীর খারাপ নাকি?"

আবু শুধু মাথা দোলাল। বুঝলাম, গতরাতে দস্তরখানের ব্যাপারে বেগমসায়েবা তাকে নিশ্চয় বকেছেন। মিনা ব্রেকফাস্টের প্লেট অর্থাৎ 'নাশতা' নিয়ে এল। গরম গরম পরোটা, সুজির হালুয়া, কয়া মুরগির মাংস, দুটো ডিমের পোচ। তার সঙ্গে এক প্লেট খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কাটা আপেল আর কমলালেবুর কোয়া। এরপর কফি। বেগমসায়েবার মতে এই নাকি 'গরিবের ঘরের নাশতা!' উপরন্তু এ জিনিস নাকি তাঁর প্রয়াত পিতার মতেও ছিল 'ছোটলোকের খাদ্য!' বেগমসায়েবা তাঁর পিতার যে খাদ্যতালিকা বর্ণনা করেছেন, তা উল্লেখ করতে গেলে মহাভারত হয়ে যায় এবং তা আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য শব্দসমষ্টি মাত্র। সেইসব অদ্ভুত নাম মনে রাখাও দুঃসাধ্য।

মিনা কফি আনতে গেলে আবুকে জিগ্যেস করলাম, "আজ ভালভাবে মেঝে সাফ করেছ তো?"

আবু গোমড়া মুখে বলল, "আমার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে মাজী নিজেই—"

সে হঠাৎ থেমে গেল। শামিম-আরা বেগম পর্দা ফাঁক করে একটু হেসে বললেন, "কর্নেল সায়েবের মর্নিংওয়াক এখনও হয়নি?"

"এসে যাবেন এখনই। হয়তো পাখির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন।"

বেগমসায়েবা বললেন, "আপনি বড্ড কম খান। নাকি আমাদের বাড়ির রান্না পছন্দ হচ্ছে না?"

দ্রুত বললাম, "না, না। কী যে বলেন! এমন সুস্বাদু রান্না আমি জীবনে খাইনি!"

"সত্যি বলতে কী, আমি রান্না জানি না। আগে তো বাবুর্চি ছিল। তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর মিনাই রান্নাবান্না করে। আমি একটু তদারক করি শুধু।"

বেগমসায়েবা কথাটা বলে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন। আবু প্লেট গুছিয়ে এবং দস্তরখান তুলে নিয়ে চলে গেল। মিনা কফির পট ও পেয়ালা রেখে গেল। কফি খেতে খেতে ব্যাপারটা ভাবতে থাকলাম। ভাঁজকরা কাগজটা খুঁজে পাওয়ার জন্য বেগমসায়েবাকে ঝাড়ু হাতে নিতে হয়েছিল। নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। কিন্তু এঁটো দস্তরখানের ভেতর রেখে দিয়েছিলেন কেন? অন্যমনস্কতার জন্য, নাকি দ্রুত গোপন করার ঝোঁকে? কারুর চোখে পড়ার ভয়েই কি ঝটপট লুকিয়ে ফেলেছিলেন হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন তার ভেতরেই? বাড়িতে লোক বলতে আবু, মিনা আর তাঁর দুই যমজ মেয়ে। কাল সন্ধ্যার পর অবশ্য নাসির খাঁও ছিলেন। কিন্তু তিনি তো পাগল মানুষ। আর আবু-মিনাকে ওঁর ভয় করার কারণই নেই। অতএব মুনা-রুনার চোখে পড়ার ভয়েই ঝটপট কাগজটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন।...

কর্নেল ফিরে এলেন, তখন দশটা বাজে। বললাম, 'আমি তো ভাবছিলাম গুলি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে আছেন কোথাও। আমি অবশ্য আপনার ডেডবডি উদ্ধারের চেষ্টা করতাম না। আজকের দিনটা কোনোরকমে কাটিয়ে কাল ভোরের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যেতাম।"

কর্নেল আমার কথার দিকে কান করলেন না। পোশাক বদলে আবুকে জানিয়ে দিলেন, বাইরে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছেন। আবুর কাছে জানা গেল, বেগমসায়েবা মিনাকে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন রিকশো চেপে। মুনা-রুনা ছোটমামাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

আবু ভেতরে গেলে চাপা স্বরে বললাম, "নাসির খাঁয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে বিশ হাজার টাকায় আস্তাবলে বাঁধা স্বর্গের বাহনটিকে বেচতে চেয়েছেন।"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কথাটা শোনার পরও ওঁর কোনো ভাবান্তর ঘটল না। চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার ভেতর শুধু বললেন, "হুম!"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "বড়নবাবসায়েব আপনাকে তাঁর ভগ্নীপতির হত্যা রহস্যের কিনারা করতে বলেছিলেন। আপনি এতসব সূত্র পাচ্ছেন। অথচ কিছু করছেন না। কাল জাভেদ পাঠানকে হাতের কাছে পেয়েও ধরিয়ে দিলেন না! তার হাতে রাইফেল থাক আর যাই থাক, আমরা দুজন ছিলাম এবং তার খুব কাছাকাছিও ছিলাম। রাইফেল ব্যবহারের সুযোগই পেত না সে। তাছাড়া আপনার কাছে রিভলভার আছে বলে জানি।"

এবার কর্নেল হাত বাড়িয়ে খাটের মশারি-স্ট্যান্ডের কোনায় ঝুলন্ত ওঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করলেন। কাগজটা আমাকে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন।

খুলে দেখে বললাম, "এ তো আপনার হাতের লেখা!"

"হ্যাঁ চিঠি।"

"ইংরিজিতে কাকে চিঠি লিখেছেন?"

"পড়ে দেখ আগে।"

চিঠিটাতে কোনো সম্বোধন নেই। তলায় কোনো নামও নেই। এ আবার কেমন চিঠি? কিন্তু পড়ার পর খুব অবাক হয়ে গেলাম। যা লেখা আছে, তা বাংলায় এরকম দাঁড়ায় ঃ

"আমি আর দুটো দিন অপেক্ষা করে দেখব। তারপর বোম্বাই চলে যাবো। সেখান থেকে আবুধাবি। আমার পাসপোর্ট-ভিসা সব বোম্বাইয়ে রেডি আছে। তুমি গেলে তোমারও যে পাসপোর্ট-ভিসা করাতে অসুবিধে হবে না, তা আমি বরাবর বলে আসছি। কলকাতায় ভাইজান জিনিসটার খদ্দের ঠিক করে রেখেছে। ভাল দাম পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের ভাড়ার টাকার অভাব হবে না। তুমি

ছোটকুকে কেন এত ভয় পাচ্ছ, বুঝি না। সে তো পাগল হয়ে গেছে। তবু যদি সে বাগড়া দেয় তাকে খতম করতে আমার হাত কাঁপবে না।...

"তুমি বুনোহাঁসের রোস্ট খেতে চেয়েছ। দুদিন ধরে রোশনিবাগ ঝিলে হাঁস মারার চেষ্টা করছি। কিন্তু মুশকিল হল, আমার এই রাইফেলের গুলিতে হাঁস মারলে এমন ছাতু হয়ে যায় যে শুধু খানকতক পালক ছাড়া কিছু থাকে না। তবু দেখছি চেষ্টা করে। বুঝতে পারছি আগের দিনগুলো তুমি ফিরে পেতে চাইছ, যখন ঝিলে আমি বন্দুকবাজি করে বেড়াতাম আর তুমি প্যালেসের ছাদ থেকে রুমাল নাড়তে!...

"এখানেই থাক। দেখি তুমি কী করো আর দুটো দিন—মনে রেখো।...অ্যাই হসনু, তু পুছতি মেরা মঞ্জিল কিতনি দূর হ্যায় তেরি গুলবদনসে মেরা মহব্বতোঁকা দম যিতনা দূর হ্যায়...হে সুন্দরী, জানতে চাইছ আমি কতদূরে আছি? তোমার গোলাপ শরীর থেকে আমার প্রেমের নিঃশ্বাসের যতটা দূরত্ব, আমি তত দূরে।......

পড়া শেষ হলে কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু বুঝলে?"

বললাম, "হ্যাঁ। এটা একটা প্রেমপত্র। সম্ভবত জাভেদ লিখেছে। কিন্তু আপনার হাত দিয়ে ইংরিজিতে লিখল কেন?"

"এটা অনুবাদ। কাল রাতে দস্তরখানের ভাঁজ থেকে যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল, তার ফোটো তুলে নিয়েছিলাম।"

"হুঁ, দেখেছি। ফোটো তুলে নিয়ে ওটা মেঝেয় ফেলে দিয়েছিলেন। আজ সকালে বেগমসায়েবা আবুর হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে নিজেই মেঝে সাফ করতে গেলেন কেন, তাও বুঝতে পেরেছি।"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "জাহানাবাদে টুরিস্ট অল্পবিস্তর আসে। তাই এখানে স্টুডিও আছে। সকালে গিয়ে ভদ্রলোককে স্পেশাল চার্জ দিয়ে প্রিন্ট করালাম। তারপর এক উর্দুভাষী স্কুলশিক্ষককে খুঁজে বের করলাম। তিনি বাংলা ভাল বলতে পারেন না। তবু যা বললেন, তাতে প্রচুর ইংরেজি থাকায় আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেললাম।"

"তাহলে এই ব্যাপার! জাভেদ পাঠানের সঙ্গে বেগম শামিম-আরার বাল্যপ্রণয়ের জের এখনো পুরোদমে চলেছে। অবশ্য বেগমসায়েবাকে এখন পরিণতযৌবনা বলা যায়। কিন্তু তাহলে তো বেগমসায়েবা জানেন জাভেদ কোথায় লুকিয়ে আছে। এমন কী জাভেদের দাদা ফরিদসায়েবও জানেন দেখছি!"

"বেগমসায়েবা তো অবশ্যই জানেন। কারণ তিনিই তাকে খাদ্য পাঠান নিয়মিত মিনার হাত দিয়ে। মিনা আস্তাবলের ওদিকটা ঘুরে কবরখানায় ঢোকে।" কর্নেল চুরুটের অনেকটা ধোঁয়া লম্বা করে ছেড়ে দিলেন। ফের বললেন, "আমার কাছে সবসময় বাইনোকুলার থাকার এই একটা সুবিধে জয়ন্ত! বহুদূর থেকেও অনেক দৃশ্য আমার দেখা হয়ে যায়।"

"মুনা-রুনা কি জানে এসব কথা?"

"না। তাদের মনে কবরখানার জিন সম্পর্কে ভয় ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু বেগমসায়েবা তাহলে তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে!"

"প্রেম মানুষকে অন্ধ করে, ডার্লিং!"

"নিজের স্বামীকে খুন করিয়েছিলেন প্রেমিককে দিয়ে—এমন নিষ্ঠুরতা প্রেম শোভা পায় না., কর্নেল! সে আপনি যাই বলুন। এ হল ব্যাভিচার।"

কর্নেল মাথা দুলিয়ে বললেন, "উঁহু। জর্জিস খাঁকে খুন করেছিল তাহের দর্জি।"

"কীভাবে জানলেন?"

"নবাবদের আস্তাবল বাড়িটা তুমি দেখনি। দেখার মতো জায়গাও নয়। কবরখানার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ওই যে দেখছ ভাঙাচোরা বাড়িটা, ওটাই আস্তাবল ছিল নবাবদের স্বর্ণযুগে। এখনও গোটাতিনেক ঘর আস্ত আছে। একটাতে থাকত তাহের মিয়া। বাকি দুটোর মধ্যে একটাতে থাকে এক বুড়ি। অন্যটাতে তার দূরসম্পর্কের নাতি মকবুল রিকশোওয়ালা আর তার বউ। বাজার থেকে ফেরার পথে মকবুলের রিকশোয় আসছিলাম। আমার স্বভাব তো জানো। মকবুলের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছিলাম। কোথায় সে থাকে, জিজ্ঞেস করলে বলল, আস্তাবলে থাকে। নবাবী আস্তাবল দেখবার আগ্রহ একজন ট্যুরিস্টের থাকতেই পারে। কাজেই সে সেখানে নিয়ে যেতে আপত্তি করল না। তাহের দর্জির ঘরও দেখলাম। তারপর তাহের মিয়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা শুরু হল। বুড়ি কান করে শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, তাহের মরবে না কেন? সে যে নেমকহারাম ছিল। নবাবদের জামাইকে সেই তো খুন করেছিল। মকবুল আঁতকে উঠে বলল, চুপ, চুপ। বুড়ি খুব জেদী। বলল যে, চুপ করার কী আছে? সে নিজের চোখে দেখেছে, ভোরবেলায় কী নিয়ে দুজনে কবরখানার ভেতর কাড়াকাড়ি ধস্তাধস্তি চলছিল। তারপর তাহের দর্জি নবাবদের জামাইয়ের মাথায় ইট ছুঁড়ে মারল। বেগতিক দেখে মকবুল বলল, আমার নানী পাগল হয়ে গেছে। ওর কথায় কান দেবেন না। যাই হোক বুড়ির মিথ্যা কথা বলার কারণ নেই। তাছাড়া আমার সাজানো ছকটার সঙ্গে বুড়ির বিবৃতি চমৎকার খাপ খেয়ে যাচ্ছে।"

"ছকটা কী?"

কর্নেল সে-প্রশ্নে কান না করে বললেন, "ছকটার শুধু এক জায়গায় খুঁত ছিল সেটা তোমার একটা কথায় দূর হয়েছে। এখন ছকটি খাসা হয়েছে। তুমি একটি মূল্যবান সূত্র পেয়েছিলে জয়ন্ত!"

"আপনি কি নাসির খাঁর আস্তাবলে বোররাখ্ বেঁধে রাখার ব্যাপারটা মূল্যবান সূত্র বলছেন?"

"একজ্যাক্টলি!" কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। "আল-বিরুনির আঁকা ঐতিহাসিক ছবিটি যে আস্তাবলে কোথাও লুকোনো ছিল, তাতে আর আমার সন্দেহ নেই।

আর তা ছিল তাহের দর্জির ঘরে। জর্জিসসায়েব আর তাহের মিয়াকে বুড়ি কবরখানায় মারামারি করতে দেখেছিল। কী একটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলেন ওঁরা। সেটা ওই ছবি। জর্জিসসায়েবকে মেরে তাহের ছবিটা নিয়ে পালিয়েছিল।"

"কবরখানায় জর্জিসসায়েব ছবি নিয়ে কী করছিলেন?"

"বড়নবাবসায়েব যাতে ছবিটা জোর করে না নিয়ে যান, তাই উনি সেটা লুকিয়ে রাখতেই গিয়ে থাকবেন। তাহের দর্জি যে-কোনো উপায়ে জেনে থাকবে মূল্যবান ছবিটার কথা। সে যে ওঁত পেতে ছিল, এমন না হতেও পারে। কারণ তার ঘরের পশ্চিম-জানালা থেকে কবরখানা পরিষ্কার দেখা যায়। দূরত্বও মোটে মিটার দশেকের বেশি নয়।" কর্নেল চোখ বুজে থাকার পর হঠাৎ চোখ খুলে ফের বললেন, "বড়নবাবসায়েবও তাকে ছবিটার ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তাহেরের ঘরটা খোঁজা খুবই দরকার। আজই। মিঃ ভদ্রকে বলা আছে অবশ্য। কিন্তু তত গা করছেন না। দেখি, বিকেলের মধ্যে আসেন কি না। নইলে রাতেই চুপিচুপি হানা দেব।"

"নাসির খাঁ—"

আমার কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "নাসির খাঁ পাগল হয়ে গিয়েই সমস্যা বেড়েছে। নইলে উনি অনেককিছু জানেন বলে আমার ধারণা। দিদির গোপন প্রণয় থেকে শুরু করে সবকিছুই সম্ভবত ওঁর জানা।"

"বিজ্জু বলেছিল, বড়নবাবসায়েব ওষুধ খাইয়ে ওঁকে পাগল করে দিয়েছেন!"

কর্নেল সে কথায় কান দিলেন না। চুরুট নিভে গিয়েছিল। আবার জ্বেলে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "ছবিটা উদ্ধার করা গেলেও সেটা আর নবাব পরিবারের হবে না।"

"কেন?"

"ওটা এখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। সরকার যে-মুহূর্তে নিজামতকেল্লা অধিগ্রহণ করেছেন, সেই মুহূর্তের তার যা কিছু—ইট কাঠ পাথর পর্যন্ত, সবই সরকারের মালিকানায় চলে গেছে। বড়নবাবসায়েব কেন অত অস্থির হয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, এবার তা স্পষ্ট হয়েছে, জয়ন্ত! উনি আসলে ওঁর ভগ্নীপতির হত্যারহস্যের কিনারা করতে চাননি, ওটা নেহাত অছিলা। ওঁর আসল উদ্দেশ্য আমাকে দিয়ে ছবিটি উদ্ধার করানো। কিন্তু আমি যে দেশের আইন লঙ্ঘনের পক্ষপাতী নই, উনি সেটা অনুমান করেননি। ভেবেছেন আমি গোয়েন্দাগিরি করি টাকার লোভে। তাই প্রথমে টেলিফোনে যোগাযোগ করে টাকার কথাই তুলেছিলেন।"

॥ ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসা ॥

এদিন দুপুরে খাওয়ার পর আর ভাত-ঘুম ঠেকানো যায়নি। কম্বলের তলায় বিকেল অব্দি পড়ে থেকে এবং অজস্র দুঃস্বপ্ন-সুখস্বপ্ন দেখে আবুর ডাকে উঠে

বসেছিলাম। আবু কফি এনে ডাকছিল। তার কাছে জানতে পারলাম, বুড়োসায়েব রোশনিবাগের আমবাগানে পরগাছা পাড়তে গেছেন। আবুকেই একজন গাছে-চড়তে জানা লোক যোগাড় করে দিতে হয়েছে। ভাত-ঘুমের পর নিঝুম বেলায় কফিটা দারুণ লাগল। নিজামতকেল্লার ভগ্নস্তূপের ফোকরগলিয়ে টকটকে গোলাপী রোদ চুঁইয়ে পড়েছিল এবং কবরখানার গাছপালা জুড়ে তখনই নীলচে কুয়াশার আলোয়ান মুড়ি দেওয়ার আয়োজন শুরু হয়েছে। কফি খেয়ে ভাবলাম, একটু চক্কর দিয়ে আসি। নইলে দুপুরের বিরিয়ানি আর কোর্মা-কোফ্‌তা হজম হবে না।

কিন্তু এই অবেলায় একটা বেয়াড়া ইচ্ছে মাথায় চেপে বসল। কবরখানায় গিয়ে একটু গোয়েন্দাগিরি করলে কেমন হয়? জাভেদ পাঠানের ভূগর্ভস্থ গোপন ডেরার হদিস যদি পেয়ে যাই, কর্নেলকে টেক্কা দিতে পারব।

কবরখানার পশ্চিম প্রান্তে চলে গেলাম ঘুরতে ঘুরতে। ওদিক দিয়ে গেয়ে কারুর চোখে পড়ার চান্স কম। ধ্বংসস্তূপ এবং ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কবরখানার নিচু পাঁচিল পেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড কল্কেফুলের ঝোপের সামনে গিয়ে পড়লাম।

ঝোপটার ভেতর সার-সার কয়েকটা পুরনো কবর আছে। সেগুলোর মাথায় ছাদ ছিল মনে হল। কারণ তিনটে থাম এখনও তিন কোনায় খাড়া রয়েছে। একেকটা ফুট ছ-সাত উঁচু। চতুর্থ থামটার চিহ্ন নেই। থামগুলো বেশ মোটা। ধূসর আলোয় এই কবর-গুচ্ছকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বুঝলাম, ছাদের ধ্বংসাবশেষ কোন যুগে সরিয়ে কবরগুলোকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং সবই অল্পবয়সী মানুষের। অথবা স্ত্রীলোকেরও হতে পারে। মধ্যিখানে একটা ফলক আঁটা রয়েছে লাইম-কংক্রিটের পাটাতনে। তাতে ফার্সি হরফে কী সব লেখা আছে। ভাবছিলাম, এই মৃত মানুষগুলোর মধ্যে কি পরস্পর রক্তের সম্পর্ক ছিল, তাই এদের এভাবে আলাদা জায়গায় কাছাকাছি কবরে শোয়ানো হয়েছিল? হঠাৎ চোখে পড়ল, এই কবরগুচ্ছের শেষদিকে মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের কবর। তার ফলকে লেখা ফার্সি হরফের তলায় ইংরেজিতে কয়েক লাইন কী সব লেখা আছে।

'এগিয়ে গিয়ে পড়ে দেখলাম ঃ

"I see before me spread the road
that leads to the kingdom of Death
like a thread stringing smooth
the uniquiet broken bits of life
Thus peace comes, thus ends strife."

—Mirza Ghalib

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি করে গেছে কবি গালিবের? জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন ব্যর্থ না হলে মৃত্যুর মধ্যে

জীবনকে আবিষ্কার করা যায় না, আর তখন মৃত্যুই হয়ে ওঠে শান্তি। এমনি করে উচ্চারিত হয়, 'সমুখে শান্তি পারাবার/ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।' মৃত্যু হয়ে ওঠে 'শ্যামসমান'।

শ্মশানে যেমন, তেমনি গোরস্তানে গেলেও বুঝি বা মনে এক ধরনের দার্শনিকতা ঘনিয়ে আসে। দিনের শেষের এই ধূসর কুয়াশা যেমন অবশিষ্ট আলোটুকু ঘিরে ফেলেছে, তেমনি একটা অস্পষ্টতা ঘিরে ফেলে জীবন নামক অস্তিত্বকেই।

সেই সময় চমকে উঠলাম। কে গুনগুন করে গান গাইছে কোথায়। গায়ে কাঁটা দিল। তারপরই বুঝতে পারলাম এ গান পাগল নাসির খাঁই গাইছেন। একটু তফাতে একটা কাঞ্চনফুলের গাছের তলায় একটা উঁচু কবরে আমার দিকে পিছু ফিরে বসে আছেন নাসির খাঁ।

বারবার গাইছেন। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেল।

"কিস্ সে মাহ্রুমি কিসমতকি শিকায়ত্ কিজে
হামনে চাহাথা কে মর যায়েঁ সো উও ভি না হুয়া ॥"

তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম। শীতের দিনের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে গিয়েছিল কখন। আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল। হঠাৎ আমার পিছনে কোথাও খটখট হড়মড় গোছের চাপা একটা শব্দ হতে লাগল। ঘুরে কিছু দেখতে পেলাম না। শব্দটা তারপরই থেমে গেল।

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে সাড়া দিলাম নাসির খাঁকে। কিন্তু উনি আমাকে দেখেও যেন দেখতে পেলেন না। আপন মনে গান গাইছেন গুনগুন করে। এবার গানের মানেটা অনুমান করতে পারছিলাম। "দুর্ভাগ্যের জন্য কার কাছে অভিযোগ করব? মরে যেতে চাইলাম, তো মরণও হল না।"

কবরের সংসর্গ দেখছি বড় বিপজ্জনক। খালি মৃত্যু আর মৃত্যু ছাড়া কথা নেই। জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে মৃতদের মাঝে গিয়ে পড়া ঠিক নয়। এখনই কেটে পড়া উচিত। গোয়েন্দাগিরি আমার সইবে না।

তারপর নাসির খাঁ সম্পর্কে কর্নেলের ভাবনার কথা মনে পড়ায় ওঁকে এখান থেকে চলে আসার জন্য ডাকলাম। এমন কী বোররাখ্ ফিনতে চাওয়ার কথাও বললাম। উনি কানে নিলেন না। তাই ভাবলাম উত্তরের গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওঁর ভাগ্নীদের খবর দিই।

কিছুদূর গেছি, হঠাৎ পেছনে কোথাও একটা হুংকার শুনতে পেলাম। আবছা আঁধারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কিছু। কিন্তু তারপরই নাসির খাঁয়ের চিৎকার শোনা গেল, "নাফরমান! কুত্তাকা বাচ্চা!"

তারপর গুলির শব্দ। সন্ধ্যার গোরস্তানের স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্য চিড় খেল। আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না যে হতভাগ্য নাসির খাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু উপহার দিয়েছে জাভেদ পাঠান!

সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরোইনি। তাই দৌড়ে উত্তরের গেট দিয়ে বেরিয়ে পোড়ো জমি ভেঙে বেগমসায়েবার বাড়ি পৌঁছুলাম। আবু ঘরের মেঝেয় ঝাড়ু বোলাচ্ছিল। রোজ সকালসন্ধ্যা এই তার কাজ। আমাকে দেখে বলল, "বুড়োসায়েব এসেছিলেন একদঙ্গল পুলিশ নিয়ে। আস্তাবলে কী হচ্ছে দেখুন গে!"

কী হচ্ছে, তা জিগ্যেস করার মন ছিল না। টর্চ বের করে বললাম, "আবু! শিগগির বুড়োসায়েবকে খবর দাও! কবরখানায় আবার মানুষ খুন হয়েছে।"

আবু তাকিয়ে রইল। আমি দৌড়ে চললাম কবরখানায়। দূর থেকে টর্চের আলো ফেলে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। নাসির খাঁ খুন হননি। কোমরে দু হাত রেখে সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা লোক আরেকটা উপুড় হয়ে থাকা লোকের পিঠে চেপে বসেছে। সে নাসির খাঁকে বলছে, "জলদি লাও বেটা। জলদি করো!"

লোকটাকে কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম। সে বিড্ডু।

এবং তলার লোকটি জাভেদ পাঠান। তার রাইফেলটা একটু তফাতে পড়ে রয়েছে। বুঝলাম, জাভেদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

কিন্তু বিড্ডু কোত্থেকে হঠাৎ সময়মতো আবির্ভূত হয়েছিল? তাকে তো কলকাতায় দেখে এসেছিলাম!

বিড্ডু আমাকে চিনতে পারল না প্রথমে। সে দম আটকানো গলায় বলে উঠল, "দেখিয়ে সাব! এর নাম আছে জাভেদ পাঠান। খুনী ঔর দাগী আসামী আছে হারামি। ছোটানবাবকে খুন করতে গোলি চালিয়ে দিল। তো আমি একে পাকড়ে ফেললাম। সাব, জেরা মেহেরবানি করকে আপ থানামে খবর ভেজিয়ে জলদি। হামি ওকে পাকড়ে রেখেছে।"

রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে চেম্বার খুলে দেখলাম এখনও দুটো গুলি আছে। রাইফেলটা অটোমেটিক। তাই গুলি দুটো বের করে পকেটে রাখলাম।

বিড্ডু আবার তাগিদ দিল। তারপর আমাকে চিনতে পারল। একগাল হেসে বলল, "ও! চিনেছে—আপনি ছোটা গোয়েন্দাসাব আছেন। তো বুড়া গোয়েন্দাসাব কোথায়? উনহিকো জলদি বোলাইয়ে!"

ওকে রুমাল ছুড়ে দিয়ে বললাম, "তুমি আসামীর হাত দুটো রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলো বিড্ডু। বুড়োগোয়েন্দাসায়েব এখনই এসে যাবেন।"

বিড্ডু জাভেদের হাত দুটো পেছন থেকে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর উঠে দাঁড়াল। জাভেদ ওঠার চেষ্টা করলে সে তার জুতোসুদ্ধ পা পিঠে চাপিয়ে গর্জন করল, "চুপসে শুত্‌কে—একদম চুপসে! শর্ তোড় দেগা ইটা মারকে।"

কয়েকটা টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কর্নেল এসে পড়লেন সদলবলে। কনস্টেবলরা এসেই জাভেদকে ওঠাল। তারপর তার কাঁধে থাবা হাঁকড়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। রাইফেল এবং গুলি দুটো পুলিস অফিসার মিঃ ভদ্রকে দিলাম। আগাগোড়া ঘটনাটা বললামও।

কর্নেল টর্চের আলো ফেলছিলেন চারদিকে। গঠাৎ বললেন, "কিন্তু নাসির খাঁ কোথায় গেলেন?"

বিজ্জু ডাকল, 'ছোটকু! বেটা ছোটকু! কাঁহা হ্যায় তুম?"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে উত্তরের গেটের দিকে এগিয়ে গেলে তাঁকে অনুসরণ করলাম। জিগ্যেস করলাম, "আস্তবল অভিযানে লাভ হল কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "হয়েছে।"

"ছবিটা পেয়েছেন? কোথায় রাখা ছিল?"

কর্নেল আমাকে অবাক করে বললেন, "ছবি? ছবি পাইনি!"

"তাহলে লাভটা কী হয়েছে?"

"বড়নবাবসায়েবের কিছু চিঠি পাওয়া গেছে।" কর্নেল ব্যস্ততার মধ্যে বললেন। "যা অনুমান করেছিলাম। বসির খাঁ তাহের মিয়াকে তাঁর ভগ্নীপতি জর্জিস খাঁর ওপর নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছবিটা বেচতে পারলে টাকার অর্ধেক ভাগ দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাহের তক্কে তক্কে ছিল।"

"মশা মারতে কামান দাগার আয়োজন!"

মিনা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। কর্নেলকে বলল, "মাজীকে খুঁজে পাচ্ছি না। মুনা-রুনা কান্নাকাটি করছে।"

কর্নেল বললেন, "পাগলানবাবকে তুমি দেখেছ, মিনা?"

মিনা কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, "উনি ভাগ্নীদের কাছে বসে আছেন।"

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, "এস তো জয়ন্ত!"

বাড়ি ঘুরে নহবতখানার ফটক পেরিয়ে গিয়ে একটা সাইকেল রিকশো ডাকলেন কর্নেল। দুজনে উঠে বসলাম রিকশোতে। তারপর কর্নেল বললেন, "রোশনিবাগ চলো। একটু তাড়াতাড়ি গেলে বখশিশ পাবে।"

সারা পথ আমার কোনো প্রশ্নের জবাব পেলাম না। অবশেষে আবিষ্কার করলাম, আমরা গিয়াসুদ্দিন পাঠানের বাড়ির দিকে চলেছি।

দরজায় কর্নেল জোরে কড়া নাড়লেন। একটু দেরি করে দরজা খুলল। গিয়াসুদ্দিন আমাদের দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, "বেগমসায়েবাকো খবর ভেজিয়ে মেহেরবানি করকে।"

গিয়াসুদ্দিন কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করছেন, তাঁর পেছন থেকে বেগম শামিম-আরা এগিয়ে এসে বললেন, "চলুন কর্নেলসায়েব! আর ঝামেলা করে লাভ নেই।"

কর্নেল বললেন, "আপনার হাতে কী?"

শামিম-আরা বাঁকা হাসলেন। "একমুঠো ছাই। নাসিরের মুখে মাখিয়ে দেব বলে নিয়ে যাচ্ছি।"

কর্নেল চমকে উঠলে। "সর্বনাশ! ছবিটা পুড়িয়ে ফেললেন আপনি! একটা অমূল্য ঐতিহাসিক ছবি। বেগমসায়েবা, এ কী করলেন আপনি!"

বৃদ্ধ গিয়াসুদ্দিন তেমনি কাঠপুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শামিম-আরা বেরিয়ে এসে বললেন, "চলুন!"

জনহীন অন্ধকার রাস্তায় রিকশোওলা রিকশো নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কর্নেল বললেন, "বেগমসায়েবা আপনি এই রিকশোয় চলে যান। আমরা হেঁটেই ফিরব।"

রিকশোওলা বলল, "পথে রিকশা পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।"

"তাই দিও। আর শোনো, তুমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে একটু অপেক্ষা কোরো। তোমার ভাড়াটা—"বলে কর্নেল পার্স বের করলেন। "না না—বরং তুমি ভাড়াটা নিয়েই যাও।"

শামিম-আরা রিকশোওলার উদ্দেশে চাপাস্বরে বললেন, "ছোড়্। হামকো পহুঁছা দে জলদি! ফিকর মাত কর। হাম সব দে দেগি।"

"জী।" বলে রিকশোওলা প্যাডেলে চাপ দিল। কর্নেল ভাড়া দেওয়ার সুযোগ পেলেন না।

রোশনিবাগের জনহীন রাস্তায় শীতের সন্ধ্যায় হাঁটছিলাম দুজনে। একটু পরে কর্নেল চুরুট ধরালেন। লাইটার জ্বালানোর সময় ওঁর মুখে একটা প্রশান্তির ভাব দেখতে পেয়েছিলাম। তাই বললাম, "ছবিটা তাহলে বেগমসায়েবা গিয়াসুদ্দিনসায়েবের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তবে সেটা আজই বেলা দশটার পরে কোনো এক সময়ে।"

"বুঝেছি। মিনাকে নিয়ে ওই সময় বেরিয়েছিলেন—আবু বলছিল।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ছবিটা আস্তাবলে গতরাত্রে তাহের মিয়ার ঘর থেকেই হাতিয়েছিলেন শামিম-আরা। কাল রাতে পাগল নাসির খাঁ ভাগ্নীদের বলেছিলেন, আস্তাবলে বোররাখ্ বাঁধা আছে। দুই বোনই আমাকে বলেছে, গতরাতে মা মিনাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। আস্তাবলে তাহের দর্জির ঘরে ঢোকার অসুবিধে নেই—কারণ পশ্চিমের জানালা একেবারে ভাঙাচোরা। মুনা-রুন্না ভোরবেলা কবরখানায় ফুল দিতে গিয়ে আমাকে সেখানে দেখে ভড়কে গিয়েছিল। যাই হোক্ মেয়ে দুটো অত্যন্ত সরল। কথায় কথায় সব ফাঁস করে দিল।"

"তাহলে নাসির খাঁয়ের কথা শুনেই বেমসায়েবা বুঝতে পেরেছিলেন ছবি কোথায় আছে?"

"ঠিক তাই।" কর্নেল চাপাস্বরে কথা বলছিলেন। "মুনা-রুন্নার বর্ণনা অনুসারে ছবিটা খুবই ছোট্ট। কাপড়ে আঁকা কালো রঙের স্বর্গীয় বাহনের ছবি। ইঞ্চিছয়েক লম্বা আর ইঞ্চিচারেক চওড়া ফ্রেমে কাচ দিয়ে বাঁধানো ছিল।"

"বোঝা যায়, ছবিটা বেচে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যেতেন বেগমসায়েবা। হতভাগিনী মেয়ে দুটোকে ফেলে রেখে!"

"কে জানে কী করতেন! স্ত্রীলোকের মনের কথা দেবতারাও নাকি টের পান

না।" কর্নেল একটু হাসলেন। "তবে আমি জানি, মেয়েদের প্রতি শামিম-আরার স্নেহও কিছু কম নেই। তাই আমার ধারণা, স্নেহের জয়ই হত। জয়ন্ত, অবৈধ প্রেম-ট্রেমের চেয়ে বাৎসল্যের টান অনেক বেশি। আসলে জাভেদ ওঁকে প্ররোচিত করত। আর উনি ভুগতেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। এবার বোধ করি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। বাসল্যেরই জয় আশা করতে পারব।"

একটা রিকশোর ভেঁপু বাজছিল দূরে। জুগজুগ করছিল ভুতুড়ে একটা আলো। রিকশোটা এসে দাঁড়িয়ে গেল। রিকশোওয়ালা বলল, "সেলাম সাব!"

সেই রশিদ রিকশোওলা।

নহবতখানা ফটক পেরিয়ে যাবার সময় জিগ্যেস করলাম, "গিয়াসুদ্দিনের বাড়িতে ছবি রাখার খবর কে দিল আপনাকে?"

"বাইনোকুলার।"

"সে কী!"

"অর্কিডটা পাড়ার জন্য নিজেই গাছে উঠেছিলাম। কিন্তু অত উঁচুতে এই প্রকাণ্ড শরীরের পক্ষে পৌঁছুনো অসম্ভব হত। ডালটা ভেঙে যেত এবং মারা পড়তাম। তবে আমার যা স্বভাব। গাছে উঠে বাইনোকুলারে গিয়াসুদ্দিনের বাড়ির উঠোনে বেগমসায়েবা আর মিনাকে দেখে অবাক হইনি। নাসিরের ভয়ে ছবিটা কোথাও লুকিয়ে রাখতেই হত ওঁকে।"

ডেরায় পৌঁছে দেখি, আবু দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল বললেন, "তোমার মাজী এসেছেন?"

"জী সাব!"

"পাগলানবাব ঘরে আছেন তো?"

"জী সাব! আপাদের সঙ্গে গল্প করছেন।"

"খুব ভাল। দেখ তো বাবা, একটু কফি খাওয়াতে পারো নাকি। বড্ড ঠাণ্ডা আজ।"

আবু চলে গেলে জিগ্যেস করলাম, "একটা কথা বুঝতে পারছি না। তাহের দর্জি কাল ভোরে কবরখানায় ঢুকেছিল কেন?"

"এ প্রশ্নের সঠিক জবাব হয়তো পাওয়া যাবে না। তবে আমার অনুমান, সে কবরখানায় জাভেদের লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা কোনোভাবে টের পেয়ে থাকবে। তাই কৌতূহলী হয়ে তদন্ত করতে গিয়েছিল হয়তো। কিংবা গতকাল ভোরবেলা তার চোখে পড়েছিল কিছু। হয়তো জাভেদকে দেখতে পেয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। জাভেদকে জেরা করলে জানা যাবে কেন সে তাহের মিয়াকে খুন করেছে।"

"কর্নেল! জাভেদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা দেখতে কৌতূহল হচ্ছে।"

কর্নেল হাসলেন। "কল্কেফুলের জঙ্গলের ভেতর শাদা পাথরের একটা প্রকাণ্ড কবর আছে। ওটা নকল কবর। পাথরের ঢাকনা সরালে সিঁড়ি আছে। নিচে

একটা ঘরের ভেতর নবাব ইস্কান্দার খানের আসল কবর। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ইংরেজরা তাঁর মৃতদেহের অবমাননা করবে। তাই ওই পাতালঘরে নিজের আসল কবরের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। যাই হোক, তোমাকে সেই পাতালঘরে ঢোকাতে রাজি আছি। তবে তুমি যদি ভয় পেয়ে হার্টফেল কর আমি দায়ী থাকব না।"

"ভয় পাওয়ার কী আছে? জাভেদ তো দিব্যি সেখানে থাকত।"

"ডার্লিং! জাভেদ একজন দুঃসাহসী লোক। খুনী, ডাকাত এবং একসময় স্মাগলারও ছিল সে। তার পক্ষে কবরের পাশে শুয়ে নাক ডাকানো খুবই সম্ভব।"

দ্রুত বললাম, "থাক গে! কী দরকার কবরে ঢোকার!"

কর্নেল হাসতে লাগলেন। আবু কফি আনল। চাপাস্বরে বলল, "মাজী খুব কাঁদছেন। পাগলানবাব ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গান করছেন, কী সব হচ্ছে বাড়িতে। আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

দুঃখিত বালকটি পশ্চিমের বারান্দায় চলে গেল। কানে এল, পাগল নাসির খাঁ গুন গুন করে গাইছেন। একটু পরে বিড্ডু এসে সেলাম দিয়ে মেঝেয় বসল।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "থানা থেকে এলে বিড্ডু?"

"জী হাঁ সাব!"

"তুমি কলকাতা ফিরবে কবে?"

"ছোটকুনবাবকে সাথে নিয়ে যাব। দেখি, উনির কখন মর্জি হয়।"

আমি জিগ্যেস করলাম, "তুমি হঠাৎ কলকাতা থেকে চলে এলে কেন, বিড্ডু?"

বিড্ডু বলল, "কর্নেলসাব হামাকে আসতে বলেছিলেন। তাই চলে আসল।"

"তুমি তখন কবরখানায় কী করছিলে?"

"কুছু না। হামি এসে ছোটকুনবাবকে ঢুঁড়ছিল। ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে কবরখানায় গেল। গিয়েই দেখল কী, জাভেদ হারামি বন্দুক তাক করেছে। হামি ওকে পাকড়ে ফেলল। গুলিভি ছুটে গেল। বাপরে বাপ! হারামি ডাকুর গায়ে এত্তা তাকত, হামাকে বুঢ়া সমঝেছিল।"

বিড্ডু হাসতে লাগল। তারপর গম্ভীর হয়ে ফের বলল, "সাব! জাভেদকে পাকড়াও করল পুলিশ। লেকিন ওর বড়ভাই ফরিদভি হারামি আছে। ওহি তো ছোটকুনবাবকে হেকিমি দাওয়া খিলিয়ে পাগল করে দিয়েছে! হামি এখন সমঝে লিয়েছি, ফরিদ এইসা কিয়া।"

কর্নেল নিভন্ত চুরুটটি ধরিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "ফরিদসায়েবকে শিগগির পুলিশ অ্যারেস্ট করবে, বিড্ডু! পাসপোর্ট জাল করার জন্য পুলিশ ওঁর দিকে নজর রেখেছে কিছুদিন থেকে।"

মিনা এসে মৃদুস্বরে বলল, "কর্নেলসাব! আপনাকে অন্দরে আসতে বললেন

মাজী!" তারপর বিল্ডুকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। "বিল্ডুভাইয়া, কখন এলে তুমি? তা এখানে বসে আছ কেন? ভেতরে এস।"

কর্নেল ও বিল্ডু অন্দরমহলে গেলে প্যাড বের করে রেপোর্টাজ লিখতে বসলাম। একখানা জম্পেশ রেপোর্টাজই লিখতে হবে। একাদশ শতাব্দীর পর্যটক ও পণ্ডিত আল-বিরুনির আঁকা স্বর্গীয় বাহনের ছবি থেকেই শুরু করা যাক। ওই বাহনে চেপে জাহানাবাদের নবাববংশীয়া এক প্রেমিকা প্রেমের স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন। শেষে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসায় বাহনটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন।......

বিগ্রহ রহস্য

কে ওখানে?

আনমনা মানুষের গলায় প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইলেন দীনগোপাল।

দৃষ্টি রাস্তার ডানদিকে, যেখানে বৃক্ষলতার ঘন বুনোট। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, হাতে ছড়ি।

নীতাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে বলল—কেউ না, আসুন।

দীনগোপাল পা বাড়িয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।—কী একটা ঘটছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো হ্যালুসিনেশান। অথচ—

থেমে গেলে নীতা বলল—কী?

—অথচ তুই নিজেও তো পরশু বিকেলে দেখে এসে বললি, কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। ঘাসগুলো সবে খাড়া হচ্ছিল। দীনগোপালের গলায় আরও অন্যমনস্কতা টের পাচ্ছিল নীতা। একটু পরে ফের বললেন—আমার বয়স হয়েছে। একটা চোখে ছানি। কিন্তু তুই—কথা কেড়ে নীতা বলল—কুকুরটুকুর হবে। ঘাসগুলো সোজা হচ্ছে দেখেছিলাম। তার মানে এই নয় যে, কোনও মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ছিল!

—কিন্তু আমি মানুষই দেখেছিলাম।

নীতা একটু হাসল।—এখনও বুঝি মানুষ দেখলেন? দীনগোপাল ঘুরে সেই জায়গাটার দিকে ছড়ি তুলে বললেন—হুঁ, মানুষই মনে হলো।

—কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না তো?

একটু বিরক্ত হয়ে বললেন দীনগোপাল—তাহলে হ্যালুসিনেশান।

নীতা আর কথা বাড়াল না। হেমন্তের মাঝামাঝি এলাকার আবহাওয়ায় বেশ

হিম পড়ে গেছে। এই শেষবেলায় হিমটা জোরাল। কলকাতার সবচেয়ে শীতের কোনও রাতের মতো। দুধারে রুক্ষ অসমতল মাঠ, কিছু ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছে জটলা। চাষবাসের চিহ্ন কদাচিৎ। তবে বসতির দিকটায় একটা ক্যানেল এবং কিছুটা সমতল মাটি উর্বরতা এনেছে। আধ কিলোমিটার দূরে এখনই কুয়াশার ভেতর বাতি জ্বলে উঠল। অথচ পেছনে পশ্চিমে দূরে টিলার মাথায় ডুবুডুবু সূর্যের লালচে ছটা। আদিবাসী মেয়ে-পুরুষের একটা দল পাশ কাটিয়ে বোবা চলে গেল। খাটতে গিয়েছিল সরডিহিতে।

একটা উঁচু ডাঙ্গাজমির ওপর দীনগোপালের বাড়ি। পুরনো লালরঙের দোতলা বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দি। এখানে-সেখানে ধসে গেছে। কাঠ দিয়ে সেখানে বেড়া দেওয়া হয়েছে। পুরনো ফুলফলের গাছপালার চেহারায় ক্রমশ আদিম ছাপ ঘন হয়ে উঠেছে। পোড়ো হানাবাড়ি দেখায় নীচের রাস্তা থেকে।

ছড়ির ডগায় চাপ দিয়ে রাস্তা থেকে গেটে উঠছিলেন দীনগোপাল। একটু আগের মতো ফের বলে উঠলেন—কে ওখানে?

নীতা রাগ করে বলল—ভূত!

দীনগোপাল কিছু বলার আগেই সাড়া এল—আমি জ্যাঠামশাই! দীপু।

নীতা ছটফটে ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল।—দীপুদা! কখন এলে? বউদি আসেনি?

দীপ্তেন্দু দীনগোপালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পর বলল—নবর কাছে শুনলাম বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাই আপনাদের খুঁজতে যাচ্ছিলাম। তারপর নীতার উদ্দেশে বলল—তোর বউদি আসবে কী? সামনে স্কুলের পরীক্ষা। দিদিমণিদের এখন সিরিয়াস অবস্থা। তা তোর খবর কী বল?

দীনগোপাল দীপ্তেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বাড়ি ঢুকলেন। নীতা বলল—আমার কোনও নতুন খবর নেই—যথাপূর্বং।

—কী যেন একটা চাকরি করছিলি কোথায়?

—করছি। মরবার ইচ্ছে নেই যখন, তখন বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু করতে হবে।

দীপ্তেন্দু হেসে উঠল। দীনগোপাল বললেন—একটু খবর দিয়ে এলে স্টেশনে নবকে পাঠাতাম। তোমরা সব্বাই আমাকে ভুলে গেছ। একটা চিঠি পর্যন্ত না। কাজেই ধরে নিচ্ছি, এরিয়ায় কোম্পানির কোনও কাজে এসেছ।

—দীপ্তেন্দু বলল—মোটেও না জ্যাঠামশাই! বিশ্বাস করুন, অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম আসব—তো সময় করাই কঠিন।

দীনগোপাল বলবেন—নীতুও একই কৈফিয়ত দিয়েছে। যাই হোক, তোমরা এসেছ। আমার খুবই ভাল লাগছে। আগের মতো আর যখন-তখন কলকাতা ছুটতে পারি না। চোখে ছানি। শরীরটাও—কে ওখানে?

—হঠাৎ এমন গলায় কথাটা বলে উঠলেন, প্রথম নীতা এসে যে চমক খাওয়া তীব্র চিৎকার শুনেছিল, সেই রকম। দীপ্তেন্দু ভীষণ চমকে উঠেছিল,

নীতার মতোই। কিছু বলতে যাচ্ছিল, দীনগোপাল নিজেই ফের আস্তে বললেন—কিছু না।

দীপ্তেন্দু নীতার দিকে তাকালে নীতা চোখ টিপল। দীপ্তেন্দুর দৃষ্টিতে বিস্ময় ছিল। বেড়ে গেল। দীনগোপাল লনে হাঁটতে হাঁটতে বললেন ফের—ও মাসে শান্ত চিঠি লিখেছিল। কিন্তু ঠিকানা ছিল না। অবিশ্যি ওর তো বরাবর এরকম। ভবঘুরে স্বভাব হলে যা হয়।

দীপ্তেন্দু বলল—শান্তর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। রাস্তায়।

দীনগোপাল তার কথায় কান দিলেন না। বললেন—তুমি তো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ?

—হ্যাঁ, কেন জ্যাঠামশাই?

—ওষুধপত্তরের খবরাখবর তুমি রাখো। দীনগোপাল দাঁড়িয়ে গেলেন।—বিনা অপারেশনে ছানি সারানোর কোনও ওষুধ নেই?

দীপ্তেন্দু হাসল।—ও নিয়ে ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করে দেব'খন। বলুন কবে যাচ্ছেন?

দীনগোপাল আস্তে বললেন—এখানকার ডাক্তার বলেছে, এখনও ম্যাচিওর করেনি। বুঝি না! এক হোমিওপ্যাথকে দেখলাম কিছুদিন। সে আবার বলে, ছানি-টানি নয়। ঠাণ্ডা লেগে ইনফেকশান। শেষে—কে ওখানে?

—দীপ্তেন্দু আবার চমকে উঠেছিল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, নীতার ইশারায় চুপ করল। দীনগোপাল বাঁদিকে ঘুরে লনের ওধারে ভাঙা পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই সময় বাড়ির আলোগুলি জ্বলে উঠল। দীনগোপাল সামনে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডাকলেন—নব!

—আজ্ঞে! বারান্দা থেকে সাড়া দিল নব।

—চা। দীনগোপাল বারান্দায় উঠে বললেন—আর ইয়ে, দীপুর থাকার জন্য পুবের ঘরটা খুলে দে।

নব বলল—দিয়েছি। দাদাবাবু এলে তো ওই ঘরেই থাকেন।

ডাইনে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন দীনগোপাল।—আমার চা ওপরে পাঠিয়ে দে। আর দীপু, তোমরা গপ্পটপ্প করবে তো করো কিছুক্ষণ।

ওপরে-নিচে ছ'খানা ঘর। নিচের মধ্যিখানের ঘরটা বড় এবং সেটাই সাবেকি ড্রইংরুম। ভেতরে ঢুকে বাঁদিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল দীপ্তেন্দু ও নীতা। দীপ্তেন্দু খাটে বসে সিগারেট জ্বালাল। নীতা একটু তফাতে চেয়ারে বসে বলল—হঠাৎ চলে এলে যে!

—আর তুই?

—আমিও অবিশ্যি তাই। নীতা আঙুল মটকাতে থাকল।—তবে বিনি খরচায় সাইট-সিইং। একঘেয়েমি দূর করা। অনেক কৈফিয়ত দিতে পারি। তবে—

দীপ্তেন্দু ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে রিংটা দেখতে দেখতে বলল—একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, জানিস?

নীতা একটু চমকে উঠল—কী?

দীপ্তেন্দু খুব আস্তে বলল—কাল বিকেলে তোর বউদি স্কুল থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় একটা লোক ওকে জিগ্যেস করেছে, ও আমার স্ত্রী কি না। তারপর বলেছে, আপনার স্বামীকে বলবেন, সরডিহিতে ওঁর যে জ্যাঠামশাই থাকেন, তাঁর সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে চলেছে। তোর বউদিকে তো জানিস। বাড়ি ফিরে আমাকে প্রায় ঠেলে বের করে দিল। এক্ষুনি গিয়ে দেখ কী ব্যাপার।

নীতা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিল। শ্বাস ছেড়ে বলল—আশ্চর্য! আমারও একই ব্যাপার।

—বল্।

—বাসস্টপে একটা লোক—

—বলল সরডিহিতে জ্যাঠামশায়ের বিপদ?

—হুঁ। নীতা আনমনে বলল।—লোকটার মুখে দাড়ি ছিল। আর—

—চোখে সানগ্লাস?

—তাই। আমি ওকে চার্জ করতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বাস এসে পড়তেই লোকটা সেই বাসে উঠে নিপাত্তা হয়ে গেল। তাছাড়া বাসস্টপের জায়গাটায় আলো ছিল না। ফিসফিসিয়ে কথাটা বলেই কেটে পড়েছিল।

দীপ্তেন্দু একটু চুপ করে থাকার পর বলল—তুই জ্যাঠামশাইকে একথা বলেছিস?

—না। আমি এসেছি গত পরশু। বলল-বলব করে দুটো দিন কেটে গেল। আসলে জ্যাঠামশাইকে তো জানো। আনপ্রেডিক্টেবল ম্যান। কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবেন, কে জানে। কিন্তু আমি আসার পর—

নীতা থেমে গেল। নব ট্রেতে চায়ের পট আর কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। বড় প্লেটে কিছু চানাচুর, বিস্কুট আর কয়েকটা সন্দেশ। সে কথা বলে কম। টেবিলে ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল। দীপ্তেন্দু বলল, হুঁ বল্।

নীতা বলল, ব্যাপারটা তুমিও লক্ষ্য করেছ একটু আগে। জ্যাঠামশাই যখন তখন 'কে ওখানে' বলে উঠছেন। পরশু বিকেলে আমি আসার একটু পরে পাঁচিলের কাছে একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন 'কে ওখানে?' আমি তখনই দৌড়ে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না! কিন্তু একখানে লক্ষ্য করলাম ঘাসগুলো সবে সোজা হচ্ছে। তার মানে সত্যিই কেউ ওখানে ছিল। ফিরে গিয়ে বললাম, শেয়াল বা কুকুরটুকুরও হতে পারে। জ্যাঠামশাই নিজেও অবিশ্যি বলেছেন 'হ্যালুসিনেশান'। একটা চোখে ছানির জন্য নাকি ভুল দেখেছেন।

দীপ্তেন্দু একমুঠো চানাচুর তুলে নিয়ে বলল—কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয়, বাসস্টপের লোকটার কথা ওঁকে বলা দরকার। চা খেয়ে নে। তারপর চল্, দুজনে গিয়ে বলি।

এই সময় বাইরে কাছাকাছি গাড়ির প্রি-প্রি এবং গরগর শব্দ হলো। নীতা উঠে গিয়ে উত্তরের জানালাটা খুলে দিলে একঝলক তীব্র আলো এসে ঢুকল। দীপ্তেন্দুও উঠে দেখতে গেল।

নব গেট খুলে দিলে একটা জিপ ঢুকল প্রাঙ্গণে! নীতা বলল—অরুদা! সঙ্গে বউদিও এসেছে।

—অরুণ! বলে বেরিয়ে গেল দীপ্তেন্দু।

অরুণ ডাকছিল—জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই!

ওপরের ঘরের জানালা থেকে দীনগোপাল সাড়া দিলেন। অরুণ হইহই করে উঠল। দীপু! আরে নীতা যে! কী অবাক, কী অবাক!

অরুণের বউ ঝুমা এসে নীতাকে জড়িয়ে ধরল।—ইশ! কত্তোদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো!

নীতা বলল—তুমি বড্ড বেশি মুটিয়ে গেছ বউদি!

ঝুমা দীপ্তেন্দুর দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বলল—আশাকরি, দীপুর বউয়ের টোয়েন্টি প্যার্সেন্টের বেশি নয়। দেখে তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। দীপু ওষুধের ব্যাপারটা ভাল বোঝে! নিশ্চয় কোনও ট্যাবলেট খাওয়ায়, যাতে বেচারা আরও মোটা হতে হতে শেষে ঘরবন্দি হয়ে ওঠে এবং দীপুর পরকীয়া প্রেমের—সরি! ঝুমা জিভ কেটে থেমে গেল।

দীনগোপাল নেমে এসেছিলেন। অরুণ ও ঝুমা প্রণাম করলে বললেন—এবার শান্তটা এসে পড়লে দারুণ হয়! তিনি হাসছিলেন। মুখে খুশির ঝলমলানি। তারপর হাঁকলেন—নব!

—আজ্ঞে!

—এদের ওই ঘরটা খুলে দে। দ্যাখ্, পরিষ্কার আছে নাকি। বিছানা বদলে দিবি। আর ইয়ে—আগে চা-টায়ের ব্যবস্থা। অরু, তোরা দীপুর ঘরে গিয়ে বসতে পারিস ততক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে তোদের নিয়ে বসব।

দীনগোপাল আবার ওপরে চলে গেলেন। নব বিশাল লন পেরিয়ে গেটে তালা বন্ধ করতে গেল। সওয়া পাঁচটাতেই সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। বারান্দায় সিঁড়ির নিচে অরুণের গাড়িটার ওপর হলুদ আলোর ঝলক হিংস্র দেখাচ্ছে যেন। দীপ্তেন্দুর ঘরে এসে অরুণ প্রথমে সন্দেশগুলোকে গিলতে শুরু করল। তার ফাঁকে নীতাকে হুকুমও দিল—পটে আশা করি এখনও যথেষ্ট চা আছে। মেয়েদের চা খেতে নেই। দীপু আর আমি ভাগ করে খাব। তারপর ফের চা এলে আগে ফের দুজনে—হুঁ, বাকিটা তোমরা দুজনে। কেমন? আর এক একমাত্র লজিক হলো, পুরুষেরা সব কিছুতে আগে এবং মেয়েরা পরে। সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথা।

ঝুমা চোখ পাকিয়ে বলল—ইউ টক টু ম্যাচ। থামো তো। সব সময় খালি—

অরুণ বলল—ওক্কে। কথা কম, কাজ বেশি।

সে খাবারগুলো একা শেষ করছিল। নীতা তার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে আস্তে বলল—তোমাদেরও কি বাসস্টপে একটা লোক—

অরুণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—ঝুমা! এবার বোঝ তাহলে। হুঁ—বাসস্টপে একটা লোক। দ্যাটস রাইট, নীতা!

দীপ্তেন্দু প্রথমে অরুণের দিকে, তারপর ঝুমার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে বিস্ময় ঝিকমিক করছিল। নীতা কথাটা ঠাট্টা করে বলেছিল! কিন্তু এবার সে গম্ভীর হয়ে গেল। দীপ্তেন্দুর হাতে চা দিয়ে বলল—মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা একটা হোক্স। শান্তদার কাণ্ড।

ঝুমা বলল—সেটা ওকে বোঝাও। সবতাতেই হইহই খালি।

অরুণ খাটে বসে বলল—হোক্স হোক আর ফোক্স হোক, এমন একটা চমৎকার জার্নি আর এক্সকার্সানের জন্য লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সরডিহি এলে, বিলিভ মি, নতুন করে ভাইটালিটি পাই। ঝুমা ভিটামিনের কথা বলছিল। সরডিহি আস্ত ভিটামিন! এ বি সি ডি ই—

তাকে থামিয়ে নীতা বলল—বাসস্টপের লোকটার কথা বলো।

—কথা কম, কাজ বেশি। অরুণ একই মেজাজে বলল।—বাসস্টপে একটা দেড়েল লোক, চোখে কালো চশমা। সে কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, গো অ্যাট ওয়ান্স টু সরডিহি। ইওর জ্যাঠামশাই ইজ ইন ডেঞ্জার। তারপর হাওয়া!

দীপ্তেন্দু বলল, আরও একটু আছে। নীতা তুই বল্।

নীতা একটু হাসল।—এটা অবিশ্যি জ্যাঠামশাইয়ের নতুন বাতিক হতেও পারে। সবসময় দুয়ে-দুয়ে যোগ করে চার হওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে না।

অরুণ বলল—গো অন!

—আসা অব্দি দেখছি, জ্যাঠামশাই খালি 'কে ওখানে!' বলে চমকে উঠছেন। নীতা গলার স্বর নামিয়ে বলল—শেষে নিজেই বলছেন হ্যালুসিনেশান। আমারও তাই মনে হচ্ছে। চোখের গণ্ডগোলের জন্য ভুলভাল দেখছেন।

দীপ্তেন্দু বলল—কিন্তু তুই বললি, ঘাসগুলো—

অরুণ দ্রুত বলে উঠল—ঘাসগুলো! ঝুমা তোমাকে বলছিলাম সরডিহিতে নেচার কথা বলে। নেচার স্পিকস টু ম্যান। ঘাস ইজ আ পার্ট অব নেচার। সো ঘাস স্পিকস টু ম্যান!

ঝুমা চোখ পাকিয়ে তাকালে সে থেমে গেল। নীতা জ্যাঠামশাইয়ের চিৎকার এবং পাঁচিলের কাছে ঘাসগুলোর সোজা হওয়ার ঘটনাটি এবার একটু রহস্য মিশিয়ে বর্ণনা করল। শোনার পর অরুণ মন্তব্য করল—জ্যাঠামশাইকে একটা অ্যালসেশিয়ান পোষার কথা বলব।

নব আবার চা এবং কিছু খাবার আনল। সে চলে যাচ্ছে, এমন সময় অরুণ তাকে ডাকল—নব, শোনো!

নব একগাল হেসে বলল—মুরগির মাংস খাবেন তো? সে ব্যবস্থা করেই রেখেছি।

—ধুস! অরুণ হাসল। কী বলব না শুনেই মুরগি ছেড়ে দিল!

ঝুমা বলল—এসেই তো মুরগির পালে হানা দাও। ওর দোষ কী?

অরুণ সায় দেবার ভঙ্গি করে বলল—দিই। কারণ সরডিহির মুরগি অতি সুস্বাদু। তবে নবকে আমি এখন অন্য কিছু বলতে চাই। প্লিজ ডোন্ট ইন্টারফিয়ার! আচ্ছা, নব—!

নব বিনীতভাবে বলল—বলুন দাদাবাবু!

—ইদানীং তোমার কর্তাবাবু, মানে আমাদের জ্যাঠামশাই নাকি দিন দুপুরেও ভূত দেখতে পাচ্ছেন?

—আজ্ঞে। নব সায় দিয়ে বলল।—যখন তখন। বুঝলেন দাদাবাবু? যখন তখন খালি কাউকে দেখছেন। আর এদিকে আমার হয়েছে যত জ্বালা। সব ফেলে বাড়ির চার তল্লাট খুঁজে হন্যে হচ্ছি। শেষে দিদি আসায় একটু হুলুস্থুলু থেমেছে মনে হচ্ছে।

দীপেন্দু বলল—থেমেছে কোথায়?

নব একটু হাসল। তা অনেকটা থেমেছে, আজ্ঞে। চ্যাঁচামেচি কমেছে। অন্তত রাতবিরেতে আর গণ্ডগোল করছেন না।

অরুণ বলল—কতদিন থেকে ভূত দেখছেন জ্যাঠামশাই?

নব একটু ভেবে এবং হিসেব করে বলল—তা প্রায় সপ্তাটাক হবে। দুপুর রাত্তিরে প্রথম হুলুস্থুলু—'কে ওখানে, কে ওখানে' করে চ্যাঁচামেচি। টর্চ আর বল্লম নিয়ে বেরুলাম। বস্তি থেকে লোকেরাও দৌড়ে এল। কিন্তু কোথায় কী? শেষে বাবুমশাইকে বললাম, থানায় খবর দিয়ে রাখা ভাল। তখন বললেন, আমারই চোখের ভুল। চোখে ছানি পড়লে নাকি এমন হয়।...

নব চলে গেলে নীতা বলল—কিন্তু বাসস্টপের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কী?

ঝুমা বলল—তুমিই তো বললে, শান্ত সবাইকে নিয়ে একটা জোক করছে হয়তো।

অরুণ চোখ বুজে বলল—গো অন বেবি! এক্সপ্লেন!

ঝুমা মুখ টিপে হাসল—দেখবে, কালই শান্ত এসে পড়বে। আসলে ও আমাদের সবাইকে এখানে জড়ো করতে চাইছে।

নীতা ভুরু কুঁচকে বলল—কিন্তু কেন?

—অনেকদিন একসঙ্গে সবাই মিলে সরডিহিতে হইহল্লোড় করতে আসা হচ্ছে না, তাই।

দীপেন্দু বলল—ঠিক আছে। কিন্তু বাসস্টপের লোকটা কে?

—হয়তো ওর কোনো বন্ধু। নীতা রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল।—শান্তদাকে তো চেনো। ওর মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত প্ল্যান গজায়।...

এবার পরিবেশ হাল্কা হয়ে এসেছিল। ওরা চা খেতে খেতে নানা ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে নব এসে খবর দিল কর্তাবাবু সবাইকে ওপরের ঘরে ডাকছেন। ওরা দীনগোপালের ঘরে গেল।

দোতালায় পূবদিকের ঘরটাতে দীনগোপাল থাকেন। ঘরটা খুবই অগোছাল। একটা সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। তার ওপর বইপত্তর, আরও টুকিটাকি জিনিস। একটা স্যুটকেস পর্যন্ত। দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা কাঠ আর স্টিলের আলমারি। কোনার দিকে টেবিল এবং একটা গদি-আঁটা চেয়ার। দেয়ালে বেরঙা কয়েকটা ফোটো আর বিলিতি পেন্টিং। একটা সেকেলে ড্রেসিং টেবিলও আছে। নব কয়েকটা হাল্কা বেতের চেয়ার এনে দিল। দীনগোপাল গম্ভীর মুখে খাটে ডাঁই-করা বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন।

সবাই বসলে দীনগোপাল বললেন—তোমরা এসেছে, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা বেধেছে। সেটা হলো, তোমরা যে যখনই এসেছে, আগে খবর দিয়েছ। না, কেউ কেউ খবর না দিয়েও অবিশ্যি এসেছ। কিন্তু এভাবে প্রায় একই সঙ্গে এবং খবর না দিয়ে এসে পড়ার মধ্যে কী যেন একটা লিংক আছে।

অরুণ মুচকি হেসে বলল—আছে। এতক্ষণ আমরা সেই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসে বললেন—কী লিংক্? কেউ কি তোমাদের খবর দিয়েছে আমি মৃত্যুশয্যায়?

কথাটার মধ্যে কিছু রূঢ়তা ছিল। তাই পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল ওরা। তারপর নীতা বলল—দোষটা আমারই, জ্যাঠামশাই! এসেই আপনাকে কথাটা বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলিনি!

অরুণ ঝটপট বলল—আঃ! এত লুকোচুরির কী আছে? আমি বলছি জ্যাঠামশাই! পুরো ব্যাপারটা শান্তর জোক।

দীনগোপাল বিরক্ত মুখে বললেন—শান্ত বলেছে আমি মৃত্যুশয্যায়?

জিভ কেটে দীপ্তেন্দু বলল—ছি, ছি! এ কী বলছেন জ্যাঠামশাই! আমরা কি কেউ আপনার প্রপার্টির লোভে—

তাকে থামিয়ে অরুণ বলল—তুমি চুপ করো তো দীপু! জ্যাঠামশাই, শান্তকে তো জানেন—বরাবর এরকম জোক করে। এবার করেছে কী, ওর এক বন্ধুকে দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে খবর দিয়েছে, তোমার জ্যাঠামশাইয়ের খুব বিপদ। হি ইজ ইন ডেঞ্জার। গো অ্যান্ড প্রোটেক্ট হিম।

দীনগোপাল কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন—আমার বিপদ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী বিপদ?

অরুণ একটু ইতস্তত করে বলল—সেটা তো বলেনি! কিন্তু এসে নীতার মুখে যা শুনলাম, তাতে মনে হলো, সত্যি যেন কী ঘটতে চলেছে। অবশ্য আপনার চোখের অসুখ হয়েছে শুনলাম। নিজেও নাকি হ্যালুসিনেশান দেখার কথা বলেছেন।

দীনগোপাল হাসবার চেষ্টা করে বললেন—তাহলে তোমরা আমাকে প্রোটেকশান দিতে এসেছ?

দীপ্তেন্দু বলল না। মানে, অরুণ তো বলল, ব্যাপারটা শান্তর জোক। আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি, শান্তর শিগগির এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আসলে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে সরডিহিতে এসে হইহল্লা করিনি।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দীনগোপাল বললেন—বুঝতে পেরেছি।

অরুণ বলল—কিন্তু এবার আপনার ওই হ্যালুসিনেশান দেখার ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হলে ভাল হয়, জ্যাঠামশাই!

দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—চোখের অসুখের জন্য কি না জানি না। কিছুদিন থেকে হঠাৎ হঠাৎ এটা ঘটছে। ঝোপজঙ্গল বা গাছপালার আড়ালে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি।

—চেহারার ডেসক্রিপশান দিন। অরুণ গম্ভীর চালে বলল।

হাসলেন দীনগোপাল।—কী ডেসক্রিপশান দেব? নিছক ছায়ামূর্তি।

—আহা, মানুষ তো?

—হ্যাঁ। মানুষের মতোই। কিন্তু আবছা চেহারা। আমি কিছু বলতেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীতাকে জিগ্যেস করো।

দীপ্তেন্দু বলল—নীতা বলেছে। ঘাসে কেউ দাঁড়িয়েছিল। জন্তুজানোয়ার হওয়াই সম্ভব।

দীনগোপাল গম্ভীর মুখে বললেন—কিন্তু আমি সেখানে আবছা মানুষের মূর্তিই দেখেছিলাম।

নীতা জোর দিয়ে বলল—মানুষ হলে পালাবে কোন পথে? পাঁচিলের ভাঙা জায়গাগুলোয় তো কাঠের শক্ত বেড়া। বড়জোর একটা শেয়াল বা কুকুর, তাও অনেক কষ্টে গলে যেতে পারে।

দীনগোপাল অন্যমনস্কভাবে খাটের কোনার দিকে জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপরই দ্রুত ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে ওখানে?

আচমকা এই চেঁচানিতে সবাই প্রথমে হকচকিয়ে উঠছিল। তারপর অরুণ একলাফে বাইরে বারান্দায় চলে গেল। ওদিকটা দক্ষিণ এবং বারান্দার মাথায় একটা চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। আবছা হলুদ খানকটা আলো নিচে গিয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড়, ঘাসে ঢাকা মাটি। সে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল। তাকে অনুসরণ করল দীপ্তেন্দু। দীনগোপাল বললেন—হ্যালুসিনেশান!

কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না। ঝুমা উত্তেজিতভাবে বারান্দায় গেল। তার পেছনে নীতা। দুজনেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।...

একটু পরে নিচে টর্চের আলো ঝলসে উঠল। অরুণের গলা শোনা গেল—দীপু তুমি ওদিকটায় যাও।

নবরও সাড়া পাওয়া গেল—কিছু না দাদাবাবু! খামোকা ছুটোছুটি করে লাভ নেই।

অরুণ বলল—শাট আপ! কাম অন উইথ ইওর বল্লম! হাথিয়ার লে আও জলদি!

দীপ্তেন্দুর হাতেও টর্চ। সে পূর্বদিক ঘুরে আলো ফেলতে ফেলতে উত্তরে গেটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাড়ির পশ্চিমদিক থেকে অরুণের চিৎকার ভেসে এল—দীপু! দীপু! ধরেছি—ধরে ফেলেছি ব্যাটাকে।

দীপ্তেন্দু দৌড়ে সেদিকে চলে গেল। নব একটা বল্লম হাতে বেরুল এতক্ষণে।

টর্চের আলোয় দীপ্তেন্দু হতভম্ব হয়ে দেখল, অরুণকে ধরাশায়ী করে তার ওপর বসে আছে গাব্দাগোব্দা প্রকাণ্ড একটা গুঁফো লোক। পরনে প্যান্ট, গলাবন্ধ কোট, গলায় মাফলার জড়ানো। দীপ্তেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নব বল্লম তাক করেছিল। সেও থেমে গেছে।

দীপ্তেন্দু হো হো করে হেসে ফেলল।—কী অদ্ভুত কাণ্ড!

—অদ্ভুত তো বটেই! বলে গুঁফো লোকটি উঠে দাঁড়ালেন।—হতভাগাকে বারবার বলছি, হাতে টর্চ—ভাল করে দ্যাখ্ কে আমি। কথায় কান করে না! অ্যাই অরুণ! ওঠ্! নাকি ভিরমি খেলি?

দীপ্তেন্দু বলল—মামাবাবু, একটা কাণ্ড করলেন বটে!

—আমি করলাম, না অরুণ করল, তাই দ্যাখ্!

অরুণ পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—কোনও মানে হয়?

—হয়। তোর মাথাটা বরাবর মোটা। নে—ওঠ্!

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—সদর গেট রয়েছে। দিব্যি সেখান দিয়ে আসতে পারতেন! খামোকা আমাকে হ্যারাস করার জন্য লুকোচুরি খেলা। বরাবর আপনার এই উদ্ভুটে কারবার।

দীপ্তেন্দু হাসতে হাসতে বলল—আপনি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিলেন নাকি? পারলেন?

গুঁফো ভদ্রলোক বললেন—পলিটিকাল লাইফে জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে নিউজ হয়েছিলাম, ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। দীনুদার বাড়ির পাঁচিল না আঁচিল!

তারপর অরুণের কাঁধে হাত রেখে মুচকি হাসলেন।—অনেককাল আগে

জুডো শিখেছিলাম। দেখা গেল, ভুলিনি। আয়, দীনুদা কী অবস্থায় আছে দেখি। ওর বিপদের খবর পেয়েই তো আসা। আমার স্বভাব তো জানিস!

অরুণ গুম হয়ে বলল—জানি! গোয়েন্দাগিরি। তা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসলেই পারেন!

'মামাবাবু' প্রভাতরঞ্জন পা বাড়িয়ে বললেন, আমার পুরো প্ল্যানটা তুই ভেস্তে দিলি। ভেবেছিলাম কয়েকটা রাত্তির চুপিচুপি এসে ঘাপটি পেতে বসে থাকব এবং দীনুদার ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। হলো না। এদিক যে হোটেলে উঠেছি, সেখানে রাত্তিরে আজ পাঁঠার ঝোলের খবর আছে। জানিস তো, আমি ভয়ংকর আমিষাশী রাক্ষস।

দীপ্তেন্দু বলল—আচ্ছা মামাবাবু, আপনি কীভাবে জানলেন যে—তার কথার ওপর অরুণ বলল—বাসস্টপে একটা লোক তো?

প্রভাতরঞ্জন থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—মাই গুডনেস! তুই কী করে জানলি?

যেতে যেতে দীপ্তেন্দু সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাল। শান্তর জোকের সম্ভাবনাটাও উল্লেখ করল। প্রভাতরঞ্জন আনমনে বললেন—তাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, শান্ত সত্যি এসে পড়লে এর মীমাংসা হবে। যতক্ষণ সে না আসছে, ততক্ষণ ব্যাপারটা হেঁয়ালি থেকে যাচ্ছে।...

ওপরে দীনগোপাল ততক্ষণে নীতা ও ঝুমার মুখে ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। প্রভাতরঞ্জন সদলবলে ঘরে ঢুকলে ছড়ি তুলে হাসতে হাসতে বললেন—এস। আগে এক ঘা খাও, তারপর কথা।

প্রভাতরঞ্জন মাথা নিচু করে বললেন, মারো তাহলে।

দীনগোপাল হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে কাছে বসালেন।—আশা করি তুমিও বাসস্টপে কোনও লোকের মুখে আমার বিপদের খবর শুনে গোয়েন্দাগিরি করতে আসোনি!

প্রভাতরঞ্জন কিছু বলার আগেই অরুণ বলে উঠল—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, দা সেইম কেস।

ঘরে হাসির হল্লোড় পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে নব আরেক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। চা খেতে যেতে শান্তর কথা উঠল। প্রভাতরঞ্জন বললেন—শান্তর সঙ্গে মাসখানেক আগে কলেজ স্ট্রিটে দেখা হয়েছিল। বলল, বিয়ে করেছে। বউকে নিয়ে প্রণাম করতে যাবে। যায়নি।

নীতা চমকে উঠেছিল।—শান্তদা বিয়ে করেছে? অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

দীপ্তেন্দু বলল—আমিও না।

অরুণ বলল—আমিও।

ঝুমা বলল—ভ্যাট্! ও বিয়ে করবে কী? ও তো কোন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যেত-টেত শুনেছিলাম।

প্রভাতরঞ্জন হাসলেন।—তোমরা ভাবলে আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম? নেভার।

অরুণ একটু কিন্তু-কিন্তু ভঙ্গি করে বলল—অবশ্যি, ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। জ্যাঠামশাই, প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না। ওর মধ্যে আপনার খানিকটা আদল আছে। আমাদের বংশের যদি কোনও বিশেষ লক্ষণ থাকে, সেটা খানিকটা আপনার আর শান্তর মধ্যেই আছে। আমার কথা না, বাবাই বলতেন।

দীনগোপাল একটু হেসে বললেন—কী সেই লক্ষণ?

—জেদ। বলেই অরুণ হাত নাড়তে লাগল।—না, না। কদর্থে বলছি না, সদর্থে। ইট ইজ জাস্ট লাইক—টু স্টিক টু আ পয়েন্ট। যা ভাল বুঝেছি, তাই করব—এরকম আর কী!

দীনগোপালের হাতে সেই ছড়িটা তখনও আছে। খেলার ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে বললেন—কোন পয়েন্ট স্টিক করে আছি, আমি নিজেই জানি না। আর জেদের কথা যদি ওঠে কিসের জেদ?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—দীনুদা, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?

—নির্ভয়ে। দীনগোপাল একটু হাসলেন।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—একা এই সরডিহিতে পড়ে থাকা, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, বিয়ে করোনি। নাম্বার থ্রি...

বলে প্রভাতরঞ্জন হঠাৎ থেমে মুখে যথেষ্ট গাম্ভীর্য আনলেন। কথাটা গুছিয়ে বলতে চান এমন একটা হাবভাব। অরুণ সেই ফাঁকে বলে উঠল—হ্যালুসিনেশানের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়েছে। অথচ গা করছেন না। সাইকোলজির বইতে পড়েছি, এ একটা সাংঘাতিক অসুখ। অথচ গ্রাহ্য করছেন না। এও একটা জেদ।

ঝুমা স্বামীকে যথারীতি ধমকের সুরে বলল—থামো তো! হাতেনাতে প্রমাণ পেলে, হ্যালুসিনেশান নয়। মামাবাবুকে জানালা দিয়ে দিব্যি দেখতে পেলেন। কিসের হ্যালুসিনেশান?

প্রভাতরঞ্জন হাত তুলে বললেন—চুপ! নাম্বার থ্রি, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন। সব মানুষেরই মোটামুটি একটা লক্ষ্য থাকে। দীনুদার ছিল না এবং এখনও যা দেখছি, নেই।

দীনগোপাল ঈষৎ কৌতুকে বললেন—লক্ষ্য ব্যাপারটা কী?

—লক্ষ্য দুরকমের। প্রভাতরঞ্জন ভারিক্কি চালে বললেন। বৈষয়িক এবং মানসিক। বৈষয়িক লক্ষ্য কী, আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। মানসিক লক্ষ্য বলতে ঐহিক আর পারলৌকিক, উভয়ই। ধরো, কেউ সমাজসেবা করে। আবার কেউ ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করে।

দীনগোপাল আস্তে বললেন—ঈশ্বরটিশ্বর বোগাস। আর সমাজসেবার কথা বলছ! সেও একটা লোক-দেখানো ভড়ং। এই যে একসময় তুমি রাজনীতি করে বেড়াতে। জেল খেটেছ। কাগজে নাম ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কী? প্রভাতরঞ্জন উজ্জ্বল মুখে বললেন।...স্যাটিসফ্যাকশান! চিত্তের সন্তোষ। এটা জীবনে কম নয়, দীনুদা! একটা মহৎ কাজ করার তৃপ্তি। তাছাড়া জীবনের একটা মানেও তো আছে!

দীনগোপাল একই সুরে বললেন—ওসব আমি বুঝি না। তোমার জেল খাটায়—হ্যাঁ, তুমি একবার জেল থেকে পালিয়েও ছিলে, ভাল কথা—কিন্তু এতে কার কী উপকার হয়েছে বুঝি না। পৃথিবী বড়ো ব্যাপার—এই দেশটার কথাই ধরো। দিনে দিনে কী অবস্থাটা হচ্ছে! বাসের অযোগ্য একেবারে। নরক!

প্রভাতরঞ্জন অট্টহাসি হেসে বললেন—সিনিক! সিনিক! একেবারে সিনিসিজম!

অরুণ বলল—শান্ত! অবিকল শান্তর কথাবার্তা।

—তাও তো শান্তর ব্যাপারটা বোঝা যায়। প্রভাতরঞ্জন বললেন। শান্ত, ওই যে কী বলে, উগ্রপন্থী রাজনীতি করত। আমার সঙ্গে একবার সে কী এঁড়ে তক্ক! যাই হোক, ঘা খেয়ে ঠেকে শেখে শিখল। কিন্তু তোদের এই জ্যাঠামশাই ভদ্রলোকের ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ! কী দীনুদা? খুব চটিয়ে দিচ্ছি, তাই না?

হাসলেন দীনগোপাল।—তোমার তো চিরকাল ওই একটাই কাজ। লোককে চটানো। কিন্তু আমি পাথুরে মানুষ।

নীতার এসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। সে ঝুমাকে ছুঁয়ে চোখের ইশারা করল, বারান্দায় গিয়ে গল্প করবে। ঝুমা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল। অরুণ মুচকি হেসে বলল—সরডিহিতে প্রচুর ভূত আছে। সাবধান!

ততক্ষণে ঝুমা ও নীতা বারান্দায়। অরুণের কথা শেষ হবার পর দুজনে এক গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কে, কে?

শোনামাত্র প্রথমে প্রভাতরঞ্জন একটা হুংকার ছেড়ে দরজার দিকে ঝাঁপ দিলেন। অরুণ ও দীপেন্দু তাঁর পেছনে গিয়ে হাঁক ছাড়ল—কোথায়, কোথায়?

তারপরই ঝুমা ও নীতার হাসি শোনা গেল। প্রভাতরঞ্জন, দীপেন্দু ও অরুণের মুখের আক্রমণাত্মক ভাব অদৃশ্য হলো। অরুণ বলল—তাহলে যা ভেবেছিলাম!

দীনগোপাল ঘরের ভেতর থেকে বললেন—শান্ত নাকি?

—আবার কে? প্রভাতরঞ্জন সহাস্যে শান্তকে টানতে টানতে ঘরে ঢোকালেন।

শান্ত কেমন চোখে সবার দিকে তাকাচ্ছিল। দীনগোপাল ডাকলেন—আয় শান্ত! তখন সে দীনগোপালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

অরুণ বলল—খুব জব্বর চালটা দিয়েছিস, শান্ত! তবে আমরা ড্যাম গ্লাড।

শান্ত বলল—আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমরা এখানে...

তার কথা কেড়ে দীপেন্দু বলল—ন্যাকামি করবি নে।

ঝুমা চোখে ঝিলিক তুলে বলল—ন্যাকামি মানে, বাসস্টপে একটা লোক।

অরুণ খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল—এবং মুখে দাড়ি, চোখে সানগ্লাস আমাদের সবাইকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শান্ত আস্তে বলল—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ ওরকম একটা লোক কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনার সরডিহির জ্যাঠামশাই বিপন্ন। শিগগির চলে যান। তারপর কথাটা বলেই ভিড়ে মিশে গেল। এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, ওকে কিছু বলব বা চার্জ করব, সুযোগই পেলাম না।

প্রভাতরঞ্জন কান করে শুনছিলেন। একটু কেশে বললেন—শান্ত, আশা করি জোক করছ না?

—না আর যেখানে করি, জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারে আমি জোক করি না। বলে সে আঙুল খুঁটতে থাকল। মুখটা নিচু।

দীনগোপাল খুব গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে ছিলেন। **ঘরে স্তব্ধতা ঘন** হয়েছিল, চিড় খেল তাঁর ডাকে—নব! নব—অ!...

॥ দুই ॥

সরডিহিতে দীনগোপালের এই বাড়িতে এর আগেও তাঁর ভাইপো-ভাইঝিদের দঙ্গল এসে জুটেছে। হইহল্লা করেছে! কিন্তু এবারকার আসা অন্যরকম। বিশেষ করে শান্ত এসে একই কথা বলায় প্রকাণ্ড একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রভাতরঞ্জন নীতারই মামা। দীপ্তেন্দু, শান্ত, অরুণেরও অবশ্যই নিজ নিজ মামা আছেন। কিন্তু তাঁরা অন্য ধরনের মানুষ। প্রভাতরঞ্জন অরুণের ভাষায় 'কমন মামা'। প্রাণবন্ত, হাসিখুশি আর বেপরোয়া মানুষ। গল্পের রাজা বলা চলে। অবিশ্যি 'গল্প' বললে চটে যান। বলেন, রিয়েল লাইফ স্টোরি। কিন্তু এবার কোনও 'রিয়েল লাইফ স্টোরি'-র আবহাওয়া ছিল না। সরডিহি বাজার এলাকায় যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেখান থেকে বোঁচকা গুটিয়ে চলে এসেছিলেন। দীনগোপালকে পাহারার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে সেটা দীনগোপালের অজ্ঞাতসারে। প্রভাতরঞ্জনের ধারণা, এই রাতেই কিছু ঘটবে। যেহেতু শান্ত আসার পর আর কেউ এখানে আসার মতো নেই।

সুতরাং একটা প্রচণ্ড হিম ও কুয়াশা-ঢাকা রাত শুধু জেগে কাটানো নয়, মাঝে মাঝে বেরিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা, ভুল কোনও নড়াচড়া দেখেই টর্চের আলো এবং ছুটোছুটি, এসবের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। দীনগোপালের প্রতি প্রভাতরঞ্জনের নির্দেশ ছিল, কেউ ডাকলে দরজা যেন না খোলেন। দীনগোপাল একটু হেসে বলেছিলেন—আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুই।

রাত চারটেয় কুয়াশা আরও ঘন হয়েছিল এবং প্রথমে নীতা ওপরে শুতে যায়। পরে অরুণ, তারপর দীপ্তেন্দু, শেষে শান্ত শুতে যায়। নিচের ড্রইংরুমে শুধু প্রভাতরঞ্জন একা জেগে ছিলেন। হাতে টর্চ এবং নবর সেই বল্লম।...

অভ্যাসমতো ভোর ছটায় উঠে দীনগোপাল গলাবন্ধ কোট, মাথায় হনুমান টুপি, পায়ে উলের পুরু মোজা ইত্যাদি পরে এবং হাতে যথারীতি ছড়ি নিয়ে

নিচে নামলেন। সিঁড়ি ড্রইংরুমের ভেতর নেমে এসেছে। নেমে দেখলেন, সোফায় কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রভাতরঞ্জন ঘুমোচ্ছেন। দীনগোপালের ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি ফুটে উঠল। নবর বল্লমটা সাবধানে তুলে নিলেন এবং নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দরজার বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিলেন।

বল্লমটা লনের মাটিতে পুঁতে রেখে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন দীনগোপাল। গেট রাতে তালাবন্ধ থাকে। একটা চাবি তাঁর কাছে, অন্যটা নবর কাছে। নব উঠতে রোজই দেরি করে।

দীনগোপাল রাস্তায় নেমে একটু দাঁড়ালেন। রাস্তাটা পূর্বপশ্চিমে লম্বা। পশ্চিমে এক কিলোমিটার-টাক গেলে টিলা পাহাড়গুলো। পূর্বে আধ কিলোমিটার হাঁটলে ক্যানেলের স্লুইস গেট। তার দক্ষিণে এই রাস্তার বাঁকে বাজার এলাকা। তারপর রেল স্টেশন।

পশ্চিমে টিলাগুলোর দিকেই হাঁটতে থাকলেন দীনগোপাল। প্রথম টিলাটার মাথায় এখনও চড়তে পারেন। কাল বিকেলে নীতা তাঁকে কিছুতেই চড়তে দিল না। সেজন্যই যেন জেদ চেপেছিল মাথায়। টিলাটার শীর্ষে একটা খর্বুটে পিপুল গাছ আছে। নিচে একটা বেদির মতো কালো পাথর আছে। পাথরটাতে বসে সূর্যোদয় দেখবেন ভাবতে ভাবতে মনে হলো, পাথরটা এখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

তা হোক। এই উনআশি বছরের জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ঘা খেয়েছেন দীনগোপাল।...

দোতলার পুবের ঘরে দীনগোপাল, মাঝখানেরটাতে নীতা, পশ্চিমের ঘরে শান্ত। শান্তর ঘরেই প্রভাতরঞ্জনের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। চারটেয় যখন শান্ত শুতে আসে, নীতা তখনও জেগে ছিল। শান্ত ঘরের দরজা বন্ধ করছে, তাও শুনেছিল। তারপর কখন তার ঘুম এসে যায়।

দীনগোপাল বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে নীতার ঘুম ভেঙে গেল। নিচে প্রভাতরঞ্জনের উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনতে পেল। সে উত্তরের জানালা খুলে উঁকি দিল। বাইরে কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নীতা দ্রুত ঘুরে এসে দরজা খুলে বেরুল। নিচে নেমে দেখল, পুবের ঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে দীপ্তেন্দু সবে বেরুচ্ছে। তারপর পশ্চিমের ঘর থেকে ঝুমা বেরিয়ে এল, গায়ে আলখাল্লার মতো লালচে গাউন। প্রভাতরঞ্জন ব্যস্তভাবে বললেন বল্লম! বল্লম অদৃশ্য!

নীতার চোখ গেল বাইরের দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকানো গলায় বলল—দরজা খোলা!

প্রভাতরঞ্জন সশব্দে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় গেলেন। তারপর তাঁকে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গিতে নিচের লনে নামতে দেখা গেল এবং ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—সর্বনাশ! সর্বনাশ!

দীপ্তেন্দু দৌড়ে গেল। নীতা ও ঝুমা বারান্দায় গিয়ে দেখল, নিচে শিশির

ভেজা ঘাসে বল্লমটা বেঁধা এবং প্রভাতরঞ্জন সেটার এদিক থেকে ওদিক মাকুর মতো আনাগোনা করছেন। দীপ্তেন্দু বল্লমটা উপড়ে তুলল। তখন প্রভাতরঞ্জন হাঁসফাঁস করে বললেন—রক্তটক্ত লেগে নেই তো?

দীপ্তেন্দু ভাল করে দেখে বলল—নাঃ! কিন্তু ব্যাপারটা কী? প্রভাতরঞ্জন সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—নীতু! শীগগির ওপরে গিয়ে দ্যাখ তো দীনুদা ঘুমুচ্ছেন নাকি! তাঁর গলার স্বর ছ্যাৎরানো—কিছুটা হিমও এর কারণ। দেখে মনে হচ্ছিল, কাঁপছেন। সেটা অবশ্যি হিমের চেয়ে উত্তেজনার দরুনই। এই সময় নব বারান্দার লাগোয়া কিচেন-কাম ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নীতার উদ্দেশে বলল—বাবুমশাই বেড়াতে বেরুলেন দিদি! আজ আমি ওঁর আগেই উঠেছি। সে খি-খি করে হাসল।—দেখি কী, বাবুমশাই বল্লমখানা পুঁতে দিয়ে চলে গেলেন। আমার বল্লমখানা বরাবর ওঁর অপছন্দ।

নীতা কোনও কথা না বলে ওপরে চলে গেল। তারপর দীনগোপালের ঘরের দরজায় তালা দেখে আশ্বস্ত হলো। সে শান্তর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকতে লাগল—শান্তদা! উঠে পড়ো—দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছে। নীতার হাসি পেয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের কৌতুকবোধ দেখে। গম্ভীর ধাতের মানুষ। এমন রসিকতা কল্পনা করা যায় না...

নিচে দীপ্তেন্দু ও প্রভাতরঞ্জন তখন নবকে ধমক দিচ্ছেন পালাক্রমে। কেন সে সঙ্গে সঙ্গে জানায়নি? ঝুমা ঘরে ঢুকে অরুণকে ওঠানোর চেষ্টা করছিল। খিমচি এবং শেষে গালে বাসি দাঁতের একটা প্রেম-কামড় খেয়েই অরুণ চোখ মেলল। ঝুমা মুখে মিথ্যা আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে বলল—বাইরে কী হচ্ছে দ্যাখো গিয়ে! বল্লমটা কে বিঁধিয়ে দিয়ে গেছে—

সর্বনাশ! বলে সে স্ত্রীর কথা শেষ হবার আগেই কম্বল থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর একলাফে ড্রইংরুম পেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গেল। চিড় খাওয়া গলায় চেঁচাল—হোটাট হ্যাপনড্? মার্ডার? ও মাই গড! সে জ্যাঠামশাইয়ের রক্তাক্ত লাশ দেখতে যাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে লনে ঝাঁপ দিল।...

এতক্ষণে দীনগোপাল প্রায় সিকি কিলোমিটার দূরে। সরডিহি এলাকায় প্রকৃত শীত আসতে এখনও কয়েকটা দিন দেরি। শেষ হেমন্তের ভোরবেলায় এই শীতটা বাইরের লোককে পেলে হয়তো মেরেই ফেলবে। কিন্তু দীনগোপালের এ মাটিতে প্রায় অর্ধশতক কেটে গেল।

ইচ্ছে করেই একটু জোরে হাঁটছিলেন তিনি। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর ঘর তালাবন্ধ দেখে ওরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। ব্যাপারটা প্রচণ্ড বিরক্তিকর ঠেকছে দীনগোপালের। তাঁর কোনও শত্রু নেই বলেই জানেন—অন্তত তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলবে, এমন কেউ নেই। কারণ জীবনে কারুর সঙ্গে এতটুকু ঝগড়া-বিবাদ করেননি। বরাবর সমস্ত কিছুতে নির্লিপ্ত এবং একানড়ে স্বভাবের মানুষ তিনি। স্থানীয় কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনোদিন জড়িয়ে

পড়েননি। সরডিহির সবাই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাঁর মতো মানুষের কী বিপদ ঘটতে পারে, কিছুতেই মাথায় আসছে না।

বিপদ ঘটার অন্য একটা সম্ভাবনার দিক অবশ্যি ছিল। তা হলো, ধনসম্পত্তি। কিন্তু সেও যতটুকু আছে, সবটাই ব্যাঙ্ক আর সরকারি-বেসরকারি কি-ছু কাগজে, অর্থাৎ ঋণপত্রে। সুদের টাকার সামান্য কিছু অংশ জীবনযাত্রার জন্য নেন। বাকিটা জমার ঘরে ঢুকে যায়। বছর বিশেক আগে দশ কিলোমিটার দূরে খনি অঞ্চলে গোটা তিনেক খনির মালিক ছিলেন। সেগুলো সরকার নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, সেই টাকা। একসময় ক্যানেল এলাকায় কিছু জমি কিনেছিলেন। কিন্তু চাষবাসের ঝুটঝামেলা বড্ড বেশি। জমিগুলো বেচে দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে মাত্র লাখ দেড়েক টাকা লগ্নি করা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইপো ভাইঝিরা তা পাবে। মাঝে মাঝে অবশ্যি এ নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। অরুণ, দীপ্তেন্দু—ওদের পয়সাকড়ির অভাব নেই। অরুণ তাঁর পরের ভাই সত্যগোপালের ছেলে। সত্যগোপাল কলকাতায় বিশাল কারবার ফেঁদেছিলেন। মৃত্যুর পর সে-সবের মালিক হয়েছে অরুণ। একটু খ্যাপাটে স্বভাবের হলেও টাকাকড়ির ব্যাপারে হুঁশিয়ার। পরে ভাই নিত্যগোপালের নাম ছিল ডাক্তার হিসেবে সুখ্যাত। নিত্যগোপালের মৃত্যুর পর দীপ্তেন্দু যদিও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েছে, সেটা ওর নেহাত খেয়াল। ডাক্তারি পড়ানো যায়নি ওকে, পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। বছরখানেক প্রায় নিরুদ্দেশ। বাবার মৃত্যুর পর বাড়ি ফেরে। তাহলেও ওর বাবা যা রেখে গেছেন, তা ওর পক্ষে যথেষ্ট। শুধু শান্তর বাবা প্রিয়গোপাল কিছু রেখে যাননি। মাথায় সন্ন্যাসের ঝোঁক চেপেছিল। এখন নাকি হরিদ্বারের কোন আশ্রমে আছেন—একেবারে সাধুবাবা! শান্তর মা সুইসাইড করেছিলেন, সেটাই প্রিয়গোপালের সংসারত্যাগের কারণ কি না কে জানে! শান্ত ভাগ্যিস ততদিনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। মফস্বলের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে যায়। তারপর উগ্রপন্থী রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। এখন সে কলকাতায় কী করে-টরে, দীনগোপাল জানেন না।

আর নীতা ছোটভাই জয়গোপালের মেয়ে। জয়গোপাল এবং তাঁর স্ত্রী নন্দিনী বছর দুই আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান। তার আগে অবশ্যি নীতার বিয়ে হয়েছিল। গতবছর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে নীতার। লোকটা নাকি লম্পট আর মাতাল। তবে বিয়ের পর নীতা তার স্বামী প্রসূনকে সঙ্গে নিয়ে দীনগোপালের কাছে এসেছিল, হনিমুনে আসার মতোই, তখন দীনগোপালের মনে সন্দেহ জেগেছিল ওদের দাম্পত্য-সম্পর্কে কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে। তার চেয়ে বড় কথা, প্রসূনকে পছন্দ হয়নি দীনগোপালের। আর নবও চুপিচুপি বলেছিল, জামাইবাবু লোকটা সুবিধের নয়, বাবুমশাই! মহুয়ার মদ কোথায় পাওয়া যায় জিগ্যেস করছিলেন।

নীতা একটা আফিসে স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরি করে। তাকেও বারবার

ডেকেছেন দীনগোপাল, আমার কাছে এসে থাক্। কী দরকার চাকরি করার? নীতার এক কথা, কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে তার আপত্তি নেই।

দীনগোপালের গোপন পক্ষপাতিত্ব নীতার প্রতিই। তার জন্য তাঁর বেশি মমতা। তাই ভাবেন, বরং উইল করে নিজের যা কিছু আছে, নীতার নামেই দেবেন। কিছুদিন আগে ফিরোজাবাদে তাঁর অ্যাটর্নির সঙ্গে এ নিয়ে শলাপরামর্শ করেও এসেছেন। তারপর হঠাৎ নীতা চলে এল। গতকালও ভাবছিলেন, ফিরোজাবাদে গিয়ে কাজটা সেরে ফেলবেন। নীতাকে দেখে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কী উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল চেহারায়, ক্ষয়ে গেছে একেবারে। দীনগোপাল ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলেন। একটু পরে তাঁর ভাবনা মোড় নিল। অবাক হয়ে গেলেন। গতকাল সন্ধ্যায় একের পর এক করে দীপ্তেন্দু, অরুণ, প্রভাতরঞ্জন এবং শেষে শান্ত এসে হাজির। কৈফিয়তটা বড্ড হাস্যকর আর রহস্যময়। এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না। বাসস্টপে-বাসস্টপে ঘুরে একটা দাড়িওয়ালা কালো চশমাপরা লোক কেনই বা ওদের অমন একটা উদ্ভট কথা বলে সরডিহি পাঠিয়ে দেবে, বিপদটাই বা কী, নাকি সবাই মিলে ওঁর সঙ্গে তামাশা করতে এসেছে, কিছু বোঝা যায় না।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন দীনগোপাল। ভুঁরু কুঁচকে গেল। ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। সমস্ত ব্যাপারের পেছনে একটা ক্রূর অভিসন্ধি ওঁত পেতে আছে যেন। বাসস্টপের লোকটা...

অথবা সবটাই ওই প্রভাতরঞ্জনের কারসাজি। ওঁকে বোঝা কঠিন। রাজনীতিওয়ালারা দীনগোপালের চক্ষুশূল। তবে এমনিতে প্রভাতরঞ্জন বেশ মনখোলা মানুষ। তাছাড়া নীতার বাবার সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ের ঘটকালি তিনিই করেছিলেন—এর সঙ্গে দীনগোপালের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় এবং বন্ধুতার সূত্র ছিল। রাজনীতি করার সময় ফেরারি আসামী প্রভাতরঞ্জন কতবার দীনগোপালের বাড়িতে এসে লুকিয়ে থেকেছেন। খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন তখন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চালাতেন। কিন্তু যখনই দীনগোপাল বুঝতে পারতেন, তাঁর বাড়িটি রাজনীতির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে, তখনই সোজা প্রভাতরঞ্জনকে বলতেন—আর নয় হে! এবার তল্পি গোটাও। প্রভাতরঞ্জনের এই একটা গুণ, তাঁর ওপরে রাগ করতেন না। একটু বেহায়া ধাতের মানুষ বটে। ফের কোনও এক রাতে এসে হাসিমুখে হাজির হতেন।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দীনগোপাল উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁটছিলেন। টিলাগুলোর কাছাকাছি রাস্তার চড়াই শুরু। এবার একটু ক্লান্তি এল। বাঁদিকে ঝোপজঙ্গল আর ন্যাড়া পাথুরে মাটি ঘিরে টিলার দিক থেকে একটা ঝিরঝিরে জলের ধারা এসে ছোট্ট সাঁকোর তলা দিয়ে চলে গেছে। সাঁকোর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন।

ততক্ষণে কুয়াশা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। পেছনে পুবের আকাশে লালচে ছটা। সূর্য উঠেছে, তবে সরডিহির আড়ালে রয়েছে এখনও। বাঁদিকে ঝরনাধারার

গা ঘেঁষে সামান্য দূরে সেই টিলাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। মাথার পিপুল গাছটায় লাল রঙের ছোপ পড়েচে। কাছিমের খোলার গড়ন টিলাটার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের কোনা দিয়ে আবার লক্ষ্য করলেন, কিছুদিন ধরে যা ঘটছে, একটা আবছা মানুষমূর্তি!

কেউ ঝোপগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছে যেন।

ঘুরে সোজাসুজি তাকাতেই আর তাকে দেখতে পেলেন না দীনগোপাল। অভ্যাসমতো 'কে ওখানে' বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, কিন্তু কথাটি উচ্চারণ করলেন না। সোজাসুজি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই টিলাটাও নজরে পড়েছিল। একটা লোক পিপুল গাছের নিচে এইমাত্র উঠে দাঁড়াল।

মুহূর্তে ক্ষিপ্ত দীনগোপাল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। খোলা পাথুরে জমিটার ওপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে হলো, চোখের কোনা দিয়ে অন্যদিনের মতো যে-ছায়ামূর্তি দেখেন, সে কোন মন্ত্রবলে একেবারে টিলার মাথায় চলে গেল—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে?

টিলার শীর্ষে কুয়াশা হাল্কা হয়ে গেছে এবং ঈষৎ রোদ্দুরও পড়েছে। লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু ডান চোখটা অক্ষত। দীনগোপালের দৃষ্টিশক্তি বরাবর প্রখর। একটা চোখে পরিষ্কার দূরের জিনিস দেখতে পান। চশমার দরকার হয়নি এখনও। পিপুল গাছের তলায় দাঁড়ানো লোকটির পরনে ওভারকোট, মাথায় টুপি, একটা হাতে ছড়ি বলেই মনে হচ্ছে। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। অন্য হাতে কী একটা যন্ত্র ধরে চোখে রেখেছে এবং দূরে পুবদিকে কিছু দেখছে। দূরবীন বা বাইনোকুলার মনে হলো।

দীনগোপাল টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। এই সময় চোখ থেকে যন্ত্রটি নামিয়ে লোকটি দীনগোপালের দিকে ঘুরে তাকাল। দীনগোপাল নিচে থেকে রুষ্টভাবে চেঁচিয়ে বললেন—ও মশাই! শুনছেন? কে আপনি? ওখানে কী করছেন?

জবাব না পেয়ে আরও রুষ্ট দীনগোপাল ঢালু টিলা বেয়ে উঠে গেলেন। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। সাদা দাড়িওয়ালা লোকটির চেহারায় মার্জিত এবং অমায়িকভাব। রীতিমতো সাহেবসুবো মনে হলো। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। সরডিহি গির্জার পাদ্রি সলোমন সায়েবের প্রতিমূর্তি!

—নমস্কার! আশা করি, আপনিই দীনগোপালবাবু?

বিস্মিত দীনগোপাল কপালে হাত ঠেকালেন, নিছক ভদ্রতাবশে তাঁর মনে পড়েছিল একটা দাড়িওয়ালা লোক দীপেন্দুদের সরডিহি আসতে প্ররোচিত করেছে এবং তার মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এই লোকটিই সেই লোক কি? অবশ্য তার দাড়ির রঙ সাদা না কালো ওরা বলেনি। কিন্তু কথাটা হলো, এঁকে দেখে তো অত্যন্ত সজ্জন ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। কণ্ঠস্বরও অমায়িক। শুধু হাতের ওই দুটো জিনিস সন্দেহনক। বাইনোকুলারটা, এবং একটা ছড়ি—নয়, ডগার দিকে জালের গোছা জড়ানো! জিনিসটা কী?

দীনগোপাল একটু দ্বিধায় পড়ে বললেন—মশাইকে তো আগে কখনও দেখিনি! আপনি কে?

আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—আপনি কর্নেল? দীনগোপাল একটু অবাক হয়ে বললেন। মানে মিলিটারির লোক?

—ছিলাম। বহু বছর আগে রিটায়ার করেছি।

—অ। তা আপনি এখানে...

—আপনার মতোই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি।

—আপনি আমার নাম বললেন! অথচ আপনার সঙ্গে আমার কস্মিনকালে চেনাজানা নেই!

—আপনার কথা আমি শুনেছি। কাল বিকেলে আপনাকে দূর থেকে বাইনোকুলারে দেখেছিও।

দীনগোপাল সন্দিগ্ধভাবে বললেন—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আপনি থাকেন কোথায়?

—কলকাতায়। গতকাল আমি সরডিহিতে বেড়াতে এসেছি। উঠেছি ইরিগেশান বাংলোয়।

দীনগোপাল ফের ওঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার কথা কে আপনাকে বলল? বলার কোনও স্পেসিফিক কারণই বা কী?

—সরডিহিতে বাঙালিদের মধ্যে আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে। আর আমার স্বভাব, যেখানে যাই, সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিই।

দীনগোপাল এবার হাল্কা মনে একটু হাসলেন।—ভাল। খুব ভাল। তা ওই যন্তরটা দিয়ে কী দেখছিলেন?

—পাখি। বার্ড-ওয়াচিং আমার হবি।

—হুঁ। আর ওটা কি যন্তর?

—এটা প্রজাপতি ধরা জাল। বিশেষ কোনও স্পেসির প্রজাপতি দেখলে ধরার চেষ্টা করি!

দীনগোপাল হাসতে লাগলেন। কলকাতার লোকেদের মাথায় সব অদ্ভুত বাতিক থাকে দেখছি। তবে আপনার বাতিক বড্ড বেশি উদ্ভুটে, কর্নেলসায়েব!

—আচ্ছা দীনগোপালবাবু, আপনি সরডিহিতে এ বয়সে একা পড়ে আছেন কেন?

দীনগোপালের হাসি মুছে গেল। আস্তে বললেন—হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ?

—নিছক কৌতূহল, দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল চটে গেলেন আরও।—অদ্ভুত কৌতূহল! চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে এসে এই উটকো প্রশ্ন। আপনার কি অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর স্বভাব, নাকি আপনি—

—বলুন, দীনগোপালবাবু।

দীনগোপাল ক্রুদ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—কে আপনি? কেন এমন আজগুবি প্রশ্ন করছেন?

—প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না! আমি আপনার হিতৈষী।

—কোনও উটকো লোকের এই উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজি নই—তা আপনি মিলিটারির কোনও কর্নেল হোন, আর যেই হোন। বলে দীনগোপাল সটান ঘুরে টিলা বেয়ে নামতে থাকলেন। আপন মনে গজগজ করছিলেন—কেন এখানে একা পড়ে আছি! যাবটা কোথায়? সরডিহি আমার ভাল লাগে। একলা থাকতে ভাল লাগে। অদ্ভুত কথা তো! তারপর হঠাৎ থেমে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললেন—জালনোটের কারখানা খুলেছি, বুঝলেন, চোরাচালানের কারবার করছি। আরও শুনবেন? মেয়ে পাচারের ঘাঁটি গড়েছি। নার্কোটিক্স চালানও দিই। ডাকাতের দল পুষি।...

একটু পরে রাস্তায় পৌঁছে আবার ঘুরে টিলার মাথায় কর্নেলকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টে দেখে নিলেন। কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার। তারপর দ্রুত টিলার অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দীনগোপালের শরীর অবশ। মনে হলো, আর এক পাও হাঁটতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কেটে গেল। ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। বহু বছর আগে এক সন্ন্যাসী তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে এমন আকস্মিকতা ছিল না। ছিল না এমন একটা রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিতও। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, একলা পড়ে আছ বেটা! এই একলা থাকাটাকে কাজে লাগাও। জেনো একলা থাকা মানুষই যোগী হতে পারে। আর যোগী কে—না, যে যোগ করে। যোগ কিসের সঙ্গে? মনের সঙ্গে আত্মার যোগ। এই যোগ সময়কে থামিয়ে দেয়। সময় বলে কোনও জিনিস তখন থাকে না। অথচ আত্মা থাকে। আনন্দের মধ্যে লীন হয়ে থাকে।

সাধুসন্ন্যাসীদের সবই হেঁয়ালি। সেটা একটা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু ওই ভদ্রলোক—কর্নেল! তাঁর হঠাৎ এই হেঁয়ালির মানেটা কী? কেন এ প্রশ্ন—অতর্কিতে?...

শান্তকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে এবং বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়েও জাগাতে পারেনি নীতা। কোনও সাড়াও পায়নি। বিরক্ত হয়ে নিচে নেমে এসেছিল। শান্ত এমন মড়ার মতো ঘুমোয়, সে জানত না।

লনে অরুণকে নিয়ে তখন খুব হাসাহাসি হচ্ছে অরুণ 'মার্ডার' বলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে সিঁড়িতে আছাড়া খাওয়ার উপক্রম, সেটাই সবচেয়ে হাসির ব্যাপার। নীতাকে দেখে প্রভাতরঞ্জন হাঁকলেন—দীনুদা? অর্থাৎ নবর কথা সত্যি কি না। নীতার মুখে দীনগোপালের ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা আটকানো শুনে তিনি গুম হয়ে বললেন—দীনুদাটা চিরকাল এরকম একগুঁয়ে

মানুষ। কোনও মানে হয়? ওর সেফটির জন্য আমরা সারারাত জেগে পাহারা দিলাম, আর দিবি একা বেড়াতে বেরুল? এভাবে রিস্ক নেবার কোনও মানে হয়?

—অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল—মামাবাবু, চলুন, আমরা জ্যাঠামশাইকে গিয়ে দেখি—কোনও বিপদ ঘটল নাকি! দীপু তুইও আয়।

দীপ্তেন্দু বলল—হ্যাঁ। আমাদের যাওয়া উচিত। এতক্ষণ নিশ্চয় বেশি দূরে যেতে পারেননি।

ওরা তিনজনে শশব্যস্তে পা বাড়ালে পেছন থেকে ঝুমা বলল—আহা, সশস্ত্র হয়ে যাও। বল্লমটা অন্তত হাতে নাও!

সে মুখ টিপে হাসছিল। নীতাও হেসে ফেলল। কারণ বউয়ের কথায় সত্যিই অরুণ বল্লমটা দীপ্তেন্দুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল। গেট খুলে দিল নব। দীনগোপাল বেরুনোর সময় বাইরে থেকে গরাদ দেওয়া গেটে তালা আটকে দিয়েছিলেন।

নব ফিরে এসে বলল—আপনাদের জন্য চা করে দিই ততক্ষণ। ওঁরা ফিরে এলে তখন ফের করে দেব।

ঝুমা বলল—আমার কিন্তু র। দুধ দেবে না।

নব কিচেনে গিয়ে ঢুকলে নীতা লনে নামল। ডাকল—এসো বউদি, মর্নিং ওয়াক করি ততক্ষণ।

—ঝুমা বলল—বড্ড কুয়াশা। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রোদ্দুর উঠতে দাও না।

নীতা বলল—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। গত দুদিনই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি। কতদূরে জানো? সেই টিলাগুলো অব্দি। এসো না বউদি, গেটে গিয়ে দেখি মামাবাবুরা কোনদিকে গেলেন!

ঝুমা অনিচ্ছা অনিচ্ছা করে লনে নামল। তারপর নীতার পাশে গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—জ্যাঠামশাই যেদিকে গেছেন, দেখবে ওরা ঠিক তার উল্টোদিকে গেছে।

নীতা হাসল।—শান্তদাকে ডেকে ওঠাতে পারলাম না। ও দলে থাকলে সুবিধে হতো। দুজন করে দুদিকে খুঁজতে যেত। জ্যাঠামশাই কোনও কোনও দিন উল্টোদিকে ক্যানেলের স্লুইসগেটের কাছেও যান।

—শান্ত উঠল না?

—নাঃ। একেবারে কুম্ভকর্ণ।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে নীতা নিচের রাস্তায় দুদিকে দলটাকে খুঁজছিল। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সে চাদরটা এতক্ষণে মাথায় ঘোমটার মতো টেনে দিলে ঝুমা আস্তে বলল—শান্তর বিয়ের কথা বিশ্বাস হয় তোমার?

নীতা বলল—ও জ্যাঠামশাইয়ের মতো আনপ্রেডিক্টেবল। শুনলে তো, রাত্তিরে জ্যাঠামশাইয়ের সামনেই জোর দিয়ে বলল, বিয়ে করেছে।

—কিন্তু বউকে সঙ্গে আনল না কেন?

—হয়তো এমন একটা সিচুয়েশানে সঙ্গে আনা ঠিক মনে করেনি। ঝুমা একটু পরে বলল—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন?

ঝুমা একটু গম্ভীর মুখে বলল—বিবাহিত পুরুষ চেনা যায়। অন্তত আমি চিনতে পারি।

নীতা হাসতে হাসতে বলল—কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখে বুঝি? কী লক্ষণ? শারীরিক না মানসিক!

—দুই-ই।

নীতা দুই কাঁধে এবং হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা ভঙ্গি করে বলল—কে জানে বাবা! আমি ওসব বুঝিটুঝি না।

নব ডাকছিল।...দিদি বউদিদি! চা রেডি।

ঝুমা বলল—এখানে দিয়ে যাও!

নীতা বলল—ঠাণ্ডার ভয়ে বেরুচ্ছিলে না বউদি। এখন কেমন এনজয় করছ দেখ।

নব চা নিয়ে এল। নীতা বলল—নবদা! তুমি গিয়ে দেখো তো, শান্তদাকে ওঠাতে পারো নাকি।

ঝুমা আস্তে বলল—ওকে বলবে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। ব্যস্। দেখবে হইহই করে বেরিয়ে পড়বে।

—নব গম্ভীর মুখে চলে গেল। নীতা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—এবার এসে এবং জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমার মধ্যে একটা দারুণ চেঞ্জ ঘটেছে, জানো বউদি?

—কী চেঞ্জ?

—সরডিহিতে থেকে যেতে উচ্ছে করছে। বেশ নিরিবিলি সুন্দর ন্যাচারাল স্পট। কলকাতায় থাকলে রাজ্যের উটকো প্রব্লেম এসে ব্রেনকে ঘুলিয়ে তোলে। নীতা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল।—এখানে এসে সেগুলো একেবারে অর্থহীন লাগছে। আসলে আর্বান লাইফে সবসময় কতকগুলো কৃত্রিম সমস্যা মানুষকে ব্যস্ত করে রাখে। এখানে কিন্তু কোনো সমস্যাই নেই।

—আছে। হঠাৎ করে দুদিন এসে থেকে-টেকে সেটা বোঝা যায় না।

—উঁহু। তুমি জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবো বউদি! দিব্যি আছেন।—

—কোথায় আছেন? ঝুমা অন্যমনস্কভাবে বলল।—কী জন্য তাহলে তোমরা ছুটে এসেছ, ভেবে দেখো। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সরডিহি, আফটার অল অন্য প্ল্যানেট তো নয়।

নীতা একটু চুপ করে থাকার পর বলল—এটা একটা আনইউজুয়্যাল ব্যাপার। হয়তো সত্যি কেউ জোক করেছে কোনও উদ্দেশ্যে। তবে যাই বলো, আমি সরডিহির প্রেমে পড়ে গেছি।

ঝুমা বাঁকা হেসে বলল—তুমি তো চিরপ্রেমিকা। হুট করতেই প্রেমে পড়ো এবং সাফার করো।

নীতা একটু চটে গেল খোঁচা খেয়ে। কিন্তু কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে দূরে তাকিয়ে রইল।

—এই তো! রাগ করলে! এজন্যই নাকি মুনি-ঋষিরা বলেছেন অপ্রিয় সত্য কক্ষনো বলো না। ঝুমা তার কাছে গেল।—সরি, নীতা। অ্যাপলজি চাইছি।

নীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল ওর ভঙ্গি দেখে। তারপর বলল—কিন্তু নব যে শান্তদাকে ওঠাতে গেল! পাত্তা নেই কেন?...

দীনগোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন বল্লমধারী অরুণ এবং প্রভাতরঞ্জনকে দেখে। প্রভাতরঞ্জন ওঁর মুখের রাগী ভাব দেখে আমতা-আমতা করে বললেন—মানে, আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম দীনুদা!

দীনগোপাল রূঢ় স্বরে বললেন—তোমাদের এ পাগলামি সত্যি বরদাস্ত হচ্ছে না।

অরুণ বলল—কিন্তু জ্যাঠামশাই, যাই বলুন, এভাবে আর আপনার একা বেরুনো উচিত হয়নি।

—উচিত অনুচিতের ব্যাপারটা আমি বুঝব। দীনগোপাল পা বাড়িয়ে বললেন—তোমাদের মতলব আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

মাই গড! অরুণ হতভম্ব হয়ে বলল।—এ আপনি কী বলছেন জ্যাঠামশাই? আমরা এতগুলো লোক সব্বাই আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছি? কী আশ্চর্য! বাসস্টপে সত্যি একটা লোক—সে অভিমানে চুপ করল।

দীনগোপাল জবাব দিলেন না। প্রভাতরঞ্জন বললেন দীনুদা, তুমি কিন্তু আমাকেই আসলে অপমান করছ। আমাকেও তুমি মিথ্যাবাদী বলছ, মাইন্ড দ্যাট।

দীনগোপাল তবু চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন।

প্রভাতরঞ্জন ক্ষুব্ধভাবে বললেন—তোমার সেফটির জন্য আমরা এত কাণ্ড করছি কাল থেকে। আর তুমি এর মধ্যে মতলব দেখছ। কী মতলব? তোমার ভাইপো-ভাইঝিদের মতলব থাকার কথা—অবশ্য, আছে তা বলছি না—জাস্ট একটা সম্ভাবনা। কারণ তোমার কিছু প্রপার্টি হয়তো আছে—কী বা কতটা আছে, তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি? আমার কী মতলব থাকতে পারে! তুমি একসময়ে আমাকে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছ। সাংঘাতিক রিস্ক্ নিয়েছ। আমি তোমার কাছে ঋণী। তাছাড়া বরাবর আমি তোমার হিতৈষী।

—হঠাৎ ভুঁইফোড় হিতৈষীদের জ্বালায় আমি অস্থির। দীনগোপাল বাঁকা হাসলেন।—একটা আগে একটা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। সেও হঠাৎ বলে কিনা—আমি আপনার হিতৈষী।

প্রভাতরঞ্জন ও অরুণ দুজনেই চমকে উঠেছিল। একগলায় বলল, লোক!

—হ্যাঁ। তারও মুখে দাড়ি আছে।

ফের দুজনে একগলায় বলে উঠল—দাড়ি!

—হ্যাঁ দাড়ি, সাদা দাড়ি। দীনগোপাল আগের সুরে বললেন। পাদ্রি সলোমন সায়েবের মতো পেল্লায় চেহারা। হাতে বাইনোকুলার আর প্রজাপতি-ধরা নেট। সরডিহিতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক আসে। তবে কেউ এ পর্যন্ত আমাকে বলেনি, আমি আপনার হিতৈষী।

প্রভাতরঞ্জন খুব ব্যস্তভাবে বললেন—তাহলে তো ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে পড়ল। লোকটার পরিচয় নিলে না কেন?

দীনগোপাল এবার একটু হাল্কা মেজাজে বললেন—বলল, মিলিটারির লোক ছিল। কর্নেল!...হুঁ, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইরিগেশান বাংলোয় উঠেছে বলল।

অরুণ বলল—খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু আগাগোড়া একটু ডিটেলস বলুন তো জ্যাঠামশাই!

দীনগোপাল বললেন—কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অরুণ প্রভাতরঞ্জনকে বলল—মনে হচ্ছে এ লোক বাসস্টপের লোকটা নয়, মামাবাবু! তাই না?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—হ্যাঁ। আমাদের প্রত্যেকের বর্ণনা মিলে গেছে। দাড়ির কথা ধরছি না। নকল দাড়ি সাদা বা কালো দুই-ই হয়। কিন্তু গড়ন? দীনুদা বলল, পেল্লায় চেহারা—পাদ্রি সলোমনের মতো। এই পাদ্রি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

অরুণ বলল—আমিও তাঁকে দেখছি।

—হুঁ, অরুণ! চিন্তিত মুখে প্রভাতরঞ্জন বললেন।—তুমি এখনই ইরিগেশান বাংলোয় গিয়ে খোঁজ নাও, সেখানে সত্যি কোনও কর্নেল-টর্নেল এসেছেন কি না। তারপর যা করার করব'খন। দীপুকে ওদিকে পাঠিয়েছি। দেখা হলে ওকে সঙ্গে নিও।

অরুণ তাঁর হাতে বল্লমটা গছিয়ে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। দীনগোপাল বললেন—সঙ! জোকার একটা! সার্কাসের ক্লাউন!

প্রভাতরঞ্জন ব্যথিতস্বরে বললেন—আমাকে বলছ!

—না ওই অরুণটাকে। বলে দীনগোপাল ভুরু কুঁচকে একবার প্রভাতরঞ্জনকে দেখে নিলেন। একটু পরে গলা ঝেড়ে ফের বললেন—এভাবে বল্লম হাতে আমার সিকিউরিটি গার্ড সেজে পাশে পাশে হেঁটো না। আমার খারাপ লাগছে। তুমি এগিয়ে যাও। আমি একটু পরে যাব।

দীনগোপাল রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা প্রকাণ্ড পাথরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রভাতরঞ্জন বললেন—ওকে দীনুদা! সিকিউরিটি গার্ড তো সিকিউরিটি গার্ড। আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাচ্ছি না।

—খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, প্রভাত!

দীনগোপাল খাপ্পা মেজাজে কথাটা বললেন। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না প্রভাতরঞ্জন। বল্লমটা সঙ্গিনের মতো কাঁধে রেখে সকৌতুকে সান্ত্রীর স্যালুট ঠুকলেন। দীনগোপাল অমনি রাস্তা থেকে ঢালুতে নেমে হনহন করে উত্তরে টাঁড় জমিটার দিকে হেঁটে চললেন। জমিটার নিচের দিকে কিছু গাছপালা তারপর ক্যানেল। প্রভাতরঞ্জন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু ক্যানেলের পাড়ে গিয়ে আর দীনগোপালকে দেখতে পেলেন না। পাড় বরাবর ঘন ঝোপঝাড়। প্রভাতরঞ্জন বারকতক 'দীনুদা' বলে ডাকাডাকি করার পর তেতো মুখে আপন মনে বললেন—বদ্ধ পাগল! জানে না কী বিপদ ঘটাতে চলেছে।

তারপর তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। ততক্ষণে রোদ্দুর ফুটেছে এবং কুয়াশা হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভেতর দীনগোপাল গুঁড়ি মেরে কোনদিকে নিপাত্তা হলেন, প্রভাতরঞ্জন বুঝতে পারছিলেন না। ক্যানেলটা পুব-পশ্চিমে লম্বা। প্রথমে পশ্চিমেই পা বাড়ালেন প্রভাতরঞ্জন।

নীতা বলল—ধুস! নব শান্তদাকে ডাকতে গিয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল যেন।

আমি ভাবছি মামাবাবু আর তোমার শ্রীমান দাদাটির কথা। ঝুমা হাসতে হাসতে বলল। —জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গেল, হাতে বল্লম! জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এতক্ষণ যুদ্ধ বেধে গেছে!

নীতা আনমনে বলল—কেন?

ঝুমা প্রশ্নে কান না দিয়ে বলল—লাঠি ভার্সেস বল্লম। বল্লমটা অবশ্য লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী—নীতা! দেখো, দেখো! যা বলছিলাম। তোমার শ্রীমান দাদা জগিং করছে। অথবা তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছে। আরে! ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?

নীতা গেট থেকে দেখল অরুণ জগিংয়ের ভঙ্গিতে নিচের রাস্তা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাকবে বলে ঠোঁট ফাঁক করেছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। অরুণ দ্রুত নাগালের বাইরে চলে গেল।

ঝুমা বলল—কিছু মনে কোর না নীতা! তোমাদের বংশে পাগলদের সংখ্যা বড্ড বেশি।

—ঠিকই বলেছ বউদি! নীতা হাসল। আই এগ্রি। ওই দেখো, উল্টোদিক থেকে দীপুদা এসে গেছে।

অরুণ এবং দীপেন্দুকে মুখোমুখি দুটি ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছিল। তারপর দুজনে কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝুমা ব্যাপারটা দেখার পর মন্তব্য করল—একটা ব্যাপার বোঝা গেল। জ্যাঠামশাইকে এখনও ওরা খুঁজে পায়নি।

1)

তাকে এবার একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। নীতা বলল—আমার ধারণা, জ্যাঠামশাই খুব বিরক্ত হয়েছেন।

—হবারই কথা! ঝুমা ওর হাত ধরে টানল। বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে এখানে। চলো, ঘরে গিয়ে বসি।

লন পেরিয়ে দুজনে বাইরের বারান্দায় পৌঁছে ওপরতলায় নবর হাঁকাহাঁকি এবং দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনতে পেল। ঝুমা বলল—কী আশ্চর্য! সেই তখন থেকে নব ওকে ওঠাতে পারছে না? কী কুম্ভকর্ণ রে বাবা!

সে দ্রুত ঘরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল। পেছনে নীতা। ওপরে গিয়ে ওরা দেখল, নব এবার দরজায় উদ্ভ্রান্তের মতো লাথি মারতে শুরু করেছে। ঝুমা দম আটকানো গলায় বলল, সাড়া পাচ্ছ না?

সেই মুহূর্তে পুরনো দরজার একটা কপাট মড়াৎ করে ভেঙে গেল এবং নব আবার লাথি মারলে সেটা প্রচণ্ড শব্দে জং ধরা কব্জা থেকে উপড়ে ভেতরে পড়ল। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল নব। তারপরই সে চেঁচিয়ে উঠল—দাদাবাবু! সর্বনাশ!

দরজা থেকে নীতা ও ঝুমা উঁকি মেরে দেখেই আঁতকে পিছিয়ে এলো। ঝুমা দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। নীতা দেয়াল আঁকড়ে ধরেছিল। ঠোঁট কামড়ে আত্মসংবরণের চেষ্টা করছিল সে। ঘরের মাঝামাঝি কড়িকাঠ থেকে শান্ত ঝুলছে। গলায় একটা মাফলারের ফাঁস আটকানো। ঝুলন্ত পায়ের একটু তফাতে একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

নীতা ভাঙা গলায় অতিকষ্টে ডাকল—নব!

নব বেরিয়ে এল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। পাথরের মূর্তির মতো মাঝখানের অপ্রশস্ত করিডর থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির মাথায় একটু দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে হলো এবার। কিন্তু বলল না। সশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। ঝুমা তখনও দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নীতা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

॥ তিন ॥

বাইনোকুলারে পাখির ঝাঁকটিকে দেখেই চঞ্চল হয়েছিলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লাল ঘুঘুপাখির ঝাঁক। ইদানীং এই প্রজাতির ঘুঘু দেশে বিরল হয়ে এসেছে। এরা পায়রাদের মতো ঝাঁক বেঁধে থাকে। ক্যামেরায় টেলিলেন্স এঁটে দূরত্বটা দেখে নিলেন। কিন্তু কুয়াশা এখনও রোদকে ঝাপসা করে রেখেছে। কাছাকাছি না গেলে ছবি তোলা অসম্ভব। তাই সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকলেন।

কাছিমের পিঠের গড়ন একটা পাথুরে মাটির ডাঙা। খর্বুটে ঝোপঝাড়ে ডাঙা জমিটা ঢাকা। লাল ঘুঘুর ঝাঁক ঝোপগুলোর ডগায় বসে সম্ভবত রোদের প্রতীক্ষা করছে।

প্রাকৃতিক ক্যামাফ্লোজ ব্যবস্থা সত্যিই অসামান্য। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও আনাড়ি চোখে পাখিগুলোকে আবিষ্কার করা কঠিন। ঝোপের রঙের সঙ্গে ওদের ডানার রঙ একাকার হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে ছোট-বড় পাথরের চাঙড়, ক্ষয়াটে চেহারার গাছ কিংবা ঝোপ—খুব সাবধানে সেগুলোর আড়ালে গুঁড়ি মেরে কর্নেল এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা নিচু জমি। পাথরের ফাঁকে কাশঝোপ মাথা সাদা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিসে পা জড়িয়ে গেল কর্নেলের এবং টাল সামলানোর মৃদু শব্দেই লাল ঘুঘুর ঝাঁক চমকে উঠল। নিঃশব্দে উড়ে গেল।

ওরা উড়ে যাওয়ার মুহূর্তে কর্নেল নিজের পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। ছাই-রঙা ন্যাকড়াকানির মতো কী একটা জিনিস। কিন্তু পাখিগুলোর দিকেই মন থাকায় বাইনোকুলারটি দ্রুত চোখে রেখেছিলেন। ঝাঁকটি উড়ে চলছে বসতি এলাকার দিকে। গাছপালার আড়ালে ওরা উধাও হয়ে গেল বাঁদিকে পুরনো একটা লালবাড়ি ভেসে উঠল। তারপর চমকে উঠলেন কর্নেল। লালবাড়ির দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় ভিড়। এক দঙ্গল পুলিশ।

তাহলে সত্যিই কিছু ঘটল—এবং এত দ্রুত?

পা বাড়ানোর আগে সেই জিনিসটার দিকে একবার তাকালেন। ন্যাকড়াকানি নয়, একটা ছাই-রঙা পশমি মাফলার। ছেঁড়াফাটা। মাফলারটা শিশিরে নেতিয়ে গেছে। তারপর মাকড়সার জাল লক্ষ্য করলেন। জালটাও ছেঁড়া। তার মানে, তাঁর পায়ে জড়িয়ে যাওয়ার সময় পা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন। তখন মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে গেছে।

একটা ছেঁড়াফাটা মাফলার এখানে পড়ে আছে এবং তার ওপর মাকড়সা জাল বুনেছে, এটা কোনও ঘটনা নয়। এর চেয়ে জরুরি লালবাড়িটার দোতলার বারান্দায় ভিড় এবং পুলিশ। কর্নেল কী ভেবে মাফলারটি তুলে নিতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়লেন। নিলেন না। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে চললেন লালবাড়ির দিকে।

পেছন ঘুরে বাড়িটার গেটে পৌঁছে দেখলেন, ভেতরের লনে পুলিশের গাড়ি এবং একটা অ্যামবুলেন্স গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। গেটে দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল। কর্নেলকে দেখে তারা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল। একজন গম্ভীর গলায় বলল—আভি কিসিকো অন্দর যানা মানা হ্যায়, সাব!

কর্নেল নরম গলায় বললেন—কৈ খতরনাক হুয়া, ভাই?

—স্যুইসাইড কেস। কনস্টেবলটি বগলে লাঠি দিয়ে খৈনি বের করল। তারপর খৈনি ডলতে ডলতে ফের বলল—এক-দো ঘণ্টা বাদ আইয়ে, কিসিকো সাথ মুলাকাত মাংতা তো? আভি হুকুম হ্যায়, কৈ চুহা ভি নেহি ঘুসে। সে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকল।

অন্য কনস্টেবলটি বলল—কাঁহা সে আতা হ্যায় আপ?

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—কলকাত্তাসে।

—ইয়ে বাঙ্গালি বাবুকো সাথ আপকা জান পহচান হ্যায়?

—জরুর। দীনগোপালবাবু মেরা দোস্ত হ্যায়।

—তব আপ যানে সকতা। যাইয়ে, যাইয়ে! উনহিকা কৈ ভাতিজা স্যুইসাইড কিয়া—বহুৎ খতরনাক।

খৈনি ডলছিল যে, সে গুম হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রইল। কর্নেল সোজা লনে গিয়ে ঢুকলেন। বারান্দায় প্রভাতরঞ্জন দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেলকে দেখে অবাক চোখে তাকালেন। দ্রুত বললেন—আপনি?

কর্নেল নমস্কার করে বললেন—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

প্রভাতরঞ্জন নড়ে উঠলেন। চমক-খাওয়া গলায় বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? বুঝেছি। তাহলে আপনিই সেই ভদ্রলোক? দীনুদাকে আপনিই—কী আশ্চর্য! মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দীপু আর অরুণকে ইরিগেশান বাংলোয় আপনার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম। ওরা এসে বলল, খবর ঠিক। কিন্তু—কী আশ্চর্য! প্রভাতরঞ্জন এলোমেলো কথা বলছিলেন। কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—কে স্যুইসাইড করেছে শুনলাম?

—শান্ত। দীনুদার এক ভাইপো। প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বললেন—কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। এসব কী হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। আপনিই বা হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে দীনুদাকে—আরে! ও মশাই! যাচ্ছেন কোথায় আপনি?

কর্নেল বসার ঘরে ঢুকে ডানদিকে সিঁড়ি দেখতে পেলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলেন। পেছনে প্রভাতরঞ্জন তাঁকে তাড়া করে আসছিলেন। গ্রাহ্য করলেন না কর্নেল।

ওপরে যেতেই সরডিহি থানার সেকেন্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডে সহাস্যে ইংরেজিতে বলে উঠলেন—আপনাকে এ বাড়িতে দেখে অবাক হয়েছি ভাববেন না কর্নেল! তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। নিছক আত্মহত্যা। দীনগোপালবাবু নিরাপদেই আছেন। তাঁর এই ভাইপো সম্পর্কে আমাদের হাতে কিছু খবর অবশ্য আছে। তার আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। চূড়ান্ত হতাশা আর কি! পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্টদের ফ্রাস্ট্রেশন।

দুজন ডোম ততক্ষণে শান্তর মৃতদেহ কড়িকাঠ থেকে নামিয়েছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন—মিঃ পাণ্ডে! জানালাগুলো খোলা হয়নি দেখছি!

—কী দরকার? পাণ্ডে বললেন।—দেখছেন তো, নিছক আত্মহত্যা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। লাথি মেরে ভাঙা হয়েছে।

কর্নেল দক্ষিণের জানালাটা আগে খুললেন। তারপর খাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়ে বললেন—মিঃ পাণ্ডে, বডি নিশ্চয় মর্গে পাঠানো হবে?

—নিশ্চয়। দ্যাটস আ রুটিন ওয়ার্ক।

কর্নেল জানালাটা লক্ষ্য করছিলেন। বললেন—এটা আপনাদের কারুর চোখে পড়া উচিত ছিল, মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেতরে ঢুকে বললেন—কী, বলুন তো?

এই জানালার তিনটে রড নেই।

দীপ্তেন্দু, অরুণ এবং প্রভাতরঞ্জন ব্যাপারটা দেখছিলেন। দীপ্তেন্দু আস্তে বলল—রডগুলো বরাবরই নেই। জ্যাঠামশাই বাড়ি মেরামত করতে চান না। এই জানালাটার কথা আমি ওঁকে বলেছিলাম। উনি কান করেননি।

কর্নেল জানালার পাল্লা দুটো ঠেলে দিয়ে বললেন—জানালাটা ভেতর থেকে আটকানো যায় না। ছিটকিনিও কবে ভেঙে গেছে দেখছি।

পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—পুরো বাড়িটারই তো এই অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ জানালা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন, কর্নেল?

কর্নেল জানালা দিয়ে ঝুঁকে নিচেটা দেখছিলেন। বললেন পাশেই ছাদের পাইপ!

—তাতে কী? পাণ্ডে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন।—আত্মহত্যার সমস্ত চিহ্ন আমরা এখানে পাচ্ছি। কড়িকাঠের সঙ্গে মাফলারের ফাঁস লটকে শান্তবাবু ঝুলে পড়েছেন। ওই দেখুন, একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

—কোনও স্যুইসাইড নোট পেয়েছেন কি?

—না। পাণ্ডে বললেন।—সবসময় সবাই লিখে রেখে আত্মহত্যা করে না।

কর্নেল শান্তর মৃতদেহের দিকে তাকালেন। বললেন—এটা আত্মহত্যা নয় মিঃ পাণ্ডে, নিছক খুন। লক্ষ্য করুন, গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুললে মানুষের জিভ যতটা বেরিয়ে পড়ার কথা, ততটা বেরিয়ে নেই।

সবাই চমকে উঠেছিল। প্রভাতরঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন—কী আশ্চর্য! তাও তো বটে।

—তাছাড়া এভাবে আত্মহত্যার আরও কিছু স্বাভাবিক চিহ্ন থাকে। মলমূত্রও বেরিয়ে যায়। একটু রক্তক্ষরণের চিহ্নও থাকে। দম আটকে ফুসফুস ফেটে গেলে সেটাই স্বাভাবিক। কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরে বললেন—মিঃ পাণ্ডে, শান্তবাবুকে কেউ খুন করে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে। আশা করি ছাদ থেকে নেমে যাওয়া পাইপ পরীক্ষা করলে কিছু সূত্র মিলবে।

নীতা ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেলের কথায় সে মুখ ফেরাল এবং কর্নেলের চোখে চোখ পড়তেই আস্তে বলল—ওই মাফলারটা...

সে হঠাৎ থেমে গেলে কর্নেল বললেন—শান্তবাবুর নয়। তাই না?

প্রভাতরঞ্জন অবাক চোখে ভাগনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বলিস কী? কী করে বুঝলি?

নীতা বলল—কাল রাত্তিরে শান্তদার গলায় ওই ডোরাকাটা মাফলার ছিল না।

দীপ্তেন্দু নড়ে উঠল।—মাই গুডনেস! শান্তর গলায় একটা ছাইরঙা মাফলার দেখেছি মনে পড়ছে।

অরুণও বলল দ্যাটস্ রাইট। আমারও মনে পড়ছে। অ্যাশ কালার মাফলার!

বসে সে অতি উৎসাহে শান্তর বিছানার দিকে প্রায় লাফ দিয়ে এগোল। কম্বল উল্টে খাটের তলা চারদিক থেকে খুঁজে তারপর শান্তর কিটব্যাগ হাতড়াতে থাকল। শেষে হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

কর্নেল পাণ্ডের উদ্দেশে বললেন—কিছু ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। শান্তবাবু ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হননি। মর্গের রিপোর্টে সবকিছু জানা যাবে। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে খুনী নিজের মাফলারটাই কাজে লাগিয়েছে। তারপর শান্তর মাফলারটা কারও চোখে পড়ে থাকবে। তার মানে, শান্ত মাফলারটা গলায় জড়িয়ে শুয়ে ছিল না। কেউ শোবার সময় মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে না যদি না তার গলাব্যথা বা ঠাণ্ডার অসুখ থাকে।

পাণ্ডে সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

—মাফলারটা চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা ছিল! কর্নেল বললেন।

বলে বিবর্ণ দেয়ালে পেরেক পুঁতে আটকানো একটা ব্র্যাকেটের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। কাঠের তৈরি জীর্ণ ব্র্যাকেট। এ ধরনের ব্র্যাকেট ভাঁজ করা যায়। একটা দিক মরচে ধরা পেরেক থেকে উপড়ে একটু বেঁকে ঝুলে রয়েছে। অন্যদিকে একটা বাদামি রঙের জ্যাকেট ঝুলছে। জ্যাকেটটা শান্তরই। সেটা কোনোরকমে ঝুলছে মাত্র।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—কী আশ্চর্য! আপনার চোখ আছে বটে কর্নেলসায়েব।

কর্নেল প্রশংসায় কান করলেন না। বললেন একঝটকায় মাফলারটা টেনে নিয়ে খুনী পালিয়ে গেছে। ওটা থাকলে এটা স্যুইসাইড কি না, তা নিয়ে কারও সন্দেহ জাগত। খুনী সেই ঝুঁকি নিতে চায়নি।

অরুণ বলল—কিন্তু বডি মর্গে গেলেই তো...

তাকে বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—মর্গের রিপোর্ট পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ততক্ষণে খুনী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিপাত্তা হওয়ার সুযোগ পেত।

এবার প্রভাতরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বললেন—হেঁয়ালি! কিছু বোঝা যায় না। আমারও মশাই ক্রিমিনলজিতে একটু-আধটু পড়াশোনা আছে। রাজনীতি করে জেল খেটেছি বিস্তর। জেলেও ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে মেলামেশার স্কোপ ছিল। কথাটা হলো, প্রতিটি খুনের একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। একটা হলো, পার্সোনাল গেন—ব্যক্তিগত লাভ। অন্যটা হলো গিয়ে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। হ্যাঁ—হঠাৎ রাগের বশেও মানুষ মানুষকে খুন করে, কিংবা দৈবাৎ নেহাত থাপ্পড় মারলেও মানুষ মারা পড়তে পারে। কিন্তু এটা কোনও ডেলিবারেট মার্ডার নয়।

অরুণ বলল—মামাবাবু, উনি ডেলিবারেট মার্ডারের কথাই বলছেন কিন্তু—মাইন্ড দ্যাট!

পাণ্ডের তাড়ায় শান্তর মৃতদেহ নিয়ে ততক্ষণে দুজন ডোম এবং কনস্টেবলরা বেরিয়ে গেল। প্রভাতরঞ্জন বললেন—সেটাই তো হেঁয়ালি! শান্তকে কে কী উদ্দেশ্যে খুন করবে?

দীপ্তেন্দু বলল—শান্তর শত্রু থাকা সম্ভব, মামাবাবু! ওর অনেক ব্যাপার ছিল যা আমরা জানি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, ওর নামে রেকর্ডস আছে এখানকার থানায়।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পশ্চিমের জানালায় গিয়ে উঁকি মেরে ফের ছাদের পাইপটা দেখে নিয়ে বললেন—দীনগোপালবাবু কোথায়? ওঁকে দেখছি না যে?

পাণ্ডে বললেন—নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। আপনি আসার মিনিট কুড়ি আগে বাইরে থেকে ফিরে এই সাংঘাতিক ঘটনা দেখে ওঁর অবস্থা শোচনীয়। এখন ওঁকে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না।

—একা আছেন নাকি?

প্রশ্নের জবাব দিল নীতা—না ঝুমা বউদি আছেন। ডাক্তারবাবু আছেন।

পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—রুটিন জব, কর্নেল। সঙ্গে ডাক্তার নিয়েই এসেছিলাম। বডি পরীক্ষা করেই বলেছেন, বহুক্ষণ আগেই মারা গেছেন শান্তবাবু।

কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু কোনও সন্দেহ করেননি?

—না তো। পাণ্ডে গম্ভীর হলেন এবার।—ওঁর কাছেও এ একটা রুটিন জব। কিন্তু আপনি যে পয়েন্টগুলো তুলেছেন, তাছাড়া মাফলারের ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ—তাতে মনে হচ্ছে, কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার আছে। পারিবারিক কোনও ব্যাপার থাকাও স্বাভাবিক!

অরুণ আপত্তি করে বলল—অসম্ভব।

দীপ্তেন্দু বলল। অসম্ভব। আমাদের পারিবারিক কোনও গণ্ডগোল নেই।

প্রভাতরঞ্জন জোর দিয়ে বললেন—এই ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা জানেন না। তাই এ প্রশ্ন তুলছেন। তবে আমারও একটা প্রশ্ন আছে মিঃ পাণ্ডে!

বলে তিনি কর্নেলের দিকে আঙুল তুললেন।—এই ভদ্রলোক সম্পর্কে প্রশ্ন।

কর্নেল একটু হাসলেন। বলুন।

—দীনুদা বলছিল, আজ মর্নিং ওয়াকে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল. আপনি ওঁকে বলেছেন, আমি আপনার হিতৈষী। এর মানেটা কী?

—হিতৈষী শব্দের মানে বরং অভিধানে দেখে নেবেন।

প্রভাতরঞ্জন চটে গেলেন।—আপনি আমাকে অভিধান দেখাবেন না। যেচে পড়ে কলকাতা থেকে এসে কাউকে বেমক্কা 'আমি আপনার হিতৈষী' বলার মানেটা কী? কে আপনি?

পাণ্ডে হাসলেন। কর্নেলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে আপনার সরডিহিতে আবির্ভাবের কিছু কারণ আছে। যাই হোক, প্রভাতবাবু। আপনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাম শোনেননি বোঝা যাচ্ছে।

প্রভাতরঞ্জন জোরে মাথা নেড়ে বললেন—না দেশে বিস্তর কর্নেল আছেন।

পাণ্ডে কিছু বলার আগে নীতা বলে উঠল—মামাবাবু, উনি একজন প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাছাড়া উনি যেচে পড়ে এখানে আসেননি। আমিও ওঁকে বাসস্টপের লোকটার কথা বলে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলাম।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে এবং ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বললেন—তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়েছিস—ভালো। কিন্তু কেমন গোয়েন্দা উনি যে, এই সাংঘাতিক অপঘাত ঠেকাতে পারলেন না? এবার দীনুদার কিছু হলে কি তুই ভাবছিস উনি ঠেকাতে পারবেন?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ব্যালকনিতে গেলেন। বাইনোকুলারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই মাফলার-পড়ে-থাকা জায়গাটা দেখতে থাকলেন। নিচু জায়গাটা ঝোপের আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনও লোক নেই।

পাণ্ডে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—বাসস্টপের লোকটা। ব্যাপারটা কী, কর্নেল?

কর্নেল একটু ভেবে বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—নীতা, এঁকে ব্যাপারটা আগে তোমার জানানো উচিত ছিল।

পাণ্ডে নীতার দিকে তাকালেন। সেই সময় প্রভাতরঞ্জন বলে উঠলেন—আমি বলছি। সমস্তটাই রীতিমতো রহস্যজনক। পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার জানা দরকার।

বাড়ির পশ্চিমে ছাদের পাইপের অবস্থা জরাজীর্ণ। কর্নেল এবং পুলিশ অফিসার পাণ্ডে নিচে গিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, তখনও প্রভাতরঞ্জনের ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ণনা থামেনি। পাণ্ডে পাইপের খাঁজে পা রেখে ওঠার চেষ্টা করতেই ঝরঝর করে খানিকটা মরচে আর চুনবালি ঝরে পড়ল। দেয়াল থেকে হুক উঠে গেল। অমনি প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের সামনে হাতমুখ নেড়ে ঘোষণা করলেন—ইউ আর রং কর্নেলসাহেব।

পাণ্ডে দুহাত থেকে ময়লা ঝেড়ে বললেন—হ্যাঁ! এ পাইপ বেয়ে কেউ উঠলে আছাড় খেত। পাইপটাও আস্ত থাকত না।

কর্নেল দোতলায় শান্তর ঘরের জানালার কাছাকাছি পাইপের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—পাইপটা আস্ত নেই, মিঃ পাণ্ডে! খানিকটা ভেঙে গেছে।

নিচের দিকে দেয়াল ঘেঁষে ঘন ঝোপ। পাণ্ডে বেটন দিয়ে ঝোপগুলো ফাঁক করে দেখে বললেন—কিছু মরচে ধরা লোহার টুকরো আছে দেখছি। তবে এগুলো আপনা-আপনি খসে পড়তেও পারে।

কর্নেল ঝোপের দিকে ঝুঁকে টুকরোগুলো দেখছিলেন। প্রভাতরঞ্জন তাঁর পাশ

গলিয়ে কয়েকটা টুকরো কুড়িয়ে নিলেন। বললেন—আপনি তো মশাই ডিটেকটিভ। ডিটেকটিভদের নাকি অগুনতি চোখ থাকে। আমার মাত্র একজোড়া চোখ। বলুন, এগুলো টাটকা ভাঙা? এই দেখুন, একটুতেই মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। ষাট বছর আগে তৈরি ঢালাই লোহার পাইপ। মরচে ধরে ক্ষয়ে—এই রে! সর্বনাশ!

প্রভাতরঞ্জনের আঙুল কেটে রক্তারক্তি। অরুণ, দীপেন্দু, নীতা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণ দৌড়ে এসে বলল এখনই এ টি এস নিন মামাবাবু! মরচে ধরা লোহায় কেটে গেলে টিটেনাস হয় শুনেছি।

পাণ্ডে বললেন—ওপরে ডাক্তারবাবু আছেন। নিশ্চয় তাঁর কাছে এ টি এস পেয়ে যাবেন।

আঙুল চেপে ধরে প্রভাতরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। ঝোপের গায়ে রক্তের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছিল। দীপেন্দু বলল—মামাবাবুর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কাল রাত্তিরে কী কাণ্ডটা না করলেন বলো অরুণদা!

পাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

অরুণ গত রাত্তিরের সব ঘটনা বলল। পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—আপনাদের এই মামাবাবুর সব ব্যাপারে বড্ড বেশি উৎসাহ দেখছি। একসময় পলিটিক্স করতেন। আমাদের রেকর্ডে আছে।

দীপেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল—সেটাই তো সমস্যা! পলিটিসিয়ানদের মুখের জোর যতটা, ততটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থাকে না। অন্তত মামাবাবুর ছিল না। অরুদা, আজ ভোরের মজার ব্যাপারটা বলোনি কিন্তু!

অরুণ বলল জ্যাঠামশাইকে সারা রাত পাহারা দেওয়ার পর ভোর প্রায় চারটে নাগাদ মামাবাবু হুকুম দিলেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার সব শুয়ে পড়ো গে। আমি একা পাহারা দেব। তারপর উনি বসার ঘরের সোফায় দিব্যি শুয়ে পড়লেন। হাতে নবর বল্লম। এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের মর্নিং ওয়াকের অভ্যাস আছে। ঘুমন্ত মামাবাবুর হাত থেকে বল্লমটা নিয়ে লনে পুঁতে চলে গেছেন। মামাবাবু টেরও পাননি। হঠাৎ জেগে দেখেন বল্লম নেই। যাই হোক, নব বল্লম পুঁততে দেখেছিল। নইলে মামাবাবু হুলুস্থুল বাধিয়ে দিতেন ফের।

দীপেন্দু বলল—বাধিয়েও ছিলেন। আমাদের ডেকে তুলে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।

পাণ্ডে বললেন—শান্তবাবু গণ্ডগোল শুনে নেমে আসেননি তখন?

নীতা মৃদু স্বরে বলল—নিচে হৈচৈ শুনে আমি শান্তদার ঘরের দরজায় নক করেছিলাম। ডেকেছিলামও। সাড়া পাইনি। তখন ছটা বেজে গেছে।

—তার মানে, তখন শান্তবাবু আর বেঁচে নেই! পাণ্ডে কথাটা কর্নেলের উদ্দেশে বললেন।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—ঠিক তাই।

পাণ্ডে বললেন—যদি মর্গের রিপোর্টে দেখা যায় এটা সত্যিই মার্ডার, তাহলে তো ব্যাপারটা অদ্ভুত হয়ে ওঠে। শান্তবাবুর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। এদিকে আপনি বলছেন, খুনী এই পাইপ বেয়ে পালিয়েছে। কিন্তু পাইপের অবস্থা তো দেখছেন। ধরা যাক, খুনী কাল রাত্তিরে কোনও সুযোগে শান্তবাবুর ঘরে ঢুকে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল। তারপর কাজ শেষ করে এই পাইপ বেয়ে নেমে গেছে। কিন্তু নামতে গেলে পাইপ্ ভেঙে পড়তই।

কর্নেল বললেন—পুরোটা ভেঙে পড়েনি। কিন্তু খানিকটা ভেঙেছে।

বলে কর্নেল বাইনোকুলারে পাইপটার ওপরদিকটা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর বাইনোকুলারটা পাণ্ডের হাতে গুঁজে দিলেন।—দেখুন! দেখলেই বুঝবেন, আমি ঠিকই বলেছি।

পাণ্ডে বাইনোকুলারে পাইপের ওপরদিকটা দেখে হাসতে হাসতে বললেন—বিশাল স্তম্ভ!

—ভাঙা অংশটা দেখুন।

—দেখছি। বিশাল গহ্বর।

—হ্যাঁ। কিন্তু বিশাল গহ্বরের কিনারা লক্ষ্য করুন।

—করছি।

—কিছু বুঝতে পারছেন না?

—না তো!

—মিঃ পাণ্ডে, কিনারার রঙ ঘন কালো নয় কি?

হ্যাঁ। ঘন কালো। বলে পাণ্ডে বাইনোকুলার কর্নেলকে ফিরিয়ে দিলেন। চাপা শ্বাস ফেলে ফের বললেন—বুঝেছি, টাটকা ভাঙা। তা না হলে কিনারাতেও মরচে ধরে এমনি লালচে হয়ে থাকত।

কর্নেল প্রজাপতি ধরা জালের স্টিক নিচের একটা ঝোপের পাতায় ঠেকিয়ে বললেন—প্রভাতবাবুর যেমন আঙুল কেটে রক্ত পড়ল, খুনীরও সম্ভবত আঙুল কেটে গিয়েছিল মিঃ পাণ্ডে! এই কালচে লাল ফোঁটাগুলো হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাতার স্বাভাবিক কুটকি বা ছোপ! নানা প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভিদের পাতায় এমন স্পট পড়ে। কিন্তু এগুলো তা নয়, রক্ত। খুনীরই রক্ত।

পাণ্ডে ঝোপের পাতাগুলো দেখছিলেন। বললেন—রক্ত বলেই মনে হচ্ছে। আশেপাশে আর কোনও ঝোপের পাতায় এমন ছোপ নেই।

কর্নেল বললেন—মরচে ধরা পাইপের রঙের সঙ্গে রক্তের ছোপ মিশে গেছে। তাই পাইপের গায়ে রক্তের ছোপ খালি চোখে ধরা পড়ছে না। কিন্তু আমার বাইনোকুলারে ধরা পড়েছে।

পাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবার।—খুনীকে সনাক্ত করার মতো একটা চিহ্ন পাওয়া গেল। বলে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে একটু হাসলেন—কিন্তু যদি মর্গের রিপোর্ট বলে যে, নিছক দম আটকেই মারা গেছেন শান্তবাবু? স্রেফ স্যুইসাইড?

কর্নেল আস্তে বললেন—দেখা যাক। তারপর তিনি লনের দিকে চললেন।

ততক্ষণে অ্যামবুলেন্সে শান্তর মৃতদেহ হাসপাতালে চলে গেছে। পুলিশ অফিসার পাণ্ডে কর্নেলের উদ্দেশে হাত নেড়ে চলে গেলেন। গেটের সেপাই দুজন তাঁর জিপের পেছনে উঠে বসল। জিপটা চলে গেল। দীপ্তেন্দু, অরুণ ও নীতা সামনের লনে কর্নেলকে ঘিরে দাঁড়াল।

অরুণ বলল—আমার একটা থিওরি আছে কর্নেল সরকার!

—বলুন।

—এটা একটা মার্ডার ট্র্যাপ। খুনের ফাঁদ। কেউ শান্তকে খুন করতে এই ফাঁদটি তৈরি করেছিল, অবশ্য যদি এটা সত্যিই খুনের কেস হয়।

দীপ্তেন্দু তাকে সমর্থন করে বলল—আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখানে আমাদের সবাইকে জড়ো করে কেউ শান্তকে খুন করলে পুলিশ স্বভাবত আমাদেরই কাউকে-না-কাউকে সন্দেহ করবে।

কর্নেল বললেন—কেন?

—জ্যাঠামশাইয়ের প্রপার্টির আমরাই উত্তরাধিকারী। দীপ্তেন্দু যুক্তি দেখিয়ে বলল।—সংখ্যায় একজন কমলে বাকি উত্তরাধিকারীদের শেয়ার কিছুটা বাড়বে। পুলিশ তো এই লাইনেই দেখবে ব্যাপারটা।

অরুণ একটু হাসল।—অবশ্য পুলিশের রেকর্ডে শান্তর অনেক কীর্তি লিস্ট করা আছে। কলকাতা থেকে আরও রেকর্ড আনাবে। তবে আমি যা বলছিলাম, মার্ডার ট্র্যাপ! এখানে—মানে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে শান্তকে মার্ডার করা সোজা। নিরিবিলি জায়গা। যে কোনও সময় ওকে একলা পেয়ে যাবার চান্স বেশি।

নীতা বলল—কিন্তু আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে জড়ো না করে শুধু শান্তকে একা ডাকতে পারত। বাসস্টপের লোকটার কথা ভুলে যাচ্ছে অরুদা!

—ভুলিনি। ওই লোকটাই তো ফাঁদ। অরুণ গলা চেপে বলল।—আমাদের জড়ো করার উদ্দেশ্য হলো—দীপু যা বলছিল, আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপানো।

দীপ্তেন্দু বলল—নীতু, তুই এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে এনে ভাল করেছিস। তোর বুদ্ধি আছে। আমরা জানি, শান্তকে আমরা কেউ খুন করিনি। বলে সে কর্নেলের দিকে তাকাল।—আমরা চাই, যদি সত্যি শান্ত খুন হয়ে থাকে, আপনি খুনীকে বের করুন। আপনার ফি একা নীতু কেন দেবে? আমরা সবাই শেয়ার করব। কী অরুদা?

অরুণ বলল—নিশ্চয়!

কর্নেল বাইনোকুলারে আকাশে হাঁসের ঝাঁক দেখতে থাকলেন। নীতা চোখ টিপে আস্তে বলল—উনি ফি নেন না। ফি নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবুকে বেরুতে দেখা গেল। ঢ্যাঙা মানুষ, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। নবর হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ। কর্নেলকে আড়চোখে দেখতে দেখতে

পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন গেটের দিকে নবও যেতে যেতে কয়েকবার ঘুরে কর্নেলকে দেখছিল।

ওপরে দীনগোপালের ঘরের জানালায় প্রভাতরঞ্জনকে দেখা গেল। বললেন—অরু! ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে বল, দীনুদা কথা বলবেন। ও মশাই! দয়া করে একটু দর্শন দিয়ে যান।

মুখে তেতো ভাব। গলার স্বর ঝাঁঝালো। নীতা দ্রুত বলল মামাবাবু ওইরকম মানুষ, কর্নেল! প্লিজ, ওঁর কোন কথায় অফেন্স নেবেন না।

কর্নেল হাসলেন।—না, না। ব্যর্থ রাজনীতিকদের আমি খুব চিনি।

অরুণ ও দীপ্তেন্দু এক গলায় সায় দিয়ে বলল—ঠিক বলেছেন।...

দোতলায় পুবদিকের ঘরটা বেশ বড়। সেকেলে আসবাবপত্রে ঠাসা। প্রকাণ্ড খাটে কয়েকটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন দীনগোপাল। খাটের পাশে জানালার কাছে একটা গদি আঁটা চেয়ারে প্রভাতরঞ্জন। দুই হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কর্নেল ঢুকলে দীনগোপাল বাঁকা মুখে বললেন—হিতৈষী মশাইয়ের বসতে আজ্ঞা হোক। নীতু, তুইও বস। দীপু, অরু! তোরা এখন ভিড় করিস নে। মর্গে গিয়ে দ্যাখ গে কী হচ্ছে। আর বউমা, নব বোধ করি ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে গেছে—তুমি চা বা কফি যাই হোক, এক পট তৈরি করে আনো।

ঝুমা চলে গেল। তার পেছনে অরুণ ও দীপ্তেন্দু। কর্নেল বসলেন দরজার কাছে একটা চেয়ারে।

দীনগোপাল বললেন—নীতু! তুই গোয়েন্দা ভাড়া করেছিস শুনলাম!

নীতু মুখ নামাল।

—তোর গোয়েন্দামশাই আমার হিতৈষী। খুব ভালো। দীনগোপাল আরও বাঁকা মুখে বললেন।—তখন আমাকে অমন একটা উটকো প্রশ্ন করলেন কেন, জিজ্ঞেস কর তো তোর গোয়েন্দামশাইকে।

নীতা বলল—কী প্রশ্ন?

কর্নেল মুখে কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে বললেন—নিছক একটা কথার কথা! এ বয়সে এখানে একলা আছেন—দেখাশোনার লোক নেই, মানে আত্মীয়-স্বজনের কথাই বলছি আর কী! স্রেফ কৌতূহল মাত্র!

—থামুন! দীনগোপাল ধমকের স্বরে বললেন।—এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কিছুদিন ধরে আপনিই আমাকে ফলো করে বেড়াচ্ছেন। ঝোপে ঝাড়ে, গাছপালার আড়াল থেকে। এদিকে নীতু ব্যাপারটা দিব্যি চেপে রেখে আমাকে ভোগাচ্ছিল।

নীতা ব্যস্তভাবে বলল—না জ্যাঠামশাই! আমি তো কর্নেলের সঙ্গে আমার আসার আগের দিন কনট্যাক্ট করেছি। আর আপনি হ্যালুসিনেশান দেখছেন তার কতো আগে থেকে।

দীনগোপাল কর্নেলকে চার্জ করলেন—কী মশাই? নীতু ঠিক বলছে?

কর্নেল বললেন—একেবারে ঠিক। আজ তেসরা নভেম্বর। নীতা আমার কাছে গিয়েছিল ৩০ অক্টোবর।

দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—শুনলাম আপনি বলেছেন শান্ত স্যুইসাইড করেনি। খুনী আগে থেকে লুকিয়ে ছিল। শান্তকে মেরে কড়িকাঠে লটকে ভাঙা জানালা দিয়ে পালিয়েছে—পাইপ বেয়ে!

—হ্যাঁ, দীনগোপালবাবু। ঠিক তাই।

কিন্তু প্রভাত বলছে, পাইপের যা অবস্থা পুরোটা ভেঙে পড়ার কথা। পুলিশও তাই নাকি বলছে। দীনগোপাল চোখ বুজে ঢোক গিলে শোক দমন করলেন। ভাঙা গলায় ফের বললেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এসব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে! শান্ত যদি স্যুইসাইড করে—এখানে এসে কেন করবে? যদি কেউ তাকে খুন করে থাকে—তাই বা কেন করবে? আর কলকাতার বাসস্টপে কেন কোন ব্যাটাচ্ছেলে আমার ভাইপো-ভাইঝিদের বলে বেড়াবে আমার বিপদ, সরডিহি চলে যাও?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—তোমার ব্যাপারটা সম্ভবত হ্যালুসিনেশান নয় দীনুদা। এটাও একটা রহস্য। একেবারে গোলকধাঁধায় পড়া গেল দেখছি।

বলে কর্নেলের দিকে কটাক্ষ করলেন।—নীতা ডিটেকটিভ এনেছে। দেখা যাক, উনি কিছু জট ছাড়াতে পারেন নাকি।

কর্নেল একটু হাসলেন!—জটের খেই যতক্ষণ অন্যের হাতে, ততক্ষণ আমি নিরুপায় প্রভাতবাবু।

প্রভাতরঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন—কার হাতে?

—একটা লোকের হাতে—আমি সিওর নই। তবে তাই মনে হচ্ছে।

প্রভাতরঞ্জন দীনগোপালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—সে আবার কে?

—সম্ভবত যে আড়াল থেকে দীনগোপালবাবুকে এক সপ্তাহ ধরে ফলো করে বেড়াচ্ছে।

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসে বললেন—কেন ফলো করে বেড়াচ্ছে?

—এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল চটে গেলেন।—পারি না। কারও পাকা ধানে এই ইহ জীবনে আমি মই দিইনি!

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—মানুষের জীবনে এটাই ঘটে থাকে দীনগোপালবাবু! নিজেই জানে না যে, সে কী জানে। অর্থাৎ নিজের অগোচরে মানুষ কিছু ইনফরমেশন বা তথ্য বয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং নিজের অগোচরে সেই তথ্য ফাঁস করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসে। তখন সেই তথ্য যার পক্ষে বিপজ্জনক, সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাধা দিতে মরিয়া হয়।

দীনগোপাল কান করে শুনছিলেন। শ্বাস ছেড়ে বললেন—ফিলসফি! আপনি

শুধু গোয়েন্দা নন, দেখছি ফিলসফারও বটে! খুব ভাল গোয়েন্দা এনেছে নীতু। লেগে পড়ুন আদাজল খেয়ে।

প্রভাতরঞ্জন বললেন—না দীনুদা। ওঁর কথাটা ভাববার মতো।

—তুমিও তো ফিলসফার। ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা।

প্রভাতরঞ্জন জোরে মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু হুঁ হুঁ! ফিলসফি নয়, ফিলসফি নয়। প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার।

দীনগোপাল একটু চটে গিয়ে বললেন—কী প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার? আমি এমন কিছু জানি না, যা কারও পক্ষে বিপজ্জনক। আমি এমন নতুন কিছু করে যাচ্ছি না যে তাতে কারও বিপদ ঘটবে। যদি বা জানি কিংবা নতুন কিছু করি, তাতে শান্তর বিপদ কেন ঘটল?

—আহা, না জেনেও তো কত লোক সাপের মাথায় পা দেয়।

দীনগোপাল আরও চটে বললেন—মলো ছাই! কোথায় শান্ত কিসে পা দিল? আর আমি পা দিতে যাচ্ছি কোথায়? একটা চোখে একটু ছানি পড়েছে বলে আমি কি কানা?

প্রভাতরঞ্জন মিঠে গলায় বললেন—সেবার তুমি বলছিলে উইলের কথা ভাবছ। আমি তোমাকে বললাম, কাউকে বঞ্চিত না করে উইল করো। তুমি বললে, দেখা যাক। তুমি নীতুকে বেশি স্নেহ করো, জানি। নীতু আমারই ভাগনী। তো—এমনও হতে পারে তুমি নীতুর নামে উইল করবে প্ল্যান করেছ, এতেই কারুর ব্যাঘাত ঘটতে চলেছে।

সেটা সাপের মাথায় পা দেওয়া হলো বুঝি? দীনগোপাল অন্যমনস্কভাবে বললেন—উইলের প্ল্যান করার কথা ঠিকই। অ্যাটর্নির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা। কিন্তু ধরো, সম্পত্তি যার নামেই দিই, তাতে কার কি তথ্য ফাঁস হবে? তাছাড়া দীপু, অরু, ওদের বাপের প্রচুর পয়সা। ওরা আমার কানাকড়ির মুখ চেয়ে নেই। শান্তর অবশ্য পয়সাকড়ি ছিল না। কিন্তু সে পয়সাকড়ির ধারই ধারত না। তাছাড়া ও এখন বেঁচে নেই।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে বললেন—হুঁ, দুটোকে লিংক আপ করা যাচ্ছে না! কর্নেলসাহেব! বলুন এবারে? আপনিই কিন্তু হিন্ট দিয়েছেন।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, দীনগোপাল পুবের জানালার দিকে সরে গিয়ে আচমকা হাঁক দিলেন—কে ওখানে?

প্রভাতরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে উঁকি দিলেন। কর্নেলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বাইনোকুলারে চোখ রেখে এগিয়ে গেলেন। ঘন গাছপালার জঙ্গল হয়ে আছে ওদিকটাতে। তার ওধারে টালি-খোলার বস্তি। আরও গাছ। মাঝে মাঝে পোড়ো খালি জমি এবং নতুন দোতলা-একতলা বাড়ি।

দীনগোপাল অভ্যাসমতো আস্তে বললেন—হ্যালুসিনেশান! তারপর ঠোঁটের

কোনায় বাঁকা হেসে কর্নেলের উদ্দেশে বললেন—আপনার সেই আড়ালের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না দূরবীনে?

কর্নেল তখনও তন্নতন্ন খুঁজছেন। কোনও জবাব দিলেন না। পাঁচিলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা অংশ ভাঙা। সেখানে ডালপালা দিয়ে বেড়া করা হয়েছে। বাইনোকুলারে এক পলকের জন্য বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা কালো কুকুরের মুখ বিশাল হয়ে ভেসে উঠল, প্রকাণ্ড লকলকে জিভ। তারপরই ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। একটু পরে আবার কুকুরটা দেখা গেল এক সেকেন্ডের জন্য। বাইনোকুলারে সবকিছু বড় আকারে দেখা যায়। কুকুরটা আরেকটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

প্রভাতরঞ্জন ব্যস্তভাবে চাপা স্বরে বললেন—কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল চোখ বাইনোকুলারে রেখেই বললেন—হ্যাঁ। একটা কালো রঙের কুকুর।

কালো কুকুর! দীনগোপাল চমকে ওঠা গলায় বললেন।—হুঁ নব বলেছিল বটে।

কালো কুকুরটা অ্যালসেশিয়ান বলে মনে হয়েছিল কর্নেলের। এবার ফাঁকা জায়গায় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পশ্চিম দিকে হেঁটে চলেছে। উঁচু-নীচু মাঠে কখনও আড়াল হয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। কর্নেল ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে বারান্দায় গেলেন। তারপর আবার বাইনোকুলারে কুকুরটাকে খুঁজলেন। দেখতে পেলেন না আর। কিন্তু এবার খোলামেলা একটা উঁচু জমির মাঝখানে একটা বেঁটে গাছের কাছে একটা লোক দেখতে পেলেন।

রোদে কুয়াশা মেখে আছে। তার ভেতরে আবছা ভেসে উঠল লোকটার চেহারা। খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, মাথায় মাফলার জড়ানো, গায়ে খাকি রঙের সোয়েটার—মোটেও ধোপদুরস্ত নয়, পরনে যেমন তেমন একটা ফুল প্যান্ট। এরকম কোনও লোক সরডিহির মাঠে ঘোরাফেরা করতেই পারে। কিন্তু কালো অ্যালসেশিয়ানটা তার কাছে পৌঁছুতেই ঘটনাটি তাৎপর্য পেল।

কুকুরটা আর লোকটা তখনই জমিটার ঢালে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের কাছে এসে আগের মতো ব্যস্তভাবে বললেন—কুকুরটাকে ফলো করছেন? কোথায় যাচ্ছে?

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। ঝুমা কফির ট্রে নিয়ে এল এতক্ষণে। কর্নেল চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, দীনগোপাল বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। চোখ বন্ধ। মুখ ভীষণ গম্ভীর। কর্নেল ডাকলেন—দীনগোপালবাবু!

চোখ না খুলেই দীনগোপাল বললেন—বলুন।

—আমি আপনার কাছেই কিছু শোনার আশা করছিলুম।

—কী ব্যাপারে?

—কালো কুকুরটার ব্যাপারে।

—দীনগোপাল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন—আপনি তো গোয়েন্দা! আপনিই খুঁজে বের করুন, দেখি আপনার বাহাদুরি।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—কুকুরটার মালিককেও আমি দেখতে পেয়েছি, দীনগোপালবাবু! ভদ্রলোক মাঠে অপেক্ষা করছিলেন—কুকুরটাকে পাঠিয়ে রোজকার মতোই আপনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন।

দীনগোপাল তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। ঝুমা চুপচাপ কফির পেয়ালা তুলে দিচ্ছিল প্রত্যেকের হাতে । প্রভাতরঞ্জন কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বোঝা যায় না! আড়ালের কোনো লোকের কথা বলছিলেন? সেই লোক নাকি? কে সে? বলে দীনগোপালের দিকে ঘুরলেন।—ও দীনুদা, একটু ঝেড়ে কাশো তো! এ যে বড্ড হেঁয়ালিতে পড়া গেল দেখছি।

দীনগোপাল ধমক দিলেন।—চুপ করো তো। সবতাতে নাক গলানো অভ্যাস খালি।

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে গেলেন। একটু পরে আস্তে বললেন—নাক কি সাধে গলাচ্ছি? আমার মাথার ভেতরটায় চর্কির মতো কী ঘুরছে। যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মাথায়।

কর্নেল বললেন—আপনার হাতেও।

প্রভাতরঞ্জন চমকে উঠে বললেন—কী? তারপর বিষণ্ণ হাসলেন।—হ্যাঁ, হাতেও ব্যথা।...

॥ চার ॥

সরডিহি সেচ বাংলো বিশাল জলাধারের ধারে একটা টিলা জমির ওপর তৈরি। জলাধারটি পাখিদের স্যাংচুয়ারি বলা চলে। লাঞ্চের পর কর্নেল লনে ইজিচেয়ার পেতে বসে জলাধারের পাখি দেখছিলেন। এখনই হিমালয় ডিঙিয়ে সাইবেরিয়ার হাঁসের ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। সারা শীত এখানে কাটিয়ে তারা আবার স্বদেশে ফিরে যাবে। একটি জলটুঙ্গির ওপর ঘন জঙ্গল। উঁচু মগডালে অদ্ভুত চেহারার সারস জাতীয় একটা পাখি বসে আছে। বাইনোকুলারে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর কর্নেল চিনতে পারলেন, ওটা 'কেরানি পাখি' ইংরেজিতে 'সেক্রেটারি বার্ড' বলা হয়। এ পাখি এখন দুর্লভ প্রজাতির হয়ে উঠেছে। দ্রুত ক্যামেরা নিয়ে এলেন তাঁর রুম থেকে। টেলিলেন্স ফিট করে ছবি তুলতে যাচ্ছেন, পাখিটা হঠাৎ নিচের ডালে সরে গেল।

হতাশ মুখে ক্যামেরা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময়ে বাংলোর গেটের দিকে গাড়ির শব্দ। ঘুরে দেখলেন পুলিশের জিপ। চৌকিদার রামলাল দৌড়ে গিয়ে গেট খুলে দিল।

জিপটা প্রাঙ্গণে ঢুকল এবং নেমে এলেন সরডিহি থানার অফিসার-ইন-চার্জ

গণেশ ত্রিবেদী। একা এসেছেন। কর্নেলকে সম্ভাষণ করে হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাল্লো ওল্ড বস! আপনি দেখছি সত্যিই পূর্বজন্মে শকুন ছিলেন! কাল বিকেলে দর্শন দিয়ে যখন বললেন, 'স্রেফ সাইট-সিইং' তখনও অবশ্য মনে মনে একটু সন্দেহ জাগেনি, এমন নয়। কারণ সত্যিই যদি এটা নিছক সাইট-সিইং হয়, তাহলে কেন থানায় গিয়ে নিজের উপস্থিতি জানাতে এত ব্যগ্র? তার মানে, ইউ নিড পোলিস হেল্প! ওক্কে? তারপর দেখছি সত্যি একটা বডি পড়ল।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন—মর্গের রিপোর্টে বলছে কি শান্তকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল?

ত্রিবেদীকে লনে বসতে একটা চেয়ার এনে দিয়েছে রামলাল। বসে বললেন—হ্যাঁ। মারাত্মক নিকোটিন ইঞ্জেকশান করা হয়েছিল। ডান বাহুতে সোয়েটার আর শার্টের ভেতর ইঞ্জেকশানের চিহ্ন রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন—আপনার ধারণা খুনী আগেই খাটের তলায় অপেক্ষা করছিল। জানালা খুলে পাইপ বেয়ে পালিয়ে যায়। তাই কি?

কর্নেল ইজি চেয়ারে বসে বললেন—ঠিক তাই। রাত্রে দীনগোপালবাবুর বাড়ি পাহারা দিতে সবাই নিচে ছিলেন। তখন নিশ্চয় ওপরে শান্তর ঘরের দরজা খোলা ছিল। শুনলাম রাত্রে ওঁরা সবাই একটু সন্দেহজনক শব্দেই বাইরে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। সেই সময় কোনও সুযোগে খুনী ওপরে উঠে গিয়েছিল।

—কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্য করুন। ত্রিবেদী বললেন—শান্তবাবুকে কড়িকাঠে ঝোলানো একজনের পক্ষে সম্ভব কি না! ওঁর যা বডি ওয়েট, তাতে ওঁকে ওভাবে লটকাতে হলে রীতিমতো একজন 'অরণ্যদেব' হওয়া দরকার। একা কারুর পক্ষে এটা কি সম্ভব?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন—হুঁ, সেটা আমি ভেবেছি, খুনীর একজন সঙ্গী থাকা অবশ্যই দরকার।

—তাহলে দুজন লোক শান্তবাবুর ঘরে লুকিয়ে ছিল!

কর্নেল একটু হাসলেন।—আপাতদৃষ্টে খুনীর একজন সহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাচ্ছে না, এটুকু বলা চলে।

ত্রিবেদী চোখে ঝিলিক তুলে রহস্যের ভঙ্গিতে বললেন—যাই হোক, আমার একটুখানি ব্যাকগ্রাউন্ড জানা দরকার।

—কিসের?

পাণ্ডের কাছে শুনলাম, দীনগোপালবাবুর ভাইঝি নীতা দেবীই আপনার এখানে আগমনের কারণ। 'বাসস্টপে একটা লোক'—এপিসোডটাও জানা জরুরি।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—এই এপিসোড সম্পর্কে মিঃ পাণ্ডে আপনাকে যতটুকু বলেছেন, আমিও ততটুকু জানি। আর নীতার ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। বাসস্টপে একটা লোক ওর জ্যাঠামশাইয়ের বিপদের কথা বলায় খুব ভয় পেয়ে আমার কাছে যায় এবং সাহায্য চায়। তবে...

তাঁকে আবার চুপ করতে দেখে ত্রিবেদী ব্যস্তভাবে বললেন—বলুন কর্নেল!

—গত বছর অক্টোবরে যখন এখানে বেড়াতে আসি, তখন আপনি কথায় কথায় সরডিহি রাজবাড়ির মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি যাওয়ার ঘটনা বলেছিলেন।

ত্রিবেদী একটু অবাক হয়ে বললেন—হ্যাঁ! কিন্তু সে তো প্রায় দু'বছর আগের কেস। এখনও সে বিগ্রহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওপর মহলের ধারণা, আর তা উদ্ধারের আশা নেই। কারণ মূর্তিটা নিরেট সোনার এবং প্রায় হাফ কিলোগ্রাম ওজন। চোর যাকে বেচেছিল, সে হয়তো গলিয়ে ফেলেছে সোনাটা। গয়না হয়ে কত সুন্দরীর শরীরে ঝলমল করছে এতোদিনে। কিন্তু এ কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

ত্রিবেদী হাসতে লাগলেন। কর্নেল বললেন—বিগ্রহটি ছিল নৃসিংহদেবের। তাই না?

—হ্যাঁ, কিন্তু...

অর্থাৎ মুখটা সিংহের, শরীর মানুষের।

ত্রিবেদী হতাশ ভঙ্গিতে দুহাত চিতিয়ে বললেন—ওঃ কর্নেল! আপনি বড্ড হেঁয়ালি করতে ভালবাসেন।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন—নীতা আমার সম্পর্কে ওর কোনও এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছিল। তো ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওর জ্যাঠামশাইয়ের কী বিপদ হতে পারে সে ভাবছে? যেন ও একটা অদ্ভুত কথা বলল। দু'বছর আগে...

ত্রিবেদী কান করে শুনছিলেন। বললেন—বলুন প্লিজ! থামবেন না।

—দু'বছর আগে, ওর জ্যাঠামশাইয়ের কাছে নীতা বেড়াতে এসেছিল। সঙ্গে ওর স্বামী প্রসূনও ছিল। হনিমুন বলাই উচিত। তো একদিন নীতা আর প্রসূন সন্ধ্যা অব্দি বাইরে ঘুরে এসে সোজা ওপরে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে যায় প্রসূন পেছনে ছিল, নীতা সামনে। নীতা লক্ষ্য করে, ওর জ্যাঠামশাই একটা ছোট্ট ধাতুমূর্তি হাতে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী যেন পরীক্ষা করছেন। নীতার পায়ের শব্দেই উনি মূর্তিটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র এক পলকের দেখা। তবে নীতা দেখেছিল, মূর্তিটার মুখ মানুষের নয়—কোনও জন্তুর। তাছাড়া ওর বিশ্বাস, মূর্তিটা সোনার।

ত্রিবেদী সোজা হয়ে বসে বললেন—মাই গুডনেস! তাহলে তো এখনই অ্যাকশন নিতে হয় কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন।—একটু ধৈর্য ধরতে হবে মিঃ ত্রিবেদী।

এইসময় বাংলোর চৌকিদার রামলাল কফি নিয়ে এল। কফির পেয়ালার চুমুক দিয়ে ত্রিবেদী তার উদ্দেশে বললেন—ঠিক হ্যায়! তুম আপনা কামমে যাও।

রামলাল ঝটপট সরে গেল। সরডিহি থানার দুঁদে অফিসার-ইন-চার্জের ভয়ে

ইঁদুরও গর্তে সেঁধিয়ে থাকে, তো সে এক নাদান আদমি। সে বাংলোর পেছন দিকটায় চলে গেল।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—রামলাল খুব সজ্জন লোক, মিঃ ত্রিবেদী! আমার ধারণা, আপনাদের থানার রেকর্ডে ওর নামে কিছু নেই।

—বলা যায় না! ত্রিবেদী হাসছিলেন।—সরডিহি এলাকায় সজ্জন মানুষ বলতে জানতাম একমাত্র ওই বাঙালি ভদ্রলোককে। কিন্তু আপনার কাছে যা শুনলাম, মনে হচ্ছে, এখানকার মাটিতেই ক্রাইমের জীবাণু থকথক করছে।

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—রাজবাড়ির নৃসিংহ-মূর্তি দীনগোপালবাবু নিজে চুরি নাও করতে পারেন। দৈবাৎ তাঁর হাতে আসাও স্বাভাবিক।

—তাহলে উনি তখনই থানায় জমা দিলেন না কেন?

—এখানেই রহস্যের একটা জট রয়ে গেছে, মিঃ ত্রিবেদী! কর্নেল আস্তে বললেন।—নীতাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলেছিল কি না। নীতা বলল, জ্যাঠামশাই রাগী মানুষ। কাজেই যে জিনিসটা উনি ওদের সাড়া পেয়েই লুকিয়ে ফেলেছেন, তা নিয়ে কথা তুলতে ভরসা পায়নি। তখন আমি বললাম, মূর্তিটা কি প্রসূনও দেখতে পেয়েছিল? না পেলে নীতা কি ওটার কথা পরে তাকে বলেছিল? নীতা জোর গলায় বলল, সে প্রসূনকে ব্যাপারটা বলেনি। আর তার বিশ্বাস, প্রসূন কিছু দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয় সে নীতার কাছে কথাটা তুলত। যাই হোক! নীতা বলল, তার জ্যাঠামশাই নাস্তিক মানুষ। অথচ তাঁর কাছে একটা সোনার ঠাকুর—সেটা উনি লুকিয়ে রেখেছেন! এ থেকে নীতার বিশ্বাস, ওই সোনার ঠাকুরের জন্যই ওর জ্যাঠামশাইয়ের কোনও বিপদ হতে পারে।

ত্রিবেদী সিগারেট জ্বেলে বললেন—বুঝলাম। কিন্তু বাসস্টপের লোকটাই বা কে? মনে হচ্ছে, সে দীনগোপালবাবুর হিতৈষী এবং যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে যে, সোনার ঠাকুরের জন্য ওঁর বিপদ ঘটতে চলেছে এত দিনে। এই তো?

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

—কিন্তু এত দিনে কেন?

—খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন।—এটাই স্টার্টিং পয়েন্ট, মিঃ ত্রিবেদী।

ত্রিবেদী উত্তেজিতভাবে বললেন—আমি কিন্তু দীনগোপালবাবুকে সোজাসুজি চার্জ করার পক্ষপাতী।

—উনি অস্বীকার করবেন।

—নীতাদেবী সাক্ষী। উনি আপনাকে বলেছেন।

কর্নেল হাসলেন। দীনগোপালবাবু অস্বীকার করলে শুধু মুখের সাক্ষ্যে কিছু

হবে না, মিঃ ত্রিবেদী—অন্তত যতক্ষণ না সোনার মূর্তিটা ওঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে পারছেন।

—ওকে! ওঁর বাড়ি তন্নতন্ন করে সার্চ করব।

—দীনগোপালবাবুকে তত নির্বোধ বলে মনে হয়নি আমার। একটু ধৈর্য ধরা দরকার মিঃ ত্রিবেদী। কর্নেল নিভন্ত চুরুট জ্বেলে ফের বললেন তার আগে একটা জরুরি কাজ করতে হবে। আশা করি, আপনার সাহায্য পাব।

—বলুন।

—সম্প্রতি, মানে গত কয়েকদিনের মধ্যে সরডিহির বাজারে কোনও দোকান থেকে ডোরাকাটা মাফলার বিক্রি হয়েছে কি না...

বাধা দিয়ে ত্রিবেদী বললেন—অসম্ভব। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার ব্যাপার। অসংখ্য দোকান আছে, অসংখ্য মাফলার বিক্রি হয়েছে সিজনের মুখে।

—হলুদ রঙের ওপর কালো ডোরা। এই বিশেষত্বের জন্য দোকানদারদের মনে পড়া স্বাভাবিক।

ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে বললেন—আপনি শান্তবাবুর গলায় আটকানো মাফলারটার কথাই বলছেন তো?

—হ্যাঁ, মিঃ ত্রিবেদী।

—বেশ তা! ওটা নিয়ে দোকানে দোকানে খুঁজলেই হলো।

—না মিঃ ত্রিবেদী। তাতে দোকানদাররা ভয় পেয়ে যাবে। বিশেষ করে পুলিশকে দেখেই।

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন—ঠিক বলেছেন। সাদা পোশাকেই কেউ খোঁজ নেবে। সে ব্যবস্থা এখনই করছি গিয়ে।

—কিন্তু হাতে ওই মাফলার নিয়ে নয়।

ত্রিবেদী হাসলেন।—না, না কখনই নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতে লাভটা কী হবে? ধরা যাক, এমন একটা মাফলার মাত্র একজনেরই দোকানে ছিল এবং একজনই কিনেছে। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হবে সেটাই শান্তবাবুর গলায় আটকানো হয়েছিল? এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোড়া!

কর্নেল আস্তে বললেন—ঠিক। কিন্তু ছুড়ে দেখতেই বা ক্ষতি কী, যদি লক্ষ্যভেদ করা যায়?

—ওকে ওল্ড বস! গণেশ ত্রিবেদী এবার একটু গম্ভীর হলেন—এস ডি পি ও সায়েবের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করে আসছি। উনি বলছিলেন শান্তবাবুর মার্ডার কেসটা সি আই ডি-র হাতে ছেড়ে দিতে। কারণ শান্তবাবুর সঙ্গে একসময় এলাকার একটা গুপ্ত বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ছিল। আই বি-র ফাইল দেখে উনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। দলটা ডাকাতি করে বেড়াত একসময়। ডাকাতি করা টাকায় চোরা অস্ত্র-শস্ত্র কেনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুলিশ দলটা খতম করে দিয়েছে। শুধু শান্তবাবু গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন পরে কলকাতায়

কোনো রাজনৈতিক মুরুব্বি ধরে সেট্‌ল্ করে ফেলেন। সরডিহি থানায় নির্দেশ আসে, ডোন্ট বদার অ্যাবাউট হিম। এখন কথা হলো, সি আই ডি-র হাতে কেসটা যাক—অন্তত আপনাকে এখানে দেখার পর আমার এতে প্রচণ্ড আপত্তি। এস ডি পি ও সায়েবকে আপনার কথা তখনই বললাম। উনি আপনার কথা জানেন। তবে মুখোমুখি আলাপ হয়নি বললেন।

—কী নাম বলুন তো?

—রণবীর রায়। বাঙালি। তবে এই বিহারেই জন্ম। পাটনায় ওঁদের বাড়ি।

—হুঁ, কী বললেন রণবীরবাবু?

ত্রিবেদী একটু হাসলেন।—আর কী বলবেন, ঠিক আছে। তাহলে যা ভাল বোঝেন, করুন। আমি যা ভাল বুঝেছি, করতে চাইছি, কর্নেল।

—বলুন।

—আমি নিজের হাতে নিয়েছি কেসটা। ও বাড়ির প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডেকে জেরা করব? স্টেটমেন্ট সই করিয়ে নেব। আপনিও উপস্থিত থাকবেন এবং আমার ইচ্ছা, আপনিও জেরা করবেন।

কর্নেল একটু ভেবে বললেন—বেশ তো! শুধু একটা শর্ত।

—শর্ত? কী শর্ত বলুন তো?

—দীনগোপালবাবুকে সেই সোনার ঠাকুর সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করবেন না। আমিও করব না। অবশ্য নীতাকে ও ব্যাপারে জেরা করতে পারেন।

আর কাউকে?

—করতে পারেন। সে আপনার ইচ্ছা। তবে সাবধান! দীনগোপালবাবুর সঙ্গে সোনার ঠাকুরের সম্পর্কের কথা এড়িয়ে থাকাই উচিত হবে। বরং সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারেন, কেউ কোনও সোনার ঠাকুর দেখেছেন কি না!

ত্রিবেদী ঘড়ি দেখে বললেন—তিনটে বাজে। শান্তর বডি দাহ করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা, বরং আগামীকাল সকালে—ধরুন, নটা নাগাদ দীনগোপালবাবুর বাড়িতেই সরেজমিন তদন্ত শুরু করবো। আপন ওই সময় ওখানে পৌঁছবেন। বাই দা বাই, যে ঘরে শান্তবাবু খুন হয়েছেন, সেই ঘরটা মিঃ পাণ্ডে গিয়ে লক করেছেন এবং দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। নীচেও কয়েকজন কনস্টেবল রাখা হয়েছে। কোনও রিস্ক নিতে চাইনে আমি।

বলে গণেশ ত্রিবেদী উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেল তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উঠলেন। ত্রিবেদী জিপে স্টার্ট দিলে হঠাৎ বললেন—আচ্ছা মিঃ ত্রিবেদী, সরডিহিতে কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে কাউকে ঘুরতে দেখেছেন কখনও?

—ত্রিবেদী স্টার্ট বন্ধ করে অবাক হয়ে বললেন—কেন বলুন তো?

—আমি একজনকে কালো অ্যালসেশিয়ান নিয়ে ঘুরতে দেখেছি মাঠে।

—ত্রিবেদী ফের স্টার্ট দিয়ে জোরে মাথা নাড়লেন।—নাঃ! আমি আড়াই

বছর সরডিহিতে আছি। এ পর্যন্ত তেমন কাউকে দেখিনি। কুকুর অবশ্য অনেকেই পোষেন। তবে কালো অ্যালসেশিয়ান? নাঃ—দেখিনি।

—তাহলে বাইরের লোক। বেড়াতে এসেছে কুকুর নিয়ে।

ত্রিবেদী অট্টহাসি হাসলেন।—এ কেসের সঙ্গে লিংক থাকলে বলুন, তাকে খুঁজে বের করি।

কর্নেল হাত তুলে বললেন—না, না। কালো কুকুর আমার চক্ষুশূল। তাই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। কালো নাকি অশুভের প্রতীক। আমার কিছু কিছু কুসংস্কার আছে আর কী!

ত্রিবেদীর জিপ জোরে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে রামলাল বাংলোর পেছন থেকে এসে গেট বন্ধ করল।

কর্নেল বললেন—রামলাল, আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হলে রাতের খাবারটা আমার ঘরের টেবিলে রেখে দিও।

রামলাল মাথা দোলাল। এই খেয়ালি বুড়ো কর্নেল সায়েবকে সে গতবছরই ভালভাবে চিনে ফেলেছে। তবে এটা ঠিকই যে, সে কথামতো রাতের খাবার টেবিলে রেখে গিয়ে শুয়ে পড়বে না। যতক্ষণ না কর্নেলসায়েব ফেরেন, সে জেগে থাকবে এবং গরম খাবারই পরিবেশন করবে।

সকালে যে উঁচু ঢিবির মতো জমিতে লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখেছিলেন কর্নেল, সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পড়ন্ত সূর্য প্রায় সামনা সামনি, তাই বাইনোকুলার ব্যবহার করার সমস্যা। নিচু জমিতে, যেখানে ছাইরঙা মাফলার পড়ে থাকতে দেখেছিলেন সকালে, সেখানে পৌঁছুতেই কোথাও চাপা গর্জন শুনতে পেলেন। কুকুরেরই গরগর গর্জন। থমকে দাঁড়ালেন। উঁচু ঝোপঝাড়ে ভরা ঢিবি জমি থেকে কালো কুকুরটা তাঁর দিকে তেড়ে আসছে।

ঝটপট জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজের আবিষ্কৃত প্রখ্যাত 'ফর্মুলা-টোয়েন্টির' কৌটোটি বের করলেন। প্রজাপতি ধরা জালের স্টিকের মাথায় কৌটোটা আটকানোর ব্যবস্থা আছে। কৌটো আটকে ছিপি খুলে স্টিকটা উঁচিয়ে ধরলেন কর্নেল।

কুকুরটা আসছিল দক্ষিণ থেকে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে। ঝোপের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রকাণ্ড কুকুর। কুচকুচে কালো রঙ। লকলকে জিভ। গলার ভেতর বাঘের গজরানি যেন।

কর্নেল স্টিক উঁচিয়ে দু-তিন পা এগোতেই কুকুরটা কুঁই-কুঁই শব্দ করে ঘুরল। তারপর লেজ গুটিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হলো।

কর্নেল আপন মনে হাসলেন। কুকুর জব্দ-করা এই বিদঘুটে গন্ধের লোশন আরও পাঁচটা টুকিটাকি জিনিসের মতোই তাঁর সঙ্গে থাকে, যখনই বাইরে কোথাও যান। কিন্তু সরডিহিতে এটা এত কাজে লাগবে, কল্পনাও করেননি।

কৌটোটা জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে এবার দ্রুত মাফলারটা পড়ে আছে কি না খুঁজে নিলেন। নেই। কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর, সেটাই স্বাভাবিক।

পরমুহূর্তে একটা অনুভূতি তাঁকে চমকে দিল—ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত বোধ, যেন কেউ উঁচুতে ঝোপের ভেতর দিকে তাঁকে লক্ষ্য করছে, এবং এক সেকেন্ডেরও হয়তো কম সময়ের জন্য কী একটা শব্দ শুনেছেন, এক লাফে বাঁদিকের একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে গিয়ে বসে পড়লেন—ঠিক বসে পড়া নয়, আছাড় খাওয়ার মতো পড়া। লম্বা চওড়া মানুষের এরকম ঝাঁপ দেওয়ায় মাটিতে ধপাস শব্দটা বেশ জোরালোই হলো।

সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা ঘ্যাস শব্দ হলো ডানদিকে, এখনই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘুরেই দেখলেন, নরম মাটিতে ঘাসের ভেতর একটা ভোজালি গড়নের ভারী ছোরার বাঁট কাত হয়ে আছে। কেউ প্রচণ্ড জোরে ওটা তাঁকে তাক করে ছুড়েছে। দেখামাত্র জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে ওপরের ঝোপের দিকে আন্দাজে গুলি ছুড়লেন। স্তব্ধতা চিড় খেল। লাল ঘুঘুর ঝাঁকটা কোথাও ছিল। ডানার শব্দ করে উড়ে গেল। কর্নেল নির্ভয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে রেখে বাঁ হাতে গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার চোখে রাখলেন। যে ছোরা ছুড়েছে, তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র কখনোই নেই।

কিন্তু ঝোপের লতাপাতা লেগে ঢেকে যাচ্ছে। সাহস করে এগিয়ে গেলেন। উঁচু ঢিবি জমিতে উঠে চারদিকে লোকটাকে খুঁজলেন। যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নেমে এসে ছোরাটা তুললেন। প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলাটা নরম মাটিতে আমূল বিঁধে গিয়েছিল। শিউরে উঠলেন কর্নেল। একটু হঠকারিতা হয়ে গেছে তাঁর দিক থেকে। আগে ভালভাবে চারদিক দেখে না নিয়ে নিচু জমিতে এসে দাঁড়ানো ঠিক হয়নি। সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে গেছেন। সামরিক জীবনে জঙ্গলে জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেওয়ার সময় এ ধরনের হামলার জন্য প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকার বোধটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটা কখনও কখনও কাজে লাগে। কোনো শব্দ বা আড়ালে কোনো উপস্থিতি বিপজ্জনক, নিমেষে টের পান। আবার সেই বোধ আজ কাজে লাগল। কিন্তু এই অতর্কিত উত্তেজনার জন্য যতটা নয়, ছোরাটা তাঁকে ফুঁড়ে ফেলত ভেবেই শরীর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

কর্নেল পেছনকার খোলামেলা ন্যাড়া উঁচু জমিতে উঠে একটা পাথরে বসে পড়লেন। রিভলবারটা জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে বাঁ হাতে ধরা ছোরাটার দিকে তাকালেন। মাঠে শেষ বিকেলে উত্তরের বাতাস যথেষ্ট হিম। কিন্তু তাঁর শরীরে অস্বাভাবিক একটু উষ্ণতা। হাত কাঁপছে। মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁকে দুর্বল করে না। নির্বুদ্ধিতাজনিত ঝুঁকি নিয়েছিলেন ভেবেই এই আড়ষ্টতা আর কম্পন।

ভাবছিলেন, কেন এমন একটা ঝুঁকি নিতে এসেছিলেন—জেনেশুনেও! বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশ কি অবশেষে তাঁকে পেয়ে বসেছে এবং এই ঘটনা তারই সংকেত? কাঁপা-কাঁপা হাতে ছোরাটা পাশে রেখে চুরুট ধরালেন কর্নেল। একটু পরে ধাতস্থ হলেন। কিন্তু শরীর অবশ মনে হচ্ছিল।

সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের নিচে নেমে গেল ক্রমশ। ধূসর আলো ঘনিয়ে এল। অন্যমনস্কতায় অথবা স্বভাববশে বাইনোকুলারে নিচু টিলাটা দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন। পিপুল গাছের তলায় কালো কুকুর আর সেই লোকটা—তাঁর ব্যর্থ আততায়ী দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব প্রায় সিকি কিলোমিটার। তাঁকে দেখছে লোকটা! আবছা হয়ে আসছে তার মুখ। কুকুরটা পেছনকার দু-ঠ্যাং মুড়ে আছে। ক্রমশ গাছের তলার কালো পাথরটার সঙ্গে কুকুরটাও একাকার হয়ে গেল।...

—কে ওখানে?

দীনগোপাল গেটের কাছে ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাড়ির বারান্দার মাথায় যে বালবটা জ্বলছে, তার আলো গেট অব্দি পৌঁছোতে ফিকে হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। গলার স্বরে আজ তীব্র চমক ছিল। কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন—আমি দীনগোপালবাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—ডিটেকটিভ মশাই! দীনগোপাল আস্তে বললেন। তবু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস কথাটাতে।—তা আমার কাছে কী? আপনার মক্কেল এখন নেই। শ্মশানে যান, দেখা হবে।

লনের শেষে বাড়ির সামনেকার বারান্দায় একটা বেঞ্চে একদঙ্গল কনস্টেবল বসে আছে দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল গেটের কাছে গিয়ে বললেন—আপনি কি এখানে কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন দীনগোপালবাবু?

দীনগোপাল রুক্ষ মেজাজে বললেন—আমার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। কারুর অপেক্ষা করছি কি না এ প্রশ্ন অর্থহীন।

—আপনি শ্মশানে যাননি দেখে একটু অবাক লাগছে দীনগোপালবাবু!

—অবাক হবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমাকে উত্যক্ত করার অধিকার আপনার নেই।

কর্নেল একটু হাসলেন।—উত্যক্ত করতে আমি আসিনি দীনগোপালবাবু। আমি আপনার হিতৈষী।

—আমার কোনো হিতৈষীর দরকার নেই।

—নেই! তার কারণ আপনি ভালই জানেন যে, আপনার প্রাণের ক্ষতি কেউ করবে না।

দীনগোপাল এক পা এগিয়ে বললেন—তার মানে?

—তার মানে, আপনাকে মেরে ফেললে কারুর কোনও লাভ তো হবেই না, ভীষণ ক্ষতি হবে।

—এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝলাম না।

—সোনার ঠাকুর ফিরে পাওয়ার আর সম্ভাবনাই থাকবে না।

দীনগোপাল কয়েক মুহূর্তের জন্য পাষাণমূর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর গলা ঝেড়ে আস্তে বললেন—সোনার ঠাকুর? কী অদ্ভুত কথা!

—দীনগোপালবাবু! আপনি এবার বুঝতে পেরেছেন কি শান্তকে কেন মরতে হল?

দীনগোপালবাবু আবার পাষাণমূর্তি হয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন—আমি অন্তর্যামী নই। নিছক অঙ্ক কষে দুইয়ে দুইয়ে চার করেছি মাত্র। সরডিহির রাজবাড়ির সোনার ঠাকুর তারই গুপ্ত বিপ্লবী দল চুরি করেছিল, এটা স্পষ্ট। শান্ত সেটা আপনার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। দৈবাৎ আপনি সেটা দেখতে পান। শান্তকে বাঁচানোর জন্যই আপনি সেটা লুকিয়ে ফেলেন। শান্ত খুঁজে না পেয়ে দলের কাছে কৈফিয়তের ভয়ে পালিয়ে যায়। সম্ভবত তারপরই নীতা তার স্বামীকে নিয়ে হনিমুনে আসে এখানে। এদিকে আপনি ঠিক করতে পারছিলেন না, মূর্তিটা কী করবেন। ফেরত দিতে গেলে ঝুঁকি ছিল। আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হতো। দীনগোপালবাবু, আপনি এমন মানুষ, যিনি সত্য গোপন করার চাইতে মিথ্যা বলাটাই অন্যায় মনে করেন। অতএব আপনি সত্যকে গোপন রেখে আসছেন এতদিন। কিন্তু আপনার এই নীতিবোধের ফলেই শান্তকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হলো।

দীনগোপাল হঠাৎ ঘুরে হনহন করে চলে গেলেন বাড়ির দিকে।

কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় নেমে এলেন। সেচ বাংলোর দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুটা চলার পর পুরসভা এলাকায় রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো পড়েছে রাস্তায়। রাস্তাটা ডাইনে ঘুরে সরডিহি বাজার ও বসতির ভেতর ঢুকে গেছে। বাঁদিকে সংকীর্ণ ঢালু রাস্তাটা গেছে সেচ বাংলোর দিকে। এ রাস্তার আলো নেই। দুধারে ঘন গাছপালা। প্যান্টের এক পকেটে রুমালে জড়ানো ছোরাটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন কর্নেল। সহসা তীব্রভাবে একটা গা শিরশির করা বিভীষিকা কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাঁকে নাড়া দিল। অন্য পকেট থেকে দ্রুত টর্চ বের করে জ্বাললেন।

দুধারে আলো ফেলতে ফেলতে হাঁটছিলেন কর্নেল। এমন কি রিভলবারটাও বের করে তৈরি রেখেছেন, মৃত্যুর বিভীষিকা পিছু ছাড়ছে না যেন।

রামলালকে বারান্দার আলোয় দেখা গেল চড়াইয়ে ওঠার মুখে। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে চাদর জড়ানো। আজ শীতটা একটু জোরালো হয়েছে। এখানে এভাবেই হঠাৎ শীত রাতারাতি বেড়ে যায়।

গেটে পৌঁছুলে সে উঠে দাঁড়াল। সেলাম দিয়ে এগিয়ে এল। বলল কলকাত্তাসে এক বাঙ্গালি সাহাবলোক আয়া স্যার। তিসরি নাম্বারমে উনহিকা

আগাড়ি বুকিং থা। মালুম, ডি ই সাহাবকা কৈ জানপহচান আদমি। পুছতা এক নাম্বারমে কৌন আয়া? হাম বোলা, কর্নেল সাহাব।

কর্নেল দেখলেন পশ্চিমের তিন নম্বরের দরজা বন্ধ। পূবে জলাধারের দিকটায় এক নম্বর। কর্নেল তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন! দরজা থেকে রামলাল মৃদু হেসে বলল—কফিউফি পিনা জরুরি হ্যায় স্যার। আজ বহৎ ঠাণ্ডা মালুম হোতা!

—হাঁ রামলাল। কফি! বলে কর্নেল দরজা ভেজিয়ে দিলেন এবং পকেট থেকে রুমালে জড়ানো ছোরাটা বের করে বালিশের তলায় রেখে দিলেন। ইজিচেয়ারে বসে সাদা দাড়ি খামচে ধরে চোখ বুজলেন অভ্যাসমতো।

একটু পরে দরজায় টোকা দিয়ে রামলাল সাড়া দিল—কফি স্যার।

—আও রামলাল। বলে কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।

রামলাল পাশের টেবিলে কফির পেয়ালা রেখে বেরিয়ে যাবার সময় দরজা আগের মতো ভেজিয়ে দিচ্ছিল। কর্নেল বললেন—রহ্‌নে দো!

রামলাল চলে যাওয়ার মিনিট দুই পরে খোলা দরজার সামনে একজন স্মার্ট চেহারার যুবক এসে দাঁড়াল। পরনে ঘিয়ে রঙের জ্যাকেট আর জিনস। একটু হেসে নমস্কার করে বলল—আসতে পারি?

কর্নেল এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন—আসুন!

যুবকটি ঘরে ঢুকে একটু তফাতে একটা চেয়ারে বসে বলল—আপনিই কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? আমার সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে এখানে মুখোমুখি পরিচয় হবে কল্পনাও করিনি। চৌকিদারের কাছে বর্ণনা শুনেই চিনতে দেরি হয়নি, আপনি তিনিই।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—জামাইবাবু, মানে আমার দিদি কেয়ার স্বামী অমর চৌধুরী লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ডিটেকটিভ ডিপার্টের ইন্সপেক্টর। তাঁর কাছে আপনার সাংঘাতিক সব গল্প শুনেছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন তাহলে অমরবাবুর শ্যালক আপনি?

—আমার নাম প্রসূন মজুমদার।

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।—আশা করি দীনগোপালবাবুর ভাইঝি শ্রীমতী নীতার...

প্রসূন এক নিঃশ্বাসে এবং কাঁচুমাচু হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—ঠিক ধরেছেন। আমিই সেই হতভাগা।

বলার ভঙ্গিতে কর্নেল হেসে ফেললেন। পরক্ষণে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—নীতার সঙ্গে তো আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে?

—পুরোটা হয়নি, আইনত। প্রসূনও একটু গম্ভীর হলো—লিগাল সেপারেশনের পিরিয়ড চলছে।

—আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলেছি বলে এ বৃদ্ধকে ক্ষমা করবেন। তবে প্রশ্নটা জরুরি ছিল।

—প্লিজ কর্নেল আমাকে তুমি বলুন।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—হুঁ। তুমি আমরবাবুর শ্যালক। স্বচ্ছন্দে তুমি বলা চলে।

—এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও তোলা যায়। প্রসূন শুকনো হাসল। ফের বলল—সেই সঙ্গে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে সামনে পেয়ে আশাও জাগে।

—পুনর্মিলনের?

প্রসূন আস্তে বলল—নীতা বড় অবুঝ মেয়ে। দোষের মধ্যে আমি একটু-আধটু ড্রিংক করি। বেহিসেবি খরচ করে ফেলি। কিন্তু ও আমাকে ভুল বুঝেছিল। অকারণ আমাকে সন্দেহ করত, আমার চরিত্র নাকি ভাল নয়। একেবারে মিথ্যা।

—হুঁ! তো তুমি কি নীতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই এখানে এসেছ?

—তাই। শেষ চেষ্টা বলতে পারেন। লিগাল সেপারেশন পিরিয়ড শেষ হতে আর এক মাস বাকি।

—তুমি কীভাবে জানলে নীতা সরডিহিতে এসেছে?

—আমার দিদি কেয়ার সঙ্গে নীতার খানিকটা বন্ধুত্ব আছে। বয়সের তফাত মেয়েদের মধ্যে বন্ধুতার বাধা নয়, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন।

—তোমার দিদি তোমাকে বলেছে নীতা সরডিহি গেছে?

—কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছিল। মানে, জামাইবাবুর সঙ্গে নীতাদের ব্যাপারে কী আলোচনা করছিল। তখন...

—কেন গেছে বলেনি তোমার দিদি?

প্রসূন একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—না তো! তাছাড়া নীতা তো মাঝে মাঝে আসে এখানে।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—তুমি শান্তকে নিশ্চয় চেনো? চিনি। উগ্রপন্থী রাজনীতি করে। জামাইবাবু ওকে বহুবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—তুমি জানো গত রাতে ওর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে শান্ত খুন হয়েছে?

প্রসূন ভীষণ চমকে উঠল।—শান্ত খুন হয়েছে? শান্ত...সর্বনাশ!

বলেই সে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন শুধু। একটু পরে বাইরে গিয়ে দেখলেন, তিন নম্বর ঘরের দরজায় তালা আঁটা।...

॥ পাঁচ ॥

কর্নেল রাত প্রায় বারোটা অব্দি জেগে ছিলেন! প্রসূনের ফেরার অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ অমন করে তার চলে যাওয়ায় অবাক হয়েছিলেন। ফলে

প্রসূনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রহস্যটার একটা ক্ষীণ সূত্র যে আছে, বুঝতে পেরেছিলেন। রামলাল তিন নম্বরের বাঙালি সায়েবের জন্য এগারোটা অব্দি অপেক্ষা করে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল—আজিব আদমি! হাম ক্যা করে বোলিয়ে স্যার? সুবেমে নেহি লোটে তো থানেমে খবর কিয়েগা। কর্নেল শুধু বলেছিলেন—ঠিক হ্যায়, রামলাল।

এই বাংলোয় টেলিফোন একটা আছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে ডেড। রামলাল এক্সচেঞ্জে খবর দিয়েছে। এখনও কেউ সারাতে আসেনি। সরডিহিতে নাকি সবই এরকম ঢিমেতেতালা চালে চলে। রামলালের মতে, খোদ ডি ই সাহেব এসে পড়লে ফোনটা চালু হবার সম্ভাবনা আছে। নইলে ডেড থেকেই যাবে।

অভ্যাসমতো ভোর ছটায় কর্নেল প্রাতঃভ্রমণে বেরুলেন। বাইরে গাঢ় কুয়াশা। আজ ঠাণ্ডাটাও জোরালো। গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে হনুমান টুপি পরে বেরুতে হলো। প্রজাপতির নাগাল পাওয়া এ আবহাওয়ায় অসম্ভব। তাই প্রজাপতি ধরা জালটি সঙ্গে নেননি। তবে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা নিয়েছিলেন। রিভলবারও। কাল থেকে অতর্কিত মৃত্যু-বিভীষিকাটি মনে যখন তখন গভীর জলের মাছের মতো ঘাই মারছে।

দীনগোপালের বাড়ির নিচের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমে টিলা পাহাড়গুলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কর্নেল। ছোট্ট সোঁতার ওপর ব্রিজে পৌঁছে দক্ষিণ-পশ্চিমে সেই পিপুল গাছ-শীর্ষক টিলাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কুয়াশায় সব একাকার।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর টিলাটির দিকে এগিয়ে চললেন। পিপুল গাছের তলার প্রায় চৌকো বেদির গড়ন কালো পাথরটিকে গতকাল সকালে লক্ষ্য করেছেন। গতকাল দিনশেষে তারই ওপর বসে থাকতে দেখেছেন নিজের আততায়ীকে, যার একটা কালো অ্যালসেশিয়ান আছে।

পাথরটি কেন যেন তাঁর মনোযোগ দাবি করছে। সেটির গড়নে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি? পরীক্ষা করার তাগিদেই এখন খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখতে দেখতে টিলায় উঠছিলেন কর্নেল। কুয়াশার সঙ্গে স্তব্ধতাও এই পারিপার্শ্বিককে নিঝুম করে রেখেছে। তবে এমন স্তব্ধতা তাঁর জন্য এখন নিরাপদ।

পিপুলতলায় পৌঁছে চোখে পড়ল, বেদির পেছনে একরাশ ছাই। কেউ আগুন জ্বেলে তাপ নিয়েছে—সম্ভবত গতকাল সন্ধ্যার দিকেই। কারণ, কিনারায় মাকড়সার জাল এবং তাতে শিশিরের ফোঁটা জমেছে। সেই আততায়ী ছাড়া আর কে হতে পারে? অবশ্য সর্বক্ষেত্রে দুয়ে দুয়ে চার হয় না।

টিলার ওপাশটা কিছুটা খাড়া। ন্যাড়া পাথর উঁচিয়ে আছে। ডাইনে বাঁয়ে ঢালুতে ইতস্তত কয়েকটি ঝোপ। দেখে নেওয়ার পর চৌকো পাথরটার দিকে মনোযোগ দিলেন কর্নেল।

হুঁ পাথরটার গড়ন স্বাভাবিক নয়। তার মানে, কোনো সময়ে মানুষের হাত

পড়েছিল এর গায়ে—এটা আসলে একটা বেদিই বটে। তাছাড়া যে আঁক-জোকগুলোও প্রাকৃতিক সৃষ্টি ভেবেছিলেন, সেগুলো মানুষেরই তৈরি। অজস্র স্বস্তিকা চিহ্ন খোদাই করা হয়েছিল একসময়। প্রকৃতির আঘাতে ক্ষয়ে গিয়ে বিশৃংখলা রেখায় পরিণত হয়েছে।

তাহলে বলা যায়, এটা কোনও পূজা-বেদি, অথবা কোনও দেব-দেবীর থান। এলাকার আদিবাসী বা তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় মানুষদের পুজো-আচ্চা হতো একসময়। যে কারণে হোক, পরিত্যক্ত হয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গতকাল সকালে দীনগোপাল তাঁকে এখানে দেখে প্রায় তেড়ে এসেছিলেন! কেন? দীনগোপাল কি তাঁর উপস্থিতি অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন এখানে? কী আছে এখানে?

পাথরটা ঠাণ্ডা হিম। তবে কর্নেলের হাতে দস্তানা পরা আছে। ঠেলে নড়ানোর চেষ্টা করে বুঝলেন অসম্ভব। তারপর ফের ছাইগুলোর কাছে গেলেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল, ছাইয়ের পাশে ইঞ্চিটাক এক টুকরো কাপড়জাতীয় জিনিস। সেটা দৈবাৎ পোড়েনি। হাতে নিয়েই কর্নেল বুঝতে পারলেন, এটা সেই ছাইরঙা মাফলারেরই অংশ। সম্ভবত কালো কুকুরের মালিক এখানে বসে মাফলারটা নিশ্চিহ্ন করেছে। 'সম্ভবত' এই কথাটিই মাথায় আসছে। কারণ কে এ কাজ করেছে কর্নেল বস্তুত দ্যাখেননি। ধরা যাক, সে-ই খুনী। কিন্তু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। মর্গের পরীক্ষায় খুন যখন সাব্যস্ত হতোই, তখন শান্তর মাফলার নিয়ে খুনীর এত মাথাব্যথা কিসের? সে কি এত নির্বোধ যে, ভেবেছিল পোস্টমর্টেম ছাড়াই শান্তর লাশ দাহ করা হবে? দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে শান্তর মাফলারটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে যাওয়া এবং মাঠে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার মধ্যে আপাতদৃষ্টে মনে হয়, শান্তর আত্মহত্যাই সে সাব্যস্ত করাতে চেয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টেমের কথা অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল তার। যে কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অন্তত সরডিহির মতো জায়গায় পুলিশকে না জানিয়ে দাহ করার ঝুঁকি আছে। সে ঝুঁকি দীনগোপালবাবু বা তাঁর ভাইপো-ভাইঝিরা নেবে কেন? তাছাড়া অমন হুঁশিয়ার মানুষ প্রভাতরঞ্জন সেখানে উপস্থিত!

বিশেষ করে নীতা কর্নেলকে এখানে ডেকে এনেছে। অন্যেরা যদি বা পারিবারিক কেলেঙ্কারি ঢাকতে, ধরা যাক, পুলিশকে না জানিয়ে দাহ করে ফেলতেন নীতা চুপ করে থাকত না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দুটো পয়েন্ট কর্নেলের মাথায় ভেসে এল।

এক ঃ শান্তর 'আত্মহত্যা'র খবর পুলিশকে প্রথম কে জানিয়েছিল, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন।

দুই ঃ শান্তর মাফলার নিয়ে আসা কি শান্তর আত্মহত্যা আপাতদৃষ্টে সাব্যস্ত করা, নাকি অন্য কোনও গূঢ় কারণ ছিল—যখন শান্তর লাশের পোস্টমর্টেমের চান্স প্রায় ৯৯ শতাংশ?

পুবে সরডিহির মাথায় কুয়াশার ভেতর আবছা লালচে গোলা—সূর্য উঠে গেছে। লালচে রঙটা দ্রুত সোনালী হয়ে যাচ্ছে। আশে-পাশে কুয়াশা অনেক পাতলা হয়েছে। কর্নেল চুরুট জ্বাললেন। কিন্তু কাশি পেল। খালি পেটে চুরুট টানেন না কখনও। আসলে কেসের ওই পয়েন্ট দুটো তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তারপর মনে পড়ে গিয়েছিল প্রসূনের অন্তর্ধানের কথাটি। কোনও বিপদ ঘটেনি তো তার! শান্তর খুনের খবর শুনেই অমন উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে নিপাত্তা রইল সে। কর্নেল বেদিতে ঘষে চুরুটটি নিভিয়ে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পরে হলদেটে রোদ ফুটলে বাইনোকুলারে লাল ঘুঘুর ঝাঁক খুঁজতে থাকলেন। সেই উঁচু ডাঙাজমিটার ওপর থেকে বাইনোকুলার বাঁ দিকে ঘোরাতেই রাস্তার উত্তরে সমান্তরালে ক্যানেলের পাড়ে দুটি মূর্তি আবছা ভেসে উঠল। এদিকে পেছন-ফেরা দুটি মানুষ। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে।

চমকে উঠেছিলেন কর্নেল। ঠোঁটে হাসিও ফুটেছিল। কিন্তু তারা এদিকে ঘুরে একটা টাঁড় জমির ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে আসতে থাকল, তখন নিরাশ হলেন। প্রসূন ও নীতা নয়, দীনগোপালের আরেক ভাইপো অরুণ আর তার স্ত্রী ঝুমা।

অরুণ খুব হাত নেড়ে স্ত্রীকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। ঝুমা যেন বুঝতে চাইছে না, এরকম হাবভাব। কর্নেল বাইনোকুলার নামালেন চোখ থেকে। কোনও দম্পতিকে এভাবে দূর থেকে লক্ষ্য করাটা অশালীন। বিশেষ করে যখন ওরা টিলার মাথায় কর্নেলকে দেখতে পাবে, কী ভাববে?

ওরা রাস্তা ধরে পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। ব্রিজের ওপর এসে গেলে কর্নেল টিলা থেকে নিম্নগামী হলেন। সোঁতার পাড় ধরে রাস্তার কাছে পৌঁছে একটু কাশলেন। অমনি অরুণ ভীষণ চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তাঁর দিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। কর্নেল বুঝলেন, তাঁকে ওরা চিনতে পারছে না। পারবার কথাও নয়। ওভারকোট, তার ওপর হনুমান টুপিতে সাদা দাড়ি পুরোটাই ঢাকা।

কিন্তু কাছাকাছি গেলে ঝুমা একটু হেসে ফেলল। কর্নেলও সহাস্যে বললেন—গুড মর্নিং!

অরুণ তখনও চিনতে পারেনি। গোমড়া মুখে আস্তে বলল—মর্নিং!

ঝুমা বলল—ও আপনাকে চিনতে পারছে না। আবার, এতক্ষণ আমাকেই উল্টো বোঝাবার চেষ্টা করছিল আমি মানুষ চিনি না! বুঝুন কর্নেল কেমন অবজার্ভার আমার এই হাজব্যান্ড ভদ্রলোক!

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ জিভ কেটে হাত বাড়িয়ে বলল—হ্যালো কর্নেল! সরি—ভেরি সরি। একেবারে চেনা যায় না এ বেশে! বলে কর্নেলের দস্তানা পরা হাতে হাত দিয়ে সে ঝাঁকুনি দিয়ে হৃদ্যতা প্রকাশ করল।

কর্নেল বললেন—ঝুমাদেবী, আশা করি এই বাইনোকুলারটি দেখেই চিনতে পেরেছেন এ বৃদ্ধকে?

—হ্যাঁ। ঝুমা মাথা দোলাল। তবে নীতার মতো আমাকেও তুমি না বললে রাগ করব।

অরুণ বলল—আমাকেও।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আমি সব মানুষের নৈকট্যপ্রার্থী।

—কী বললেন, কী বললেন? অরুণ ছেলেমানুষি ভঙ্গি করে বলল—নৈকট্যপ্রার্থী! দারুণ একটা কথা। মুখস্থ রাখার মতো। নৈ-ক-ট্য-প্রা-র্থী! তারপর সে ঝুমার দিকে ঘুরল।—সরি! ঝুমা. ইংরেজিতে এর সেন্সটা একটু ক্লিয়ার করে দেবে?

ঝুমা চোখ পাকিয়ে বলল—তুমি ইংলিশম্যান নাকি? বাঙালির ঘরে জন্ম—বাংলা বোঝো না!

অরুণ জোকারের ভঙ্গি করল।—ট্যাশ! ট্যাশ হয়ে গেছি ক'বছর ওয়েস্টে থেকে। তবে এক মিনিট!...হুঁ, কথাটার মানে, হি লাইকস টু কাম নিয়ারার। ইজ ইট?

ঝুমা ধমকের সুরে বলল—খুব হয়েছে। কর্নেল বুঝি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন?

কর্নেল একটু মাথা নেড়ে বললেন—একটা কথা। গত রাতে আশা করি কোনও গণ্ডগোল হয়নি। পুলিশ পাহারা ছিল যখন, তখন কোনো

অরুণ কথা কেড়ে বলল—হয়েছে। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, নীতু ইজ লাকি—জোর বেঁচে গেছে। তবে পুলিশ-টুলিশ বলছেন, বোগাস! মামাবাবু ভাগ্যিস ছিলেন. তাই নীতু বেঁচে গেল।

ঝুমা কী বলতে যাচ্ছিল. কর্নেল দ্রুত বললেন—প্রসূন?

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চমকে কর্নেলের দিকে তাকাল। তারপর ঝুমা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলল—হ্যাঁ. নীতার বর। আপনি চেনেন ওকে?

—চিনি। কর্নেল বললেন—প্রসূন ও-বাড়ি গিয়েছিল? তারপর?

অরুণ উত্তেজিতভাবে বলল—যাওয়া মানে কী? হামলা! মামাবাবুর চোখে পড়ে যায় সময়মতো। ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। মামাবাবুকে আপনি চেনেন না, কর্নেল!

ঝুমা বলল—আঃ! তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো সবতাতে। কর্নেল, আমি বলছি কী হয়েছিল। প্রসূনের কী উদ্দেশ্য ছিল জানি না তবে ও কাল রাত্তিতে ও-বাড়ি ঢুকেছিল। গেটে তালাবন্ধ ছিল। ও পেছনদিককার ভাঙা পাঁচিলের বেড়া দিয়ে ঢুকছিল। সেই সময় মামাবাবু দোতলা থেকে ওকে দেখতে পান। তারপর চুপিচুপি নেমে গিয়ে ওঁত পেতেছিলেন। প্রসূন ঢোকামাত্র মামাবাবু ওকে ধরে ফেলেন। সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার।

কর্নেল গুম হয়ে বললেন তাহলে সে এখন থানার লক-আপে?

অরুণ বলল—হ্যাঁ! এবার তো বোঝা গেল হু ইজ দা মার্ডারার।

—কীভাবে বোঝা গেল?

অরুণ রুষ্ট মুখে হাসবার চেষ্টা করল।—পিওর ম্যাথ, কর্নেল!

—বুঝলাম না।

ঝুমা, বুঝিয়ে দাও। আমার রাগ হলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

ঝুমা বলল—নীতুর সঙ্গে প্রসূনের বিয়ের পেছনে ছিল শান্ত। শান্ত প্রসূনের বন্ধু ছিল। শান্ত পলিটিক্স করত শুনেছেন হয়তো? আপনি ডিটেকটিভ। আপনি নিশ্চয় জানেন শান্ত কী ছিল!

অরুণ মন্তব্য করল—এক্সট্রিমিস্ট! বাংলায় কী যেন বলে, ঝুমা?

—উগ্রপন্থী। ঝুমা শ্বাস ছেড়ে বলল।—তো শান্ত মাঝে মাঝে নীতুর ফ্ল্যাটে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। প্রসূনের সঙ্গে কী ব্যাপারে যোগাযোগও যেন ছিল। নীতা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না।

—প্রসূন ব্যাটাচ্ছেলেও পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্ট! অরুণ ফের মন্তব্য করল।

ঝুমা বলল—যাই হোক, নীতুর সঙ্গে সেই সূত্রে প্রসূনের আলাপ। শেষে বিয়ে।

কর্নেল বললেন—বুঝলাম। কিন্তু প্রসূন কেন শান্তকে খুন করবে?

অরুণ বলল—পলিটিকাল রাইভ্যালরি হতে পারে। আবার প্রসূনের এও ধারণা হতে পারে, নীতুর সঙ্গে তার ডিভোর্সের পেছনে শান্তর প্রভোকেশন—বাংলায় কী বলে ঝুমা?

—প্ররোচনা। কর্নেল বললেন।

ঝুমা বলল—অসম্ভব নয়। নীতুর কাছেই শুনেছিলাম একসময় ওর বরের সঙ্গে শান্তর নাকি কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল বহুদিন।

অরুণ সায় দিয়ে বলল—হুঁ মনে পড়ছে। তুমিই বলেছিলে কথাটা।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—ফেরা যাক। তোমরা ঘোরো বরং।

বলেই আর পিছু ফিরলেন না। হনহন করে এগিয়ে চললেন সরডিহির দিকে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের মনে হলো, শান্তর অপমৃত্যুর শোকের একটুও ছায়া যেন নেই দম্পতির মধ্যে। ঝুমার মধ্যে নাও পড়তে পারে। অরুণ তো শান্তর খুড়তুতো ভাই। তার আচরণে এতটুকু শোকের ছাপ নেই!

অবশ্য এও সম্ভব, শান্তর জীবনরীতি বা কাজকর্মে তার আত্মীয়রা কেউ খুশি ছিল না। হয়তো বিব্রতই বোধ করত। শান্তর মৃত্যুতে তাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল সকালে দীনগোপালের বাড়িতে পুলিশ দেখে যখন ওখানে ঢুকেছিলেন, কোনও চোখে জলের ছাপ দেখেননি। শুধু...

কী আশ্চর্য! থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন কর্নেল। শুধু ওই ঝুমাই খুব কেঁদেছে মনে হচ্ছিল।

আর নীতা? তার মুখে শোকের ছাপ ঘন ছিল। কিন্তু চোখ দুটো শুকনোই ছিল। কর্নেলকে দেখামাত্র তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেটা

স্বাভাবিকই। কিন্তু কাল সকালে দীনগোপালের ঘরে যখন ঝুমাকে লক্ষ্য করেন কর্নেল, এমন কি কফি নিয়ে ঢোকার সময়ও—তাকে ভীষণ বিহ্বল দেখাচ্ছিল।

এখন অন্য ঝুমাকে দেখে এলেন। সেই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। তাকে শান্ত আর স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। প্রসূনকে পুলিশ লক-আপে ঢুকিয়েছে বলেই কি?

অথবা নিজেরই চিন্তা-ভাবনার বেড়াজালে জড়িয়ে অকারণ সবকিছুকে সন্দেহজনক গণ্য করে ফেলছেন তিনি নিজেই। কর্নেল ঝুমার ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেললেন মন থেকে। আবার হাঁটতে থাকলেন।...

বাংলোয় পুলিশের জিপ, তারপর মিঃ পাণ্ডেকে দেখতে পেয়েছিলেন কর্নেল। লনে ঢুকলে পাণ্ডে উত্তেজিতভাবে কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছেন, কর্নেল দ্রুত বললেন—জানি মিঃ পাণ্ডে! শ্রীমতী নীতার হাজব্যান্ড প্রসূন ধরা পড়েছে গতরাতে।

পাণ্ডে থমকে গেলেন প্রথমে। তারপর হাসলেন।—এক্স-হাজব্যান্ড বলুন?

—এখনও ডিভোর্স আইনত সেটল্‌ড্ হয়নি। লিগ্যাল সেপারেশনের পিরিয়ড চলছে, মিঃ পাণ্ডে! কাজেই আইনত ভুল বলিনি।

লনে রোদে বেতের চেয়ার-টেবিল পেতে রেখেছে রামলাল। শিগগির কফি এনে হাজির করল। পাণ্ডে কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—রামলাল আমাকে খানিকটা বলেছে এবং তার ধারণা, আপনার সঙ্গে তিন নম্বরের বাঙ্গালি সায়েব, মানে প্রসূন মজুমদারের পরিচয় আছে। তার খোঁজেই আপনি বেরিয়েছেন, এও রামলালের বিশ্বাস।

রামলাল বিনীতভাবে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। একটু হেসে বলল—ওহি শোচা, স্যার!

কর্নেল বললেন—তুম আভি ব্রেকফাস্ট বানাও, রামলাল! ফির বাহার যানে পড়ে? পাণ্ডেজিকে লিয়ে ভি!

পাণ্ডে হাত নেড়ে বললেন—নেহি রামলাল! কর্নেল, প্লিজ! এইমাত্র গিন্নির হাতের তৈরি পুরি একপেট খেয়ে বেরিয়েছি।

কর্নেল সেই পোড়ামুখো চুরুটটি জ্বেলে বললেন—আপনাদের আসামীর কথা শোনা যাক।

পাণ্ডে হাসলেন—সে আপনার কথা বলেছে। তাই ও সি সায়েব আপনার কাছে আমাকে পাঠালেন। আপনাকে নিয়ে দীনগোপালবাবুর বাড়ি যেতেও বলেছেন—কাল আপনার সঙ্গে ওঁর কথাও হয়েছে। ওখানে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন—হুঁ, কী বলেছে প্রসূন আমার সম্পর্কে?

—আপনি ওকে চেনেন। আর...

—আর?

—কলকাতার সি আই ডি ইন্সপেক্টর মিঃ অমর চৌধুরী নাকি তার জামাইবাবু। রাত্রেই এই ব্যাপারটা কলকাতায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে। মিঃ চৌধুরী আজ দুপুরের মধ্যে এসে পড়বেন শ্যালককে সনাক্ত করতে। হ্যাঁ, প্রসূন মজুমদার নামে তাঁর এক বাউণ্ডুলে শ্যালক আছে এবং দীনগোপালবাবুর ভাইঝি নীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, সেও ঠিক।

—তাহলে?

পাণ্ডে গম্ভীর হয়ে বললেন—রাত্রে চুপিচুপি ও-বাড়ি ঢোকার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত দিতে পারেনি প্রসূন মজুমদার।

—কী বলছে সে?

—আপনার কাছে শান্তবাবুর খুনের খবর শুনেই নাকি ওর মাথার ঠিক ছিল না। কারণ শান্তবাবু নাকি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বেশ! কিন্তু তাই বলে চুপিচুপি ভাঙা দেয়ালের বেড়া গলিয়ে ঢোকার কী উদ্দেশ্য? জেরায় জেরবার করেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। খালি এক কথা, মাথার ঠিক ছিল না। ধোলাই দিলে হয়তো বেরুত। কিন্তু সি আই ডি ইন্সপেক্টরের শ্যালক। দেখা যাক, যদি মিঃ চৌধুরী এসে বলেন, এটি তাঁর জাল শ্যালক, তাহলেই থার্ড ডিগ্রি চড়াব।

পাণ্ডে পুলিশি উল্লাসে খুব হাসতে থাকলেন। কর্নেল বাংলোর তিন নম্বর ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রসূনের ঘরটা আশা করি সার্চ করেছেন?

পাণ্ডে মুখে হাসি রেখেই ভুরু কুঁচকে বললেন—শুনেছি আপনি নানা বিষয়ে জিনিয়াস। তবে আমাদের পুলিশ-মস্তিষ্কে কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সম্ভব, কর্নেল।

—সরি! আমি শুধু জানতে চাইছিলাম কিছু পাওয়া গেছে নাকি।

—একটা স্যুটকেস পাওয়া গেছে মাত্র। থানায় নিয়ে গিয়ে খোলা হবে। চাবি আসামীর কাছে আছে। তাই এখনই তালা ভাঙার জন্য ব্যস্ত হইনি। হ্যাঁ, স্যুটকেসটা জিপে আছে। দেখতে চান কি?

পাণ্ডের বলার ভঙ্গিতে ঈষৎ কৌতুক ছিল। কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে পাণ্ডে বললেন—আপনাকে ন'টার মধ্যে দীনগোপালবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে থানায় ফিরব। ও সি সায়েব বলেছেন, ন'টার আগেই ও-বাড়ি যাবেন। একটু কথা বলা দরকার ওঁর সঙ্গে। এখন পৌনে ন'টা প্রায়। রামলাল!

কিচেন থেকে সাড়া এল-স্যার!

—কর্নেলসাবকা ব্রেকফাস্ট? জলদি কিও রামলাল!

—আভি যাতা হুজৌর!

ব্রেকফাস্টের ট্রে সাজিয়ে রামলাল এসে গেল। পাণ্ডে বললেন—আপনি চালিয়ে যান। ততক্ষণ আমি ড্যামের পাখি দেখি। আপনার বাইনোকুলারটা দিন, প্লিজ!

কর্নেল বাইনোকুলার দিলে পাণ্ডে লনের শেষ প্রান্তে পূর্বদিকের নিচু পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওদিকেই জলাধার। পাখি দেখতে থাকলেন পুলিশ অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বাইনোকুলার ফেরত দিয়ে বললেন—জিনিসটা অসাধারণ! আমি এবার একটা বাইনোকুলার কিনবই। পুলিশের কাজের জন্য সরকার কেন যে বাইনোকুলার দেন না, বুঝি না। সামরিক বাহিনীর বেলায় কিন্তু সরকার একেবারে দিলদরিয়া। কর্নেলের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে ততক্ষণে। আবার কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু পাণ্ডের তাড়ায় সেটা হলো না। ঘরে গিয়ে ওভারকোট-হনুমান টুপি খুলে টাক-ঢাকা একটা নীলচে টুপি পরে বেরিয়ে এলেন।

পাণ্ডে ততক্ষণে জিপের কাছে চলে গেছেন। কর্নেল দেখলেন, পাণ্ডে জিপের ভেতর ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলন কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর সোজা হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—কর্নেল! কর্নেল! আশ্চর্য তো!

কর্নেল এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—কী ব্যাপার মিঃ পাণ্ডে?

পাণ্ডে পাগলের মতো জিপের ভেতর, পেছনের দিকটায় এবং চারদিকে কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনও কাত হয়ে চক্কর দিচ্ছিলেন কর্নেল কাছে গিয়ে তাঁকে দু কাঁধ ধরে মুখোমুখি দাঁড় করালেন। আস্তে বললেন—প্রসূনের স্যুটকেসটা খুঁজছেন কি?

পাণ্ডে নড়ে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—অসম্ভব! আমি ওটা সিটের পাশে রেখেছিলাম।

—নেই?

—নাঃ। কোথাও নেই! বলে পাণ্ডে হাঁক ছাড়লেন—রামলাল! ইধার আও শুয়ারকা বাচ্চা!

রামলাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কর্নেল বললেন—রামলাল কিছু জানে না মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডে হুংকার ছেড়ে বললেন—আলবাৎ জানে! ও ব্যাটাই হাফিজ করে দিয়েছে কোন ফাঁকে।

—না মিঃ পাণ্ডে! এক মিনিট। বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন। প্রথমে দক্ষিণে সরডিহি বসতি এলাকা, তারপর পশ্চিমে ঘুরলেন।—ওই দেখুন মিঃ পাণ্ডে! প্রসূনের স্যুটকেস নিয়ে একটা কালো কুকুর এইমাত্র ক্যানেলের পাড় থেকে নামছে।

পাণ্ডের হাতে বাইনোকুলারটি তুলে দিলেন। পাণ্ডে তাঁর নির্দেশমতো দেখতে দেখতে বারকতক 'কই কই কোথায়' বলার পর লাফিয়ে উঠলেন।—মাই গুডনেস! কী অদ্ভুত!

কর্নেলের হাতে ফিতে-পরানো দূরবীন যন্ত্রটি ফেরত দিয়েই জিপে ঢুকলেন পাণ্ডে। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল এবার যন্ত্রটিতে চোখ রাখলেন।

এইমাত্র রাস্তা পেরিয়ে কালো কুকুরটি দক্ষিণের মাঠে পৌঁছুল। তারপরই তার মালিককে দেখা গেল। দৌড়ুচ্ছে। নিচু জমিতে আড়াল হয়ে গেল দুজনেই। একটু পরে আবার এক পলকের জন্য দেখা গেল তাদের। এবার লোকটার হাতে স্যুটকেসটা। পাণ্ডের জিপ কাছাকাছি পৌঁছোনোর অনেক আগে ওরা নিপাত্তা হয়ে গেল টিলাগুলোর কাছে।

কর্নেল ঘুরে ডাকলেন—রামলাল!

রামলাল কাঁপা কাঁপা গলায় সাড়া দিল—হুজৌর!

—তোমার কোনও ভয় নেই, রামলাল! ডরো মৎ!

—জি হুজৌর!

—আচ্ছা রামলাল, সরডিহিমে কিসিকা কালা বিলায়তি কুত্তা হ্যায়?

—নেহি তো! রামলাল বিব্রত মুখে বলল।—হামনে নেহি দেখা স্যার! হাম যব ছোটা থা, রাজাসাবকা কোঠিমে বিলায়তি কুত্তা দেখা। লেকিন কালা কুত্তা! নেহি হুজৌর! আপকা কিরিয়া..রামজিকা কিরিয়া...বজরঙ্গবলীজিকা কিরিয়া হুজৌর!...

সরডিহি থানার অফিসার-ইন-চার্জ গণেশনারায়ণ ত্রিবেদী সেকেন্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডের তুলনায় স্থিতধী প্রকৃতির মানুষ। কর্নেলের কাছে ঘটনাটি 'লালবাড়ি' অর্থাৎ দীনগোপালের বাড়ির লনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শোনার পর প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন—পাণ্ডেজিকে নিয়ে সমস্যা হলো, সবকিছুতে তর সয় না। রুটিন জব হিসেবেই কাজে নামেন এবং কত শিগগির কাজটা শেষ করে ফেলা যায়, সেদিকেই মনোযোগ দেন বেশি। যেমন দেখুন, এই শান্তবাবুর কেসটা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, দৈবাৎ আপনি গিয়ে না পড়লে উনি স্যুইসাইড কেস ধরে নিয়েই যত শিগগির পারা যায় নিষ্পত্তি করে ফেলতেন। এদিকে আমাদের হাসপাতালের মর্গের বা অবস্থা। ডোমই বডি কাটাকুটি করে। নেহাৎ আইনমাফিক একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাকে রুমাল গুঁজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ডাক্তারবাবুও তাই। স্পেশাল কেস এবং চাপ না থাকলে কদাচ নিজের হাতে ছুরি ধরবেন না। যাই হোক, কালো কুকুর ব্যাপারটা কেসটাকে ভীষণ ঘুলিয়ে দিল দেখছি। প্রসূন মজুমদারের স্যুটকেসে কী এমন ছিল যে ওটা হাফিজ করে নিয়ে গেল? হুঁ, কালো কুকুরের মালিকের সঙ্গে প্রসূনের ভাল চেনাজানা আছে। আগে থেকে বলা ছিল আর কী! প্রসূন কোনোভাবে বিপদে পড়লে তার সঙ্গী স্যুটকেসটা যেন হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কী বলেন কর্নেল?

ত্রিবেদী দেখলেন কর্নেল যেন তাঁর কথা শুনছেন না। চোখে বাইনোকুলার এবং নিশ্চয় পক্ষীদর্শন। একটু বিরক্ত হলেন মনে মনে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছিলাম, কর্নেল!

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে হাসলেন।—শুনেছি। তবে প্রশ্নের জবাব জানা নেই বলে চুপচাপ পাণ্ডেজির অবস্থা দেখছিলাম।

—কী অবস্থা ওঁর?

—দুরবস্থা বলা চলে। হন্যে হয়ে ফিরে আসছেন জিপের দিকে।

লনে দুটো চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে নব। ত্রিবেদী এতক্ষণে বসলেন। অনেকটা তফাতে বাড়ির পুবে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে দীপ্তেন্দু, প্রভাতরঞ্জন, ঝুমা ও অরুণ চাপা গলায় কথা বলছে। দীনগোপাল তাঁর ঘরে। নব কফি আনল এতক্ষণে।

সে চলে যাচ্ছে, কর্নেল ডাকলেন—শোনো!

নব ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—চিনি লাগবে স্যার?

—না। কর্নেল তাকে তীক্ষ্নদৃষ্টে দেখতে দেখতে বললেন।—তোমার নাম কী যেন?

—আজ্ঞে নব দাস।

—তুমি কত বছর এ বাড়িতে কাজ করছ?

—তা আজ্ঞে বিশ-বাইশ বছর হবে প্রায়।

—হুঁ, তুমিই শান্তবাবুর ঘরের দরজা ভেঙেছিলে শুনলাম?

নব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—আজ্ঞে স্যার...ডাকাডাকি করে সাড়া পাচ্ছিলাম না, তাই..

—তোমার কোনও সন্দেহ হয়েছিল নিশ্চয়?

—হয়েছিল স্যার! অতক্ষণ ধরে ডাকছি, জোরে ধাক্কা দিচ্ছি দরজায়। সাড়া পাচ্ছি না।

কর্নেল সে কথায় আমল না দিয়ে বললেন—কেন সন্দেহ হয়েছিল, বলতে ভয় কী নব?

নব আরও ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল—ওই তো বললাম স্যার! ধাক্কা দিয়ে...

—তুমি শান্তবাবুকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিতে দৌড়েছিলে?

—হ্যাঁ স্যার!

—কেন?

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে তীব্রতা ছিল। নব একটু ইতস্তত করার পর গলার ভেতর বলল—শান্ত দাদাবাবু পরশু রাত্তিরে আসার পর আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, আমার কোনও বিপদ হলে যেন পুলিশে তক্ষুণি খবর দিই।

ত্রিবেদী একটু চটে গিয়ে বললেন—তার মানে, শান্তবাবু টের পেয়েছিলেন তাঁর বিপদ ঘটতে পারে! আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি বুদ্ধুর মতো এ-কথা চাপা দিয়েছ! বলে বুকপকেট থেকে নোটবই বের করলেন।—কর্নেল! এখানেই শুরু করা যাক। শুভস্য শীঘ্রম্!

কর্নেল বললেন—নব, তুমি কখনও কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখেছ?

নবর মুখের চমক স্পষ্ট দেখা গেল। ঢোক গিলে বলল—দেখেছি স্যার!

—কোথায় দেখেছ?

—দিনকতক আগে ওদিকের পাঁচিলে বেড়া গলিয়ে ঢুকছিল। নব বাড়ির পেছনে দক্ষিণ দিকটা আঙুল তুলে দেখাল।—আমি বল্লম নিয়ে ছুটে গেলাম। সাংঘাতিক কুকুর স্যার! খোঁচা খেয়ে তবে পালিয়ে গেল। কর্তামশাই তখন ছিলেন না। ফিরে এলে বললাম।

—কী বললেন উনি?

—কিছু তো বললেন না।

—আচ্ছা নব, তুমি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেছ?

হঠাৎ এ প্রশ্নে নব হকচকিয়ে গেল।—সোনার ঠাকুর স্যার? কে—কেন স্যার?

—আহা, দেখেছ কি না বলো!

নব অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—না তো স্যার! চোখে কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি।

—কী শুনেছ?

—রাজবাড়ির মন্দিরে নাকি সোনার ঠাকুর ছিল। চুরি হয়েছিল সেটা, তাও শুনেছি।

—পরশু রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন তোমার দাদাবাবুরা। তখন তুমি কোথায় ছিলে?

নব কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করল।—খামোকা হইচই! আসলে মামাবাবুমশাই বরাবর এরকম জানেন স্যার? তিলকে তাল করেন। তবে হ্যাঁ, ওঁর গায়ে জোর আছে বটে। অরুণ দাদাবাবুর মতো তগড়াই লোককে কুপোকাৎ করে ফেলা চাট্টিখানা কথা নয়।

ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—শুনেছি। কর্নেল, এবার আমি ওকে একটু বাজিয়ে দেখি।

কর্নেল বললেন—এক মিনিট। নব, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, পরশু রাত্তিরে বাড়ি পাহারার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

নব ঝটপট বলল—আমি আমার ঘরেই ছিলাম স্যার! আমার খামোকা শীতের রাত্তিরে ছোটাছুটি পোষায় না। তবে ঘুমোনোর কথা যদি বলেন, তার জো ছিল না। বাইরে ওই দাপাদাপি, এদিকে শান্ত দাদাবাবুর কথাটা মনে গেঁথে আছে—কাজেই ঘুম আসছিল না। সত্যি বলছি স্যার, সারাটা রাত্তির আমি জেগেই কাটিয়েছি। ভোরবেলা কর্তামশাই বেরুলেন। তারপর বসার ঘরে মামাবাবু মশাইয়ের হাতের কাছ থেকে আমার বল্লমটা তুলে নিয়ে গিয়ে কোণে পুঁতে বেড়াতে বেরুলেন—সব দেখেছি। কর্তামশাই খুব রেগে গেছেন, জানেন?

এই সময় পাণ্ডে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে গেলেন। বললেন—পাত্তা পেলাম না কুকুরটার!

ত্রিবেদী বললেন—আপনি এখনই গিয়ে লক-আপে প্রসূন মজুমদারকে চার্জ করুন। স্যুটকেসে কী ছিল জানা দরকার। ডিটেলস লিস্ট তৈরি করে ওর সই করিয়ে নেবেন। তারপর কুকুর-টুকুর নিয়ে দেখা যাবে।

পাণ্ডে চলে গেলেন। ত্রিবেদী নবর দিকে তাকালে নব কুণ্ঠিত মুখে বলল—যদি হুকুম দেন একটা কথা বলি স্যার!

ত্রিবেদী চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন—কথা তুমি অনেক জানো। বলছ না। বলাচ্ছি থামো!

নব বেজায় ভড়কে করুণ মুখে বলল—আমি তো নিজে থেকেই সব বলছি স্যার! বলছি না?

কর্নেল বললেন—কী বলতে চাইছিলে নব?

নব গলা চেপে বলল—প্রসূনবাবু ভেতর-ভেতর সাংঘাতিক লোক।

—কীরকম সাংঘাতিক? ত্রিবেদী একটু আগ্রহ দেখালেন।—খুলে বলো. সাংঘাতিক মানে কী?

—নীতা দিদিমণির সঙ্গে বিয়ের পর সেবার এলেন। দিন পনেরো ছিলেন। তো প্রায় দেখতাম ওই বস্তিতে গিয়ে মহুয়া খাচ্ছেন। আর স্যার, সেই মঙ্গল সিং—মংলা ডাকু স্যার, তার সঙ্গে আড্ডা দিতেও দেখেছি।

কর্নেল ত্রিবেদীর দিকে তাকালেন। ত্রিবেদী বললেন—রাজ-মন্দিরের সোনার ঠাকুর চুরির কেসে প্রথমে মংলা ডাকুকেই পাকড়াও করেছিলাম। বলছি সে কথা। তবে কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে দ্য কেস ইজ সেটলড্। থ্যাংক য়ু নব! তোমাকে আর দরকার নেই। কেটে পড়ো।

নব চলে গেলে কর্নেল বললেন—কেস সেটলড্ মানে কী মিঃ ত্রিবেদী?

ত্রিবেদী হাসলেন। সিগারেট ধরিয়ে বললেন—প্রসূন মজুমদারের সঙ্গে মংলা ডাকুর যোগাযোগ ছিল। এদিকে প্রসূন শান্তবাবুর বন্ধু। শান্তবাবু এই এরিয়ার একটা গুপ্ত বিপ্লবী দলের লোক ছিলেন। তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? বলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।—বলুন, কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

কর্নেল বললেন—ধোঁয়া!

—সরি! ত্রিবেদী ধোঁয়া হাত দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে খুব হাসলেন।—হুঁ, আসল কথাটা বলা হয়নি। বললেন আপনিও বুঝবেন কেস ইজ সেটলড্। মংলা ডাকুকে সোনার ঠাকুর চুরির কেসে ধরে নিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল। মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বের করানো গিয়েছিল : 'সোনার ঠাকুর চুরি যাবে আমি জানতাম।' ব্যস! এটুকুই।

—তারপর?

ত্রিবেদী নির্বিকার মুখে বললেন—পুরো কথাটা জানবার জন্য থার্ড ডিগ্রি

চড়ানো হলো। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মারা যায় ব্যাটাচ্ছেলে। বুঝতেই পারছেন, এ ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে যা করা দরকার, তাই করা হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যুর রিপোর্ট তৈরি হলো। কাগজগুলো তা যথারীতি খেল এবং ফলাও করে ছাপল।

—এসব ক্ষেত্রে তো তদন্ত করার কথা! তাছাড়া তার বডি...

কথা কেড়ে ত্রিবেদী দ্রুত বললেন—এটা গত বর্ষার সময়কার ঘটনা। ওই ওয়াটার ড্যামে বডিটা ফেলে দেওয়া হয়। তখন ড্যামের জল ছাড়া হয়েছে। রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, বন্যা এলাকায় ডাকাতি করতে যাওয়ার সময় পুলিশ খবর পেয়ে নৌকা নিয়ে তাকে তাড়া করে। নৌযুদ্ধ বলতে পারেন।

ত্রিবেদী অট্টহাসি হাসলেন। কর্নেল বললেন—মঙ্গল সিংয়ের ছবি আপনার থানায় আছে কি?

—আছে। কেন?

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন নিছক কৌতূহল। তো 'কেস ইজ সেটলড' ব্যাপারটা কী?

ত্রিবেদীও গম্ভীর হলেন।—আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন না দেখে অবাক লাগছে। দীনগোপালবাবুর হাতে সোনার ঠাকুর দেখার কথা নীতা দেবী আপনাকে বলেছেন—আপনিই কাল বললেন। প্রসূনও নিশ্চয় দেখেছিল। নীতাকে বলেনি। ঠাকুর চুরি করেছিল শান্তবাবুর দল। শান্তবাবু সেটা এ বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের চোখে পড়ে উনি সেটা হাতান। শান্তবাবু মাল বেহাত হলে দলের ভয়ে কেটে পড়েন। মাইন্ড দ্যাট, এসবই আপনার থিওরি।

—বেশ। তারপর?

—প্রসূন শান্তবাবুর দলের লোক। সে এতদিন পরে শান্তকে খুন করে শোধ নিয়েছে—প্রতিহিংসা বলতে পারেন। আক্রোশ বলতে পারেন। তারপর তার প্ল্যান ছিল দীনগোপালবাবুকে খুন করা। গত রাতে সেই উদ্দেশ্যেই চুপিচুপি এ-বাড়ি ঢুকছিল। ঠিক যেভাবে চুপিচুপি ঢুকে শান্তবাবুর ঘরে খাটের তলায় লুকিয়েছিল।

—প্রসূন গতকাল সন্ধ্যায় এসেছে সরডিহিতে।

ত্রিবেদী জোর গলায় বললেন—কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন? সে আগেও এসে কোনও হোটেলে থাকতে পারে। তারপর সেচ বাংলোয় উঠে আপনার কাছে ভালমানুষ সেজেছে!

—কুকুরটা...

কর্নেলকে থামিয়ে ত্রিবেদী বললেন—কুকুরটা ট্রেন্ড অ্যানিম্যাল। তার মালিক প্রসূনেরই কোনও সহকারী। তার গ্যাংয়ের লোক। স্যুটকেসে নিশ্চয় কোনও ইনক্রিমিনেটিং ডকুমেন্টস ছিল। আড়াল থেকে সে প্রসূনকে গার্ড দিচ্ছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'পিওর ম্যাথ'। বিশুদ্ধ গণিত!

ভুরু কুঁচকে ত্রিবেদী বললেন—হোয়াট'স রং ইন ইট? গণ্ডগোলটা কেন? কলকাতায় সুযোগ ছিল।

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন—মনে হচ্ছে, বাসস্টপের লোকটা প্রসূনই। এভাবে দীনগোপালবাবুর আত্মীয়দের এখানে পাঠিয়ে সে তাদের ঘাড়েই দোষটা চাপাতে চেয়েছিল। জ্যাঠামশাইয়ের সম্পত্তি একটা ফ্যাক্টর। পুলিশ স্বভাবত এই অ্যাঙ্গেলে এগোবে ভেবেছিল প্রসূন।

—মামাবাবু প্রভাতরঞ্জনকেও এখানে পাঠাল কেন তাহলে? তার জানার কথা, এই ভদ্রলোক বিচক্ষণ মানুষ। এ বয়সেও এঁর গায়ের জোর আসাধারণ।

ত্রিবেদী হাসলেন।—সেজন্যই প্রভাতবাবুর উপস্থিতি দরকার মনে করেছে, যাতে তাঁকে আমরা প্রথমেই সন্দেহ করি।

কর্নেল নিভন্ত চুরুটটি জ্বেলে বললেন—আপনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। আপনি ভালই জানেন, সব ডেলিবারেট মার্ডার অর্থাৎ পরিকল্পিত খুনের প্রধানত দুটো মোটিভ থাকে। পার্সোনাল গেইন—ব্যক্তিগত লাভ বা কোনও স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। আপনি কি মনে করেন, প্রসূন এটুকুও বোঝে না যে প্রভাতবাবুর মোটিভ আপনারা খুঁজে পাবেন না কিংবা আইনত সাব্যস্তও করতে পারবেন না?

ত্রিবেদী ফের অট্টহাসি হাসলেন।—কর্নেল! এই এরিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা নেই। যাই হোক, আমাদের হাতে রেকর্ডস আছে। এটাই সুবিধে। প্রভাতবাবু ওদিকে ফিরোজাবাদে খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি করতেন। এখন অবশ্য আর রাজনীতি করেন না—অন্তত ওই এলাকায় করেন না। যখন করতেন, তখন শান্তবাবুদের দলের সঙ্গে ওঁদের প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। প্রসূনের মাথায় এই অ্যাঙ্গেলটাও কাজ করে থাকবে।

কর্নেল সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন—হুঁ, পিওর ম্যাথ।

গণেশ ত্রিবেদী ঘড়ি দেখে বললেন—যাই হোক, আসল কাজ শুরু করা যাক। দেরি হয়ে গেল বড্ড। তো প্রভাতবাবুর কথা যখন উঠল, ওঁকেই প্রথমে ডাকা যাক।...

॥ ছয় ॥

প্রভাতরঞ্জনের পরনে এখন পাঞ্জাবি, পাজামা, জহর কোট এবং আলতোভাবে একটা পুরু আলোয়ান জড়ানো গায়ে। দু'হাতে পশমি দস্তানা, পায়ে পশমি মোজা ও পামসু। মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। নমস্কার করে বসলেন। নব ইতিমধ্যে আর একটা চেয়ার এনে দিয়েছিল পুলিশের হুকুমে। একটু তফাতে দাঁড়িয়েও ছিল সে। ত্রিবেদীর ধমকে কেটে পড়ল। প্রভাতরঞ্জন হাসবার চেষ্টা করে বললেন—দীনুদার এই লোকটা একটু নাক-গলানে স্বভাবের। দেখলে বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু বেজায় চালাক। এতক্ষণ তো জেরা করলেন ওকে। কিছু বের করতে পারলেন পেট থেকে? পারবেন না। আমি ওকে হাড়েহাড়ে চিনি।

ত্রিবেদী একটু হেসে বললেন—আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত। চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হলো এতদিনে। আপনার নামে ফিরোজাবাদ এলাকায় বিস্তর গল্প চালু আছে।

—থাকা উচিত। প্রভাতরঞ্জন ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন।—আমি জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়েছিলাম। আপনারা ধরতে পারেননি। শেষে নিজেই ধরা দিয়েছিলাম। আমার পার্টি ক্ষমতায় এলে ছাড়াও পেয়েছিলাম। তবে মশাই, সত্যি বলছি—আর রাজনীতি ব্যাপারটা শিক্ষিত এবং আদর্শবাদীর জন্য নয়। এখন রাজনীতি হলো মতলববাজ আর রাজ্যের মস্তানদের আখড়া। কাজেই ইস্তফা দিয়ে দূরে সরে এসেছি। এ বয়সে নোংরা ঘাঁটতে পারব না।

প্রভাতরঞ্জনের মুখভাব বদলে বিকৃত হয়ে গেল। ত্রিবেদী বললেন—আপনি তো নীতাদেবীর মামা?

—হ্যাঁ। নীতার বাবা জয়গোপাল আমার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী ছিল। আমার বোনও রাজনীতি করত। আমিই ওদের পার্টি ম্যারেজের ব্যবস্থা করেছিলাম। ঘটকালিই বলতে পারেন।

—আপনার ঠিকানাটা, প্লিজ?

—লিখে নিন ভিলেজ অ্যান্ড পোস্ট অফিস ইন্ডিয়া! ইন্ডিয়া কেন, পৃথিবীই লিখুন!

প্রভাতরঞ্জনের মুখে কৌতুকের ছাপ। ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। বললেন—তামাশা করার জন্য আমি আসিনি প্রভাতবাবু! অফিসিয়ালি এসেছি। তাছাড়া এটা পোলিশ ইনভেস্টিগেশন।

প্রভাতরঞ্জন একটুও না দমে গিয়ে বললেন—যা সত্যি তাই বলছি। আমার কোনও বিশেষ ঠিকানা নেই। ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। সেই যে পদ্যে আছে : 'সব ঠাঁয়ে মোর ঘর আছে...'

—আপনি নিজেকে ভবঘুরে বলছেন?

—ঠিক টার্মটি হলো 'যাযাবর'।

ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনার জানা উচিত, ভবঘুরে বিষয়ে একটা আইন আছে।

—অবশ্যই জানি। গ্রেফতার করুন সেই আইনে। তারপর আপনাদের স্টেটের হোম দফতর, মানে পুলিশ যার অধীনে তার মিনিস্টার খবর পাবেন। তিনি আমার সঙ্গে একসময় ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। তারপর...

ত্রিবেদী সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে গিয়েছিলেন। কর্নেল দ্রুত বললেন—প্রভাতবাবু, আপাতত সরডিহি এসেছেন তো কলকাতা থেকেই?

—পথে আসুন। প্রভাতরঞ্জন অমায়িক হাসলেন।—হ্যাঁ, কলকাতা থেকেই। সে-ঠিকানা অবশ্য দিতে পারি। লিখুন কেয়ার অফ অনন্তকুমার হাটি, অ্যাডভোকেট এবং প্রাক্তন এম এল এ। ১২২/২ সি হরিনাথ আঢ্যি লেন, কলকাতা-৭৯। এখানে তেরাত্তির ছিলাম। তার আগেরটা বলি, লিখে নিন।

—থাক। আচ্ছা প্রভাতবাবু, আপনার বয়স কত **হলো?**

বাষট্টি বছর তিন মাস বারো দিন।

—আপনি সমস্ত ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার!

—অন্তত চেষ্টা করি পার্টিকুলার থাকতে।

—আপনার সবদিকে দৃষ্টি প্রখর। কারণ গতরাতে আপনিই প্রসূনকে বেড়া গলিয়ে ঢুকতে দেখেছিলেন।

—হুঁউ। প্রভাতরঞ্জন সগর্বে বললেন।—আমি কড়া নজর রেখেছিলাম। অন্ধকারেও আমি দেখতে পাই।

—কিন্তু কাল দিনের বেলাতেই কালো কুকুরটা আপনি দেখতে পাননি।

প্রভাতরঞ্জন তাচ্ছিল্য করে বললেন—আপনি ডিটেকটিভ। আপনার প্রশ্নের লক্ষ্য কী জানি না। তবে কুকুর ইজ কুকুর—স্বাভাবিক প্রাণী। সবখানেই ঘোরে। সন্দেহজনক কিছু গণ্য হলে তবে তো সেদিকে মানুষের চোখ পড়ে।

কর্নেল একটু হাসলেন।—বাসস্টপের লোকটাকেও চিনতে পারেননি!

প্রভাতরঞ্জন নড়ে বসলেন!—তখন পারিনি। এখন পারছি। শয়তান প্রসূনই ছদ্মবেশে...

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—তার উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে? এভাবে আপনাদের সরডিহিতে জড়ো করবে কেন?

—দীনুদা আমাদের সকলেরই প্রিয়জন। কাজেই ও জানে, দীনুদার বিপদের কথা বললে আমরা সবাই এখানে এসে জড়ো হবো। প্রভাতরঞ্জন জোর গলায় বললেন।—শান্তর সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল। ও শান্তকে খতম করতে চেয়েছিল আসলে। এখানে খতম করলে আমাদেরই কারও না কারও ঘাড়ে দায়টা পড়বে। দীপ্তেন্দুর মাথায় এটা এসেছে। একটু আগে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ও ঠিক ধরেছে। দীনুদার ভাইপোদের ঘাড়ে দায় পড়তই।

—কেন?

—দীনুদার সম্পত্তি।

—সোনার ঠাকুর?

মুহূর্তে প্রভাতরঞ্জনের উত্তেজনা নিভে গেল।—সোনার ঠাকুর! কথাটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে বেরিয়ে এল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ফের বললেন সোনার ঠাকুরটা কী?

—আপনি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেননি প্রভাতবাবু?

—দীনুদা নাস্তিক। এ বাড়িতে ঠাকুরই নেই তো সোনার ঠাকুর! কর্নেল প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন—আপনি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেননি?

এবার প্রভাতরঞ্জন একটু হাসলেন।—কোনও ক্লু পেয়েছেন বুঝি? ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো? আপনি ডিটেকটিভ। জীবনে এই প্রথম ডিটেকটিভ দেখলাম। তবে পলিটিক্যাল লাইফে পুলিশের আই বি বিস্তর দেখেছি। যাই

হোক, 'কালো কুকুর' এবং 'আড়ালের লোকটা' ছিল। এবার এল 'সোনার ঠাকুর'। বলে ত্রিবেদীর দিকে ঘুরলেন।—মিঃ ত্রিবেদী, এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের যা বয়স, তাতে—সরি! অভদ্রতা করতে চাইনে। আমার ভাগনীই এই গণ্ডগোলটি বাধিয়েছে। কিছু প্রশ্ন করার থাকলে আপনি করুন। ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলো শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

ত্রিবেদী নোট করছিলেন। মুখটা নিচু। মুখ তুললেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—আপনি কোন হোটেলে উঠেছিলেন প্রভাতবাবু?

—আপনার প্রশ্নের জবাব দেব না।

ত্রিবেদী বললেন—ঠিক আছে। প্রশ্নটা আমিই করছি।

—তাহলে জবাব দিচ্ছি। হোটেল পারিজাতে। রুম নম্বর ২২। দোতলায়।

ত্রিবেদী বললেন—আপমি মঙ্গল সিং নামে কাউকে চিনতেন? এই এরিয়া তো আপনার পরিচিত।

—হুঁউ। নাম শুনেছিলুম। কেন বলুন তো? প্রভাতরঞ্জন কর্নেলের দিকে কটাক্ষ করে ফের বললেন—ট্রেড ইউনিয়ন করতাম বটে, ডাকাতি করার দরকার হয়নি। জানেন তো? ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেক টাকা রোজগারের স্কোপ থাকে। তাছাড়া এখন আমি আর ওসবে নেই। আর ডাকু মঙ্গল সিংও শুনেছি বেঁচে নেই। আপনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে—কাগজে পড়েছিলাম।

—পরশু রাত্তিরে ক'টা অব্দি শান্তবাবুকে দেখেছিলেন?

—সঠিক লাইনের প্রশ্ন। প্রভাতরঞ্জন মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে বললেন।—রাত্তির চারটে অব্দি আমরা বাড়ি পাহারা দিয়েছি। চারটে বাজলে সবাইকে শুতে যেতে বলি। শান্তও দোতলায় চলে যায়। আমি নিচে বসার ঘরে শোফায় শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে গিয়েই বিপদটা হলো।

—শান্তবাবু গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা জানি আপনার দলের সঙ্গে ওদের প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। আমাদের রেকর্ড তাই বলে।

প্রভাতরঞ্জন নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—আমি এতকাল বাদে শান্তকে সেজন্য খুন করেছি? বিষাক্ত ইঞ্জেকশান করে তারপর লটকে দিয়েছি? ইজ ইট? সেজন্য তার ঘরে ঢুকে খাটের তলায়—বলে জোরে হাসলেন।—কিন্তু খাটের তলায় ঢুকলাম কখন? শান্তর পিছুপিছু গিয়ে?

—সরি প্রভাতবাবু! তা বলছি না। ত্রিবেদী দ্রুত বললেন।—জাস্ট জানতে চাইছি, শান্তবাবুর বিরুদ্ধে কোনও পুরনো রাজনৈতিক আক্রোশ কারও ছিল কি না? তার মানে, তেমন কাউকে আপনার মনে পড়ছে কি না?

—ওসব কোনও পয়েন্টই নয়। প্রভাতরঞ্জন শক্ত মুখে বললেন কথাটা। প্রসূনই খুনী। প্রসূনের সঙ্গে শান্তর গণ্ডগোল হয়েছিল শুনেছি। পলিটিক্যাল রাইভ্যালরি। নীতু বলতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন। একই দলের দুটো ফ্যাকশনের মধ্যে বিবাদ। আজকাল তো এরকমই ঘটছে। ঘটছে না?

—ত্রিবেদী কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন—এই যথেষ্ট। এবার বরং নীতাকে ডাকুন।

প্রভাতরঞ্জন উঠে পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল হঠাৎ ডাকলেন—প্রভাতবাবু, এক মিনিট।

প্রভাতরঞ্জন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনার এলেবেলে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

—আপনি কি মাফলার ব্যবহার করেন না?

প্রভাতরঞ্জন প্রচণ্ড চমকে উঠেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন—মাথার ঠিক নেই। বলব বলে এসে আপনারই উদ্ভট সব প্রশ্নে কথাটা ভুলে গেছি। এতক্ষণ সেই নিয়ে...মানে, নীতাই কথাটা তুলেছিল।

—ডোরাকাটা মাফলারটা আপনারই?

প্রভাতরঞ্জন গুম হয়ে বললেন—হ্যাঁ। গলায় জড়িয়ে সোফায় শুয়ে পড়েছিলুম। পরে শান্তর লাশের গলায় দেখে চমকে উঠি। পাছে আমার ওপর সন্দেহ জাগে, চেপে রেখেছিলাম। তবে আমি সময়মতো বলতামই। আসলে আমিও গোয়েন্দার মতো তদন্ত করছি—তাই...

হাত তুলে কর্নেল বললেন।—ঠিক আছে। ও নিয়ে ভাববেন না। নীতাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রভাতরঞ্জন খুব আস্তে হেঁটে গেলেন। ত্রিবেদী অবাক হয়ে বললেন—আপনি দেখছি সত্যিই অন্তর্যামী, কর্নেল! ব্যাপারটা কী?

কর্নেল একটু হাসলেন।—আমি নিজেই নিজের প্রশ্নে অবাক হয়েছি, মিঃ ত্রিবেদী।

—তার মানে?

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। কেন বেরুল, সঠিক বলা কঠিন। তবে এটুকু ব্যাখ্যা করা যায়, প্রভাতবাবু যে-পোশাক পরে আছেন, তার সঙ্গে একটা মাফলার মানানসই হতো। বিশেষ করে বিহার মুলুকে মাফলারের রেওয়াজ এ মরসুমে অহরহ চোখে পড়ে। তবে এও ঠিক ওঁর মাথায় শীতের পশমি টুপি থাকলে প্রশ্নটা আমার মাথায় আসত না। আজ ঠাণ্ডাটা বেশ বেড়েছে।—তাই না?

ত্রিবেদী ভাবতে ভাবতে বললেন—যাই হোক, একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বেরিয়ে এল। ওদিকে আপনার কথামতো সরডিহি বাজারে ডোরাকাটা মাফলার কে সম্প্রতি কিনেছে, সেই খোঁজে লোক লাগিয়েছি।

—সূত্রটা গুরুত্বপূর্ণই বটে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, প্রভাতবাবু নিচের বসার ঘরের সোফায় ঘুমিয়ে পড়ার পর খুনী ওঁর গলা থেকে সাবধানে মাফলার খুলে নিয়ে গেছে।

—চারটে থেকে ভোর ছ'টার মধ্যে।

—ঠিক। কিন্তু কেন?

—শান্তবাবুর বডি কড়িকাঠে লটকানোর জন্য, যাতে আত্মহত্যা সাব্যস্ত করা যায়!

কর্নেল বেতের টেবিলে একটা চুরুট খেলাচ্ছলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন—সেজন্য শান্তর মাফলার ছিল। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, খুনী নীচে থেকে ওপরে উঠেছিল না ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিল? এটা একটা বড় প্রশ্ন।

ত্রিবেদী নড়ে বসলেন।—অবশ্যই বড় প্রশ্ন। তবে তার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। পোস্টমর্টেমের একটা রিস্ক থেকে যায়। তাই খুন প্রমাণিত হলে যাতে প্রভাতবাবুর ঘাড়েই দায়টা চাপে, তার ব্যবস্থা করেছিল। তার মানে সে প্রভাতবাবুরও শত্রু। অথবা প্রভাতবাবুকে ব্ল্যাকমেইল করার উদ্দেশ্য ছিল কোনও কারণে।

বলে পয়েন্টগুলো ঝটপট নোট করে ফেললেন ত্রিবেদী। সেই সময় নীতা এল। তাকে ইশারায় বসতে বললেন ত্রিবেদী। কর্নেল তার দিকে তাকালে সে আস্তে বলল—একটা অদ্ভুত ব্যাপার কর্নেল! শান্তদার গলায় যে মাফলারটা আটকানো ছিল, সেটা মামাবাবুর। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ আমারই খেয়াল হলো...

—জানি। কর্নেল তাকে থামিয়ে দিলেন।—কেয়া চৌধুরী নামে কোনও মহিলাকে তুমি চেনো?

—হ্যাঁ। কেয়াদিই আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন আমাকে। আমি আপনাকে অত খুলে বলিনি।

—কেয়া চৌধুরী প্রসূনের দিদি?

নীতা মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বলল—হ্যাঁ! এখন বুঝতে পারছি সব কথা আপনাকে খুলে বলা উচিত ছিল।

—কী কথা?

—কেয়াদি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে আমার মিটমাটের চেষ্টা করছিলেন। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাসস্টপে একটা লোক সন্ধ্যাবেলা...

কর্নেল ফের তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—প্রসূনের সঙ্গে শান্তর শত্রুতা ছিল?

—না তো! শান্তদাও আমাকে বকাবকি করত। বলত, মিটমাট করে নে। নীতু মুখ নামিয়ে ফের বলল—আসলে আমার বাবা-মায়ের প্রভাবে ছোটবেলা থেকে ড্রিঙ্কের বিরুদ্ধে আমার তীব্র অ্যালার্জি ছিল। বাবা-মা গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আমিও সেই পরিবেশে বড় হয়েছি। মাতাল দেখলে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হতো। আমি জানতাম না প্রসূন ড্রিঙ্ক করে। বিয়ের পর জেনেছিলাম। সেই থেকে আমাদের রিলেশান নষ্ট হতে শুরু করে। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইয়ের এখানে হনিমুনে এসে ওকে বস্তির লোকদের সঙ্গে কুচ্ছিৎ ওইসব জিনিস খেতে দেখলাম। তখন আর সহ্য করতে পারিনি।

—কীভাবে দেখলে?

—এ বাড়ির দোতলা থেকে ওপাশের বস্তিটা দেখা যায়। এক বিকেলে ওকে খাটিয়ায় বসে একটা লোকের সঙ্গে ওই রাবিশ খেতে দেখেছিলাম। নবকে ডেকে দেখালাম। নব বলেছিল, লোকটা নাকি সাংঘাতিক ডাকাত। তাই আরও ঘৃণা—আর একটু সন্দেহও হয়েছিল প্রসূনের ওপর। শুনেছিলাম, শান্তদার দলের লোকেরা নাকি ডাকাতি করত এবং প্রসূন শান্তদার বন্ধু।

—পরশু রাতে সবাই যখন নিচে পাহারা দিচ্ছিল, তুমি কোথায় ছিলে?

—নিচে ঝুমা বউদির কাছে। আমরাও জেগে ছিলাম চারটে অব্দি। তারপর ওপরে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ি। ছটায় জ্যাঠামশাই কখন বেরোন, জানতে পারিনি। একটু পরে নিচে চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙে। নিচে গিয়ে শুনি মামাবাবুর বল্লমটা...

কর্নেল হাত তুলে বললেন—তোমার ঘর আর শান্তর ঘরের মধ্যে করিডর। তোমার ঘর থেকে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেয়েছিলে কি?

নীতা একটু ভেবে বলল—ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। শুধু শান্তদার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ...বলে নীতা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কী সব শব্দ...অস্বাভাবিক শব্দ! কিন্তু ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল।...আপনি বলায় মনে পড়ছে। দরজা আবার খোলা বা বন্ধ হওয়ার শব্দ, কেউ কিছু বলল, কিংবা ওইরকম কী সব।

—হুঁ। তুমি কি মনে করো প্রসুন শান্তকে খুন করেছে?

নীতা জোরে মাথা নেড়ে বলল—নাঃ। কেন করবে? ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

—সোনার ঠাকুর নিয়ে কোনও বিবাদ হতে পারে দুজনের মধ্যে?

—কী করে হবে? আমি ছাড়া কেউই জানে না, বা দেখেওনি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে একটা সোনার ঠাকুর আছে। আমি কাউকে বলিনি এ পর্যন্ত আপনাকে ছাড়া।

ত্রিবেদী প্রশ্ন করলেন—আর য়ু সিওর?

—নিশ্চয়। নীতা শক্ত মুখে বলল।—তাছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের পেট থেকে কোনও কথা বেরোয় না, আমি জানি।

কর্নেল বললেন—কিন্তু তুমি আমাকে বলেছ, সোনার ঠাকুর নিয়েই জ্যাঠামশায়ের বিপদের আশঙ্কা করছ!

হ্যাঁ। জাস্ট একটা সন্দেহ। কারণ জ্যাঠামশায়ের কোনও শত্রু নেই। তাই ভেবেছিলাম, সোনার ঠাকুরটার কথা কেউ যেভাবে হোক জানতে পেরেছে। তাঁর কোনও ওয়েল-উইশার সেজন্য আমাকে... নীতা বিব্রত মুখে চুপ করল। শ্বাস ফেলে ফের বলল—ব্যাপারটা রহস্যময় বলেই প্রথমে কেয়াদির কাছে গিয়েছিলাম। কারণ ওঁর স্বামী সি আই ডি পুলিশ।

—কেয়াদেবীকে তুমি সোনার ঠাকুরের ব্যাপারটা বলেছিলে?

—হ্যাঁ। না বললে তো...

—তুমি কেয়াদেবীকে সোনার ঠাকুরের কথা বলেছিলে? কর্নেল ফের প্রশ্ন করলেন। অথচ তুমি একটু আগে বললে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলোনি!

নীতাকে আরও বিব্রত দেখাল। বলল—বলা দরকার মনে করেছিলাম। শুনে কেয়াদি বললেন, আমার কর্তার মাথা মোটা। বিহারে গিয়ে পুলিশ জড়ো করে হইচই বাধাবে। বরং তুমি কর্নেলসায়েবের কাছে যাও। আমি আপনার সম্পর্কে কেয়াদির কাছে সাংঘাতিক সব কীর্তির কথা শুনলাম। তাই আপনার কাছে গেলাম। জানি, কেয়াদি কাউকে ঠাকুরের কথা বলবে না।

এই সময় প্রভাতরঞ্জনকে হন্তদন্ত আসতে দেখা গেল। চিৎকার করতে করতে আসছেন—রহস্য! রহস্য! বদমাইশি অ্যান্ড রহস্য!

তাঁর হাতে একটা ডোরাকাটা মাফলার। জোরে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—দেখছেন কাণ্ডটা? এই হচ্ছে আমার মাফলার। এইমাত্র নব বসার ঘর সাফ করতে গিয়ে উদ্ধার করেছে। সোফার তলায় পড়ে ছিল। খামোকা আমাকে ফাঁসানোর তালে ছিলেন এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোক!

ত্রিবেদী মাফলারটা নিয়ে পরীক্ষা করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল তখনই প্রভাতরঞ্জনকে ফেরত দিয়ে বললেন—কিছু মনে করবেন না প্রভাতবাবু! বুড়ো হয়ে গেছি। বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া স্বাভাবিক। নীতা, তুমি এসো। প্রভাতবাবু, দয়া করে ঝুমাদেবীকে পাঠিয়ে দিন।

প্রভাতরঞ্জন বীরদর্পে ভাগনীসহ সোজা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। দীপ্তেন্দু, অরুণ, ঝুমা বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। নব বারান্দায় ঝাড়ু হাতে বেরুল। প্রভাতরঞ্জন মাফলারটা নেড়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন।

একটু পরে ঝুমা এল। কর্নেল বললেন—বসো। তখন ঝুমা কুণ্ঠিত মুখে বসল। তাকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন—তুমি সকালে ওই ব্রিজের ওখানে বলছিলে, নীতার কাছে শুনেছ যে প্রসূন আর শান্তর মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া ছিল!

ঝুমা বলল—হ্যাঁ, নীতা বলেছিল। কিন্তু এখন অন্য কিছু বলেছে বুঝি?

—হ্যাঁ। বলল, দুজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। শত্রুতা ছিল না।

ঝুমার চোখ জ্বলে উঠল।—তাই বলল নীতা? আশ্চর্য মেয়ে তো! আমাকে মিথ্যাবাদী সাজালো!

—আচ্ছা ঝুমা, নীতার সঙ্গে প্রসূনের বিয়ের আগে তুমি কি প্রসূনকে চিনতে?

ঝুমা বাঁকা মুখে বলল—নাঃ। অমন আজেবাজে লোকের সঙ্গে পরিচয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

শান্তকে তুমি তোমার বিয়ের আগে থেকে চিনতে?

ঝুমা তাকাল। একটু পরে বলল—নীতা বলল বুঝি?

—না। আমিই জানতে চাইছি।

ঝুমা চুপ করে রইল। মুখটা নিচু। ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—শান্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?

ঝুমার চোখে জল এসে গেল। আস্তে বলল 'ছিল। কেন?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে তারপর বললেন—শান্তর মৃত্যুতে তুমি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছ। আমার চোখ, ঝুমা! এ চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কাজেই আমিই তোমাকে প্রশ্ন করছি, কেন তুমি সবার চেয়ে বেশি কষ্ট পেলে?

ঝুমা এবার দুহাতে মুখ ঢাকল। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল।

ত্রিবেদী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললেন—কান্নাটান্না পরে। কর্নেলের প্রশ্নের জবাব দিন।

ঝুমা মুখ থেকে হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তীব্র দৃষ্টি রেখে বলল—দ্যাটস্ মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার। আমি জবাব দেব না।

ত্রিবেদী আরও খাপ্পা হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে নিবৃত্ত করে শান্তস্বরে বললেন—ঝুমা! আমি শান্তর হত্যাকারীকে খুঁজছি। তোমার সহযোগিতা চাই। ভুল বুঝো না।

ঝুমা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—আমার সঙ্গে শান্তর একটা ইমোশনাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ও বিয়েতে রাজি হয়নি। পরে অরুণের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। বাট আই লাভ মাই হাজব্যান্ড কাজেই পাস্ট্ ইজ পাস্ট্।

—ঝুমা! পরশু রাত্তিরে শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও কথা হয়েছিল?

—পরশু রাত্তিরে এক ফাঁকে শান্ত আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, হয়তো এভাবে তাকেই একটা ফাঁদে ফেলা হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের নয়, হয়তো তারই কোনও বিপদ ঘটতে পারে। ব্যাপারটা খুলে বলার সুযোগ ও আর পায়নি। মামাবাবু একটুতেই ডাকাডাকি হইচই বাধিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

ত্রিবেদী তাকালেন কর্নেলের দিকে। বললেন—সবও ঠিক একই......ওকে!

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে ঝুমাকে বললেন—তুমি কখনও শান্তর কাছে সোনার ঠাকুরের কথা শুনেছ?

ঝুমা চোখ মুছে ভাঙা-গলায় বলল—শান্ত বেঁচে নেই। কাজেই এখন বলা যায়—বলা উচিত।

—বলো, ঝুমা!

—শান্তর পলিটিক্যাল গ্রুপ সরডিহি রাজবাড়ির মন্দির থেকে সোনার ঠাকুর ডাকাতি করেছিল। আমাকে শান্ত বলেছিল।

—তারপর, তারপর? ত্রিবেদী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ঝুমা বলল—শান্ত সোনার ঠাকুরটা এনে লুকিয়ে রাখে। যে-ঘরে ও খুন হয়েছে, ওই ঘরে। তারপর নাকি ওটা চুরি যায় ও-ঘর থেকে।

কর্নেল বললেন—কীভাবে চুরি যায়, বলেনি?

—বলেছিল। কাগজে মুড়ে বালিশের তলায় রেখেছিল। তারপর বাইরে থেকে এসে আর ওটা খুঁজে পায়নি। দলের লোকের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যায় সরডিহি ছেড়ে।

ত্রিবেদী বললেন—সঠিক দিকেই আমরা এগিয়েছিলাম তাহলে। হ্যাঁ'গো-অন প্লিজ।

কর্নেল বললেন—আর কিছু জানো এ সম্পর্কে?

—না। ঝুমা মাথা নাড়ল।—আমি ওকে বরাবর নিষেধ করতাম, যেন সরডিহি না যায়। তবু কেন ও বোকামি করল বুঝতে পারছি না। পরশু রাত্তিরে ও যখন কথাটা বলল, ওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

—ঠিক আছে। তুমি আসতে পারো, ঝুমা! তোমার স্বামীকে—না, দীপ্তেন্দুকে পাঠিয়ে দাও।

ঝুমা চলে গেলে ত্রিবেদী হাসলেন।—এ পর্যন্ত শুধু এটুকু জানা গেল, এই খুনের সঙ্গে সেই সোনার ঠাকুর চুরির কেস জড়িত। প্রসূন, কর্নেল! প্রসূনই বারবার ফ্রন্টে এসে যাচ্ছে।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না। দীপ্তেন্দু এসে নমস্কার করে বসল। ত্রিবেদী প্রথমে তার নাম-ঠিকানা-পেশা লিখে নিলেন। তারপর কর্নেলকে বললেন—আপনিই শুরু করুন। আমি নোট করি।

কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন—তুমি বললে, আশা করি কিছু মনে করবে না।

দীপ্তেন্দু গম্ভীর মুখে বলল—না। বলুন না!

—তুমি তো মেডিকেল কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ?

—হ্যাঁ। বাবা ডাক্তার ছিলেন। আমি ডাক্তার হতে পারিনি। তবে বাবার চেনাজানার সুযোগে অগত্যা এই পেশাটা জোটাতে পেরেছি। এই নিন আমার কার্ড। এই পেশা না জোটাতে পারলে শান্তর মতো সাংঘাতিক একটা কিছু করে বেড়াতাম। বাঁচাটাই পাপ এ যুগে।

—তুমি কি কোনও কারণে উত্তেজিত? কার্ডটা দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন।

—হ্যাঁ। এবং উদ্বিগ্নও। আমার সঙ্গে সবসময় কিছু ওষুধপত্র থাকে। তো একটা ওষুধ...

কোনও ওষুধ হারিয়েছে?

দীপ্তেন্দু নড়ে উঠল।—হারিয়েছে। সাংঘাতিক ওষুধ।

—ইঞ্জেকশানের ওষুধ কি?

—হুঁঃ। দীপ্তেন্দু মুখ নামিয়ে বলল।—মর্ফিয়ার বিকল্প নতুন একটা ওষুধ আমার কোম্পানি বের করেছে। তার দুটো স্যাম্পল ছিল—দুটো অ্যাম্পুল। একটা নেই। নিকোটিন থেকে তৈরি ওষুধ। নির্দিষ্ট ডোজের বেশি ইঞ্জেক্ট করলেই মানুষ মারা পড়বে।

ত্রিবেদী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন—কখন দেখলেন একটা অ্যাম্প্যুল নেই?

—কাল রাত ন'টায়।

—কাউকে বলেছেন সে-কথা? ত্রিবেদী কর্নেলকে আর মুখ খুলতেই দিলেন না।

—না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তারপর যখন শুনলাম আজ পুলিশ তদন্ত করতে আসবে, তখন ঠিক করেছিলাম ওই সময় বলব, যা ঘটে ঘটুক।

—আপনার স্যুটকেসে ছিল অ্যাম্প্যুল দুটো?

—না। কিটব্যাগেই রাখি। কারণ সবসময় কেউ-না-কেউ এটা-ওটা ওষুধ চায়। কার অ্যাসিডিটি, কার মাথাধরা! সব মেডিকেল রিপ্রেজন্টেটিভই এভাবে ওষুধপত্র সঙ্গে রাখে। খোঁজ নিলে জানবেন।

—ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ ছিল কি আপনার ব্যাগে?

দীপ্তেন্দু বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল—বলতে সময় দেবেন তো? সিরিঞ্জ ছিল। সেও বেপাত্তা হয়ে গেছে।

—শান্তর পোস্টমর্টেম রিপোর্টের খবর শুনেছেন আপনি?

—শুনেছি। কেন শুনব না?

—কবে, কখন?

—কাল বিকেলে হসপিটালের মর্গে গিয়েই শুনেছি। দীপ্তেন্দু উত্তেজিতভাবে বলল।—তো তখনও মাথায় এটা আসেনি। শ্মশান থেকে ফেরার পর রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো। তখন কিটব্যাগ খুলে দেখি এই অদ্ভুত ব্যাপার। ভেবে দেখলাম, এ কথা পুলিশ ছাড়া কাউকে বলা উচিত হবে না। পরস্পর সন্দেহ জাগবে। তিক্ততার সৃষ্টি হবে।

ফের ত্রিবেদী কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল বললেন—তুমি কখনও সোনার ঠাকুর দেখেছ?

দীপ্তেন্দু তাকাল। তারপর খুব আস্তে বলল সোনার ঠাকুর?

—হ্যাঁ, সোনার ঠাকুর।

—হঠাৎ সোনার ঠাকুর আসছে কেন? দীপ্তেন্দু বিরক্তভাবে পুলিশ অফিসারের দিকে ঘুরল।—এই মার্ডার কেসের ব্যাপারে এমন সাংঘাতিক একটা তথ্য দিলাম। তার সঙ্গে এই উদ্ভুট প্রশ্নের সম্পর্ক কী?

ত্রিবেদী একটু হেসে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন, প্রশ্নের জবাব কিন্তু পাইনি!

দীপ্তেন্দু চটে গেল।—না, সোনার ঠাকুর দেখার সৌভাগ্য এ জীবনে হয়নি।

—ঠিক আছে। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।

—তাহলে স্যার, দীপ্তেন্দু পুলিশ অফিসার ত্রিবেদীর দিকে ফের ঘুরে বলল—আমি কিটব্যাগটা এনে দেখাচ্ছি আপনাকে।

ত্রিবেদী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদঙ্গল পুলিশের দিকে হাতের ইশারা করলেন। এ এস আই মানিকলাল এগিয়ে এলে বললেন—এঁর সঙ্গে যান। উনি একটা কিটব্যাগ দেবেন। নিয়ে আসুন।

দীপ্তেন্দু উঠল। সে কয়েক পা এগিয়ে গেলে কর্নেল ডাকলেন—আর একটা কথা দীপ্তেন্দু!

—ওষুধটা, মানে যে অ্যাম্পুলটা হারিয়েছে, সেটা তোমার কোম্পানি নতুন বের করেছে?

—বললাম তো নতুন। এমাসেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। ফ্রেশ নতুন ওষুধ।

—ঠিক আছে। তুমি অরুণকে পাঠিয়ে দাও।

দীপ্তেন্দু এবং মানিকলাল চলে গেলে ত্রিবেদী গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন—একের পর এক তথ্য বেরিয়ে আসছে। অপারেশন সাকসেসফুল।

কর্নেল হেসে উঠলেন। প্রায় অট্টহাসি।

ত্রিবেদী বললেন—হোয়াটস রং কর্নেল?

—প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এটা হয়। কর্নেল টুপি খুলে প্রশস্ত টাকে অভ্যাসবশে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন।—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সবাই সত্য-মিথ্যাকে জড়িয়ে ফেলে। অর্থাৎ পুরো সত্য মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না। স্টেটমেন্টগুলোর একেকটা কাঠামো থাকে। কাঠামো বিশ্লেষণ করে সত্য আর মিথ্যা আলাদা করাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে—এই কেসটার কথাই বলছি, এরা কেউ কেউ নিশ্চয় মিথ্যা বলছে আবার সত্যও বলছে। না—আমি এখনও জানি না, কোনটা ওরা সত্য বলছে বা কোনটা মিথ্যা বলছে। শুধু এটুকু জানি, প্রত্যেকের স্টেটমেন্টের কাঠামোতে সত্য-মিথ্যা মেশানো আছে।

ত্রিবেদী সিরিয়াস হয়ে বললেন—স্টেটমেন্ট বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? আমরা যা প্রশ্ন করছি, ওরা তার জবাব দিচ্ছে মাত্র। আমাদের প্রশ্নগুলোও ভুল প্রশ্ন হতে পারে। তার মানে, ঠিক প্রশ্ন করলে ঠিক জবাব পেতাম হয়তো। শুধু ব্যতিক্রম দীপ্তেন্দুবাবু। উনি নিজে থেকেই একটা সাংঘাতিক তথ্য দিয়েছেন।

কর্নেল চোখ বুজে একটু হেলান দিয়ে বললেন—আপনি বলছেন অপারেশন সাকসেসফুল?

—অবশ্যই। ঘুরে-ফিরে প্রসূনের কাছেই আমরা পৌঁছুচ্ছি।

—কীভাবে?

—প্রসূনের জানা সম্ভব দীপ্তেন্দুবাবুর কাছে বিষাক্ত ওষুধপত্র থাকে। সে এ-বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র চেনে। আগে থেকে এসে লুকিয়ে ছিল সে। বলে ত্রিবেদী চোখে হাসলেন।—নব তাকে হেল্প করেছে। নবকে আমি অ্যারেস্ট করছি। দীপ্তেন্দুবাবুর স্টেটমেন্ট থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঘর থেকে বিষাক্ত ওষুধ আর ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ চুরি করতে হলে বাড়িরই একজন লোকের সাহায্য জরুরি। নব ছাড়া আর কে হতে পারে সে?

অরুণ আসছিল। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।—আপনি ওকে জেরা করুন। আমি আসছি।

বলে ত্রিবেদীকে অবাক করে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন কর্নেল।

॥ সাত ॥

দীনগোপাল খাটে বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চমকে উঠে বললেন—কে ওখানে? তারপর কর্নেলাকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আসুন।

কর্নেল বললেন—একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম দীনগোপালবাবু!

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দীনগোপাল একটু কেশে বললেন—কাল সন্ধ্যায় আপনি আমাকে বললেন শান্তকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে। কথাটা পরে আমার মাথায় এসেছে। আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। ফাঁদ—হ্যাঁ, ফাঁদ ছাড়া আর কী বলব? আর ওই যে সোনার ঠাকুরের কথাটা বলছিলেন, সেটা...দীনগোপাল ঢোক গিলে আত্মসংবরণ করে বললেন সেটা ঠিক। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

—দীনগোপালবাবু, শান্তর ঘরের বালিশের তলায় কাগজে মোড়া সোনার ঠাকুরের কথা আপনাকে নব বলেছিল। তাই না?

দীনগোপাল সোজা হয়ে বসলেন। নব পুলিশকে বলে দিয়েছে? হারামজাদা নেমকহারাম!

—না। কর্নেল একটু হাসলেন। আমার ধারণা। কারণ বিছানাপত্র গোছানোর কাজ নব ছাড়া আপনার বাড়িতে আর কেউ করার নেই। সে শান্তবাবুর বিছানা গোছাতে গিয়েই দেখতে পায়...

বাধা দিয়ে দীনগোপাল বললেন—হ্যাঁ। নব আমাকে বলেছিল। সেদিনই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে রাজবাড়ির ঠাকুর চুরির কথা শুনেছিলাম। খুব হইচই পড়েছিল চারদিকে। বাড়ি ফেরার পর নব আমাকে শান্তর বালিশের তলায় কী আছে বলল। গিয়ে দেখি, সর্বনাশ! আমার বাড়িতেই সেই ঠাকুর।

—তখন শান্ত ছিল না বাড়িতে?

—না। আমি হতভাগাকে বাঁচানোর জন্য শুধু নয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্যও ওটা সরিয়ে ফেলি। আমার বাড়ি পুলিশ সার্চ করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম। কারণ শান্ত পুলিশের খাতায় দাগী-উগ্রপন্থী! সে তখন আমার বাড়িতে এসেছে। অবস্থাটা চিন্তা করুন!

—নব ছাড়া আর কাউকে কথাটা বলেছিলেন?

—প্রভাতকে বলেছিলাম। দীনগোপাল চাপাস্বরে বললেন।—ওকে ডেকে পাঠিয়ে এ নিয়ে গোপনে আলোচনা করেছিলাম।

—শান্ত চলে যাওয়ার পরে?

হ্যাঁ। তখন প্রভাত থাকত ফিরোজাবাদে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। ভদ্রলোক উকিল। আমার বিষয়-সম্পত্তির মামলা-মোকর্দমার কাজ করেন।

—কী নাম?

—অভয় মিশ্র। নামকরা উকিল।

—প্রভাতবাবু কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

দীনগোপাল বিরক্ত মুখে বললেন—প্রভাত একটা বদ্ধ পাগল। বলল, আমাকে দাও। রাজমন্দিরে চুপিচুপি রেখে আসি। কিন্তু আমি দিইনি ওকে।

—কেন?

দীনগোপাল অবাক হয়ে বললেন—আপনিও তাই! প্রভাত শুধু পাগল নয়, নির্বোধ! রাজমন্দিরে রাখতে গিয়ে ঠিক ধরা পড়ত। পুলিশের ধাতানিতে আমাকেও জড়াত। মুখে খালি বড় বড় বুলি! ওকে আমি চিনি না? গবেট—বুদ্ধু—হাঁদারাম! ওর জেল-পালানোর গল্প মিথ্যে। আমি বিশ্বাস করি না।

—আপনি প্রভাতবাবুকে কী বলেছিলেন?

—ওর ওই কথা শুনে রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, থাক। যা করার আমি করব, তুমি যাও।

—আপনি কী করলেন?

—বলব না। সব বলব, এই কথাটা বলব না। সে আপনি যত বড় গোয়েন্দা হোন, ও কথা আমার কাছে আদায় করতে পারবেন না।

—আমি জানি দীনগোপালবাবু, কোথায় সোনার ঠাকুর লুকিয়ে রেখেছেন।

দীনগোপাল তাকালেন। নিষ্পলক দৃষ্টি। একটু পরে বললেন—বলুন।

—আমিও বলব না। কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন।

—গোয়েন্দাদের চালাকি! দীনগোপাল রুষ্টভাবে বললেন।—যদি জানেন, পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছেন না কেন জিনিসটা?

—শান্তর খুনীকে না ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।

দীনগোপাল রুষ্ট ভঙ্গিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন—বেশ, দেখা যাবে।

—নব আপনাকে একটা কালো কুকুরের কথা বলেছিল?

—বলেছিল। ও একটা রামছাগল। সব কিছুতেই ওর সন্দেহ। দীনগোপাল পুবের জানালার দিকে ঘুরে অন্যমনস্কভাবে বললেন।—আপনি আবার এর সঙ্গে একটা 'আড়ালের লোক' যুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, আমি নাকি না জেনে এমন কিছু করতে তৈরি হয়েছি, যাতে তার বিপদ হবে। এই তো আপনার থিওরি?

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, 'আড়ালের লোকটা' নেহাত পুতুল। পুতুলনাচ দেখেছেন তো? পুতুলের আড়ালে একটা মানুষ থাকে। সেই মানুষটা বেশি সাংঘাতিক।

—হেঁয়ালি! চালিয়ে যান।

—দীনগোপালবাবু, আপনি জানেন কি যে দীপ্তেন্দুর ব্যাগ থেকে একটা বিষাক্ত ওষুধের অ্যাম্পুল আর ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ হারিয়ে গেছে? শান্তর বডিতে সেটাই ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল।

দীনগোপাল চমকে উঠলেন।—আমাকে কেউ বলেনি! আশ্চর্য! আর দীপুটাও আহাম্মক, হাঁদারাম! বিষাক্ত ওষুধ-টষুধ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে! এরা—এরা সব্বাই গবেট। গাধার গাধা।

—মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সঙ্গে নানারকম ওষুধের স্যাম্পল থাকা স্বাভাবিক।

—কোথায় রেখেছিল দীপু?

—খোলা কিটব্যাগে।

দীনগোপাল চঞ্চল হয়ে বললেন—আমি এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। সত্যিই শান্তকে ফাঁদে ফেলে মারা হয়েছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমিই এজন্য দায়ী। শান্তকে সোনার ঠাকুর চুরির দায় থেকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত ওর মৃত্যুর উপলক্ষ হলাম। আমিও গবেট। আমারও বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল।

বলে দীনগোপাল বিছানা থেকে নামলেন। ছড়িটি হাতে নিয়ে পা বাড়ালেন।—কই? দীপু হতচ্ছাড়াকে একবার দেখি। ওভাবে বিষাক্ত ওষুধ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে—বাউণ্ডুলে! এক বচ্ছর নিপাত্তা হয়েছিল পড়াশুনা ছেড়ে। স্রেফ একজামিনেশনের ভয়ে—জানেন? আমার ভাইপোদের কেউই ভাল নয়। সবগুলো বদমাশ! ছিটগ্রস্ত! অভিশপ্ত বংশ মশাই! এমন কী, নীতাও কি কম? জেনেশুনে এক বাঁদরের গলায় মালা দিয়ে এখন ভুগছে। কাল রাত্তিরে বাঁদর ওকেই খুন করতে এসেছিল আসলে।

কর্নেল আগেই বেরিয়েছিলেন বারান্দায়। শান্তর সেই ঘরের সামনে দুজন সেপাই পাহারা দিচ্ছে। কর্নেল ঝটপট একবার বাইনোকুলারে যতটা দূর দেখা যায়, দেখে নিলেন। দীনগোপাল বললেন—আপনার মশাই এই এক বাতিক! কালো কুকুর, আর...

কথা শেষ না করে করিডরে ঢুকে চেঁচালেন—কই? দীপু কোথায়? কোথায় সে বুদ্ধু?

কর্নেল তাঁর পিছু পিছু নেমে নিচে বসার ঘরে গেলেন। দীনগোপালের হাঁকডাক শুনে বাইরের বারান্দা থেকে প্রভাতরঞ্জন, ঝুমা ও নীতা ঘরে এল। ঘিরে ধরল তাঁকে। কর্নেল দেখলেন, কালো রঙের একটা কিটব্যাগ টেবিলে রেখে লনে গণেশ ত্রিবেদী বসে আছেন এবং তাঁর সামনে কাঁচুমাচু মুখে অরুণ খালি দুহাত নাড়ছে। সায়েবি ভঙ্গিতে কাঁধে ঝাঁকুনিও দিচ্ছে। দীপ্তেন্দু বারান্দার নিচেই একা দাঁড়িয়েছিল। কর্নেল নেমে গেলেন। সে দীনগোপালের ডাক শুনেছিল। পাশ কাটিয়ে বারান্দায় উঠল এবং ঘরে ঢুকল।

কর্নেল ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—নবাকে অ্যারেস্ট করবেন বলছিলেন। আর দেরি করবেন না। হ্যাঁ—এখনই সোজা লক-আপে পাঠিয়ে দিন। শুধু একটা কথা, যেন ওকে মারধর না করা হয়।

ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে তাকালেন এবং ফিক করে হাসলেন।—আই অ্যাম রাইট। ওক্কে! লালজি! ইধার আইয়ে।

এ এস আই মানিকলাল ছুটে এলেন।—বলিয়ে স্যার!

—অ্যারেস্ট দ্যাট ম্যান, নব। বুঢ়াবাবুকা নোকর!

মানিকলাল দুজন কনস্টেবলসহ বাড়ির দিকে মার্চ করে গেলেন। অরুণ অবাক চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বলল—তাহলে নব ব্যাটাচ্ছেলেই...মাই গড। কী সাংঘাতিক কথা!

কর্নেল বসলেন না। বললেন—অরুণ কি সোনার ঠাকুর দেখেছে মিঃ ত্রিবেদী?

অরুণ তখনই দুহাত নেড়ে বলল—নাঃ। অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড হিম দ্যাট! বাট হোয়াই সোনার ঠাকুর? ঠিক এটাই বুঝতে পারছি না। কর্নেল প্রত্যেককে এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন শুনলাম। আমরা মামাবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

ত্রিবেদী কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—আমার কাজ শেষ। আপনি ইচ্ছা করলে প্রশ্ন করতে পারেন অরুণবাবুকে।

কর্নেল বললেন—নাঃ। আমার কিছু জিজ্ঞাসা নেই।

—দেন ইউ গো! ত্রিবেদী অরুণকে ইশারা করলেন। অরুণ চলে যেতে পারলে বাঁচে, এমন ভঙ্গিতে তড়াক করে উঠে চলে গেল। তারপর ত্রিবেদী বললেন—এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কর্নেল, আমি দুঃখিত। সোনার ঠাকুরের কথা আপনি প্রথমে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, তাকে চলে যেতে দিলে তো সে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেই এবং তৈরি হয়েই আসবে। তখনই আমি ভেবেছিলাম আপনাকে বলব, এ পদ্ধতিটা ঠিক নয়। যাকে জেরা করা হবে, জেরা শেষ হলে তাকে তফাতে রাখতে হবে। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই কথাটা তুলিনি। ভাবছিলাম, সম্ভবত আপনার কোনও কৌশল এটা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কৌশল। ঠিক, ঠিক। আপনি বুদ্ধিমান।

ত্রিবেদী দেখলেন, কর্নেল চোখে বাইনোকুলার তুলে নিয়েছেন এবং পশ্চিমের অসমতল মাঠের দিকে ঘুরে রয়েছেন। ত্রিবেদী বিরক্ত হয়ে বললেন—কৌশলটা বুঝিয়ে দিলে আমার সুবিধে হতো।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—হঠাৎ সোনার ঠাকুরের কথা তুলে আমি কার কী প্রতিক্রিয়া, সেটা যাচাই করতে চাইনি মিঃ ত্রিবেদী! আসলে আমি ওদের জানাতে চেয়েছিলাম, সোনার ঠাকুরের ব্যাপারটা আমি বা আপনি,

মানে পুলিশ জানে। অর্থাৎ শান্তর খুনের সঙ্গে একটা সোনার ঠাকুর জড়িত, সেটা আমরা জানি।

—কিন্তু তা ওদের জানিয়ে দেওয়া মানে তো সতর্ক করে দেওয়া!

—হ্যাঁ, সতর্ক করে দেওয়া। ঠিক বলেছেন।

ত্রিবেদী হতাশ ভঙ্গিতে বললেন—মাথায় ঢুকছে না। আপনি বড্ড হেঁয়ালি করেন, কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন।—হেঁয়ালি কিসের? ওদের পরোক্ষে সতর্ক করে দিয়েছি, সোনার ঠাকুরের দিকে আর এক পা বাড়ালে বিপদ ঘটবে এবং পুলিশ সব জেনে গেছে।

বলে কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। পৌনে দুটো! মাই গুডনেস! আজ আমার স্নান করার দিন! চলি মিঃ ত্রিবেদী!

ত্রিবেদী অবাক এবং গুম হয়ে বসে রইলেন। মানিকলাল নবকে পাকড়াও করে নিয়ে আসছিলেন! পেছনে ক্রুদ্ধ দীনগোপাল তাড়া করে আসছেন। কড়া ধমকের জন্য তৈরি হলেন ত্রিবেদী।...

স্নানাহারের পর রোদে বসে কিছুক্ষণ চুরুট টেনে কর্নেল জলাধারে পাখি দেখায় মন দিয়েছিলেন। এ বেলা আর বেরুনোর ইচ্ছে ছিল না। সেই কেরানি পাখি বা সেক্রেটারি বার্ডটি জলটুঙ্গি থেকে উধাও হয়ে গেছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হলেন।

সবে ঘরে ঢুকেছেন, আলোও জ্বেলে দিয়েছে রামলাল, এমন সময় জিপ এল পুলিশের। পাণ্ডের সাড়া পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন—আসুন মিঃ পাণ্ডে!

পাণ্ডের জিপে দুজন সশস্ত্র কনস্টেবলও এসেছে। রামলালের চেনা লোক। রামলাল তাদের সঙ্গে গল্প করতে গেল।

পাণ্ডে ঘরে ঢুকে বললেন—প্রসূন মজুমদার গভীর জলের মাছ। স্যুটকেসের ভেতর জাকাকাপড় ছাড়া নাকি আর কিছুই ছিল না। কালো কুকুর ওর স্যুটকেস নিয়ে পালিয়েছে শুনে খুব হাসতে লাগল। কিন্তু কী অদ্ভুত কথাবার্তা শুনুন! বলে কী, ডাকু মঙ্গল সিংয়ের প্রেতাত্মা ওর স্যুটকেসটা হাতিয়েছে।

—কুকুরটা সম্পর্কে কী বলেছে প্রসূন?

—কুকুরটাও প্রেতাত্মা! পাণ্ডে হাসবার চেষ্টা করলেন। —আসল কথা বের করা যেত। সমস্যা হলো, ওর জামাইবাবু সত্যিই সি আই ডি ইন্সপেক্টর অমর চৌধুরী তিনটের ট্রেনে পৌঁছেছেন।

—অর্থাৎ এ প্রসূন সত্যিই তাঁর শ্যালক?

—সেটাই সমস্যা। শ্যালককে খুব বকাবকি করলেন অবশ্য। নেহাত একটা ট্রেসপাসের পেটি কেস। কী আর করা যাবে? পাণ্ডে গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ।—শ্যালককে নিয়ে মিঃ চৌধুরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনার সঙ্গে নাকি ওঁর খুব চেনাজানা আছে।

—আছে। বলে কর্নেল ডাকলেন, রামলাল!

বাইরে থেকে সাড়া এল—অভি আতা হ্যায় স্যার!

—দো পেয়ালা কফি, রামলাল!

বলে কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরলেন। পাণ্ডে বললেন—এদিকে কেসের অ্যাঙ্গল ঘুরে গেছে। দীনগোপালবাবুর চাকর নবকে ও সি সায়েব অ্যারেস্ট করে লক-আপে ঢুকিয়েছেন।

—জানি।

পাণ্ডে একটু হাসলেন।—কিন্তু এটা কি জানেন, সে নিজেই আগেভাগে কবুল করেছে একটা ডোরাকাটা মাফলার গতকাল জৈন ব্রাদার্সের দোকান থেকে কিনে বসার ঘরের সোফার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল?

কর্নেল নড়ে বসলেন।—হুঁ! তাই বলেছে নব? কিন্তু কেন এমন করল বলেনি?

—বলেছে, মামাবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

—প্রভাতবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিল? কর্নেল কথাটার পুনরাবৃত্তি করে চোখ বুজলেন। একটু পরেই চোখ খুলে ফের বললেন—বাঁচাতে যদি চাইবে, তাহলে কেন নিজে আগেভাবে কথাটা কবুল করল নব? হুঁ বুঝেছি!

পাণ্ডে তীক্ষ্মদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—কী?

—তার মনিব দীনগোপালবাবুর হুকুমেই কাজটা সে করেছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—তিনিই প্রভাতবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন পুলিশের সন্দেহ থেকে। কারণ শান্তর গলায় লটকানো মাফলারটা প্রভাতবাবুরই। আর, এটা উনি আগাগোড়া জানতেন বলেও মনে হচ্ছে। তবে প্রথম প্রভাতবাবুর মাফলারের ব্যাপারটা নীতারই নাকি চোখে পড়ে। যাই হোক, নব নিজেই কথাটা জানিয়ে দিয়েছে কখন? না তাকে গ্রেফতারের পর। এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ মিঃ পাণ্ডে।

পাণ্ডে পুলিশ-টুপি খুলে টেবিলে রেখে সহাস্যে বললেন—মগজ ঘেমে যাচ্ছে ক্রমশ। একটু হিম খাইয়ে নিই। ...হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা ও সি সায়েবকে বলব'খন।

—দীনগোপালবাবুর বাড়িতে পাহারা কি তুলে নিয়েছেন আপনারা?

—নাঃ। আপনাদের মিঃ চৌধুরী এবার তদন্তে নামবেন। ওঁর অনুরোধ নাকচ করেননি ও সি সায়েব। পাণ্ডে হাসলেন।—ওসব যা হবার হোক। আমার শুধু একটা চিন্তা—দ্যাট ব্লাডি ব্ল্যাক ডগ। কালা কুত্তা! আমার কাজ আমি চালিয়ে যাব। কুকুরটা প্রেতাত্মা হোক, আর যাই হোক, আমি তাকে খতম করবই।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—নব কি কিছু আশঙ্কা করেছে? পাণ্ডে দ্রুত বললেন—কিসের?

—ওর মনিবের কোনও ক্ষতির!

—কে ক্ষতি করবে?

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কর্নেল ফের অন্যমনস্কভাবে বললেন—ক্ষতি হওয়ার চান্স ছিল নবর। তাই নবকে নিরাপদে রাখার জন্যই থানার লক-আপে ঢোকাতে পরামর্শ দিয়েছি আমি। নব কিছু জানে, যা বলেনি আমাদের। নিশ্চয় জানে নব। সে রাতে সে ভোর অব্দি জেগে ছিল। কিছু দেখে থাকবে। কিন্তু বলতে চায়নি।

রামলাল কফি নিয়ে ঢুকলে কর্নেল চুপ করলেন। কপির পেয়ালা রেখে সে চলে গেলে কর্নেল আগের মতো আপন মনে বললেন—মঙ্গল সিং ডাকুর ছবি থানায় আছে। কাল গিয়ে দেখব'খন। আমার মনে হচ্ছে, প্রসূন কিছু হিন্ট দিয়েছে।

পাণ্ডে কফিতে চুমুক দিয়ে সকৌতুকে বললেন—মংলা ডাকু ওই ড্যামের জলে ভেসে গেছে। তার প্রেতাত্মা দর্শন করেননি তো? ড্যামের ধারেই এই বাংলো! রামলাল কী বলে?

কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে থাকলেন। কফি শেষ হলে চুরুট ধরালেন। পাণ্ডে উঠে বললেন—চলি কর্নেল! আসা করি, সকালেই খবর পাবেন কালো কুকুর খতম এবং তার মনিব গ্রেফতার হয়েছে।

—আপনি কি কুকুর খতম অভিযানে বেরিয়েছেন?

—দ্যাটস রাইট। বলে পাণ্ডে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

জিপের শব্দ মিলিয়ে গেলে কর্নেল বারান্দায় বেরুলেন। পাণ্ডের গাড়ি পশ্চিমে চলেছে। ওই তল্লাটে নৈশ অভিযানে যাচ্ছেন ভগবানদাস পাণ্ডে। জেদী অফিসার বটে!...

অমর চৌধুরী এবং প্রসূনকে থানার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, তখন রাত প্রায় ন'টা। অমরবাবু বললেন—যেমন আমার গিন্নি, তেমনি তাঁর এই সহোদরটি! সবচেয়ে আশ্চর্য, আমার গিন্নির পেটে পেটে এত দুষ্টুমি ছিল! নীতাকে সোজা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল? এখানে না আসা অব্দি জানতামই না সে-কথা।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কেয়াদেবীর স্বামী সত্যিকার গোয়েন্দা। আর আমি নেহাতই নকল! আপনাদের মহলে বলে বটে আমাকে 'বুড়ো ঘুঘু'—কিন্তু আমি নিজেই ঘুঘুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। সরডিহির লাল ঘুঘুর কথা সারা পৃথিবীর ওরনিথোলজিস্টরা জানেন। আমিই জানতাম না। কাজেই কেয়াদেবী আমার উপকার করেছেন। ঘুঘু দেখেছি!

—ফাঁদও দেখলেন। অমরবাবু জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে সিগারেট-পেপার আর তামাকের প্যাকেট বের করলেন। দুহাতের চেটোয় সিগারেট তৈরি করতে করতে ফের বললেন—আই পুঁটে! তোর ঘরের অবস্থা দ্যাখ গিয়ে আগে। আর চৌকিদারকে বল, একটা এক্সট্রা বেড ম্যানেজ করতে পারে নাকি।

প্রসূন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। আস্তে বলল—ওটা ডাবল-বেড রুম।

অমরবাবু জোরাল হেসে বললেন—তুইও ফাঁদ পেতে রেখেছিলি? পাখি পড়েনি! পড়বে রে পড়বে! কী বুঝলেন কর্নেল?

কর্নেলও হাসলেন।—পড়ার চান্স ছিল।

—অফ কোর্স! উড়ো পাখি তো নয়, খাঁচা থেকে পালানো পাখি!

প্রসূন রামলালের সঙ্গে কথা বলতে গেল। রামলাল অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। একটু পরে প্রসূনের ঘরের তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। অমরবাবু বললেন—আমি কাল বিকেলের ট্রেনে কেটে পড়ব। আশা করি, তার আগেই আপনি শান্তর খুনীকে খুঁজে বের করতে পারবেন। সত্যি বলতে কি, সেটা স্বচক্ষে দেখার জন্যই ছুতোনাতা করে থেকে গেলাম। কী? পারবেন না?

কর্নেল একটু পরে আস্তে বললেন—পেরেছি।

অমরবাবু চমকে উঠে তাকালেন।—খুঁজে বের করতে পেরেছেন? কিন্তু তাহলে দেরি করছেন কেন? আরও কোনো বিপদ ঘটতেও তো পারে।

—সোনার ঠাকুরের এপিসোডটি আশা করি শুনেছেন।

অমরবাবু বললেন—শুনেছি। তাহলে আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন মনে হচ্ছে!

কর্নেল হাসলেন।—সেটাই ইচ্ছা। কারণ শান্তর হত্যাকাণ্ড আর সোনার ঠাকুর একসূত্রে বাঁধা।

প্রসূন এল। মুখটা গম্ভীর। একটু তফাতে বসে হাই তুলে বলল—আমি ড্যাম টায়ার্ড। ঘুমও পাচ্ছে। কিন্তু একা ঘরে বড্ড গা ছমছম করছে।

কর্নেল বললেন—মঙ্গল সিংয়ের প্রেতাত্মার ভয়ে?

প্রসূন হাসবার চেষ্টা করল।—মংলা ডাকু অপঘাতে মরেছিল শুনেছি।

—প্রসূন। তুমি ভালই জানো যে মঙ্গল সিং মরেনি।

প্রসূন তাঁর দিকে তাকাল। অমরবাবু চমকে উঠেছিলেন! রুষ্টভাবে বললেন—ওর পেট থেকে কথা বের করা কঠিন। আপনিই হয়তো পারবেন।

—পারব। কারণ অন্যের হাতের তাস দেখার কৌশল আমি জানি।

প্রসূন একটু হাসল। ক্লান্তির ছাপ হাসিতে। বলল, বলুন আমার হাতে আর কী তাস আছে?

অমরবাবু বাঁকা মুখে বললেন—একটা আমিও বলতে পারি। ডায়মন্ড কুইন। রুইতনের বিবি। ইডিয়ট কোথাকার!

কর্নেল বললেন—প্রসূন' মঙ্গল সিং ধোলাইয়ের চোটে লক-আপে আধমরা হয়ে যায়। ওর শক্ত প্রাণ। ড্যামে পুলিশ তাকে ফেলে দিয়েছিল মড়া ভেবে। কিন্তু যেভাবেই হোক, বেঁচে ওঠে। তোমার এবং শান্তর সঙ্গে পরে যোগাযোগ করে। ঠিক বলছি?

প্রসূন গম্ভীর মুখে বলল—আপনি কী করে জানলেন?

—কয়েকটি তথ্য জোড়া দিয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছি। শান্তর খুন হওয়ার খবর

আমার মুখে শুনেই তুমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেলে। এতে বোঝা যায়, শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও গোপন প্ল্যান ছিল। এমন সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবে, তুমি ভাবতেই পারোনি। শান্ত তোমার বন্ধু ছিল। কিন্তু তার খুন হওয়া শুনে চুপিচুপি দীনগোপালবাবুর বাড়ি ঢুকতে গেলে! এবং ওইভাবে তোমার হঠাৎ এ-বাংলো থেকে ছুটে যাওয়া...প্রসূন! এটা কিছুতেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অমরবাবুও জোর দিয়ে বললেন—কখনই নয়। বিশেষ করে নীতার সঙ্গে যখন ডিভোর্সের মামলা ঝুলে আছে, তখন রাত্রে ওদের বাড়ি যাওয়া—এবং চুপিচুপি! মাথার ঠিক ছিল না বলেছিস। ওটা বাজে কথা। শান্ত তোর বন্ধু ছিল। সে খুন হয়েছে। বেশ তো! দিনে যেতে পারতিস, যদিও সে-যাওয়াতে রিস্ক্‌ ছিল।

কর্নেল বললেন—তোমার উদ্দেশ্য যাই থাক, শান্তর সঙ্গে তোমার গোপন প্ল্যান ছিল। সেই প্ল্যানের সঙ্গে মঙ্গল সিংও জড়িত ছিল। মঙ্গল সিং তার কালো অ্যালসেশিয়ানের সাহায্যে তোমার স্যুটকেসটি হাতিয়েছে। এতে বোঝা যায়, তোমার আগের নির্দেশ ছিল, যদি তোমারও কোনও বিপদ ঘটে, তোমার স্যুটকেসটা সে যেভাবে পারে, সরিয়ে ফেলে।

প্রসূন বলল—রাতেই সরাতে পারত।

—দুটি কারণে সেটা হয়নি। প্রথমত, সে তোমার ধরা পড়ার খবর রাতে পায়নি। কারণ আমার ভয়ে সে রাতে এ-তল্লাটে পা বাড়াতে সাহস পায়নি। দ্বিতীয়ত, তোমার ধরা পড়ার খবর সকালের দিকে সে পেয়ে থাকবে। তারপর সে গোপনে এসে এ বাংলোর নিচের দিকে ঝোপঝাড়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু রামলালের চোখ এড়িয়ে বাংলোয় ঢোকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ—মঙ্গল সিংয়ের সঙ্গে আমার একটা ছোটখাটো এনকাউন্টার ঘটেছিল। সেটা বলা দরকার। কেন সে আমাকে ভয় পেয়েছে, বলি।

কর্নেল সেদিন বিকেলের ঘটনাটি সংক্ষেপে বলে তাঁর বিছানার তলা থেকে ভারী ছোরাটি বের করে আনলেন। অমরবাবু সেটি পরীক্ষা করে দেখে বললেন—সর্বনাশ! তাহলে খুব জোর বেঁচে গেছেন আপনি। পুটু, তুই গোখরো সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি, বুঝতে পারছিস! তোকে...তোকে জেলে আটকে রাখাই দরকার।

প্রসূন গুম হয়ে রইল। কর্নেল বললেন—তোমার স্যুটকেসে এমন একটা চিঠির জবাব সেটা।

অমরবাবু ধমক দিলেন।—খুলে না বললে থাপ্পড় খাবি বলে দিচ্ছি!

—শান্ত নীতার সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দিতে চেয়েছিল—একটা শর্তে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—তুমি তাকে সোনার ঠাকুরের খোঁজ দেবে লিখেছিলে।

প্রসূন অবাক চোখে তাকাল। অমরবাবু প্রসূনকে দেখে নিয়ে বললেন—মাই গুডনেস!

কর্নেল বললেন—দুবছর আগে এখানে হনিমুনে এসেছিলে তোমরা। এক বিকেলে বাইরে থেকে ফিরে দোতলায় দীনগোপালের ঘরের দরজায় নীতার চোখে পড়ে, তার জ্যাঠামশাইয়ের হাতে একটা সোনার ঠাকুর। উনি তখনই লুকিয়ে ফেলেন। নীতার ধারণা, তুমি পেছনে থাকায় ওটা দেখতে পাওনি। কিন্তু তুমিও দেখতে পেয়েছিলে!

প্রসূন মুখ নামিয়ে বলল—হুঃ!

—তুমি তারপর নজর রেখেছিলেন, দীনগোপাল ওটা কী করেন। এমন কী, ওঁর ঘর থেকে ওটা হাতানোর চেষ্টা করাও সম্ভব তোমার পক্ষে। কারণ তুমি জানতে, ওটা কোন সোনার ঠাকুর এবং শান্তকে ওটার জন্যই লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে!

প্রসূন চুপ করে রইল। অমরবাবু আবার একটা সিগারেট তৈরিতে মন দিলেন।

কর্নেল বললেন—আমি দৈবজ্ঞ নই। কিছু তথ্য জোড়াতালি দিয়েছি। উপমা দিয়ে বলতে হলে বলব, জোড়াতালি দিয়েছি যে আঠার সাহায্যে, তাকে বলে 'অনুমান'। ন্যায়শাস্ত্রে 'অনুমান' একটা গুরুত্বপূর্ণ টার্ম। যাই হোক, তুমি ওঁত পেতে থেকে আবিষ্কার করেছিলেন সোনার ঠাকুর কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন দীনগোপাল। কিন্তু একজ্যাক্ট স্পটটি তুমি জানতে পারোনি। শুধু এরিয়াটা জানতে পেরেছিলে। এখনও জানো। নীতার সঙ্গে মিটমাট করাতে পারলে শান্তকে তার হদিস দেবে, এমন আভাস ছিল তোমার চিঠিতে।

প্রসূন মাথা দোলাল। বলল—তারপর সম্প্রতি শান্ত আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

—হ্যাঁ, রীতিমতো একটা আবিষ্কার-অভিযানের প্রয়োজন ছিল। ওটা প্রথমত, কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এমন আর একজনের সাহায্যের দরকার ছিল, যে সেই এলাকার নাড়ী নক্ষত্র চেনে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য কাউকে দলে টানার প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল। অতএব মঙ্গল সিং এই ছকে চমৎকার ফিট করে যাচ্ছে। সে বিশেষ করে সোনার ঠাকুর চুরি বা ডাকাতির সঙ্গে পরোক্ষ জড়িত ছিল। কারণ সে পুলিশকে বলেছিল, ঠাকুর চুরি হবে সে জানত। পরিকল্পিত অভিযানে তার উৎসাহ বেশি হওয়ারই কথা।

প্রসূন একটা কেশে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল—আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু শান্ত...

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন—তার আগের প্রশ্ন, তুমি শান্তর হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েই ও-বাড়ি দৌড়ে গেলে কেন? কেন চুপিচুপি হানা দিতে চেষ্টা করলে?

—শান্তর কাছে...

—আমি বলছি। শান্তর কাছে তোমার সেই চিঠিটা ছিল। তাই কি?

—হ্যাঁ।

—শান্তর খুন হওয়ার খবর শুনেই তুমি চিঠিটা উদ্ধার করতে গেলে এবং বোকার মতো ধরা পড়লে।

—মাথার ঠিক ছিল না।

অমরবাবু ভেংচি কেটে বললেন—মাথার ঠিক ছিল না! পুলিশকে এ কথাটাই বলেছে, জানেন তো কর্নেল? একের নম্বর বোকা!

কর্নেল বললেন—প্ল্যানিং মতো ডাকু মঙ্গল সিং দীনগোপালকে আনাচে-কানাচে থেকে ভয় দেখাতে শুরু করে। কী প্রসূন?

প্রসূন বলল—ওটা একটা নেহাত চেষ্টা যদি একজ্যাক্ট স্পট লোকেট করা সম্ভব হয়। মানে জ্যাঠামশাই ভয় পেয়ে মূর্তিটা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারেন ভেবেছিলাম। মঙ্গল সিং ওঁকে ফলো করে বেড়াচ্ছিল সেজন্য। কিন্তু ভদ্রলোক শক্ত মানুষ। তাছাড়া তিনি জানেন, তাঁকে মেরে ফেললে আর জিনিসটা উদ্ধার করাই যাবে না।

—ঠিক। আমিও দীনগোপালবাবুকে সামনাসামনি এ কথা বলেছি। অমরবাবু বললেন—কিন্তু বাসস্টপের লোকটা কে? পুটু বলছে, সে নয় এবং এটা তার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে। কীরে? বল্ কথাটা!

প্রসূন আস্তে বলল—সত্যিই জানি না কে সে। শুধু একটা খটকা লাগছে, সে যেই হোক, আমাদের তিনজনের প্ল্যানিংয়ের কথা জানতে পেরেই কি এভাবে ফাঁদ পেতেছিল?

কর্নেল বললেন—কারেক্ট। তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছ। ফাঁদ।

অমরবাবু বললেন—ফাঁদ মানেটা কী?

—শান্তকে খুনের মোটিভ এবার খুব স্পষ্ট ধরা পড়ছে বলেই ফাঁদটাও সাব্যস্ত হচ্ছে।

—কী মোটিভ?

—আপনি পুলিশ ডিটেকটিভ। আপনি ভাল জানেন, সব ডেলিবারেট মার্ডারে দুটো মোটিভ থাকে। পার্সোনাল গেইন আর প্রতিহিংসা। এখানে পার্সোনাল গেইন একটা ফ্যাক্টর। খুনী যেভাবে হোক জানতে পেরেছিল—প্রসূন ঠিকই বলেছে। সে জেনেছিল সোনার ঠাকুর সংক্রান্ত কিছু গোপন তথ্য শান্তর কাছে আছে! সেটা প্রসূনের চিঠিটাই বটে। ওটা হাতাতে সে শান্তকে খুন করেছে। ভেবেছে, ওতে নিশ্চয় একজ্যাক্ট্ স্পট্—মানে ঠাকুর কোথায় লুকানো আছে, সেটা জানা যাবে।

প্রসূন বলল—তাহলে সে ঠকেছে।

হ্যাঁ, ঠকেছে তো বটেই। কর্নেল বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শান্ত বেঁচে নেই। তাই জানা যাচ্ছে না, কীভাবে চিঠিটা বা প্ল্যানিংয়ের কথা সে জানতে পারল। শান্ত কি তারও সাহায্য চেয়েছিল?

প্রসূন বলল—কথাটা আমিও ভেবেছি। শান্ত আরও কাউকে দলে নিতে গিয়েই বিপদ বাধিয়েছে।

—শান্ত বিয়ে করেছিল সম্প্রতি?

—বিয়ে? প্রসূন একটু হাসল।—নাঃ, ওটা ওর জোক। মাঝে মাঝে বিয়ে করেছে বলে জোক করত।

—তোমার সঙ্গে কি শান্তর কখনও বিবাদ হয়েছিল?

—কে বলল?

—হয়েছিল কি না?

—হ্যাঁ। সেজন্যই চিঠি লিখেছিলাম। নইলে ত মুখোমুখি...বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—কী নিয়ে বিবাদ?

—রাজনৈতিক বিবাদ। নেহাত মতাদর্শগত ব্যাপার। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

—ঝুমা বলেছে।

—ঝুমার সঙ্গে শান্তর একটা সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শান্ত বিয়েতে রাজি হয়নি। পরে ঝুমা অরুণকে বিয়ে করে। শান্তর ওপর ঝাল ঝাড়তেই শান্তর এক জ্যাঠতুতো ভাইকে ধরে ঝুলে পড়েছিল। আমি ওকে পছন্দ করি না।

—কিন্তু নীতা বলেছে শান্তর সঙ্গে তোমার কোনও বিবাদ ছিল না।

প্রসূন হাই তুলে বলল—নীতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার অনেক পরে। কাজে সে জানে না।

কর্নেল চুরুট বের করে বললেন—বাসস্টপের লোকটা...

—আমি নই। প্রসূন ঝটপট বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।—ক্ষমা করবেন কর্নেল! ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরায় জেরবার হয়ে এসে আবার আপনার জেরা। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অমরবাবু আস্তে বললেন—গোঁয়ার! ওকে বাগ মানানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আর পেটে-পেটে বুদ্ধি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুটু জানে শান্তকে কে খুন করেছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন—আপনারা আশা করি ডিনার খেয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। প্রায় দশটা! আপনি খাওয়া সেরে নিন।

রামলাল অপেক্ষা করছিল। কর্নেলের কথায় টেবিলে রাতের খাদ্য এনে রাখল। কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। চোখ বন্ধ। অমরবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন—তাহলে আমি উঠি কর্নেল!

কর্নেল চোখ খুলে একটু হেসে বললেন—অন্যের সামনে অনেকে আহার করা পছন্দ করেন না। আমি সে-দলে নই। যাই হোক, আপনি আপনার শ্যালকের কান বাঁচিয়ে কিছু বলতে চান, সেটা বুঝতে পেরেছি। এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

আমরবাবু চাপাস্বরে বললেন—আমার মনে হচ্ছে, আজ রাত্রে আবার একটা বিভ্রাট বাধাবে পুটু। আমি একটু ঘুমকাতুরে মানুষ। আমার ভয় হচ্ছে, কখন চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়ে ফের ও-বাড়ি ঢোকার চেষ্টা না করে। কর্নেল, আমার শ্যালকটিকে মোটেও নিরীহ ভাববেন না। ওর অসাধ্য কিছু নেই। আপনি প্লিজ একটা কাজ করবেন। আপনার দরজার তালাটা আমাদের ঘরের দরজায় চুপি-চুপি আটকে দেবেন।

কর্নেল চুরুট ঘষটে নিভিয়ে বললেন—আপনি না বললেও তাই করতাম।

আমরবাবু কী বলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ বারান্দায় প্রসূনের গলা শোনা গেল।—বাঃ! জিও মঙ্গল সিং! বহুত আচ্ছা কাম কিয়া তুমনে!

আমরবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তারপর গেলেন কর্নেল। বারান্দায় একটা স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রসূন। উজ্জ্বল মুখে বলল—দরজার কাছে রেখে গেছে কাল্লু। কাল্লুকে এক কেজি মাংস খাওয়াব। আর তার মনিব—মাই গুড ফ্রেন্ড মঙ্গল সিংকে বখশিস দেব এক বোতল রঙ্গিয়া। রঙ্গিয়া কী জানেন কর্নেল? সরডিহি এরিয়ার দ্যা বেস্ট্ মহুয়া। দ্যা কুইন অফ দ্যা মহুয়াজ্!...

॥ আট ॥

দীনগোপাল গেট থেকে নিচের রাস্তায় নেমেছেন, ঝোপের আড়াল থেকে কর্নেল বেরিয়ে বললেন—গুড মর্নিং দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল চমকে উঠেছিলেন। বললেন—ও! ডিটেকটিভ মশাই!

—মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন? কর্নেল সহাস্যে বললেন—আমারও একই অভ্যাস। চলুন, গল্প করতে করতে যাই!

—গল্পের মেজাজ নেই। তাছাড়া আমি একা বেড়ানোই পছন্দ করি।

দীনগোপাল স্থির দাঁড়িয়ে গেছেন। কর্নেল বললেন—ওই টিলার পিপুল গাছের তলার বেদিতে কী আছে দীনগোপালবাবু যে, রোজ ভোরে একবার করে গিয়ে দেখে আসেন? নিশ্চয় ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করতে যান না! আপনি তো নাস্তিক!

দীনগোপাল আস্তে বললেন—আপনি কী বলতে চান?

—এভাবে দাঁড়িয়ে আমরা বিতর্ক বাধালে লোক জড়ো হবে। এবার কর্নেল অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন।—চলুন না, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

দীগোপাল তবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন—নবকে গোপনে একটা মাফলার কিনে আনতে বলেছিলেন কেন দীনগোপালবাবু?

—আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন কিন্তু!

—নব পুলিশকে নিজেই আগ বাড়িয়ে বলেছে, সে অবিকল প্রভাতবাবুর মাফলারটার মতো একটা মাফলার কিনে সোফার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

নবর কৈফিয়ত হলো, সে প্রভাতবাবুকে পুলিশের সন্দেহ থেকে বাঁচাতে এ কাজ করেছে। এখন কথা হলো, নবর এ গরজ কেন? এক হতে পারে, সে প্রভাতবাবুর সঙ্গে কোনও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা তার চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। সে অসৎ লোক হলে শান্তর বালিশের তলায় লুকনো সোনার ঠাকুর নিজেই হাতাতো। তা সে করেনি। আপনাকে দিয়েছিল। কাজেই এটা স্পষ্ট যে সে তার মনিবের হুকুমেই মাফলারটা কিনে নিয়ে গিয়ে...

—আপনি থামুন! বলে দীনগোপাল পা বাড়ালেন।

—কর্নেল তাঁকে অনুসরণ করে বললেন—দীনগোপালবাবু, নব আগ বাড়িয়ে নিজেই মাফলার কেনার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। কারণ তার আশঙ্কা, আপনার কোনও বিপদ ঘটতে পারে—যেহেতু সে আপনার বাড়িতে আর নেই, থানার লক-আপে বন্দী। নব খুব বুদ্ধিমান। সে একটা আভাস দিয়েছে।

দীনগোপাল ঘুরে বললেন—আমার বিপদ হবে না।

—দীনগোপালবাবু! আপনি কেন প্রভাতবাবুকে পুলিশের সন্দেহ থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন?

—বলব না।

—প্রভাতবাবুর গলার ডোরাকাটা মাফলার ফাঁস করে শান্তর বডি কড়িকাঠে লটকানো হয়েছিল। কাজেই প্রভাতবাবুর প্রতি পুলিশের সন্দেহ স্বাভাবিক। আমারও সন্দেহ স্বাভাবিক। সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে। পাইপ পরীক্ষার সময় উনি ইচ্ছে করেই আমাদের সামনে মরচে-ধরা পাইপ গুঁড়ো করার ছলে হাতে রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু একটা হাতে। অথচ আপনার ঘরে গিয়ে দেখেছি ওঁর দুহাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ। তার মানে, উনিই ভাঙা জানালার পাইপ বেয়ে নেমে গিয়েছিলেন! একটা হাতের আঙুল কেটে রক্ত পড়েছিল। সেটা গোপন করার সুযোগ ছাড়েননি। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাড়াহুড়োর দরুন অন্য হাতের আঙুলে রক্ত ঝরালেন। তার মানে, প্রভাতবাবুই শান্তকে নিজের মাফলারে কড়িকাঠে ঝোলান। আত্মহত্যার কেস সাজানো।

—দীনগোপাল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে শুনছিলেন। গলার ভেতর বললেন—কী অদ্ভুত কথা! প্রভাত আমাকে কাল বলল, সে নিচের ঘরে সোফায় ঘুমিয়ে থাকার সময় তার গলার মাফলার চুরি করেছে শান্তর খুনী।

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন—না। তা সত্য নয়।

দীনগোপাল চটে গেলেন।—কী বাজে কথা বলছেন! ভোর ছ'টায় মর্নিং ওয়াকে বেরুনোর সময় আমি ওর হাতের কাছ থেকে বল্লমটা নিয়ে গিয়ে লনে পুঁতে দিয়েছিলাম। ও টেরই পায়নি! কাজেই ওর গলা থেকে মাফলার খুলে শান্তকে মেরে কড়িকাঠে লটকে ওকেই কি দায়ী করার কারসাজি নয় খুনীর? প্রভাতের ঘুম মানে মড়া। তার প্রমাণ আমিও হাতে-নাতে পেয়েছিলাম। কাজেই

প্রভাত যখন গতকাল আমাকে বলল, তার মাফলার হারিয়েছে এবং সেটাই খুনী শান্তর গলায় বেঁধেছিল, তখন তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে হয়েছিল।

—গতকাল সকালে নীতার চোখে পড়ে প্রভাতবাবুর মাফলার নেই এবং সেটা ডোরাকাটা মাফলার।

—হ্যাঁ। প্রভাত বলল, মাফলারের কথা তার খেয়ালই ছিল না! আমি জানি প্রভাতের বড্ড ভুলো মন।

—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মাফলারের কথা ভুলে থাকা! শান্তর গলায় একইরকম মাফলার দেখেও সন্দেহ না জাগা! আপনিই বলুন দীনগোপালবাবু, এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

দীনগোপাল আড়ষ্টভাবে বললেন—কিন্তু আমি ওর হাতের কাছ থেকে বল্লমটা নিলেও ও টের পায়নি। কাজেই ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

কর্নেল একটু হাসলেন।—প্রভাতবাবু ঠিকই টের পেয়েছিলেন। সবটাই ওঁর অভিনয়। মাফলারের ব্যাপারটা ওঁর প্রতি সন্দেহ জাগাবে জানতেন, তাই ঘুমের ভান করে পড়েছিলেন।

দীনগোপাল চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্রভাত কেন নিজের গলার মাফলারে শান্তকে লটকে আত্মহত্যার কেস সাজাল? ও নির্বোধ। কিন্তু এত বেশি নির্বোধ?

—তাড়াহুড়ো করা ওঁর স্বভাব। ভাবেননি কী করছেন। পরে যখন বুঝেছিলেন ভুল করে ফেলেছেন, তখন আর উপায় নেই। শান্তর ঘরের দরজা ভেতর থেকে নিজেই বন্ধ করে পাইপ বেয়ে নেমে গেছেন। পাইপের অবস্থাও বুঝেছেন। পাইপ বেয়ে আবার উঠে যাওয়ার রিস্ক্ ছিল। নিজের মাফলার ব্যবহারে ওঁর হঠকারী নাটুকে চরিত্রের পরিচয় মেলে।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, প্রভাত কেন শান্তকে খুন করবে? দীগোপাল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।—আপনার বুদ্ধি আছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করছেন।

—না দীনগোপালবাবু!

দীনগোপাল খাপ্পা হয়ে বললেন—প্রভাত খুনী?

—তাঁকে আমি খুনী বলেছি কি? তবে তিনিই আত্মহত্যার কেস সাজিয়েছিলেন।

—হেঁয়ালি! খালি প্যাঁচালো কথাবার্তা।

—হেঁয়ালি নয় দীনগোপালবাবু! প্রভাতবাবু খুনীকে বাঁচাতে ও কাজ করেছিলেন। তার মানে, তিনি জানেন খুনী কে!

—আমার মেজাজ খারাপ করে দিলেন! দীনগোপাল পা বাড়িয়ে বললেন।—এখনই গিয়ে প্রভাতকে চার্জ করছি।

—না, না! এ ভুল করবেন না, **আমার প্ল্যান ভেস্তে যাবে।**

—কী আপনার প্ল্যান?

—আজ রাত্রে, ধরুন ন'টা নাগাদ আপনি ওই টিলার মাথায় পিপুলতলার বেদিটার কাছে চুপিচুপি যাবেন। খুনীর জন্য আমি একটা ফাঁদ পাততে চাইছি, দীনগোপালবাবু! আপনার সহযোগিতা চাই।

দীনগোপাল ঢোক গিলে বললেন—ওখানে কেন?

কর্নেল হাসলেন।—ওখানেই আপনি কোথাও সোনার ঠাকুর লুকিয়ে রেখেছেন, খুনীর বিশ্বাস।

দীনগোপাল মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বললেন—সে কেমন করে জানবে?

—এই জানাজানিটা রিলে-পদ্ধতিতে হয়েছে।

—ফের হেঁয়ালি করছেন?

—প্রসূন হনিমুনে এসে সোনার ঠাকুরের কথা জানতে পেরেছিল। সে আপনাকে ফলো করেছিল। কিন্তু সঠিক জায়গাটি জানতে পারেনি। তবে টিলাটির কোথাও আপনি ঠাকুর লুকিয়ে রাখেন, এটুকু তার জানা। এর পর নীতার সঙ্গে মিটমাটের জন্য সে শান্তর সাহায্য চায়। শান্তকে সে হারানো ঠাকুর উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য করতে চায়। যাই হোক, শান্ত বেঁচে নেই। শান্তর কাছ থেকেই তার খুনী জানতে পারে একটা হাফ কিলোগ্রাম ওজনের নিরেট সোনার ঠাকুরের কথা। খুনী ভেবেছিল, শান্তকে মেরে ওটা হাতাবে। শান্তর কাছে প্রসূনের চিঠিতে আভাসে লেখা ছিল কোন এরিয়ায় ওটা লুকিয়ে রেখেছেন আপনি। কিন্তু খুনী ভেবেছিল, চিঠিটাতে একজ্যাক্ট স্পট্ লোকেট করা আছে। তাই শান্তকে খুন করে তার জিনিসপত্র হাতড়ে একাকার করে সে। তার পোশাক তন্নতন্ন করে খোঁজে। না পেয়ে মাফলারটার দিকে চোখ পড়ে। হ্যাঁ, দীনগোপালবাবু! সাবধানতাবশে মাফলারটার ভেতর শান্ত প্রসূনের চিঠি এবং এরিয়ার ম্যাপ এঁকে লুকিয়ে রেখেছিল। ওতে হাত দিয়েই খুনী লুকনো কাগজ টের পায়। এক ঝটকায় ওটা ব্র্যাকেট থেকে তুলে নেয়। সোয়েটারের ভেতর লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু পরে মাফলার ছিঁড়ে কাগজগুলো বের করে সে বুঝতে পারে, ঠকে গেছে। ওতে হিন্ট আছে মাত্র।

দীনগোপাল অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন—এমনভাবে বলছেন যেন আপনিও তখন ও-ঘরে ছিলেন!

কর্নেল হাসলেন।—তথ্য জোড়াতালি দিয়ে জেনেছি। ঘটনার দিন সকালে আমি পশ্চিমের মাঠে শান্তর মাফলারটা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। মাফলারটা ছেঁড়া ছিল। মাঠে ছেঁড়াখোঁড়া মাফলার পড়ে থাকা নিয়ে আমার মাথাব্যথার কারণ ছিল না। তাছাড়া তখনও জানতাম না আপনার বাড়িতে কী ঘটেছে।

দীনগোপাল চার্জ করার ভঙ্গিতে বললেন—এত যখন জানেন, তখন আপনিও জানেন খুনী কে। কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—খুনীকে ধরার আগে একটু খেলা করা আমার চিরাচরিত স্বভাব দীনগোপালবাবু! সত্যি বলতে কী, মাঝে মাঝে এই যে শৌখিন গোয়েন্দাগিরি করে থাকি, সেটা আমার একধরনের প্রমোদ। তাস নিয়ে পেসেন্স্ খেলা!

—আপনি আমাকে 'লাস্ট কার্ড' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। দীনগোপাল রুষ্ট হয়ে বললেন।—আমি আপনার তুরুপের তাস!

—ব্যাপারটা এভাবে নেবেন না প্লিজ! কর্নেল অমায়িক কণ্ঠস্বরে বললেন। আমি আপনার সাহায্য চাইছি শুধু।

—ঠিক আছে। কিন্তু প্রভাত সব জেনেও চুপ করে আছে কেন? ও কোনও কথা আমাকে গোপন করে না। এমন সাংঘাতিক কথা আমাকে জানাল না? কেন?

কর্নেল হাসলেন।—আমার অনুমান আছে কিছু, হাতে তথ্য নেই। থাকলে জোর দিয়ে বলতে পারতাম কেন এমন করে চেপে রেখেছেন উনি।

—অনুমানটাই শোনা যাক।

—পরশু রাত্রে ভোর চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে শান্তবাবু খুন হয়েছেন। প্রভাতবাবু ভোর চারটেতে তাঁর বাহিনী ডিসপার্স করে সোফায় শুয়ে পড়েন। কেমন তো?

—হ্যাঁ। তাই শুনেছি।

—তারপর উনি যে-ভাবেই হোক জানতে পারেন, ওপরে কিছু ঘটছে। আপনার বাড়িটা পুরনো। ওপরতলায় কিছু সন্দেহজনক শব্দ হলে নীচের তলা থেকে শোনা খুবই সম্ভব। তাছাড়া প্রভাতবাবু নাটুকে চরিত্রের এবং হটকারী স্বভাবের মানুষ।

—ঠিক ধরেছেন। সেজন্যই রাজনীতি করে কিছু বরাতে জোটাতে পারেনি।

—প্রভাতবাবু ওপরে গিয়েই খুনীকে দেখতে পান। খুনী এমন লোক, তাকে দেখেই হতবাক হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে খুনী তার হাতে-পায়ে ধরে হোক, অথবা...

—অথবা কী? দীনগোপাল মারমুখী হয়ে প্রশ্নটা করলেন।

—প্রভাতবাবুর আর্থিক অবস্থা হয়তো ভাল নয়।

—মোটেও নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন জুটিয়েছিল, তাই রক্ষা। নইলে না খেয়ে মরত।

—তাহলে বলব, দুটোই তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। একটা হলো, খুনীর অনুনয়-বিনয়—খুনী তাঁর স্নেহভাজনও বটে। দ্বিতীয়ত, সে তাঁকে সোনার ঠাকুরের ভাগ দিতে চেয়েছিল। আমার ধারণা, এই দুটো কারণেই প্রভাতবাবু তাকে বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে আত্মহত্যার কেস সাজান। কিন্তু নিজের বোকামি টের পান, যখন নীতা তাঁকে মাফলারের কথাটা বলে। তিনি বুঝতে পারেন, ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না।

—আপনার অনুমানে যুক্তি আছে বটে!

—এতে খুনীর হাতে ব্ল্যাকমেল্ড্ হওয়ার ঝুঁকিও টের পান প্রভাতবাবু। খুনী তাঁকে সম্ভবত তারপর আড়ালে শাসিয়েও থাকবে। মাফলারটা প্রভাতবাবুকে আইনত খুনী সাব্যস্ত করে কি না, বলুন? ফলে প্রভাতবাবু আরও ভয় পেয়ে

আপনার শরণাপন্ন হন। একটা ডোরাকাটা মাফলার আপনার সাহায্যে যোগাড় করেন। এও প্রভাতবাবুর হটকারিতা!

দীনগোপাল আবার রুষ্ট হয়ে বললেন—কিন্তু নবটার কী আক্কেল! নব কেন আগ বাড়িয়ে পুলিশকে কথাটা বলতে গেল?

—নব আপনার বিপদের আশঙ্কা করে প্রভাতবাবুকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। কারণ সে সোনার ঠাকুরের ঘটনাটা জানে। তাছাড়া এমন কিছু সে দেখেছিল, যা এখনও কবুল করেনি পুলিশকে। কিন্তু ওই জানাটুকু তার পক্ষেও বিপজ্জনক। খুনী জানে যে নব তাকে ওপরে উঠতে এবং নীচে নামতে দেখেছে।

—তাহলে প্রভাতকেও ওপরে উঠতে এবং নীচে নামতে দেখেছিল নব?

—আমার তাই ধারণা। কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন।—এই ধারণার ফলে আমিই তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশের হেফাজতে তাকে সরিয়ে রেখেছি।

দীনগোপাল ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বললেন—সোনার ঠাকুর এমন সর্বনাশ ঘটাবে ভাবতে পারিনি। আমি নাস্তিক। আমি ঠাকুর-ভগবান-দৈবে বিশ্বাসী নই। আমার কাছে ওটা নেহাত একটা সোনার পিণ্ডমাত্র। আমার ইচ্ছা ছিল, শিগ্‌গির ওটা ফিরোজাবাদে আমার অ্যাটর্নি মিশ্রবাবুর সাহায্যে গোপনে বিক্রি করব এবং সেই টাকায় অনাথ আশ্রম খুলব। সরডিহির রাজফ্যামিলি গরিব প্রজাদের রক্ত চুষে সেই টাকায় সোনার ঠাকুর বানিয়ে পুজো করত! আপনি জানেন, কেন আমি এতগুলো সুফলা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলাম? ওই রাজাদের অত্যাচারে। ওরা আসলে জমিদার, খেতাবে লেখে রাজা না গজা! আমি ওদের ফ্যামিলিকে ঘৃণা করি। ওদের সঙ্গে আমি মামলা লড়ে ফতুর হয়েছি! কাজেই শান্ত ওদের সোনার ঠাকুর চুরি করেছে দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম। শান্তর চুরি করা ঠাকুর আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম।—সেটা নিছক শান্তর বিপদের কথা ভেবেই নয়। খুলেই বলছি, প্রতিশোধের প্রবৃত্তিবশেও বটে!

কর্নেল দেখলেন, দীনগোপালের মুখ ঘৃণায় বিকৃত। কর্নেল আস্তে বললেন—বুঝতে পারছি।

দীনগোপাল বললেন—ঠিক আছে। একটা শর্তে আপনাকে সাহায্য করব। ফাঁদ পেতে খুনীকে ধরুন। কিন্তু স্পষ্ট বলছি, আমি সোনার ঠাকুর কাউকে দেব না। আমি ভান করব, যেন সত্যি ওটা খুঁড়ে বের করছি। এই শর্ত। ওটা সময়মতো গোপনে বের করে যা প্ল্যান আছে, করব।

বলে দীনগোপাল রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। পশ্চিমদিকে গতি। কর্নেল উল্টোদিকে চললেন। সরডিহি থানার সেকেন্ড অফিসার ভগবানদাস পাণ্ডের কুকুরনিধন অভিযানের ফলাফল জানতেই।...

লাঞ্চের পর অমরবাবু এবং কর্নেল রোদে বসে গল্প করছিলেন। একসময় অমরবাবু চাপা স্বরে বলে উঠলেন—আমি বোধহয় একটা ভুল করছি, কর্নেল!

কর্নেল চোখ বুজে চুরুটে টান দিয়ে বললেন—কী ভুল?

—পুটুকে একলা হতে দিচ্ছি না। ওর ফাঁদে পাখিটা এসে পড়ছে না। দূর থেকে ঘুরে যাচ্ছে। ওই দেখুন!

কর্নেল চোখ খুললেন। তারপর বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—হুঁ। সেচ খালের ধারে নীতা একা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে! চলুন, আমরা কিছুক্ষণ বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

অমরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন—পুটে!

ঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল।—পুটে-ফুটে বলে কোনও প্রাণী নেই পৃথিবীতে।

ইস! অভিমানের বহর দেখো! অমরবাবু অট্টহাসি হাসলেন।—শোন, বেরুচ্চি আমরা। ফিরে এসে যদি শুনি বেরিয়েছিলে কোথাও ফের হাজতে ঢোকাব। সাবধান!

প্রসূন বেরিয়ে এল।—আমাকে একা ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কি? আমার যদি কোনো বিপদ হয়?

—রামলাল আছে। ডাকবি।

প্রসূন নেমে এসে রোদে বেতের চেয়ারে বসল। বলল—রামলাল আমাকে বাঁচাতে পারবে না। মঙ্গল সিং ছিল। তাকে ওই পাণ্ডে ভদ্রলোক নাকি তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছিল এরিয়া থেকে। তাই না রামলাল?

রামলাল ঘাসে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। বলল—আজিব বাত স্যার! বাজারমে শুনা, মংলু ডাকু জিন্দা হ্যায়। ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা, মুঝে তো মালুম নেহি। পুলিশ ভুল দেখা জরুর!

রাস্তায় পৌঁছে অমরবাবু বললেন—পাখি আমাদের দেখছে! ঘুঘুপাখির সঙ্গে প্রেমিকার উপমা অবশ্য জুতসই হবে না। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন।—চলুন! আপনাকে বরং লাল ঘুঘু দেখাব। বিরল প্রজাতির ঘুঘু! তবে যথার্থ ঘুঘু।

বলে কর্নেল ঘুঘুপাখির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। পায়রা আর ঘুঘুর মধ্যে কী কী পার্থক্য, ওরা সত্যিই কাঁকর খায় কি না, ভিটেয় ঘুঘু-চরানো কথাটার উৎপত্তি কী সূত্রে—এইসব বিষয়ে বিশদ বিবরণ। অমরবাবু মন দিয়ে শোনার ভান করছিলেন। কিন্তু দৃষ্টি ক্যানেলের দিকে। কর্নেল দীনগোপালের বাড়ির কাছে পৌঁছে একটু দাঁড়ালেন। অমরবাবু বললেন—কী ব্যাপার?

বাড়িটা উঁচু জমির ওপর, রাস্তাটা নিচুতে। গরাদ-দেওয়া গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, প্রভাতরঞ্জন উত্তেজিতভাবে কিছু বলছেন এবং তরুণ, তার স্ত্রী ঝুমা, দীপেন্দু তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারান্দার পশ্চিম দিকটায় রোদ পড়েছে। সেখানে বেঞ্চে বসে ঝিমোচ্ছে দুজন বন্দুকধারী সেপাই।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—আশ্চর্য তো!

—কী আশ্চর্য? অমরবাবু ব্যস্তভাবে জানতে চাইলেন।

—মিঃ ত্রিবেদী...

কর্নেলকে থামতে দেখে অমরবাবু বললেন—কোথায় ত্রিবেদী সায়েব?

কর্নেল বললেন—আসুন তো! ব্যাপারটা জানা দরকার।

অমরবাবু তাঁকে অনুসরণ করলেন। গেট খুলে তাঁরা লনে ঢুকলে দলটি তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর প্রায় মারমুখী হয়ে তেড়ে আসতে দেখা গেল প্রভাতরঞ্জনকে। কর্নেলের সামনে এসে তিনি গর্জন করলেন—গেট আউট! আভি গেট আউট! এরপর ত্রিসীমানায় দেখলে তুলে ছুড়ে ফেলব।

অমরবাবু ফুঁসে উঠলেন।—কাকে কী বলছেন মশাই? আপনি জানেন ইনি কে?

প্রভাতরঞ্জন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—খুব জানি। ডি-টে-ক-টি-ভ! টিকটিকি! ঘুঘু! এমন বিস্তর ঘুঘু আমার পলিটিক্যাল লাইনে দেখা আছে। গেট আউট!

বলে কর্নেলের কাঁধে ধাক্কা দিতে হাত বাড়ালেন। অমরবাবু সহ্য করতে পারলেন না। দ্রুত জ্যাকেটের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে প্রভাতরঞ্জনের কানের কাছে নল ঠেকিয়ে বললেন—আমি সি আই ডি ইন্সপেক্টর। এখনই এঁর পায়ে ধরে ক্ষমা না চাইলে আপনাকে অ্যারেস্ট করব।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—এ কী করছেন অমরবাবু! আপনিও দেখছি প্রভাতবাবুর মতো নাটুকে মানুষ!

অরুণ, ঝুমা, দীপেন্দু দৌড়ে এল। প্রভাতরঞ্জন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ভাঙা গলায় চেঁচালেন—পুলিশ! পুলিশ!

এ এস আই মানিকলাল বাড়ির পেছনদিকে কোথাও ছিলেন। ছুটে এলেন। সেপাই দুজনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এল।

মানিকলাল অমরবাবুকে স্যালুট ঠুকে বললেন—কী হয়েছে স্যার?

অমরবাবু রিভলবার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—এই লোকটাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান। আপনাকে নিশ্চয় বলে দেওয়া হয়েছে, আজ এই কেসের চার্জে আমি আছি—ইউ আর টু ক্যারি আউট মাই অর্ডার।

মানিকলাল প্রভাতরঞ্জনের দিকে এগিয়ে এলে কর্নেল বললেন—প্লিজ মিঃ লাল! অমরবাবু, আপনাকে অনুরোধ করছি, এখানেই ব্যাপারটা শেষ হোক। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

অমরবাবু রাগে গরগর করছিলেন। কী সাহস! আপনার গায়ে হাত তুলতে এলেন উনি?

প্রভাতরঞ্জন মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গলার ভেতর বললেন—হাত তুলেছি কি কম দুঃখে? দীনুদাকে উনি বলেছেন আমি শাম্বুর বডি আমার

মাফলারে বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়েছি! আমি খুনীকে চিনি! দীনুদা আমাকে সব বলেছে। শুনে আমার মাথার ঠিক ছিল না।

—কর্নেল অবাক হয়ে বললেন—দীনগোপালবাবু বলেছেন আপনাকে?

—হ্যাঁ। বলে প্রভাতরঞ্জন ভাঙা গলায় ডাকতে থাকলেন—দীনুদা! দীনুদা!

দীপ্তেন্দু বলল—আমি ডেকে আনি জ্যাঠামশাইকে! ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

সে পা বাড়ালে কর্নেল বললেন—থাক দীপ্তেন্দু! বরং আমরাই ওঁর কাছে যাই।

দীপ্তেন্দু ঝাঁঝাল স্বরে বলল—বড্ড গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। এর মীমাংসা হওয়া দরকার।

—নিশ্চয় দরকার। কারণ আমারও সব গোলমেলে ঠেকছে। কর্নেল দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে একটু হাসলেন।—দীনগোপালবাবু হঠাৎ মত বদলেছেন, এই একটা পয়েন্ট। আর একটা পয়েন্ট হলো, ও সি মিঃ ত্রিবেদীও মত বদলেছেন। দুটোই পরস্পর সংযুক্ত পয়েন্ট।

অমরবাবু বললেন—আমার মনে হয় কর্নেল, ব্যাপারটা খুলে বলা উচিত। নইলে আবার ড্রামাটিক কিছু ঘটে যেতে পারে।

পারে। আপনি ঠিকই বলেছেন। কর্নেল সায় দিলেন। মিঃ ত্রিবেদীকে বলেছিলাম প্রভাতবাবুকে অ্যারেস্ট করে লক-আপে ঢোকাতে। তা করেননি।

প্রভাতবাবু চমকে উঠে বললেন—শুনুন! শুনুন তাহলে! সাধে কি আমি...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে তা করতে বলেছিলাম। কারণ খুনী এখন বিপন্ন বোধ করছে। অথচ মিঃ ত্রিবেদী কেন আপনাকে গ্রেফতারে মত বদলালেন? সম্ভবত দীনগোপালবাবু তাঁকে কিছু বলে এসেছেন পরে।

দীপ্তেন্দু বলল—জ্যাঠামশাইকে ডাকলেই জানা যাবে।

অরুণ বলল—তুই যা দীপু! ওঁকে ডেকে আন।

দীপ্তেন্দু হন্তদন্ত পা বাড়াল। কর্নেলের কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেল। গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—দীপ্তেন্দু! শোনো, কথা আছে।

দীপ্তেন্দু একবার ঘুরে তাঁর দিকে তাকাল। মুখের রেখায় বিকৃতি ফুটে উঠল। তারপর সে আবার পা বাড়াল। দৌড়ে যাবার ভঙ্গি।

কর্নেল সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দীপ্তেন্দু নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কর্নেল চোখের পলকে তাকে জুডোর এক প্যাঁচেই ধরাশায়ী করে ডাকলেন অমরবাবু! মিঃ লাল! শান্তর খুনীকে গ্রেফতার করুন।

অমরবাবু ফের রিভলবার বের করে ছুটে গেলেন। মানিকলাল গিয়ে দীপ্তেন্দুর জ্যাকেটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন! ইতিমধ্যে অমরবাবু তার কানের নিচে রিভলবারের নল ঠেকিয়েছেন। দীপ্তেন্দু মুখ নামিয়ে রইল।

প্রভাতরঞ্জন হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—আমি হতচ্ছাড়াকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম...আমার ভুল হয়েছিল...আমি ওকে...

—সোনার লোভে, প্রভাতবাবু! কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন।—সোনার ঠাকুরের ভাগ দিতে চেয়েছিল দীপ্তেন্দু!

প্রভাতরঞ্জন দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।—আমি পাপী! মহা-পাপী!

মানিকলাল অমরবাবুকে বললেন—আসামীকে নিয়ে যাই, স্যার!

কর্নেল বললেন—এক মিনিট। আগে আসামীর কাছ থেকে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর 'নিকোটিমরফিডের' তৃতীয় অ্যাম্পুলটা বের করে নিই।

বলে দীপ্তেন্দুর জ্যাকেটের সামনের বাঁ দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। বেরিয়ে এল একটা সূচ-বসানো ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ। মানিকলাল বললেন—সর্বনাশ! একেবারে রেডি সিরিঞ্জ!

—হ্যাঁ। হঠাৎ দৌড়ুনোর ঝাঁকুনিতে জ্যাকেট ফুঁড়ে সুচটা বেরিয়ে পড়েছিল। কর্নেল বললেন।—তবে নিকোটিমরফিড ভরা ছিল, জানতাম না। তার মানে এবার দীনগোপালবাবুকেই চুপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল দীপ্তেন্দু।

অরুণ ও ঝুমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে ঝুমা এগিয়ে এল, তার পেছনে অরুণ। ঝুমার হাতের মুঠোয় একটা খালি অ্যাম্প্যুল। দেখিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—এটা কিছুক্ষণ আগে আমি ওইখানে ঘাসের ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাই নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় আপনারা এসে পড়লেন। কিন্তু আমরা...আমি কল্পনাও করিনি দীপ্তেন্দু এ কাজ করবে।

কর্নেল বললেন—প্রভাতবাবু! তাহলে আপনি কি দীনগোপালবাবুকে খুনীর নাম বলে দিয়েছেন?

প্রভাতরঞ্জন চোখমুখে শ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ। সকালে মর্নিং ওয়াক করে এসে দীনুদা আমাকে আড়ালে ডেকে চার্জ করলেন। আমি...আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। নামটা বলে দিলাম। শুনে দীনুদা কেঁদে ফেললেন। শেষে বললেন, ঠিক আছে। চেপে যাও। আমিও চেপে থাকি। বরং সোনার ঠাকুরটা পুলিশকে জমা দেবার ব্যবস্থা করি। ওটাই সর্বনাশের মূল।

—তারপর উনি কি বেরিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মিঃ ত্রিবেদীকে কিছু বলে এসেছেন। কর্নেল বললেন।—মিঃ লাল! আপনি আসামীকে থানায় নিয়ে যান। মিঃ ত্রিবেদীকে শিগগির আসতে বলুন।

দীপ্তেন্দুকে ধরে নিয়ে গেলেন মানিকলাল। সেপাই দুজন সঙ্গে চলল। কর্নেল বললেন—চলুন, দীনগোপালবাবুর সঙ্গে এবার দেখা করা যাক।

যেতে যেতে অমরবাবু বললেন—কর্নেল! খুনী কে, আপনি জানতেন। কিন্তু কী সূত্রে জানলেন, সবটা শুনতে চাই। দীনগোপালবাবুর ঘরে বসে শুনব।

কর্নেল বললেন—সূত্র অতি সামান্যই! মাত্র একটা সূত্রে।

—বলেন কী! একটা মাত্র সূত্র?

—হ্যাঁ, একটা মাত্র সূত্র। কিন্তু মোক্ষম সূত্র।

—কী সেটা?

কর্নেল বারান্দায় উঠে বললেন—শান্তকে মারা হয়েছি বিষাক্ত নিকোটিনের ইঞ্জেকশানে। দীপেন্দু পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। গতকাল নিজেই অতিবুদ্ধিবশে অর্থাৎ বেগতিক দেখে জানিয়েছিল, তার ব্যাগ থেকে একটা বিষাক্ত ইঞ্জেকশানের অ্যাম্পুল চুরি গেছে। দুটো অ্যাম্পুল ছিল নাকি। কিন্তু আসলে ছিল তিনটে অ্যাম্পুল—সে তো দেখতেই পেলেন। যাই হোক, ওর কথায় সন্দেহ করার উপায় ছিল না। স্টেটমেন্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ আমি পিছু ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, ওষুধটা কি ওর কোম্পানি নতুন ছেড়েছে বাজারে? ও বলল, হ্যাঁ, নতুন। এটাই আমার সূত্র। 'নতুন' শব্দটা!

অরুণ বলল—বুঝলাম না।

কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে বললেন—না বোঝার কী আছে! বাজারে নতুন ছাড়া বিষাক্ত ওষুধ। সে-ওষুধটা কী, এ বাড়িতে একমাত্র দীপেন্দুর নিজেরই জানার কথা। আর কে জানবে? এ-বাড়িতে তো সে ওষুধ বেচতে আসেনি এবং কেউ এ বাড়িতে ডাক্তারও নন যে তাঁকে নতুন ওষুধটার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, তার কাছে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ থাকার কথা কে জানবে, সে নিজে ছাড়া? সে তো ডাক্তার নয়।

বসার ঘরে ঢুকে প্রভাতরঞ্জন বললেন—রাত চারটেয় ওই সোফায় সবে শুয়েছি, কিন্তু জেগেই আছি, আলো নিভিয়ে দিয়েছি—হঠাৎ পায়ের শব্দ। দেখি, কেউ উঠে যাচ্ছে সিঁড়িতে। আমার একটু গোয়েন্দাগিরির স্বভাব। একটু পরে চুপিচুপি উঠে গেলাম। গিয়ে শুনি শান্তর ঘরে ধস্তাধস্তির শব্দ। তারপর আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেল। ভাইয়ে-ভাইয়ে খুনোখুনি! কী করব, বলুন্‌?

দীনগোপাল বিছানায় বসেছিলেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। হাতে একটা ময়লা হয়ে-যাওয়া সোনার নৃসিংহমূর্তি। মুখ তুললেন। বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

অরুণ বলে উঠল—ওঃ! কী যে হতো আর একটু হলেই! দীপু সোনার ঠাকুর পেয়ে যেত। জ্যাঠামশাইকে...ও গড!

ঝুমা কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল—ঠাকুর বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

দীনগোপাল আস্তে বললেন—ত্রিবেদী সায়েব আসেননি?

—এখনই এসে যাবেন। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকলেন।

দীনগোপাল একটু কেশে ক্লান্তভাবে বললেন—আপনারা বসুন। বউমা, এঁদের জন্য চা বা কফির ব্যবস্থা করো।

ঝুমা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমি একটা ফাঁদ পাততে চেয়েছিলাম। কেন আপনি হঠাৎ মত বদলালেন দীনগোপালবাবু?

—আমার আর ধৈর্য রইল না। অসহ্য লাগছিল। দীনগোপাল কাতরস্বরে বললেন।—ভোরবেলা আপনার সঙ্গে কথা বলার পর পথে যেতে যেতে আমার মনে হলো, বড্ড ভুল করে আসছি এতদিন। সোনার ঠাকুর নয়, সোনা—নিছক সোনার লোভ বড় সর্বনেশে। আমার বিবেক কর্নেল, বিবেক আমাকে যা বলল, তাই করলাম। এই সোনার পিণ্ডটা তুলে নিয়ে এলাম পিপুলতলার বেদি থেকে। বেদির এক কোনার নিচে পোঁতা ছিল। ওটা একটা দেবতার স্থান। নিরাপদ জায়গা। এলাকার কোনও মানুষ ওখানে মাটি খুঁড়ে অপবিত্র করবে না জানতাম।

প্রভাতরঞ্জন ফুঁপিয়ে উঠলেন।—কিন্তু দীপু এবার তোমাকেই খুন করতে আসছিল জানো?

—তুমি থামো! দীনগোপাল ধমক দিলেন।—ন্যাকামি করে বুড়ো বয়সে কাঁদতে লজ্জা হয় না? বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি তুমি! আমাকে খুন করত দীপু? আমি রেডি ছিলাম। দেখছ? খুনী ভাইপোর হার্ট ছেঁদা করে দিতাম। দরজায় দেখলেই এইটে বিঁধিয়ে দিতাম।

বলে খাটের পেছন থেকে নবর সেই বল্লমটা তুলে দেখালেন। ফের বললেন—কিন্তু তুমি বাঁচবে কী করে, সে কথা এবার চিন্তা করো। তুমি খুনের প্রমাণ চাপা দিতে চেয়েছিলে। তুমি খুনীর অ্যাসিস্টান্ট! হাঁদা মাথামোটা, শিবের ষাঁড়!

প্রভাতরঞ্জন কাঁচুমাচুভাবে বললেন—সব খুলে বলব আদালতে। তাতে জেল হবে, হোক! জেলে জেলে জীবন কেটেছে। আমি জেলের ভয় করি না।

দীনগোপাল বাঁকা মুখে বললেন—হুঁ, তুমি তো জেলের পাঁচিল টপকাতে ওস্তাদ! আর আজকাল যা জেলের অবস্থা হয়েছে! রোজই তো কাগজে পড়ি কয়েদি পালাচ্ছে—বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।

অমরবাবু হাসলেন।—উনি রাজসাক্ষী হবেন। ওঁকে বাঁচিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে।

—আপনি কে?

কর্নেল বললেন—উনি প্রসূনের জামাইবাবু। কলকাতার সি আই ডি ইন্সপেক্টর অমর চৌধুরী।

দীনগোপাল ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন—নামটা চেনা লাগছে।...ও! তুমি প্রমোদের ছেলে না? প্রসূন বলত বটে তোমার কথা। দীনগোপাল সোজা হয়ে বসলেন।—তোমার বাবা ছিলেন আমার স্নেহভাজন। বন্ধুও বলতে পারো। নামকরা শিকারী ছিলেন। সরডিহি আসতেন মাঝে মাঝে শিকার করতে। তোমার বাবা কেমন আছেন?

অমরবাবু বললেন—বাবা গত বছর মারা গেছেন জ্যাঠামশাই!

—আহা রে! বলে বিষণ্ণ দীনগোপাল একটু চুপ করে থাকলেন।—তুমি আমাকে জ্যাঠামশাই বললে। খুব ভাল লাগল। বলে কর্নেলের দিকে তাকালেন দীনগোপাল।—খুনেটাকে ধরতে পেরেছেন, না পালিয়ে গেছে?

প্রভাতরঞ্জন বললেন—তোমাকে খুন করতে আসছিল। কর্নেলসায়েব পেছন থেকে আমার মতোই জুডোর প্যাঁচে ওকে মাটিতে ফেলে কুপোকাত করেছেন।

—শাট আপ! তোমার সঙ্গে কথা বলব না। কর্নেল, বলুন!

কর্নেল বললেন—তাকে গ্রেফতার করে থানায় পাঠানো হয়েছে, দীনগোপালবাবু!

—নবর কী হবে? নব ছাড়া আমি যে অচল!

—আশা করি, ত্রিবেদী সায়েব তাকে আর আটকে রাখবেন না। সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

দীনগোপাল বিকৃত মুখে বললেন—ও সি ভদ্রলোক আপনার চেয়ে এককাঠি সরেস। তাঁকে বললাম, নবকে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতকে ধরে নিয়ে আসুন। ওর পেটে গুঁতো মারলে সব বেরুবে। তো বলেন কী কর্নেলসায়েবের ফাঁদ আমিই পাতব। কর্নেলসায়েব টিলাপাহাড়ে ফাঁদ পাততে চান, আমি পাতব আপনার ঘরে। আপনি সোনার ঠাকুর হাতে নিয়ে বসে থাকবেন। তা এই তো বসে আছি। তার আগেই খুনে বদমাশকে পাকড়াও করে কর্নেলসায়েবই টেক্কা দিলেন।

বলে ঘুরলেন কর্নেলের দিকে।—আপনি আগেই জানতে পেরেছিলেন কে শান্তর আসল খুনী? আপনার মন্তরটা কী?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—মন্তরটা হল 'নতুন ওষুধ'।

—হেঁয়ালিটা এবার ছাড়ুন তো মশাই!

কর্নেল তাঁর ছোট্ট সূত্রটির লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন। ব্যাখ্যা শেষ হতে ঝুমা ট্রে সাজিয়ে কফি আর স্ন্যাক্স্ নিয়ে এল। সেই সময় সদলবলে হাজির হলেন গণেশ ত্রিবেদী। তাঁর সঙ্গে ভগবানদাস পাণ্ডেও।

ত্রিবেদীর প্রথমেই চোখ গেল সোনার ঠাকুরের দিকে। বললেন—বাঃ! কথা রেখেছেন দীনগোপালবাবু! কিন্তু আমি দুঃখিত, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুনীকে আমার ফাঁদে পড়ার সুযোগই দিলেন না! হারিয়ে দিলেন বুদ্ধির খেলায়। ওক্কে! হার মানছি। অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন!

তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, মুখে অট্টহাসি। কর্নেল হ্যান্ডশেক করে বললেন তবে আপনিও পরোক্ষে আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন মিঃ ত্রিবেদী!

—সে কী! কীভাবে বলুন তো?

—প্রভাতবাবুকে আমার কথামতো গ্রেফতার না করে।

ত্রিবেদী চেয়ার টেনে বসে বললেন—আমি ভাবলাম, তাহলে খুনী সতর্ক হয়ে যাবে। কারণ প্রভাতবাবু তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার চেয়ে বড় কথা, প্রভাতবাবু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। প্রভাতবাবুকে গ্রেফতার করলেই সে পালাবে।

—ঠিক তাই।...কর্নেল পাণ্ডের দিকে ঘুরে বললেন—আপনাকে খুব দুঃখিত দেখাচ্ছে মিঃ পাণ্ডে!

ত্রিবেদী ফের জোরে হেসে উঠলেন।—কালা কুত্তা! দা ব্ল্যাক ডগ এপিসোড! আমি ওঁকে বোঝাতে পারছি না। কী দেখতে কী দেখেছেন। মঙ্গল সিং মরা মানুষ। আপনি তার ভূত দেখেছেন। তবে কুকুরের ব্যাপারটা আলাদা। কোনও কোনও কুকুরের অদ্ভুত স্বভাব থাকে। জিনিসপত্র কামড়ে নিয়ে পালায়। একবার আমার একপাটি জুতো নিয়ে পালিয়েছিল। স্যুটকেসটা নিশ্চয় চামড়ার ছিল, পাণ্ডেজি!

পাণ্ডে মাথা নেড়ে বললেন—নাঃ! ডাকু মঙ্গল সিং বেঁচে আছে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই। আর ওর কালো কুকুরটাকে গুলি করে মারব।...

দীনগোপাল ঝুমার উদ্দেশে বললেন—নীতু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

ঝুমা বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল—বেড়াতে বেরিয়েছে। আমি ওকে খুঁজে আনছি।

একটু চুপ করে থাকার পর দীনগোপাল বললেন—নব? ও সি সায়েব! নবকে ছাড়ছেন না কেন? আমার ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।

ত্রিবেদী বললেন—নব আমাদের সঙ্গেই এসেছে। কিচেনে ঢুকেছে। আপনার বউমার কাছে এখন সম্ভবত সে চার্জ বুঝে নিচ্ছে। আমাদের জন্য কফি আনতে বলছি তাকে।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—লাল ঘুঘুর ঝাঁকটি এতক্ষণ এসে গেছে। এই চান্সটা মিস করতে চাই নে। অমরবাবু, আপনি এখানেই আড্ডা দিন ততক্ষণ। আমি একা যেতে চাই। লাল ঘুঘুর ছবি তুলতে খুব সতর্কতা দরকার।

দ্রুত বেরিয়ে এলেন কর্নেল। বারান্দায় একটু থেমে বাইনোকুলার রাখলেন চোখে। তারপর পা বাড়লেন।...

গেটের কাছে ঝুমা দাঁড়িয়ে খুঁজছিল নীতাকে। ক্যানেলের দিকে দৃষ্টি। কর্নেলকে দেখে সে বলল—কর্নেল! আপনার বাইনোকুলার দিয়ে নীতাকে খুঁজে বের করুন তো! আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে।

কর্নেল তার হাতে বাইনোকুলার দিয়ে বললেন—উত্তর-পূর্বে ইরগেশান বাংলোর ওখানটা লক্ষ্য করো।

ঝুমা দেখতে দেখতে বলল—সর্বনাশ!

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন—সর্বনাশ কিসের ঝুমা? কই, আমার যন্তর দাও। বেশিক্ষণ দেখতে নেই ওসব দৃশ্য। অবশ্য এও একধরনের খুনোখুনি বলা চলে। পরস্পর পরস্পরের হার্টে ছুরি মারছে।

ঝুমা দুরবীন যন্ত্রটি ফেরত দিয়ে বলল—প্রসূন দীপ্তেন্দুর চেয়ে সাংঘাতিক ছেলে!

—ঝুমা, প্রেম তার চেয়েও সাংঘাতিক। বলে কর্নেল নিচের রাস্তায় নেমে গেলেন।

ঝুমা বলল—একটা কথা কর্নেল!

—বলো।

—বাসস্টপের লোকটা কে, জানেন? জানতে পেরেছেন?

—তুমি জানো মনে হচ্ছে!

ঝুমা মাথা নাড়ল।—জানি না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রসূন এবং নীতার দুজনেই চক্রান্ত করে...

কর্নেল হাত নেড়ে বললেন, না।

—তবে কে সে?

—দীপ্তেন্দু। দেখো ঝুমা, অপরাধীদের এই একটা চিরাচরিত স্বভাব অতিরিক্ত চালাকি বলো, কিংবা উল্টোটাও বলো, নিজের অলক্ষ্যে নিজেই একটা-দুটো সূত্র রেখে দেয়। এক্ষেত্রে দেখো! শান্ত, নীতা, তোমার স্বামী অরুণ, প্রভাতবাবু প্রত্যেকে বলেছেন, বাসস্টপে একই চেহারার একটা লোক তাঁদের একটা কথা বলে নিপাত্তা হয়ে গেছে। কিন্তু দীপ্তেন্দু কী বলেছে?—না, তার স্ত্রীকে ওই রকম চেহারার একটা লোক বাসস্টপে একই কথা বলেছে। কেন দীপ্তেন্দু এমন বলল? তার মনে অপরাধবোধজনিত দুর্বলতা একটা সংশয় সৃষ্টি করেছিল। কী সংশয়?—না দৈবাৎ যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে থাকে! নিজের স্ত্রীর নামে ব্যাপারটা সে চাপাতে চেয়েছিল। এত দৈবাৎ কারুর মনে সন্দেহ দেখা দিলেও সেটুকু ঘুচে যাওয়ার চান্স আছে। দীপ্তেন্দুর স্ত্রী স্কুল-টিচার। রেসপন্সিবল্ পার্সন। কাজেই ব্যাপারটা গুরুত্ব পাবে।

কর্নেল পা বাড়িয়ে ফের বললেন—যাই হোক। তার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্ড সে দিয়েছিল মিঃ ত্রিবেদীকে। ওতে তার বাড়ির ফোন নম্বর ছিল। সকালে আমি কলকাতায় ট্রাংককল করি ওর স্ত্রীকে।

ঝুমা সাগ্রহে বলল—কী বললেন রমাকে?

কর্নেল হাসলেন।—বললাম, 'আপনি বাসস্টপে সেদিন সন্ধ্যায় যে সানগ্লাস পরা দাড়িওলা লোকটাকে দেখেছিলেন, যে আপনার স্বামীকে বলতে বলেছিল সরডিহির জ্যাঠামশাইয়ের বিপদ, সে ধরা পড়েছে।'

—রমা কী বলল শুনে?

—ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী আজগুবি কথাবার্তা বলছেন? কে আপনি?' আমি বললাম, 'সরডিহি থেকে পুলিশ অফিসার বলছি। আপনার দেখা বাসস্টপের লোকটাকে পাকড়াও করেছি।' রমা দেবী বললেন, 'টকিং ননসেন্স! এমন কোনও ব্যাপার ঘটেনি। আমার স্বামী এক সপ্তাহ আগে শিলং গেছেন। ওঁর অফিসে রিং করে জেনে নিন। এই নিন ওঁর অফিসের নাম্বার।' সে-নম্বার অবশ্য তখন আমার হাতেই।

—তারপর দীপুর অফিসে ফোন করলেন?

—করলাম। ঘণ্টা দুই পরে অফিস আওয়ার্সে। থানা থেকে ট্রাংককল।

লাইন পেতে দেরি হয় না। ওর অফিস রমাদেবীর কথা কনফার্ম করল। দীপ্তেন্দু এক সপ্তাহ আগে নর্থ-ইস্টার্ন জোনে ট্যুরে গেছে।

বলে কর্নেল হনহন করে হেঁটে চললেন। দিনের আলো গোলাপী হয়ে এসেছে। কুয়াশার ধূসরতা ঘনিয়েছে পশ্চিমের টিলার গায়ে। ঝুমা গেটে দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টি সেচ বাংলোর দিকে।...

উঁচু জমিটার ঝোপে লাল ঘুঘুর ঝাঁক বসে আছে। টেলিলেন্স ক্যামেরায় জুড়ে পরপর কয়েকটা ছবি তুললেন কর্নেল। তারপর সেই নিচু জমিতে নামলেন এবং ইচ্ছে করেই জুতোর শব্দ করলেন। ঝাঁকটা উড়ল।

অমনি উড়ন্ত অবস্থায় ফের ঘুঘুর ঝাঁকটির ছবি তুললেন। ক্যামেরা নামিয়ে ওদের গতিপথ লক্ষ্য করেছেন, সেই সময় চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলেন, কী একটা চকচকে জিনিস ঝিলমিল করছে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ইঞ্জেকশানের একটা অ্যাম্প্যুল। শান্তর মাফলারের সঙ্গে এখানে ফেলে গিয়েছিল দীপ্তেন্দু। রুমালে জড়িয়ে কুড়িয়ে নিলেন অ্যাম্প্যুলটা। এটা একটা প্রমাণ। কোর্ট একজিবিট।

একটু পরে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে ছোট টিলাটার দিকে হেঁটে চললেন কর্নেল।

শীর্ষে পিপুলতলায় উঠে বেদির নিচে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা টাটকা খোঁড়া গর্ত দেখতে পেলেন। এখানেই দীনগোপাল মূর্তিটা পুঁতে রেখেছিলেন। এতক্ষণে আবিষ্কার করলেন, এখানে বেদির গায়ে স্বস্তিকা চিহ্নের একটা খোদাই করা রেখার নিচে একটা ছোট্ট গোল লালচে ছোপ। সিঁদুরেরই ছোপ। বেরঙা হয়ে গেছে এবং ঘাসের ভিতর চাপা পড়েছে। সংকেতচিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন দীনগোপাল।

হঠাৎ কুকুরের গরগর চাপা গর্জন শুনে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। দ্রুত রিভলবার এবং ফর্মুলা-টোয়েন্টির কৌটো বের করলেন জ্যাকেট থেকে।

কুকুরটা নিচের দিকে পাথরের আড়ালে গর্জন করছে। কিন্তু আসছে না। কর্নেল ডাকলেন—মঙ্গল সিং! আ যাও। ডরো মাত! চলা আও মঙ্গল সিং! হাম তুমহারা দোস্ত্ হ্যায়!

পশ্চিমের ঢালে নিচের দিকে বড় পাথরের আড়াল থেকে একটা প্রৌঢ় শীর্ণ চেহারার লোক বেরুল। কালো অ্যালসেশিয়ানটা তার পায়ের কাছে। সে জিভ বের করে জুলজুলে চোখে কর্নেলকে দেখছে আর সমানে গরগর করছে।

কর্নেল হাসলেন।—কুত্তা বহৎ ট্রেইন্ড মালুম হোতা। ঠিক হ্যায়। উসকো হুঁয়া বইঠ্‌কে রহনে হুকুম দো। তুম একেলা আও, মঙ্গল সিং! ঘাবড়াও মাত্। হাম দোস্ত্ হ্যায়।

মঙ্গল সিং ডুকরে কেঁদে উঠল হঠাৎ।—হাম জিন্দা আদমি নেহি, সাব!

হামকো মার ডালা—পানিমে ফেক দিয়া। বাবুলোগোনে চোরি কিয়া, তো হামকা পর যেত্তা জুলুম!

—জানি। হামকো সবহি মালুম হ্যায় মঙ্গল সিং! বলে কর্নেল বেদির কাছে গর্তটা দেখালেন।—ইয়ে দেখো। বুঢ়াবাবু সোনেকা ঠাকুর উঠাকে লে গয়া। দে দিয়া পুলিশ কি হিফাজতমে। অব কিস্ লিয়ে তুমি হিঁয়া ঘুমতে হো? কৈ ফয়দা নেহি জি!

কর্নেল পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে ফের বললেন—আভি তুরন্ত্ ফিরোজাবাদ হোকে কলকাত্তা চলা যাও। বড়া শহর, মঙ্গল সিং! দুস্‌রি জিন্দেগি মিলা তুমকো। ইয়ে নয়া জিন্দেগিকি নয়া লড়াই শুরু করো। লে লো ইয়ে রূপেয়া!

মঙ্গল সিং চোখ মুছে বলল—হাম্ ভিখ্ নেহি লেতা সাব!

—বখশিস মঙ্গল সিং!

—কাহে সাব?

কর্নেল হেসে উঠলেন।—তুমহারা কুত্তাকা খেল দেখা। বঢ়েয়া সার্কাস দিখায়া তুম্! এইসা ডগ-ট্রেইনার হাম কভি নেই দেখা।

নোটটা বেদিতে রেখে কর্নেল একটুকরো পাথর চাপা দিলেন। তারপর চাপাস্বরে ফের বললেন—পাণ্ডেজি পুলিশ ফোর্স লেকে আতা, তুরন্ত্ ভাগ যাও।

বলে হনহন করে নেমে এলেন পুবের ঢাল দিয়ে। ঝোপজঙ্গলের ভেতর ঢুকে সোঁতায় নামলেন। শীর্ণ সোঁতায় পাথরের ফাঁক দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। পাথরে পা রেখে ওপারে গেলেন কর্নেল। তারপর রাস্তায় উঠলেন। সাঁকোয় বাইনোকুলারে দেখলেন, কালো কুকুরটি একশো টাকার নোটটা মুখে করে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। টিলার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল দুটি প্রাণী।

একটা আশ্চর্য তৃপ্তির স্বাদে আপ্লুত হলেন কর্নেল। কালো কুকুরের সার্কাস দেখার জন্য নাকি সরডিহি এলাকার প্রাক্তন ডাকু মঙ্গল সিংয়ের ভয়ঙ্কর-নিষ্ঠুর ছুরিটার স্যাভেনির মূল্য ওই একশোটি টাকা?

অথবা নিজের জীবনের প্রতীক-মূল্য মিটিয়ে দিয়েছেন তাঁর আততায়ীকে? সেকেন্ডের জন্য লাফ দিয়ে সরে না গেলে তাঁর মৃত্যু হতো সেদিন বিকেলে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদটিকে ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলেন—হয়তো দৈবাৎ, একান্তই দৈবাৎ। তাই নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার মূল্য এভাবে শোধ করলেন। পৃথিবী নামক একটি প্রাণময় গ্রহে বেঁচে থাকার কত রকম স্বাদ, কত বিচিত্র অনুভূতি, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, প্রকৃতি ও প্রাণীর কত রহস্যজালে পরিকীর্ণ এই পৃথিবীকে একটু একটু করে বোঝবার চেষ্টা এই জীবন! সেই জীবনের মূল্য ওই সামান্য টাকায় শোধ হবার নয়। ওই কাগুজে মুদ্রাটি নিতান্তই তাঁর কৃতজ্ঞতার প্রতীক মাত্র। মঙ্গল সিং তাঁকে জীবনের মূল্য উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছে।

জীবনে কতবার এবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিটকে সরে গেছেন কর্নেল। আর প্রতিবার যেন একটি করে পর্দা উন্মোচিত হয়েছে জীবনের। এভাবে খোলস ছাড়তে ছাড়তে বারবার নতুনতর জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকতে থাকতে নির্বাণের পরম স্তরে পৌঁছুতে চান কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—স্বাভাবিক মৃত্যুই তাঁর বাঞ্ছিত। অস্বাস্থ্যে নয়, আততায়ীর আঘাতে নয়, দুর্ঘটনায় নয়—তিনি চান সেই মৃত্যু, যা প্রকৃতি তাঁকে আদরে উপহার দেবে। প্রকারান্তরে যা প্রকৃতির নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। প্রকৃতি থেকে এসে প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া। খেলাশেষে ক্লান্ত শিশু যেভাবে ঘরে ফেরে, মা তাকে ধুলো মুছিয়ে কাছে টেনে নেন।

—কর্নেল!

চমকে উঠলেন কর্নেল। ঘুরে দেখলেন, নীতা ও প্রসূন। প্রসূনই তাঁকে ডেকেছে। তার মুখে বিষাদ-মেশানো ক্ষীণ হাসির রেখা। নীতার মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য। টিলাপাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আসা শেষ লালচে রোদের ছটায় সেই গাম্ভীর্য ঈষৎ উজ্জ্বলও।

কর্নেল একটু হাসলেন।—কনগ্রাচুলেশন!

নীতা বলল আমি আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে চলে এলাম।

—আর পুটু সরি।

প্রসূন বলল—নেভার মাইন্ড! আমি পুটু! পুটু বলেই তো আমার বউ পালায়।

—তাহলে প্রসূন বলাই নিরাপদ। কর্নেল চুরুট বের করে বললেন—তো আমাকে দেখে নীতা চলে এসেছে। আশা করি, প্রসূনও তাই? অর্থাৎ দুজনে একত্র বেড়াতে বেরোওনি? আমি—এই বৃদ্ধ ঘুঘু তোমাদের দুজনেরই লক্ষ্য ছিল? ভাল। তো দেখ, এই সময়টাকেই ভারতীয় শাস্ত্রে গোধূলি লগ্ন বলা হয়। এই সময়টা বিপজ্জনক সুন্দর—কারণ এই লগ্নে ভারতীয় নর-নারী বিয়ে নামক ফাঁদে পড়ে। এগেন সরি ডার্লিংস! তোমাদের ক্ষেত্রে পুনর্মিলন বলাই উচিত। সুখী হও!

ঋষির ভঙ্গিতে কর্নেল ডান হাত প্রসারিত করলেন। এবার নীতার ঠোঁটের কোনায় ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল এবং মুহূর্তের জন্য তার মুখে ভারতীয় নারীর লজ্জার রঙ ঝলমল করল। আস্তে বলল সে—চলুন। গল্প করতে করতে ফেরা যাক।...

দানিয়েলকুঠির হত্যারহস্য

॥ বিজনের বিবৃতি ॥

আনন্দ একদিন এসে বলল—আচ্ছা বল্ তো, প্রেমে পড়লে তবে লোকে গাড়োল হয়, নাকি শুধু গাড়োলরাই প্রেম করে?

অবাক হয়ে বললুম—হঠাৎ এ কথা কেন রে?

সে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল—আমার বসকে খুব বুদ্ধিমান মনে করতুম। ইন দা সেন্স—বুদ্ধিমান ছাড়া কেউ পয়সা কামাতে পারে না এ যুগে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুদিন থেকে লোকটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে।

বাধা দিয়ে বললুম—প্রেমে পড়েছেন বুঝি ভদ্রলোক?

—প্রেম মানে কী! প্রেমেরও বাবা-মা থাকলে তাদের পাল্লায় পড়েছে। বাপ্‌স!

আনন্দ একটু বাড়াবাড়ি সব ব্যাপারেই করে। ওর কথায় গুরুত্ব কখনও দিইনে। তাছাড়া ওর বসকে আমি চিনি। রীতিমতো ঝানু ব্যবসায়-বুদ্ধির মানুষ। চৌরঙ্গি এলাকার একটা বাড়ির চারতলায় আমাদের পারুল অ্যাডভার্টাইজার্স, পাঁচতলায় আনন্দের বসের ভুবনেশ্বরী ট্রেডিং কনসার্ন। বাড়িটা বছরখানেক হয়েছে। এই এক বছরেই সাতটা ফ্লোরে গাদা গাদা ছোট-বড় কনসার্ন এসে ভিড় করেছে। ভুবনেশ্বরী এসেছে মাস ছয়েক আগে। আনন্দর সঙ্গে তারপর থেকে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়েছে। সে রীতিমতো কোয়ালিফায়েড, গুণী ছেলে যাকে বলে। কমার্সের খাসা একটা ডিগ্রি আছে। অথচ ভীষণ সাহিত্যরসিক সে। আমরা ক'জন ব্যর্থ শিল্পী-সাহিত্যিক (কবিও) মিলে এই পারুল ব্যাপারটা গড়ে তুলেছিলুম। অবশ্য পারুল বলে আমাদের কারো কোন প্রেমিকা বা আত্মীয়া নেই, ওটা জাস্ট একটা নাম। অর্থাৎ রূপকথার সেই 'সাতভাই চম্পার এক বোন পারুল' আইডিয়া। তা, আনন্দ কীভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমরা শিল্প-সাহিত্যের একদল বাউণ্ডুলে ছেলে। বেছে পড়ে সে আলাপ করতে এসেছিল। তাদের বিজ্ঞাপনের সব দায়িত্বও আমাদের মতো খুদে প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই দিক থেকে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ না ছিল এমন হতে পারে না। তবে, আসলে আনন্দের মধ্যে বন্ধুতার অনেক গুণ তো ছিলই। মাঝে মাঝে বেমক্কা রুচিবিগর্হিত স্ল্যাং বলে ফেললেও তার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ সংস্কৃতিবোধ আমরা লক্ষ্য করেছি এবং কালক্রমে আনন্দ আর আমাদের মধ্যে তুই-তোকারিও এসে পড়েছে।

তখন সময় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। শেখর রঞ্জন সেলিম কেউ তখনও আসেনি। তাদের আসতে বারোটা হয় সচরাচর। কোন নিয়মকানুনের বালাই অবশ্য নেই। শুধু আমাকে নিয়মিত সময়ে আসতেই হয়। কারণ এক অলিখিত চুক্তি অনুসারে নেতৃত্ব আমার কাঁধেই বর্তেছে। তাছাড়া, আমাদের কোন কর্মচারী নেই—এক বেয়ারা বা পিওন-কাম-বিল কালেক্টর মধুসূদন বাদে।

আনন্দ চোখ বুজে মাথাটা হেলিয়ে পা নাচাচ্ছিল। ওইভাবেই বলল—চা আনতে বল্।

মধু ফাইল ঝাড়পোঁছ করছিল। ধুলো না জমলেও তাকে এসব করতে হয়। চাকরি যাবার ভয় তার প্রচণ্ড। তাকে চা আনতে বললুম। সে তক্ষুণি কেটলি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার আনন্দকে একটু তিরস্কারের ভান করে বললুম—মধুর সামনে বসের নিন্দে করছিস! জানিস বেয়ারাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার থাকে? তোদের বেয়ারার কানে তুলতে পারে—তারপর মিঃ গুপ্টার কানে ওঠা অসম্ভব নয়।

আনন্দ হাসতে লাগল।—মধু তেমন লোক নয়।

বললুম—মিঃ গুপ্টা কার প্রেমে পড়েছেন রে? ওঁর তো বউ-ছেলেমেয়ে রয়েছে!

আনন্দ বলল—আরে, সে তো প্রথমপক্ষ।

—প্রথমপক্ষ! তাহলে দ্বিতীয়পক্ষ আছে নাকি?

—আছে তা কি আমিই জানতুম? কিছুদিন আগে জানতে পারলুম। আপন গড়, বিশ্বাস কর্, এ জিনিস বস কীভাবে ম্যানেজ করল ভাবা যায় না। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়েস, স্লিম অ্যান্ড ট্রিম চেহারা, যাকে বলে বি-উ-টিফুল! আর সে কী গ্ল্যামার মাইরি! নির্ঘাত ফিলম-লাইন থেকে বোঁটা ছিঁড়ে তুলে এনেছে।

—দুই বউ এক জায়গায় থাকে না নিশ্চয়?

—পাগল! বড় বউ জানেই না কিচ্ছু। তাহলে তো গোড়াতেই জানতে পারতুম। ইনি থাকেন ক্যামাক স্ট্রিটের এক দশতলা বাড়ির সাততলায়। সে ফ্ল্যাটের বর্ণনা আমি দিতে পারব না। ওসব তোদের জিনিস। প্রথমে আমি তো ক্যাবারে গার্ল ভেবেছিলুম!

—কিন্তু আইনে তো দুটো বউ মানা।

আনন্দ উদাসীন সুরে বলল—কে জানে! বড় বউ তো জানে না কিচ্ছু।

—তাহলে তোরই ভুল হয়েছে। বউ-টউ নয়-জাস্ট মেয়েমানুষ।

—মোটেই না বিবাহিতা স্ত্রী। এবং বাঙালি মেয়ে।

—বাঙালি মেয়ে!

—হ্যাঁ। গুপ্টাসায়েবের মা-ও তো বাঙালি মেয়ে। বুড়ি বোম্বে থেকে মধ্যে মধ্যে আসে। অবশ্য সেও কিচ্ছু জানে না। যথারীতি বড় বউয়ের কাছে গিয়েও

ওঠে। গুপ্তাসায়েবের এই গুপ্টা ব্যাপারটা আমি আর দু-চারজন ছাড়া কেউ জানে না।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—তাই গুপ্টাসায়েব অমন চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। অ্যাদ্দিনে বুঝলুম, তাই...

আনন্দ বাঁকা ঠোঁটে বলল—তুই সাহিত্যিক হলে কী হবে? সবকিছু বড্ড দেরিতে বুঝিস।

—যাক গে! তা আনন্দ, তোর বস অমন দ্বিতীয়পক্ষ থাকতে ফের প্রেমে পড়লেন কোথায়?

আনন্দ অবাক হয়ে বলল—তুই লিখিস কীভাবে? নির্ঘাত বিদেশী নভেল মেরে চালাস। আরে, সুন্দরী তরুণী বউয়ের প্রেমে পড়তে বারণ আছে মানুষের?

হাসতে হাসতে বললুম—ভ্যাট্! সে তো দাম্পত্যপ্রেম!

—বাঃ! দাম্পত্যপ্রেম প্রেম নয়?

—মোটেও না। ওটা পুরুষের স্ত্রৈণতা।

আনন্দ হতাশ ভঙ্গিতে বলল—তোর সঙ্গে তর্কে আমি পারব না। স্ত্রৈণতা কী জানি না, আমি শালা এক ব্যাচেলার। আমার চোখে ব্যাপারটা প্রেম ছাড়া কিছু নয়। তা না হলে ভাবতে পারিস, আমার বস গাড়ি বেচে উর্মিলাসুন্দরীর বায়নাক্কা মেটাচ্ছে! আপন গড়—অত ভালো গাড়িটা সতের হাজারে বেচে দিলে গুপ্টাসায়েব। বললে—আনন্দবাবু, তেলের যা আকাল পড়েছে, আর গাড়ি চাপা যাবে না। ভাবলুম, তাই হবে। উরে হালুয়া! পরদিন আমাকে যেতে বলল ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। গেলাম। তারপর উর্মিলাসুন্দরীকে নিয়ে বেরোলেন। ট্যাক্সি করে আমরা চললুম সোজা ব্যারাকপুর। তখন বুঝিনি কিচ্ছু। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা পুরনো আমলের বাগানবাড়ি কেনা হচ্ছে। ছোট বউকে ইতিমধ্যে কবে এনে দেখিয়েছে। পছন্দও হয়েছে বিবির। এবার অ্যাডভান্স করা হবে। বিবির সামনেই সেটা করতে চায় গুপ্টাসায়েব!...

মধু চা আনল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনন্দ ফের বলল—বাগানবাড়িটা কিন্তু অপূর্ব! সাত একর জায়গার মধ্যে একতলা বাড়ি—দুই পার্টে পাঁচটা করে দশটা ঘর। চারপাশে মাঠে অজস্র গাছপালা। ছ-ফুট উঁচু পাচিলের বাউন্ডারি। লোকে বলে, দানিয়েল সায়েবের কুঠি।

—দানিয়েল সায়েবের কুঠি! অবাক হয়ে বললুম।

—কেন, চিনিস নাকি?

—নিশ্চয় চিনি। ওর মালিক ভদ্রলোককেও চিনি। সেলিমের এক মাসতুতো ভাই ওঁর কনসার্নে চাকরি করে। চিৎপুরে ব্যবসা আছে মস্তোবড়ো। সেলিমের ভাইয়ের সূত্রে আমরা বার দুই ওখানে পিকনিক করে এসেছি। এবার জানুয়ারিতেও গিয়েছিলুম। রাত্রে ছিলুম আমরা। কিন্তু বাড়িটায় নির্ঘাত ভূত আছে রে!

আনন্দ খিকখিক করে হাসল।—তাহলে তো ভালই জমবে!

—সে এক অদ্ভুত রাত্রি ছিল! শেখররা তো মাল-টাল খেয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছিল। আমার একেবারে ঘুম হয়নি। অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছি সারা রাত!

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বলল—বাড়িটার একটা হিস্ট্রি আছে।

—শুনেছি।

—দানিয়েল সায়েব ছিল মিলিটারির বড় অফিসার। রিটায়ার করে বাড়িটা বানায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। সিপাহি বিদ্রোহের শুরু তো ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে। ব্যাটা অনেক সিপাহি মেরেছিল। পরে নাকি পাগল হয়ে যায়। তারপর...

অনন্দর বলার দরকার ছিল না। আমি সব জানতুম বাড়িটা অনেকে কিনেছে, তারপর বেচে দিয়েছে। কারণ নাকি যে-ই কিনেছে, তারই একটা না-একটা অঘটন ঘটেছে। ফলে অনেককাল খালি পড়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যরা ওখানে ছিল। কী একটা উপলক্ষে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তাদের চারজন খুন হয়ে যায়। দলটাকে ছত্রভঙ্গ করে নানা জায়গায় বদলি করা হয়। তারপর ফের বাড়িটা খালি পড়ে ছিল। সরকারি সম্পত্তি তখন। সেই সময় শ্রীলঙ্কার এক মুসলমান ব্যবসায়ী সাহস করে বাড়িটা কিনে নেন নেহাত জলের দামে। বাড়ির দোষ কাটাতে খুব ধুমধাম করে মৌলবি এনে মিলাদ অনুষ্ঠান হয়েছিল। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, একা এক বৃদ্ধ মৌলবি ওই ভুতুড়ে জনহীন বাড়িতে সারারাত জেগে সুর ধরে কোরানের শ্লোক উচ্চারণ করে যাচ্ছেন।

মৌলবি বলেছিলেন—বাড়িটায় দুষ্ট জিনের উপদ্রব আছে। তবে সবগুলোকে আমি এই আতরের শিশিতে ভরে ফেলেছি। নিয়ে গিয়ে আরবসাগরে ফেলে দিয়ে আসব।

কিন্তু বর্তমান মালিক ইদ্রিস মিয়া বলেন,—তার আগে মৌলবিসায়েবকে জিনগুলো কম জ্বালায়নি। মার্কিনিরা থাকার সময় ইলেকট্রিক লাইন নিয়েছিল। ফাটা ছাদে জল চুঁইয়ে সব ড্যামেজ হয়ে যায়। তারপর আর মেরামত হয়নি। নানাসায়েব (মাতামহ) কিনেছিলেন তো মাত্র দশ হাজারে। মেরামতি খরচা হিসেব করে দেখা গেল, বারো হাজারেও পার পাওয়া যাবে না। তাই উনিও বেচবার ফিকির খুঁজছিলেন। যাইহোক, মৌলবিসায়েব লণ্ঠন জ্বেলেই রাত কাটাতেন। এক রাতে কীভাবে তাঁর মশারিতে আগুন ধরে যায়। মশারির ভেতর বসে উনি কোরান পড়ছিলেন। সে এক কাণ্ড। বেরোতে গিয়ে লেপটালেপটি হয়ে দাড়ি-টাড়ি পুড়ে একাকার হল। তবে অমন তেজী নাছোড়বান্দা মৌলবি দেখা যায় না। কোরান-পাঠ শেষ করে তবে আতরের শিশিতে জিন পুরে নিয়ে মক্কা রওনা হলেন। নানাসায়েব ওঁকে হজে যাবার মতো টাকাকড়ি দিয়েছিলেন।

ইদ্রিস মিয়ার ছেলেপুলে নেই। সুশিক্ষিত আধুনিক যুগের মানুষ। ধর্মকর্মের

ধার ধারেন না। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই একটুও। নানার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তির মালিক হলেন তিনি। কলকাতায় এসে ব্যবসা পাতলেন। কিন্তু দানিয়েল কুঠিতে গিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তখন দেশ ভাগ হয়েছে। দলে দলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। তাঁদের একটা দল বাড়িটা জবরদখল করে ফেলেছেন।

ইদ্রিস খান মানুষ হিসেবে দয়ালু সন্দেহ নেই। ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে তাড়ানোর কথা তাঁর মাথায় আসেইনি। বরং তাদের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করে নিলেন। কিন্তু ভাড়াটা দেবে কোত্থেকে? কেউ মাস গেলে কিছু দেয়, কেউ দেয় না। ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। শেষ অব্দি মামলা করতে হল। মামলা চলল তিন-চার বছর ধরে। তারপর দখল পেলেন। ততদিনে অনেক পরিবার ওখান থেকে চলেও গেছেন। দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল, একটি পরিবার বাদে আর কেউ নেই। কারণ?

কারণ, স্রেফ ভূত। কীভাবে হয়তো আতরের শিশির ছিপির ফাঁক গলিয়ে দু-একটা ভূত বেরিয়ে পড়েছিল। বেরিয়ে সোজা ফিরে এসেছিল নিজেদের পুরনো আস্তানায়। রাত দুপুরে কড়িকাঠে তারা বাদুড়ের মতো ঝোলে আর নাকি সুরে গান গায়। অদ্ভুত-অদ্ভুত রোগ জন্মায় বাসিন্দাদের শরীরে। নানা অঘটন।

বাড়িটা তো এল হাতে। কিন্তু ওখানে কলকাতায় ব্যবসা রাখা আর এখানে এতবড় বাড়ি খালি ফেলে রাখা, দুটোর তাল সামলাতে ভদ্রলোক হিমশিম খাচ্ছেন। একজন নেপালি দারোয়ান রেখেছেন। সে বাউন্ডারির গায়ে বানানো ছোট্ট ঘরটায় সপরিবারে থাকে। তাহলেও ইদ্রিস খান দুদিন অন্তর রাত্রে এসে ওখানে থাকেন। সঙ্গে থাকে আমাদের শিল্পী সেলিমের সেই মাসতুতো ভাই রনু। রোববার সারাটা দিনরাতই থাকেন ওঁরা। খানিকটা দূরে বসতি এলাকায় হোটেলে খেয়ে আসেন। কখনও নিজেরাও রান্না করেন। কিচেনে রান্নার সব সরঞ্জামই রয়েছে। সামনের বড় হলঘরে দুটো খাটিয়া, একটা টেবিল আর গোটা দুই চেয়ার আছে। দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো হয়েছে কাপড়চোপড় রাখার জন্যে। একটা ক্যালেন্ডারও দেখেছিলাম—সুন্দরী তরুণীর হাসিভরা মুখ।

দুবার গিয়ে আমরা খুব হই-হল্লা করেছিলুম। ওখানে অনেকেই কলকাতা থেকে ছুটির দিন গিয়ে পিকনিক করে আসে। কিছু চার্জ নেন ইদ্রিস। আমাদের অবশ্য কিছু দিতে হয়নি।

শুনেছিলাম, বাড়িটা বেচবার তালে আছেন ভদ্রলোক। সত্তর হাজার দাম দিতে চেয়েছে কোন এক মারোয়াড়ি। ভেঙে কারখানা বানাবে। কিন্তু লাখের কমে দেবেন না ইদ্রিস। তবে লাখ টাকা পাওয়াও আপাতত লাক। যা বদনাম বাড়িটার! জেনেশুনে কি কেউ নিতে চাইবে? যারা জানে তারাই এসে দরাদরি করে। তারপর পিছিয়ে যায়...

সেই ভুতুড়ে বাড়ি গুপ্টাসায়েব তাঁর তরুণী স্ত্রীর জন্যে কিনছেন শুনে আমি

রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলুম। ওঁরা নিশ্চয় জানেন না এ বদনাম।

সেদিনই বিকেলে করিডোরে গুপ্টাসায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যথারীতি হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো!

—কেমন আছেন স্যার?

—ভেরি গুড। কোন তকলিফ নেই।

—ইয়ে, সেলিম বলছিল, ওর এক আত্মীয়ের কাছে শুনেছে, নাকি—ব্যারাকপুরে দানিয়েল সায়েবের কুঠিবাড়ি আপনি কিনছেন!...খুব স্বাভাবিকভাবে বললুম কথাটা।

মিঃ গুপ্টা একটুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিলেন—দ্যাটস্ রাইট। সেলিমের আত্মীয়—ও, বুঝেছি। রনু? খানসায়েবের কর্মচারী তো?

—হ্যাঁ।

—বাড়ি কিন্তু অপূর্ব! আপনাকে নিয়ে যাব একদিন। লেখার ম্যাটার পাবেন যথেষ্ট।

একটু হেসে বললুম—আমি গেছি। একরাত্রে ছিলুমও।

—তাই নাকি? বলে হো হো করে হাসলেন মিঃ গুপ্টা।—ভূতে জ্বালায়নি তো? কেউ কেউ আমাকে নিষেধ করছে, বাড়িটার খুব বদনাম আছে নাকি।

—আমিও শুনেছি। তবে ওসব সুপারস্টিশন তো থাকেই। সব পুরনো খালি বাড়ি কেন্দ্র করে নানান অদ্ভুত গল্প ছড়ায়।

—ইউ আর রাইট। সুপারস্টিশন! তবে আমার স্ত্রীর ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, ও গোলমাল হই-চই একেবারে পছন্দ করে না। কলকাতায় এসে হাঁপিয়ে উঠেছে, যা ভিড়! ফ্ল্যাট ছেড়ে একবারো বেরোতে চায় না। বলে, রাস্তায় নামলেই গা ঘিনঘিন করে।

বলেই মিঃ গুপ্টা হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে টানলেন।—আসুন না, আমার চেম্বারে। গল্প করা যাক। মনটা খুব ভালো আছে আজ। ইমপোর্ট লাইসেন্সটার জন্যে খুব ছুটোছুটি করছিলুম। এবার নাইনটি পারসেন্ট সফল হওয়া গেছে। শুধু টেন পারসেন্ট ঝুলছে—জাস্ট এ সিগনেচার। হয়ে যাবে! আসুন।

মিঃ গুপ্টার বয়স কমপক্ষে বাহান্ন হবেই। চুলে পাক ধরেছে নিশ্চয়, কিন্তু কলপ করেন। চাঁছাছোলা ঝকঝকে মুখ, খাড়া নাক, ঠোঁটের কোনায় বুদ্ধিময় ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। চোখে চশমা আছে, কিন্তু দৃষ্টি খুব জ্বলজ্বলে। হঠাৎ এই সাড়ে ছ'ফুট উঁচু বলিষ্ঠ ফরসা লোকটিকে দেখলে যুবক বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু একটু পরে বয়সটা ধরা পড়তে বাধ্য। কারণ, হঠাৎ-হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে পড়েন বা গুরুতর ভঙ্গিতে কথা বলে ওঠেন।

তাহলেও মিশুকে লোক। ওঁর চেম্বারে যাবার পথে আনন্দ কোনার টেবিল থেকে আমাকে বক দেখাল।

চেম্বারটা ছোট্ট। কিন্তু রুচির পরিচয় আছে গোছ-গাছে। ছোট্ট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর আর্টসের সামগ্রীও দু-একটা রয়েছে।

—হট না কোল্ড বলুন?

মার্চের দু তারিখ আজ। গরম পড়েও এবার যেন পড়ছে না। রাতের দিকে সিরসির করে শীত আসে। এ সময় হট কোল্ড আমার কোনটাই ভাল লাগে না। বছরের এই সময়টা ভারি অদ্ভুত। ঠাণ্ডা খেলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগবে, গরম খেলে মনে হয় ভীষণ গরম লাগবে।

বললুম—কিচ্ছু না। এইমাত্র চা খেয়েছি।

—দেন, কফি?

—না, থাক্।

একটু চুপ করে থেকে দুলতে দুলতে মিঃ গুপ্টা বললেন—আপনি কী বলেন?

—কিসের?

—বাড়িটা। আমার স্ত্রীর ভীষণ পছন্দ। সে তো এ-বেলায় পেলে ও-বেলায় গিয়ে ওঠে! আসলে হয়েছে কি জানেন, ও বোম্বের শহরতলি এলাকায় এমন জায়গায় মানুষ, যেখানে কোন ভিড় নেই, গোলমাল নেই, স্রেফ নির্জন একটা-একটা বাড়ি—প্রচুর ফাঁকা জায়গা, বাগান, গাছপালা! ছোট ছোট হিলকও রয়েছে, অন্যদিকে সি-বিচ। কলকাতা ওর একদম পছন্দ নয়। এখানকার অ্যাসোসিয়েশনেও ও ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তাই বাইরে একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। মিলেও গেল। কিন্তু...

ওঁকে চুপ করতে দেখে বললুম—তাহলে আর কিন্তু কী?

—কিন্তু আমি তো সারাদিন এখানে থাকব। ও একা কীভাবে ওখানে কাটাবে?

—একজন আয়া-টায়া ঠিক করে দিন। সারভ্যান্টও দরকার হবে।

—দেখা যাক্। মোটা টাকা অ্যাডভান্সও করা হয়েছে, পাক্কা রিসিপ্ট বা ডিড কিচ্ছু হয়নি এখনও। নব্বই হাজারে রফা হয়েছে। ইন ইকোয়াল সিক্স ইয়ারলি ইনস্টলমেন্টে টাকা শোধ করতে হবে। এমন চমৎকার সুযোগ হয় না। ওনার ভদ্রলোক রিয়্যালি ও ভেরি কাইন্ডহার্টেড ম্যান। যদ্দিন টাকা পুরো শোধ না হয়, আমাকে উনি অর্ধেক অংশে দখল দিচ্ছেন। তবে ভাড়াটে হিসেবে!

—ভাড়াটে হিসেবে! সে কী? ভাড়াও দিতে হবে নাকি?

—সামান্য। মাসে একশো টাকা। তবে কিস্তি শোধ হলে ভাড়ার টাকাটা পুরো ফেরত পাব আমি। এর চেয়ে আর কতটা বেনিফিট আশা করা যায় বলুন? তার মানে ছ'বছরে কথামতো টাকা শোধ হলে আমি ফেরত পাচ্ছি বাহাত্তর শো টাকা।

—একেবারে নিলেই তো পারতেন।

হেসে উঠলেন মিঃ গুপ্টা। —মশাই, কী ভাবেন আমাকে! স্রেফ পরের টাকায় ব্যবসা করি। ধার-দেনায় ডুবে আছি। ব্যাঙ্কের লোনের সুদই দিতে হয় মাসে দেড় হাজার টাকা। বাইরে ডাঁট বজায় রেখেছি মাত্র। তবে ইট ইজ সিওর, ইমপোর্ট লাইসেন্সটা হাতে এসে গেলেই তখন দেখবেন প্রকাশচন্দ্র গুপ্টা কী কাণ্ড করে!

উনি আবার হেসে উঠলেন। আমার মাথায় ওঁর এই স্ত্রীমহোদয়া সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন গজগজ করছিল। কিন্তু অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো যায় না। শেখরটা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। সে এসব ব্যাপারে যেমন নির্ভীক, তেমনি বেহায়া। কিন্তু আমিও নিজেকে 'দাবায়ে রাখতে' পারলুম না! অভিমানী সুরে বললুম—মিঃ গুপ্টা, এটা কী হচ্ছে বলুন তো?

—কী, কী? বলে ঝুঁকে এলেন মিঃ গুপ্টা।

—অমন গুণবতী বউদির সঙ্গে একবারও আলাপ হল না এ অভাগার।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কেন নয়? আসুন না একদিন!

—বাঃ! কোথায় যাব, কখন যাব—তার ঠিক নেই...

বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্টা বললেন—আনন্দ আপনাকে নিয়ে যাবে। সামনের রোববার আসুন। বলে কোন গুপ্তস্থানে চাবি টিপলেন। ঘণ্টা বাজল।

একজন বেয়ারা এল। বললেন—আনন্দবাবুকো বোলাও।

একটু পরেই আনন্দ এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে তার প্রবল বন্ধুতা—অথচ তার বসের সামনে এখন বসে আছি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া, তাই সে সপ্রতিভ হেসে আমাকে বলল—কতক্ষণ? আমি লক্ষ্যই করিনি তুই...

মিঃ গুপ্টা গম্ভীরমুখে বললেন—আনন্দ, তুমি এঁকে বাসা থেকে নিয়ে সামনের রোববার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাবে। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। তোমার আবার কিচ্ছু মনে থাকে না। লিখে রেখো। সকাল ন'টা।

—আচ্ছা স্যার।

—ও-কে। এসো।

বেচারা আনন্দ বিরসমুখে চলে গেল। আমি বললুম—কেন? একা আমিও যেতে পারতুম! ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী ছুটির দিনে?

—না। ওকেও ওদিন যেতে হবে। দরকার আছে। আপনার বাসা হয়ে আসবে। ও চেনে তো? সরি!... বলে ফের বোতাম টিপলেন।

বললুম—ওকে ডাকার দরকার নেই। আমি বলে দেব'খন।

—উঁহু। ভুলে যাবে। ...সেই বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললেন—ফির্ আনন্দবাবুকো বোলাও।

আমি মনে মনে হাসছিলুম। এবার আনন্দ এল কাঁচু-মাচু মুখে। হাতে একটা নোটবই, খোলা কলম। —স্যার?

—তোমাকে বললুম যে এঁকে বাসা থেকে নিয়ে যেতে হবে—আর তক্ষুণি ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা স্যার। কিন্তু চেনো এঁর বাসাটা কোথায়?

—না স্যার।

মিঃ গুপ্টা হেসে ফেললেন। কে—আনন্দ আপনারাই নিন বিজনবাবু। ও আসলে আর্টসলাইনের ছেলে, ভুল করে কমার্সে এসে পড়েছে! ভীষণ—ভীষণ আত্মভোলা! নিন, বলুন বিজনবাবু।

ওর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে ঠিকানা লিখে দিলুম। দেখে আনন্দ বলল—আরে! আমার বড়দার বাসার কাছেই তো! ঠিক আছে।

ও চলে গেলে মিঃ গুপ্টা বললেন—আপনার বউদি ভীষণ বই-টই পড়ে। আপনার তো বই-টই আছে। পারলে দু-একটা নিয়ে যাবেন, ভাব হয়ে যাবে।

এই সময় সেই বেয়ারাটা ঢুকে আমাকে বলল—আপকা লিয়ে সেলিম সাহাব ইন্তেজার করছে, স্যার। বহুৎ জরুরি কাম আছে। মধু আভি এসেছিল।

বিরক্তমুখে উঠে দাঁড়ালাম।—চলি মিঃ গুপ্টা।

উনি কাগজের পাতায় চোখ রেখে বললেন—ওকে। উইশ ইউ গুড় লাক। রোববার সকাল ন'টা। রাইট?

—নিশ্চয়।

আমাদের অফিসে আসতেই সেলিম তেড়ে এল।—শালাকে আজ মেরেই ফেলব। কী ফুসুর ফুসুর করতে গিয়েছিলি রে গুপ্টার কাছে? ওর দ্বিতীয় পক্ষ ডাইনী মেয়েছেলে তা জানিস? রক্ত চুষে ছিবড়ে করে ফেলবে—মরে যাবি বলছি। এখন শোন্ মোহিনী জুয়েলার্স পেমেন্ট দেবে না। নট এ সিঙ্গল্ ফার্দিং!

ঘাবড়ে গেলুম তক্ষুণি। সর্বনাশ! ওদের বিজ্ঞাপনের টাকা থেকে বরাবর মোটা কমিশন আমরা পেয়ে থাকি। এই বিজ্ঞাপনটা ছিল চারটে দৈনিকে। কম করেও শ'পাঁচেক আমাদের পাওনা। এর দিকে হাপিত্যেশ করে সবাই বসে আছি। দৈনিকগুলো আমাদের কাছে যথারীতি বিল পাঠিয়েছে। অথচ পেমেন্ট দেবে না পার্টি, এর কী মানে হয়?

হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে সেলিম বলল—বিজ্ঞাপনে যা ছবি দিয়েছ তোমরা, মোহিনী জুয়েলার্সের বুড়ো মালিক আগুন হয়ে গেছে! আমাকে তো জুতো ছোড়ে আর কী!

—বাঃ! ওরা তো ডিজাইন ম্যাটার সব অ্যাপ্রুভ করেছে!

—কে করেছে? খোদ মালিক করেছে কি? মালিকের নাতি তো একরত্তি চ্যাংড়া। তার সইয়ের কোন দাম নেই।

শেখর চুপচাপ বসেছিল। বলল—সিল তো দিয়েছে। চালাকি নাকি? মামলা করব।

বললুম—বুড়োর বক্তব্য কী?

সেলিম বলল—ছবিটা অশ্লীল। তার ওপর নাকি ভুল হিসট্রি বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মেয়েরা ন্যাংটো থাকত বলে কোন ব্যাটাচ্ছেলে?

—যা বাবা! ন্যাংটো কোথায়? বুকে কাঁচুলি, কোমরে ঘাগরা! ও তো জাস্ট কালিদাসের নায়িকা!

সেমিল বলল—বোঝা গে না বুড়াকে। আমি ভাই আর যাচ্ছি নে!

রঞ্জন বাইরে থেকে ঢুকে বলল—হলটা কী? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

বললুম—হল মাথা আর মুণ্ডু! সেলিম, তুই কিন্তু ছবিটা এঁকেছিস! মাইন্ড দ্যাট! তখনই আমি বলেছিলুম—যে মেয়েরা অমন ন্যাংটামি মানত, তারা সোনারুপোর গয়না পরত না। স্রেফ ফুল আর পাতা দিয়ে সাজত। তুই শুনলিনে!

সেলিম বলল—থাম্। ইতিহাসের পণ্ডিত তুই!

রঞ্জন বলল—ঠিক আছে। গোলমাল পরে করিস। আমাকে বুঝিয়ে বল্ তো, কী হয়েছে।

ওকে সেলিম বোঝাতে থাকল। আমি শেখরকে বললুম—এই, চল্—তুই আর আমি ব্যাপারটা দেখে আসি।

শেখর বলল—ছেড়ে দে। টাকা ওর বাপ দেবে।

—সবটাতেই তোর ওই? পেমেন্টটা না পেলে আমাদের নামে কেস করে টাকা আদায় হবে জানিস?

শেখর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। —চল্, দেখে আসি। এক মিনিট, সেই অজন্তা সংক্রান্ত ইংরিজি বইটা সঙ্গে নিই। বুড়োর তাক লেগে যাবে।

আমরা বিশাল সেই ভারী কেতাবটা নিয়ে এক বুড়ো মক্কেলের সঙ্গে লড়তে বেরোলুম।

সেই রোববার আসার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হয়ে গেল ঊর্মিলা গুপ্টার সঙ্গে। শনিবার বিকেলে আর সব অফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আনন্দকেও যেতে দেখেছি। যাবার সময় সে একটা অদ্ভুত ইশারা করে গিয়েছিল, তখন বুঝিনি। একটু পরে বুঝলুম—যখন গুপ্টাসায়েব বাইরে থেকে সাড়া দিলেন—মে উই কাম ইন জেন্টলমেন?

আমরা চারজনে কেউ টেবিলে কেউ চেয়ারে পা তুলে গ্যাঁজাচ্ছিলুম। তক্ষুণি সিরিয়াস হয়ে নড়েচড়ে বসলুম। সেলিম লাফ মেরে খাড়া হল। রঞ্জন হকচকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। শেখরের চোখদুটো গোল হয়ে যেতে দেখলুম।

আনন্দর বর্ণনায় বাড়াবাড়ি তো ছিলই না, বরং বেচারার ভাষায় কুলোয়নি—শ্রীমতী ঊর্মিলা (পরে জানতে পারি ওঁর নাম আসলে ঊর্মিমালা) প্রচণ্ড পরীমূর্তি, অবিশ্বাস্য শরীর! আমি ওঁর ডানাদুটোও দেখতে পাচ্ছিলুম। পরে রঞ্জন বলেছিল, আরব সাগরের এই ঢেউ হুগলি নদীর সব জেটি ভাসিয়ে দেবে।

হালকা নীল শাড়ির জমিনে সোনালি বিন্দুর ঝিকিমিকি, জোরালো আবেগের

মতো দুই স্বাধীন বাহু, ডিমালো খোঁপায় গোঁজা একটি তাজা গোলাপ ইত্যাদি মিলে মিসেস গুপ্টার অস্তিত্ব আমাদের ক্ষুধার্ত ঘর ভরে দিল। তীব্র সুগন্ধের ঝাঁঝ ভনভন করে উঠল।

মনে হল, গন্ধটা এ ঘরে চিরকাল থেকে যাবে।

সুন্দর কিছু দেখলেই বরাবর আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ি। ধুরন্ধর মিঃ গুপ্টা নিশ্চয় টের পেলেন আমাদের চার-আনাড়ি ব্যাচেলারের হকচকানি ভাব। মৃদু হেসে বললেন—আলাপ করিয়েই দিই। উর্মি, এনারা সেই শিল্পী-সাহিত্যিক গ্রুপ! আর...

বলার দরকার ছিল না। চারজোড়া হাত এক সঙ্গে নমস্কার করল। জবাবে শ্রীমতী উর্মিও ঠিক ফিল্মস্টারের ঢঙে নমস্কার করলেন। ঠোঁট থেকে সেন্টের ফোঁটার মতো হাসি ঝরে পড়ল। তারপর বললেন—বিজনবাবু কে?

খুশিতে ভরে গেলুম। মিঃ গুপ্টা বললেন—উনি বিজন আচার্য, ইনি রঞ্জনবাবু...

রঞ্জন বলে দিল—রায়!

—ইয়া। রঞ্জন রায়। আই থিংক, হি ইজ এ পোয়েট।

শেখর বলল—আমি শেখর ব্যানার্জি। ছবিটবি আঁকি।

সেলিম ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। এবার শুধু বলল—আমি সেলিম আমেদ।

হঠাৎ উর্মি তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন। কেমন যেন চমকে উঠলেন মনে হল। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হল—কিন্তু শুধু 'আচ্ছা' বলে থেমে গেলেন।

এতক্ষণ বললুম—দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন, বসুন।

মিঃ গুপ্টা ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে বললেন—না ব্রাদার। বসা যাবে না। জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উর্মি এল, তো ভাবলুম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এনিওয়ে, উর্মি, এঁদের তাহলে কাল সকালে চায়ে জন্যে ইনভাইট করি?

উর্মি একটু হাসলেন—কেন নয়? বিজনবাবুর তো যাবার কথা ছিল, বলছিলে।

শেখররা আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকাল। বললুম—আমার নামটা আপনার জানা আছে দেখছি। এমন কোন সুকৃতি আমার আছে কি?

মিঃ গুপ্টা বললেন—খু-উ-ব। উর্মি ভীষণ ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ে। আপনার লেখার ফ্যান।

এটা মিঃ গুপ্টার বাড়াবাড়ি হতে পারে। কারণ এসব স্ত্রীলোক বাংলায় আদৌ কিছু পড়েন বলে আমার ধারণা নেই। যা পড়েন, তা ইংরিজি ট্যাস ধরনের আজেবাজে সব পত্রিকা—যাতে বিজ্ঞাপনই বেশি টানে পাঠককে।

কিন্তু উর্মি বললেন—নববঙ্গ পত্রিকায় আপনার একটা থ্রিলার পড়লুম। ভালো লেগেছে।

বলে কী! থ্রিলার আমি কবে লিখলুম? স্রেফ গুল ঝাড়ছে। আমতা আমতা হাসতে হয় এসব ক্ষেত্রে। ও আর এমন কী লেখা, বাজে, ইত্যাদি বলতে হয়।

উর্মি পরক্ষণে ফের বলে উঠলেন—মেয়েরা প্রেমিককে খুন করতে পারে কি না, আই ডাউট। তবে আপনি নিশ্চয় অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। দ্যাটস্ অ্যান এক্সসেপশান, আই থিংক।

তাহলে সত্যি পড়েছেন তো? কিন্তু ওটা থ্রিলার হতে যাবে কেন? নিছক প্রেমের গল্প। প্রেম নিয়ে চিরকাল একটু আধটু খুনোখুনি কি হয়ে আসছে না?

তারপর হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে সেলিমের দিকে ঘুরে বলে উঠলেন—আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সেলিম আস্তে জবাব দিল—বোম্বোতে।

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন উর্মি। ঠোঁটের একটুখানি কামড়ে ধরলেন। —বোম্বে ইজ এ বিগ প্লেস। ঠিক কোথায়...

—বান্দ্রায়। মিঃ লাহিড়ীর স্টুডিওতে।

—লাহিড়ী। ও। দ্যাট পেইন্টার।

—হ্যাঁ। তাছাড়া অবনীদার পাশেও আমাকে দেখেছেন। ফিল্ম ডাইরেকটার।

—তাই বুঝি।... বলে উর্মি স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

মিঃ গুপ্টা ঘড়ি দেখলেন আবার। —ওক্কে ফ্রেন্ডস? আজ চলি। তাহলে কথা রইল, আগামী কাল সকালে আপনারা কাইন্ডলি একটু ম্যানেজ করে চলে যাবেন। বাই দ্য বাই, আনন্দকে একটু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, ওকে পাচ্ছেন না। আমি রাস্তার ডাইরেকশন দিচ্ছি।...

একটু পরেই গুপ্টা দম্পতি চলে গেলেন। তখন সেলিমকে ধরলুম আমরা, অ্যাই শালা। শিগগির! ফ্ল্যাশ ব্যাক। এক্ষুণি!

সেলিম গম্ভীর হয়ে বলল—আরে বাবা, তেমন কিছু নয়। গত বছর বোম্বেতে কয়েক মাস হন্যে হয়ে ঘুরছিলুম, তখন ভদ্রমহিলাকে নানা জায়গায় নানা ব্যাপারে দেখেছিলুম!

শেখর বলল—নানা ব্যাপারটা কী?

—লাহিড়ীদার নাম শুনেছিস? তুই তো একজন 'শিল্পী'।

—জ্ঞানেশ লাহিড়ী? সে তো কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

—পেট চালাতে হবে না? যেমন তুইও চালাচ্ছিস।

শেখর তেড়ে কী বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললুম—স্টপ ইট্! সেলিম, ফ্ল্যাশব্যাকটা চালিয়ে যা।

সেলিম বলল—তখন ওঁর নাম ছিল মিলি সেন। মডেল হয়ে পয়সা রোজগার করতেন। কখনও ঘোরাঘুরি করতেন। অবনীদা একটা হিন্দি ছবিতে ছোট্ট রোল দিয়েছিলেনও। তেমন সুবিধে করতে পারেননি। চেহারা থাকলেই তো হয় না! স্ক্রিন টেস্টে তেমন ওৎরাতে পারেননি, তার ওপর ভয়েস কেমন ক্র্যাকপড়া—লক্ষ্য করলি নে?

রঞ্জন বলল—যাঃ অমন চেহারা স্ক্রিন টেস্টে ওৎরাল না। কোন্ শালা ক্যামেরাম্যান ছিল রে?

সেলিম বলল—বাজে বকিস নে! অবনীদা নিজেই নামকরা ক্যামেরাম্যান। তিনটে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

শেখর বলল—গলার স্বর তো বেশ মিঠে লাগল!

সেলিম বলল—না, সাউন্ড রেকর্ডিং ঠিকমতো হয়নি! ও সব তোরা বুঝবি নে!

আমি বললুম—তা ভদ্রমহিলা এই গুপ্টার ঘাড়ে এসে চাপলেন শেষ অব্দি? ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে।

রঞ্জন বলল—তোর অবনীদাকে চিঠি লেখ না।

—কেন?

—ব্যাপারটা ডিটেলস জেনে নে।

—লাভটা কী?

শেখর বলল—কিছু জানা। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন। মানুষের এটা স্বভাব। জ্ঞানের জন্যেই তো মানুষকে স্বর্গ থেকে চলে আসতে হয়েছিল।

রঞ্জন বলল—তাছাড়া, তোরও টু-পাইস রোজগার হতে পারে সেলিম।

সেলিম বলল—কিসে?

—ব্ল্যাকমেইল করবি মিসেস্ গুপ্টাকে। বলবি, মালকড়ি না ছাড়লে পুলিশে জানিয়ে দেব যে, আপনি একজন ফেরারি আসামী!

সেলিম চটে গিয়ে বলল—তোরা সবটাতেই বাড়াবাড়ি করিস। উনি ফেরারি আসামী কে বলল তোকে?

এইসব কথাবার্তা বিকেল পাঁচটা অব্দি চলল আমাদের। তারপর আফিসে তালা আটকে একটা বারের দিকে বেরিয়ে পড়লুম।...

পরদিন সকালে আমার বাসায় এসে জুটল ওরা। রঞ্জন এল ঢাকুরিয়া থেকে, শেখর এল পাইকপাড়া থেকে, আর সেলিম এল পার্ক সার্কাস থেকে। আমি থাকি রিপন স্টিটের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত বাড়িতে—ছাদের ওপর একটা মোটামুটি ভাল ঘর।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ক্যামাক স্ট্রিটে গেলুম। গেটে লেখা দা ইভনিং ভিলা। অদ্ভুত নাম! কোন ধনী সায়েবের বাড়ি ছিল। এও এক বাগানবাড়ি বলা যায়। পুরনো ভিতে মাল্টিস্টোরিড দালান গড়া হয়েছে। টেনিসলন আর বাগিচা আছে। লিফট আছে।

দরজা খুলে মিঃ গুপ্টা আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। এ কোথায় এলুম! প্রকাণ্ড বসার ঘর, পুরোটায় লাল কার্পেট, মধ্যিখানে একটা সোফা সেট। দেয়ালের ধারে বিশাল পিয়ানো রয়েছে। এখানে-সেখানে ছোটবড় ভাস্কর্য, দেয়ালে মর্ডান আর্ট, কোনায় একটা সেলফে চমৎকার গোছানো বইপত্তর। ভঙ্গিটা সেকাল-একালে মেশানো।

আমাদের বসতে বলে গুপ্টা গেলেন। শেখর চোখ টিপে ফিসফিস করে বলল—মেয়েমানুষের জন্যে কত কী দিতে হয় রে! ভাবা যায় না।

রঞ্জন কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ঊর্মি একরাশ সেন্টের গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। আজ খোঁপা নেই। সদ্য স্নানের আভাস দিচ্ছে খোলা চুল। ঘিয়ে রঙের তাঁতের শাড়ি পরনে, খুব স্বাভাবিক চেহারা। ঠোঁটে রঙ বা কোন প্রসাধন নেই। আমার তো মনে হল, নিতান্ত কচি কলেজ গার্ল হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা! বয়স কম দেখাচ্ছে আজ। স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। নমস্কার করতে করতে এলেন। কার্পেটেই বসে পড়লেন। আমরাও ব্যস্ত হয়ে সোফা ছেড়ে নেমে বসলুম। সারা ঘর গন্ধে মউমউ করছিল।

ঊর্মি বললেন—ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, আপনারা এসেছেন! ফ্ল্যাটটা বেশ বড়—এত একা লাগে! হাঁপিয়ে উঠি। ও তো কাজের মানুষ! একা থাকতে হয়।

বললুম—মিঃ গুপ্টা বলছিলেন, আপনি নাকি নির্জনতাই পছন্দ করেন!

—কে জানে! বলে অস্ফুট হাসলেন ঊর্মি। —তবে বেশি ভিড়ও ভাল লাগে না। আপনাদের কলকাতায় বড্ড ভিড় কিন্তু।

শেখর বলল—যা বলেছেন! কলকাতায় আর থাকা যাবে না। বর্ষার অবস্থা দেখলে তো আরও ভয় পাবেন।

—বর্ষার অনেক পরে এসেছি। তবে সব শুনেছি অলরেডি। রাস্তাঘাট সব ফ্লাডেড হয় নাকি।

আমি বললুম—কিন্তু আগামী বর্ষার অনেক আগেই তো ব্যারাকপুরের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন?

ঊর্মি খুশি হয়ে তাকালেন আমার দিকে। —কথা তাই। বাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

রঞ্জন বলল—আমরা সেখানে মাঝে মাঝে যাই কিন্তু। পিকনিকের স্পট হিসেবে চমৎকার!

—তাই বুঝি!

এই সময় মিঃ গুপ্টা বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর কাছাকাছি বসে পড়লেন। বললেন—বেডরুমে এয়ারকন্ডিশনারটা সারানো হচ্ছে। মিস্ত্রী এসেছে, তাই দেরি হল। কিছু মনে করবেন না ব্রাদার!

ওরে বাবা! বউয়ের জন্য শোবার ঘরে এয়ারকন্ডিশন! ভাবা যায় না। আমরা নিশ্চয় চমৎকৃত হয়ে বোকার মতো হাসলুম। তারপর নানান গল্পগাছা চলতে থাকল। একফাঁকে ফের গুপ্টা কাজ দেখতে ভেতরে চলে গেলেন।

এতক্ষণ সেলিম চুপচাপ বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে ঊর্মি বলল—আপনি কিন্তু কোন কথা বলছেন না!

শেখর বলল—কী রে? পেটব্যথা করছে নাকি?

আমরা হেসে উঠলুম। সেলিম উর্মির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—আচ্ছা মিসেস্ গুপ্টা, অবনীদার সঙ্গে আপনার আর যোগাযোগ নেই?

উর্মি একটা অপ্রস্তুত হলেন যেন। —না, মানে, ফিল্মের লাইনে আমার চেনাজানা খুব কমই ছিল। তাই যোগাযোগের প্রশ্ন ওঠে না। ...পরক্ষণে একটু হাসলেন। —তবে সে একটা চাইল্ডিশ্ ব্যাপার। আমার নেশা কেটে গেছে অলরেডি।

রঞ্জন সোৎসাহে বলল—কেন, কেন? আপনি তো দুর্দান্ত হিরোইন হতে পারতেন!

উর্মি মাথা দোলালেন। কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সেলিম যে জেনে বা না জেনে ওঁকে কোথায় আঘাত করে বসেছে। সেলিমটা বড্ড একগুঁয়ে।

গুপ্টাসায়েব আবার এলেন। তাঁর সঙ্গে একটা ছোকরা ট্রেতে চা-ফা আনছে দেখা গেল। একগাদা সব চানাচুর, কয়েকরকম বিস্কুট, সন্দেশও আছে। কিছুক্ষণ জমকালো ভঙ্গিতে খাওয়া চলতে থাকল।

এক সময় মিঃ গুপ্টা বলে উঠলেন—দা আইডিয়া! উর্মি, আমরা তো নাইনটিনথ মার্চ একটা ছোটখাট পার্টি দিতে পারি!

শেখর বলল—অকেশানটা কী?

—বাগানবাড়িতে ওদিনই যাচ্ছি আমরা।

উর্মি বলল—বেশ তো। ইউ অ্যারেঞ্জ! আমার ভাল লাগবে।

উর্মির মধ্যে একটা রূপান্তর ঘটেছে, আমি অন্তত টের পাচ্ছিলুম।

তার সেই স্মার্টনেস, ঔজ্জ্বল্য কেমন যেন মিইয়ে গেছে কখন। সন্দেহ ঘনীভূত হল। সেলিম নিশ্চয় কোথায় আঘাত করে বসেছে। আমাদের দলে ওর উপস্থিতিটা যেন উর্মি সইতে পারছেন না—অস্বস্তি অনুভব করছেন।...

সেদিন চায়ের পার্টিটা অবশ্য জমানোর চেষ্টা করা হল খুব। গুপ্টাসায়েবের রসিকতা, শেষে শেখরের রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেলিম পিয়ানো বাজালও চমৎকার, কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্মির ভাবান্তর ঢাকা গেল না। ওঁর সুন্দর মুখের ওপর মাঝে মাঝে একটা ছাইরঙের আভা ভেসে উঠতে লাগল।...

পরদিন সেলিম বলেছিল, অবনীদা শিগগির কলকাতা আসছেন শুনলুম। এলে সব জানতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিলি সেন একটা সাংঘাতিক কিছু করেই বোম্বে থেকে চলে এসেছেন। মিঃ গুপ্টার পাশে ওঁকে স্ত্রী বলে কিছুতেই ভাবতে পারছিনে আমি। দেয়ার ইজ সামথিং মিসট্রিয়াস!

রঞ্জন বলেছিল—কিন্তু দিব্যি তো বাস করছেন দু'জনে একসঙ্গে!

—আজকাল অমন অনেকে থাকে। ওটা কোন ব্যাপার নয়।

আমি বলেছিলুম—তাহলে তুই বলছিস, ওঁকে মিঃ গুপ্টা বিয়ে করেননি?

—হয়তো না!

—কেন না?

—আরে বাবা, গুপ্টার রীতিমতো বউ-ছেলেমেয়ে সব রয়েছে তো! সে আমি খোঁজ নিয়েছি। উনি কাজের অছিলায় সপ্তায় তিনরাত্তির থাকেন মিলি সেনের কাছে, বাকি রাত্তির বড় বউয়ের কাছে। আনন্দটা সব জানে। জিগ্যেস করিস।

শেখরের 'সাইকলজি' নিয়ে বাতিক আছে। মাঝে মাঝে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে সে আলোচনা করে। সে বলেছিল—তবে সবচেয়ে মিসট্রিয়াস ব্যাপার হচ্ছে সেন্ট!

সেলিম ট্যারা তাকিয়ে বলেছিল-সেন্ট মানে?

গন্ধ। সুগন্ধ। সুরভি!

—তার মানে?

শেখর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। —ভদ্রমহিলা অত কড়া ঝাঁজের সেন্ট ব্যবহার করেন কেন? বাড়াবাড়ি মনে হয় না তোদের? সব সময় সারা গায়ে সেন্ট মেখে থাকেন যেন।

—হ্যাঁ! তুই ওঁকে দেখেছিস?

রঞ্জন বলেছিল—কোথায় নাক ঠেকিয়েছিলি রে?

শেখর রেগে গিয়ে বলেছিল—বুকে।

এরপর রসিকতাটা বাড়তে বাড়তে অশ্লীলতায় পৌঁছে গিয়েছিল নিশ্চয়। তাহলেও শেখরের কথাটা ভাববার মতো। কোথাও একটা গা ঘিনঘিনে ব্যাপার না থাকলে সত্যি তো, অত বাড়াবাড়ি কেন সেন্ট নিয়ে? সে-কি উর্মির শারীরিক ক্ষেত্রে কদর্য স্মৃতির ব্যাপার? না কি আরও জটিল কিছু? উর্মি কি বাইরের সবকিছু নোংরা দুর্গন্ধময় মনে করেন? কেন মনে করেন? সুগন্ধিতে মানুষের—বিশেষ করে স্ত্রীজাতির আসক্তি খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশি। কিন্তু উর্মির আসক্তিটা যেন মাত্রাহীন। আমি কল্পনায় মাঝে মাঝে উর্মির দেহের কোথাও কোথাও নাক ঠেকিয়ে পরীক্ষা করছিলুম। উরে বাস! প্রতিটি লোমকূপে একগাদা করে দুর্মূল্য তরল সুরভি চবচব করছে! আমার বুক অজানা ভয়ে ঢিবঢিব করে ওঠে।

ইতিমধ্যে আনন্দ যথারীতি এসেছে। তার ওই এক কথা। তার বস প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। এরপর বড় বউকে না ডিভোর্স করে বসেন, সেই ভয়। কারণ বড় বউ আজকাল আনন্দকে মাঝেমাঝে ডেকে পাঠান। আনন্দ বুঝতে পারে, কৌশলে স্বামীর দ্বিতীয় জীবন বা গতিবিধির খবর আদায় করতে চান ভদ্রমহিলা। আনন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। চাকরি গেলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

এইসব জেনে বেচারা বড় বউটির প্রতি মমতা হচ্ছিল আমাদের। গুপ্টাসায়েবকে আর ভাল চোখে দেখতে পারছিলুম না। যত বেলেল্লাই হই, নীতিবোধ ইত্যাদি আমাদের সংস্কারে শেকড় বসিয়ে রয়েছে। তবে আশ্বস্ত হয়েছিলুম যে

গুপ্টাসায়েবের কোম্পানিটি তার বড় বউয়ের নামে। এমন কি কয়েকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও তাঁর নামে আছে। তাই তাঁর অজান্তে এক পয়সাও তোলা যায় না। আর সেজন্যেই বাগানবাড়ি কিনতে গুপ্টাকে গাড়ি বেচে ফেলতে হয়েছে। আনন্দ বলেছে, প্রথম পক্ষ খুব হিসেবী মানুষ। লেখাপড়াও জানেন। ভাল করে না বুঝে কোথাও সই করেন না।

শুধু একটা ব্যাপার অবাক লাগল। এমন গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার গুপ্টাসায়েব আমাদের কাছে প্রকাশ্য করে তুললেন কেন? আনন্দ তাঁর কাছে হয়তো বিশ্বস্ত কর্মচারী। কিন্তু আমরা তো বাইরের লোক!

তাছাড়া প্রকাশ্যে ঊর্মি ওঁর অফিসে আসেন মাঝে মাঝে। অফিসের অন্য কেউ ওঁর প্রথমার কানে তুলে দেবার সম্ভাবনা প্রচুর। আনন্দ এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আজকাল দিশি সায়েবসুবোদের এমন সঙ্গিনী থাকে, এটা সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া চাকরি যাবার ভয় তো সবারই। কেন মিছিমিছি রিসক্ নেবে কেউ? লাভটা কী? চাকরি করতে এসেছে, মাইনে পাচ্ছে। বসের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না কেউ।

তা ঠিক। আজকাল অনেক কিছু গা-সওয়া হয়ে গেছে মানুষের। ক্রমশ সবাই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। নিজেদের জীবনেই লক্ষ-কোটি ঝঞ্ঝাট। পরের জীবন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। মুখে পরচর্চা একটু-আধটু করা যেতে পারে, তার বেশি উৎসাহ কারো থাকে না আজকাল।

এবং এ কথা গুপ্টাসায়েব বোঝেন বলেই পরোয়া করছেন না। তিনি জানেন, আমরাও যথারীতি মাইন্ড করবো না—যাকে বলে। নেহাত বড় বউয়ের প্রতি অনেক নৈতিক ও আবশ্যিক দায়-দায়িত্ব আছে, তাই সেক্ষেত্রে চক্ষুলজ্জা মেনে চলছেন। তবে কতদিন মেনে চলবেন, তাও অনিশ্চিত। কবে শুনব, ডিভোর্সের মামলা উঠেছে আদালতে। এমন তো আজকাল আকছার হচ্ছে। খবরের কাগজে কত খবরও বেরোচ্ছে।

তবে এই প্রথম কলকাতা শহরটাকে বড় রহস্যময় মনে হল আমার। বাপস, কী প্রকাণ্ড এই শহর! না—আয়তনের কথা ভাবছিনে। আশি-পাঁচাশি লাখ লোক নিয়েই তার বিশালতাটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। এ শহরে যে কেউ তিনটে-চারটে কেন, দশটা বউ দশ জায়গায় মেনটেন করলেও কোন বউ কোন বউয়ের অস্তিত্ব টেরও পাবে না। চিৎপুরের কোন বউ কামাক স্ট্রিটের কোন সতীনের খবর পেতে কয়েক জন্ম লেগে যাবে! তাছাড়া এ শহরের বড় গুণ, কেউ কারো খবর রাখে না, রাখতে চায় না। নাক গলায় না অন্যের পারসোনাল ব্যাপারে। মেট্রোপলিটন শহরের সব বৈশিষ্ট্য এখন কলকাতার গায়ে ঘায়ের মতো দগদগ করছে।...

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন আনন্দ এসে আমাকে ফিসফিস করে বলল—শোন,

তোকে একবার যেতে বলেছিল, সেকেন্ড লেডি। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম বলতে।

অবাক হয়ে বললুম—আমাকে! কেন?

—ডাইনী তোর মেটেটা খুব পছন্দ করেছে! চলে যাস যে কোন সময়।

—কী বলিস যা তা! কেন যেতে বললেন, বলেননি?

—না। ফোনে জেনে নে। এই নে, নম্বর দিচ্ছি। কিন্তু খবর্দার, কাকেও দিবিনে। বসের বারণ আছে। আর একটা কথা, ফোন করার আগে দেখে নিবি, গুপ্টা অফিসে আছে নাকি।

—উনি ফোন করলেন না কেন?

—কেন করলেন না, আমি জানি নাকি? এখন তো গুপ্টা অফিসে আছে। তুই শ্রীমতীকে ফোন কর না! কী বলে শোন্।

বলে আনন্দ চলে গেল। ও এক অদ্ভুত ছেলে। যত কৌতূহল, তত ওর নিরাসক্তি সব ব্যাপারে। ভীষণ খামখেয়ালিও।

শেখর পিছনের চেম্বারে ছবি আঁকছিল। সেলিম নেই। রঞ্জন এ ঘরের কোনার টেবিলে ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। ফোন আমার টেবিলে। দুরু-দুরু বুকে রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করলুম। রঞ্জন তাকাল না।

চাপা সুদূর রিঙের শব্দ ভয়ে ভয়ে সাড়া দিচ্ছিল ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। বার তিন বাজার পর বন্ধ হল। উত্তেজনায় আমার দম আটকে যাচ্ছিল। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে মিঠে শব্দ ভেসে এল—হ্যালো!

—মিসেস্ গুপ্টা বলছেন?

—কে আপনি?

—বিজন আচার্য।

—ও!

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম, ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল এর আগে, হঠাৎ যেন আশ্বস্ত হওয়ার আভাস ফুটে বেরোল 'ও' শব্দটার মধ্যে। হয়তো একটু হাসিও শুনলুম। তারপর স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণে ঊর্মি বললেন—আপনি! কিন্তু আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?

—আনন্দবাবুর কাছে।

—ও! আমি ওকে বলেছিলুম, আপনাকে আমার খুব দরকার। আচ্ছা, আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত?

—না। তেমন কিছু নয়।

—মিঃ গুপ্টা কি এখন অফিসে? প্লিজ, একবার খোঁজ নিন না!

—নিয়েছি। অফিসেই আছেন।

—ওঃ! ওয়েল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এখনই একটু সময় করতে পারবেন?

—খুব পারব।

—চলে আসুন না, প্লিজ!

—আসছি।

—হ্যালো, হ্যালো!

—আছি। বলুন।

—আপনার বন্ধু সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক কি আছেন এখন?

—শেখর?......সরি, সেলিম? সেলিম নেই।

—ও। ঠিক আছে। চলে আসুন।

—সেলিমকে কিছু বলতে হবে?

—না, থাক। আপনি আসুন। দেরি করবেন না কিন্তু। তাহলে দেখা না হতেও পারে।

—ফোন রাখার শব্দ হল। এক মিনিট পরে আমি আমারটা রাখলুম। এতক্ষণ কানের ভিতর দিয়েই যেন মগজে হুশহুশ করে কড়া সুগন্ধের ঝাঁজ ঢুকছিল। সেই গন্ধ এখনও মউমউ করছে।

—রঞ্জন মুখ তুলে বলল—কী রে? অমন ভ্যাবলা হয়ে বসে আছিস কেন?

—নারভাস হয়ে পড়েছিলুম। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের সঙ্গে কথা বললে আমার এমন হয়। কিন্তু শ্রীমতী ঊর্মিমালা তো আস্ত সৌন্দর্য। হেসে বললুম—তুই শুনছিলি না?

—শুনছিলুম। গুপ্টার ছোট বউয়ের কাছে যাচ্ছিস।

—যাঃ! কিসে বুঝলি?

—ওসব বোঝা যায়। যা। উইশ গুড লাক। কিন্তু সাবধান! কোনরকম বদ-মতলব নিয়ে যাসনে।

আমি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম। রঞ্জন ডাকল—শোন্।

—কী?

—গুপ্টাকে বেরোতে দেখলে আমি যাতে তোদের খবর দিতে পারি শ্রীমতীর ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়ে যা!

ও খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলুম।...

ক্যামাক স্ট্রিটে ট্যাক্সি থেকে নেমে ইভনিং ভিলার কাছাকাছি একটা দোকানে সিগারেট কিনছি, ফুরিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখি গেটের কাছে আরেকটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং গুপ্টাসায়েব নামলেন। আমি হতভম্ব।

ফোন লাইনে ট্যাপ করা আছে নাকি? পরে মনে হল, ব্যাপারটা নেহাত আকস্মিক। কিন্তু পয়সা খরচ করে এসে এভাবে অযথা ফিরতে হবে ভেবে রাগে বিরক্তিতে জ্বালা ধরে গেল। লোকটা অমন করে হঠাৎ-হঠাৎ উর্মির কাছে চলে আসে জানা ছিল না। এখন তো মোটে দুটো বাজে। একটু সরে গিয়ে গাছের নিচে একটা চায়ের আড্ডায় হাজির হলুম। বেয়ারা ড্রাইভার ইত্যাদি

উর্দিপরা লোকেরা সেখানে আড্ডা দিচ্ছে। মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খারাপ লাগে না। একপাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চা-টা খেলুম। লক্ষ্য রাখলুম গেটের দিকে, কখন গুপ্টাসায়েব বেরিয়ে যান।

একটি ঘণ্টা কেটে গেল। হতাশ হয়ে ফেরার জন্য পা বাড়াচ্ছি, তখন দেখি গেটের কাছে গুপ্টাসায়েব একা নন, সঙ্গে শ্রীমতী ঊর্মিও রয়েছেন—চোখে সানগ্লাস. গুপ্টা ট্যাক্সির জন্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন সম্ভবত।

হ্যাঁ, তাই। একটা ট্যাক্সি এসে খালি হতেই দু'জনে এগিয়ে চেপে বসলেন। ট্যাক্সিটা এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি ঘুরে দাঁড়ালুম এবং লোকগুলোর আড়ালে থাকার চেষ্টা করলুম।

ওঁরা অদৃশ্য হলে তারপর হাঁটা শুরু করলুম।

অফিসে ফিরে দেখি, সেলিম এসেছে। আমাকে দেখে রঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল—ফিরতে পেরেছিস? বেঁচে আছিস তো তুই?

সেলিম বলল—কেন ডেকেছিল রে?

শেখর বেরিয়ে এল পিছনের ঘর থেকে। —কী? জমেছিল তো খুব? ডিটেলস বলবি কিন্তু। নৈলে মেরে ফ্ল্যাট করে ফেলব।

রঞ্জনের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললুম—এরই মধ্যে সব রটিয়ে বসে আছ!

রঞ্জন বলল—বেশ করেছি! এমন নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছিস, আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো? নে—ঝেড়ে ফ্যাল ঝুলি। তারপর অগত্যা একটা করে বিয়ার আন।

সেলিম বলল—ফোনে আমার কথা জিগ্যেস করছিল, রঞ্জন বললে। কেন রে?

আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ওরা। বসে বললুম—ব্যাড লাক, বয়েজ! গিয়ে দেখি, গুপ্টা ঢুকছে। একটু পরে শ্রীমতীকে নিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে কোথায় চলে গেল। আমাকে দেখতে পায়নি। কারণ, আমি তখন ভাগ্যিস ঢুকিনি!

রঞ্জন বলল—কিন্তু গুপ্টা বেরোল কখন অফিস থেকে? বুঝেছি—বাথরুমে গিয়েছিলুম—তখনই! যাকগে, নেক্সট চান্স তো পাবি।

—সেলিম বলল—খুব জটিল হচ্ছে ব্যাপারটা। অবনীদা—সেই ফিল্ম ডিরেকটার ভদ্রলোক এসে গেছেন! আমার সঙ্গে দেখা হল আজ কিছুক্ষণ আগে। গ্রেট ইস্টার্নে উঠেছেন। একজনের কাছে খবর পেয়েই গিয়েছিলুম।

রঞ্জন বলল—তারপর? ঊর্মিমালার কথা নিশ্চয় বললি!

বললুম—সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড রে! মিলি সেন সত্যি ফেরারি আসামী। অবনীদার এক মাদ্রাজি বন্ধু একটা ছবি প্রোডিউস করছিলেন। তার ডাইরেকশানের ভার অবনীদাকে দেওয়া হয়। মাদ্রাজি ভদ্রলোক কোন এক সূত্রে মিলিকে চিনতেন। উনি তাকেই হিরোইন করার জন্যে জেদ ধরেন। এদিকে মিলি তো

অবনীদার রিজেক্টেড জিনিস! প্রচণ্ড আপত্তি করলেন। কিন্তু টিকল না—ওকে নিতেই হবে। অগত্যা নিলেন। ওদিকে নায়কও কিন্তু সম্পূর্ণ নবাগত। যাই হোক, স্যুটিং শুরু হল যথারীতি। অবনীদা পাগল হয়ে যাবার দাখিল। ওই শিমূলফুল দিয়ে কাজ করানো দুঃসাধ্য তো! যাই হোক, আউটডোরে গিয়ে এক সাংঘাতিক ঘটনা। নায়িকা হচ্ছে এক ডাকাতের পালিতা কন্যা—সেও ডাকাতনী হয়ে উঠেছে। নায়ক এক বড়লোকের ছেলে। বিয়ে করে গাড়ি চেপে বউ নিয়ে আসছে পাহাড়ী পথে। নায়িকা দলবল নিয়ে গাড়িতে হামলা করবে। নতুন বউয়ের গা ভর্তি গয়না, বাপের বাড়ির যৌতুকও রয়েছে প্রচুর। নায়ক গাড়ি থেকে বেরিয়ে রুখে দাঁড়াল মুখোমুখি। মিলি সেন ঘোড়ার পিঠ থেকে রিভলবার তুলেছে তাকে মারতে। দারুণ উত্তেজনার সিন! রিভলভার তাক করেই মিলি সেনের প্রেম জাগবে প্রচণ্ড। একটু হেসে—'আচ্ছা! ফির মিলেঙ্গে' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে। এখন—হল এক অদ্ভুত কাণ্ড! রিভলবারটা তো স্বভাবত নকল মাল। মিলি সেন তুলল। তারপর তিনবার প্রচণ্ড গুলির শব্দ হল এবং নায়ক 'বাপরে, মার দিয়া' বলে পড়ে গেল! হই-হই ব্যাপার। অবনীদা দৌড়ে গেলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি—ভেবেছিলেন কোথাও একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। চিত্রনাট্যে তো এমন ঘটনা নেই! কিন্তু সর্বনাশ!....

শেখর অস্ফুটে বলে উঠল—সত্যিসত্যি খুন নাকি?

—হ্যাঁ। মিলি সেন সত্যিকার রিভলবার দিয়ে হিরোকে মেরে ফেলেছে।

—রঞ্জন বলল—কোন সত্যিকার কারণে নিশ্চয়!

—সেলিম বলল—সেটাই রহস্য। কেন রূপেশকুমারকে মিলিকুমারী খুন করল, পুলিস আজও তা জানতে পারেনি। পরস্পর আলাপও ছিল না। তদন্তে সেটা জানা যায়।

আমি বললুম—তারপর কী হল? ঊর্মি—মানে, মিলি সেন কী করলেন তারপর?

সেলিম বলল—সেটাই তো ধাঁধা। ঘোড়া ছুটিয়ে তক্ষুণি সে পালিয়ে যায়। যদি এমন হয় যে রূপেশকুমারের কোন শত্রু নকল রিভলবারটার বদলে গুলিভরা আসল রিভলবার রেখে দিয়েছিল যথাস্থানে এবং তা না জেনে মিলি সেন ব্যবহার করেছেন, তাহলে সে পালাবে কেন? তাই না?

—ঠিক বলেছিস! হতভম্ব হয়ে পড়ত। মূর্চ্ছা যেত। কান্নাকাটি করত।

—রাইট। অথচ সে পালাল। ঘোড়াটা পরে একটা নদীর ধারে পাওয়া যায়। মিলি সেন হাওয়া। ওখানে একটা গ্রাম আছে। গ্রামের একজন লোক বলে যে নদীর ব্রিজের পাশে একটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ঘোড়ায় চেপে এক ঔরৎ আসে এবং ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়িটা চলে যায়। তার মানে কেউ অপেক্ষা করছিল সেই গাড়িতে। পুলিস তন্ন-তন্ন চেষ্টা করেও গাড়ি বা তার মালিকের হদিস পায়নি।

শেখর বলল—সব জলের মতো পরিষ্কার হল। মানে সেন্ট রহস্য ইজ ক্লিয়ার।

সেলিম বলল—মোটেও না। অবনীদাকে আমাদের আড্ডায় আসতে বলেছি। সময় পাবেন কি না জানি না। এলে ওর মুখে শুনবি সব। অবশ্য অবনীদা বলছিলেন, ছেড়ে দাও। পুরনো কেস। তার, আমারও ওসব পুলিসকে জানিয়ে এখন নষ্ট করার সময় নেই। মিলিকে নিয়ে আর ঝামেলা বাড়াবো না।

আমি বললুম—আচ্ছা, গুপ্টাসায়েব তো বোম্বেতে ছিলেন শুনেছি। তাহলে কি রূপেশকুমারকে উনিই মিলি সেনকে দিয়ে খুন করিয়েছেন?

রঞ্জন বলল—বাঃ এটা তো ভাবিনি! ঠিক বলেছিস!

এই সময় আনন্দ এল। —কী রে, খুব জমেছে মনে হচ্ছে। ইস্যুটা কী?

রঞ্জন বলল—আবার কী? মিলি সেন।

—সে আবার কে?

—তোদের ঊর্মিমালা গুপ্টা।

সেলিম রঞ্জনের দিকে চোখ টিপে বলল—আনন্দ, তোর বস কোথায় গেল রে একটু আগে?

আনন্দ বলল—দানিয়েল সায়েবের বাগানবাড়ি।

—সে তো একুশে মার্চ যাবার কথা।

—উঁহু। ডেট এগিয়ে দিয়েছে।

—পার্টি দেবে বলছিল যে?

—জানি না। গুপ্টার সবই গুপ্ত ব্যাপার।

আমি বললুম—ভ্যাট্, ওইভাবে হঠাৎ চলে যাবে কী? জিনিসপত্তর যাবে না?

—যাবে। ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি লরিতে ক্যামাক স্ট্রিটের মালপত্তর নিয়ে যাব।

—আজই?

—হ্যাঁঃ। সব ব্যবস্থা করা আছে।

—আগে বলিসনি তো?

আনন্দ চটে গিয়ে বলল—যা বাবা! আমিও কি জানতুম নাকি! আজই দুপুরে হঠাৎ ডেকে সব বললেন। ট্রান্সপোর্টে ফোন করে নিজেই ব্যবস্থা করলেন। আর তোদেরও শালা খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। যতসব আজেবাজে ব্যাপারে নাক গলাতে যাস্। এই আপার ক্লাস লোকগুলো আজকাল কী হয়েছে, জেনেও ন্যাকামি করিস। কই শেখর, সিগ্রেট দে। এক্ষুণি বেরোতে হবে।

এয়ারকন্ডিশনড ঘর ছাড়া যে মেয়ের নাকি ঘুম হয় না, সে দানিয়েল কুঠিতে রাত কাটাবে কেমন করে? ইলেকট্রিক লাইন কবে ওখানে কাটা গেছে,

আর দেওয়া হয়নি জানতুম। এবার নিশ্চয় শিগগির নেওয়া হবে। কিন্তু ততদিন শ্রীমতী উর্মির রাত কাটবে কেমন করে?

আমরা এসব জল্পনা-কল্পনা করছিলুম। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, অমন হুট করে কলকাতা ছেড়ে ওখানে চলে গেলেন কেন? এর সঙ্গে সেলিমের সেই অবনীদার কলকাতা আসার কোন যোগাযোগ নেই তো?

পরদিন দুপুরে সেলিম পরিচালক ভদ্রলোককে নিয়ে এল। নামী মানুষ ফিল্ম জগতের। ছবি দেখা ছিল, প্রত্যক্ষ দেখলাম এতদিনে। ভারি অমায়িক আর ভদ্র। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় টাক রয়েছে। ফরসা ধবধবে গায়ের রঙ। বাংলা উচ্চারণে সামান্য টান আছে, দীর্ঘকাল প্রবাসে অবাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার পর এ টানটা থাকা খুবই স্বাভাবিক। পুরো নাম অবনী ভরদ্বাজ।

আলাপ হওয়ার পর আমরা হিন্দি বনাম বাংলা ছবি নিয়ে খুব জমিয়ে তুললুম। কিন্তু আসল প্রশ্নটা মনে যতই তীব্র হোক, মুখে আসতে প্রত্যকের বাধছিল। হঠাৎ উনি নিজে থেকেই বললেন—মিঃ প্রকাশ গুপ্টার অফিস তো এ বাড়িতেই আছে?

ঘাড় নাড়লুম। অবনীবাবু আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় কিছু আঁচ করলেন। তারপর একটু হেসে বলেন—আমার প্রাক্তন হিরোইনের সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনাদের আলাপ হয়েছে শুনলুম।

সেলিম বলল—অবনীদা, আপনি প্লিজ ওদের সেই স্যুটিংয়ে মার্ডারের ঘটনাটা বলুন না! আপনার নিজের মুখে ওরা শুনলে খুশি হবে!

অবনীবাবু হেসে বললেন—খুনখারাপির ঘটনা শুনে খুশি হবেন? বল কি সেলিম?

সেলিম অপ্রস্তুত হল। শেখর আগ্রহ দেখিয়ে বলল—আপনি বলুন।

সেদিন সেলিম যা-যা বলেছিল, তা ডিটেলস বর্ণনা করে বললেন অবনীবাবু। শেষে বললেন—যাই হোক, এসব ব্যাপারে আমি তখনও জড়িয়ে পড়তে চাইনি, এখনও চাইনে। কারণ বুঝতেই পারছেন যে এতে আমার কেরিয়ারের পক্ষে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, এমন যদি হত যে মিলি নামকরা নায়িকা ছিল, তাকে না হলে আমার ছবি চলবে না, কিংবা ধরুন, সেই নবাগত রূপেশকুমার ছেলেটিও কোন সুপারহিট নায়ক ছিল—তাহলে ভিন্ন কথা। অহেতুক এসব স্ক্যান্ডাল বাড়তে দিয়ে আমার ক্ষতি করা ছাড়া কিছু হত না।

শেখর বলল—কিন্তু র‍্যাদার হিউম্যান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে...

ওকে বাধা দিয়ে অবনীবাবু বললেন—মশাই, পৃথিবীতে প্রতিমিনিটে লক্ষ লক্ষ অন্যায় বা খুনখারাপি হচ্ছে। আমি তো ত্রাণকর্তা প্রফেট নই। তাছাড়া, কে বলতে পারে যে, রূপেশকুমার মিলি সেনের কিংবা অন্য কারো জীবনে কোন সাংঘাতিক ক্ষতি করেনি? খুন বড় সহজে মানুষ করে না। আর, আমি তো জজসায়েব নই!

অবনীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে থাকার পর ফের আগের মতো সহজ হলেন। বললেন—এনিওয়ে! আমি বুঝতে পারছি—আপনারা সব ব্যাচেলার ইয়ংম্যান—আপনাদের কাছে এটা ভীষণ থ্রিলিং। খুবই স্বাভাবিক তা। আপনারা আসলে তাজ্জব হয়ে গেছেন। কারণ, সত্যি তো, অমন সুন্দর স্ত্রীলোক, তাতে তরুণী, মানুষ খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! আপনাদের কৌতূহল বা চাঞ্চল্য খুবই স্বাভাবিক।

সেলিম বলল—অবনীদা, মিলি সেন রাতারাতি ব্যারাকপুর বাগানবাড়িতে কেন পালাল, তা কিন্তু আমরা টের পেয়েছি। আপনার ভয়ে।

অবনীবাবু বললেন—যাঃ। আমাকে ও জানে। ভয় করে না।

—তাহলে অমন রাতারাতি পালাল কেন?

—মিলির রহস্য আমার জানা নেই। আরও নানা কাণ্ড করা ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—অবনীদা, এক কাজ করা যাক। আপনি আজ বিকেলে একটু সময় করুন না!

—অসম্ভব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একগাদা।

—প্লিজ দাদা! চলুন, আমরা বেড়াতে যাবার ছলে কুঠিবাড়িতে হানা দিই। তারপর দেখি, শ্রীমতী কী করেন!

সেলিম ও বাকি সবাই হেসে উঠলুম। অবনীবাবু বললেন—সেলিমের চ্যাংড়ামি এখনও যায়নি। ছেড়ে দে! খামোকা বেচারিকে বিব্রত করে কী হবে? লেট হার এনজয় উইথ দা ওল্ড ফেলো!

আমি বললুম—মিঃ গুপ্টাকে আপনি চেনেন না?

অবনীবাবু বললেন—মনে পড়ছে না ঠিক। চিনতে পারি, নাও পারি।

একটু পরে অবনীদা চলে গেলেন। সেলিম ওঁকে বিদায় দিতে নেমে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল—অবনীদা অদ্ভুত মানুষ! এমন নির্লিপ্ত আর উদাসীন লোক দেখা যায় না। বিজু, আমার মাথায় কিন্তু কুট কুট করে পোকা কামড়াচ্ছে!

শেখর নিজের মাথায় টোকা মেরে বলল—আমারও।

রঞ্জন বলল—হ্যাঁ, যা বলেছিস!

আমি বললুম—কামড়ানিটা আমারই বেশি। কারণ, মিলি সেন আমাকে ডেকেছিলেন কী জন্যে—বলা হল না। শিগগির ওঁর কথাটা না শুনলে মাইরি আমি মরে যাব!

সেলিম বলল—তাহলে চল্, বেরিয়ে পড়ি। এখন তো দুটো বাজে। পিকনিকের ছলেই যাই। আমি রনুকে ফোনে বলে দিচ্ছি, ও ইদ্রিস সায়েবকে বলবে এবং ঘরের চাবিটা নিয়ে যাবে ওখানে।

শেখর বলল—ও-কে। আয়, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। নাম্বার বল্।

রনুকে ওখানে চাবি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বেরোলুম। রান্নার সরঞ্জাম সব ওখানেই মিলবে। শুধু চাল-ডাল-মসলাপাতি সঙ্গে নিতে হবে। নিউ মার্কেটে গিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মাংস ইত্যাদি কেনা হল। তারপর সব জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে নিজের নিজের ব্যাগে নিয়ে আমরা রওনা দিলুম। পথে হুইস্কির বোতল নেওয়া হল গোটা তিন। ট্যাক্সি বিটি রোডে গিয়ে উঠলে শেখর মনের আনন্দে গান জুড়ে দিল।

ব্যারাকপুর পৌঁছতে তখন সূর্য প্রায় ডুবছে। দানিয়েল সায়েবের বাড়ির গায়ে ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। গাছপালায় পাখিরা তুমুল চেঁচামেচি করছে। গেটের কাছে রনু চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ও মোটর সাইকেলে এসেছে। এক্ষুণি চলে যাবে। ও নিজে এসে দরজা না খুলে দিলে গোঁয়ারগোবিন্দ বাহাদুর ঝামেলা বাধাবে কিনা। অবশ্য ওর দোষ নেই। ইদ্রিস খানের সবসময় ভয়, আবার কেউ এসে জবরদখল না করে ফেলে। তাই কড়াকড়ি বলা আছে। তাছাড়া আজকাল প্রতিদিন উনি আর আগের মতো রাত্রিবাস করতে আসেন না। কলকাতাতেই থেকে যান।

রনু এসব জানিয়ে চলে গেল। ওর কাছে মিঃ গুপ্টার খবরও পেলুম। বাড়ির উত্তরের অংশ এখন ওঁর দখলে। মাঝামাঝি বাড়িটা দু'ভাগ করা। মাঝের দেয়ালে কোন জানালা না থাকায় ওপাশের ঘরগুলোর টুঁ শব্দটিও এপাশে শোনা যায় না। হ্যাঁ, গুপ্টাসায়েব গতকাল থেকে আজ সারাদিনই এখানে রয়েছেন। আমরা পিকনিক করতে আসছি, তাও শুনেছেন রনুর কাছে।

আমরা দক্ষিণের গেটে থাকায় গুপ্টা সায়েব বা শ্রীমতী উর্মিকে দেখার আশা ছিল না। তবে বাইরে বেড়াতে বেরোলে দেখতে পেতুম।

দরজা খুলে জিনিসপত্র রাখা হল। বাহাদুর এল হাসিমুখে। শেখর জিগ্যেস করল—কী বাহাদুর, কেমন আছ?

বাহাদুর ঘাড় নাড়ল মাত্র। ভাল আছে।

—ভূত দেখতে পাচ্ছ তো বাহাদুর?

—বাহাদুর তাতেও ঘাড় নাড়ল। পাচ্ছে কিংবা পাচ্ছে না।

—আমি বললুম—পাশের ঘরের সায়েব মেমসায়েবের খবর কী বাহাদুর?

—বাহাদুর আবার ঘাড় নাড়ল। ভালই আছেন। না থাকার কী আছে!

—এক বালতি জল চাই, বাহাদুর!

বাহাদুর জলের বালতিটা নিয়ে রাস্তার দিকে টিউবয়েলে চলে গেলে সেলিম বলল—প্রতিবেশীরা একেবারে সাইলেন্ট ডেড! ব্যাপার কী? গুপ্টাও তো এল না রে! টের পায়নি মনে হচ্ছে! আয়, কোরাসে গান জুড়ে দিই।

শেখর গম্ভীর মুখে বলল—থাম্। আগে ছিপি খুলি।

চারটে গ্লাস পাশের কিচেন থেকে এনে রীতিমতো সেলিব্রেট করা হল।

তারপর আমরা কোরাস গান জুড়ে দিলুম। গানটা লিখেছিল রঞ্জন, সুর শেখরের। খুব প্রিয় গান আমাদের।

দারা দিরি দারা দিরি দ্রাঁও দ্রাঁও দুমুম্বা
ট্র্যাও ট্র্যাও টিরিটিরি টেরেমেরে লুমুম্বা
হুম হুম হুমা হুমা
গুম গুম গুমা গুমা
চ্যাঁও চটাস চ্যাঁও চটাস
ধড়াস ধড়াস বুক কাবুক টাবুক কুক হুড়ুম্বা
এ্যাঁও দুমুম্বা লুমুম্বা....
লারা লিরি হো
দারা দিরি হো.. হোঃ হোঃ হোঃ।।

বাহাদুর বালতিভরা জল মেঝেয় রেখে হাঁ। বাবুরা বেদম নাচছেন তখন। এই নাচ খাঁটি তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের, তা কি বেচারা জানে? ঘরে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমরা চালিয়ে গেলুম। পুরনো বাড়িটা ভুতুড়ে নাচগানে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল। আক্ষেপ হচ্ছিল, একটা গিটার আনলে ভাল হত। সেলিম ভাল বাজায়।

এক সময় বাহাদুর বলল—আলো, সাব!

হ্যাঁ, আলো জ্বালা উচিত এবার। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। মোমবাতি বের করে জ্বালা হল। তারপর বাহাদুর চলে গেল। দরকার হলে তাকে ডাকা যাবে আবার।

কিচেনে একটা মোমবাতি নিয়ে গেল সেলিম আর রঞ্জন। আমি আর শেখর মালমসলার প্যাকেট বয়ে রেখে এলুম। সেলিম রাঁধবে। আমরা সব ঠিকঠাক করে দেব। এ ঘরটা বিরাট। ফায়ার প্লেসও আছে। ডানদিকে বাথরুম। ভিতরে আরও অনেকগুলো ঘর। মোমবাতি হাতে আমি আর শেখর সব দেখে এলুম চোর এসে লুকিয়ে আছে নাকি। কেন থাকবে? চুরি করার কী-ই বা আছে? আসলে আমরা প্রতিবেশীদের কোন সাড়া পাওয়ার মতো ছেঁদা খুঁজছিলুম। দেয়াল একেবারে নিরেট। ফাটলও নেই।

কিচেনটাও বিশাল। ডাইনিং ঘরের সংলগ্ন সেটা। কিন্তু ডাইনিং ঘর এখন আর বলা যাবে না। একেবারে ফাঁকা। সদর দরজা বন্ধ করে সেখানে আমরা মেঝেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসলুম। দরজা দিয়ে সেলিমকে কুকারের সামনে রান্নায় ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছিলুম। মদ্যপান টুকটাক চলছে চারজনের। রঞ্জন সেলিমকে খাইয়ে দিয়ে আসছে। মাঝে আমরা গান গাইছি, নাচছিও। কিন্তু গুপ্টা-দম্পতির কোন সাড়া নেই। প্রতিমুহূর্তেই আশা করি ওঁরা কেউ এসে আমাদের দরজায় কড়া নাড়বেন। কিন্তু না, সে আশা যেন নেই-ই।

ফলে উৎসাহ লম্ফঝম্প ক্রমশ মিইয়ে পড়ছিল। এক সময় রঞ্জন বলল—গুপ্টার হল কী রে? একবারও যে টিকি দেখায় না!

শেখর গম্ভীরভাবে বলল—বউ নিয়ে শুয়ে আছে।

—বিজু! রঞ্জন ডাকল। —আয় না, একবার ওদিকটায় ঘুরে দেখে আসি!

উঠে পড়লুম। শেখরকে দেখলুম অমনি সেলিমের কাছে গিয়ে বসল। বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে রাস্তার ধারের আলোগুলো গাছের ফাঁকে গঙ্গার বুকেও আলো দেখা যাচ্ছে। এদিকটা সুনসান নির্জন। মাঝেমাঝে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার গরগর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমরা সিগারেট টানতে টানতে বাগান ঘুরে উত্তরদিকে গেলুম। অবাক হয়ে দেখলুম, গুপ্টার দিকটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দরজা-জানালার ফাঁক দিয়েও কোন আলো আসছে না। এই সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে পড়ল নাকি ওরা?

যা আছে বরাতে বলে সেদিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে মনে পড়ল, টর্চ আনা হয়নি। কী আর করা যাবে!

পা টিপে ধাপবন্দী বারান্দায় উঠে বুক টিপটিপ করতে থাকল। রঞ্জন আর চুপ করে থাকতে পারল না। একবার কেশে ডাকল—মিঃ গুপ্টা আছেন নাকি?

কোন সাড়া এল না। তখন আমি ডাকলুম—মিঃ গুপ্টা! মিঃ গুপ্টা আছেন?

তবু কোন সাড়া নেই। এবার দরজার সামনে দেশলাই জ্বাললুম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! পর্দা তুলতেই সেটা বোঝা গেল। সেই সময় সেদিনকার সেই কড়া সেন্টের গন্ধ নাকে এল।

আশ্চর্য তো! এই সবে সাড়ে সাতটা বাজে। এরই মধ্যে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা? দরজায় ধাক্কা দিলুম আস্তে। ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক লাগছিল।

অমনি দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল। কেন কে জানে, অজ্ঞাত ভয়ে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। রঞ্জন ফিসফিস করে বলল, দরজা খোলা কেন রে?

দরজাটা ঠেলে মরিয়া হয়ে ভিতরে ঢুকে গেলুম আমরা। তারপর আবার দেশলাই জ্বাললুম! ঘরটা বড়। এরই মধ্যে বেশ সাজানো হয়েছে। আলমারি হোয়াটনট সেলফ সোফাসেট রয়েছে। সামনের দিকে ভিতরের দরজাতেও পর্দা তুলে ভিতরে গেলুম দু'জনে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ তেজী সুগন্ধ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে।

ফের দেশলাই জ্বালাতেই যা নজরে পড়ল, আমাদের দুজনের গলায় একই সঙ্গে অস্ফুট একটা আওয়াজ বের করার পক্ষে যথেষ্টই। মেঝেয় মিঃ গুপ্টা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। পিঠের দিকে চাপচাপ রক্ত। আর ঊর্মি ওরফে মিলি সেন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে।

আবার দেশলাই জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে আমরা দুজনে দৌড়ে বেরিয়ে এলুম। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচাতে থাকলুম—সেলিম! শেখর! বাহাদুর!

শেখরের সাড়া পাওয়া গেল প্রথমে। তারপর সেলিমের। বাহাদুর একটা হারিকেন হাতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একতলা ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। লোকটা অদ্ভুত। সে যেন একজন পাথরের মানুষ।...

॥ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ॥

টেবিলের একদিকে বিজন, রঞ্জন, শেখর ও সেলিম বসেছে, অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বসেছেন। বয়স যাটের কোঠায়। মুখে সাদা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় টাক, হাসিখুশি বুড়ো মানুষটির খ্যাতি অপরাধতাত্ত্বিক হিসেবে প্রচুর।

তাঁর ইলিয়ট রোডের বাসায় বসে বিজন বিবৃতি দিচ্ছিল। একই বিবৃতি পুলিশকেও সে দিয়েছে। দানিয়েল কুঠির জোড়া খুনের কিনারা এখনও করতে পারেনি পুলিশ। এমনকি চোরের কাণ্ড বলে চালানোর চেষ্টাও চলছে। সত্যি তো! চোর-ডাকাত ছাড়া আর কে খুন করবে গুপ্টাদম্পতিকে? কী চুরি হয়েছে, সেটা বলা কঠিন। আপাতদৃষ্টে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ঊর্মি গহনা পরতেন সামান্যই। শুধু গলায় একটা দামী পাথরের হার ছিল, তা চোর নেয়নি। কানে বা হাতে যা সোনা ছিল, তাও ঠিকঠাক আছে।

আজকাল এত বেশি মানুষ খুন হয় যে পুলিশ তেমন আর গা করে না। নাক গলিয়ে অহেতুক ঝামেলা বরদাস্ত করতে চায় না তারা। কাজেই গুপ্টাদম্পতির হত্যাকাণ্ডের কিনারা বেশিদূর এগোয়নি।

কর্নেল মন দিয়ে শুনছিলেন বিজনের স্টেটমেন্ট। বিজন থামলে এবার বললেন—ঊর্মি বা মিলি সেনের ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকলে খুনের কিনারা হত, এ বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত ইয়ং ফ্রেন্ডস! কিন্তু পুলিশকে আজকাল কাজ করতে হলে প্রভাবশালী লোক কিংবা গোষ্ঠীর দরকার হয়। ...বলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

কর্নেলকে যাঁরা চেনেন, তাঁরাই জানেন—মানুষটি মোটেও বদমেজাজি গোমড়ামুখো গোয়েন্দা নন। যেমন খামখেয়ালি, তেমনি মিশুক আর কৌতুকপরায়ণ। বিশেষ করে একালের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে চমৎকার মিশে যেতে পারেন।

বিজন বলল—কর্নেল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এ খুনের ব্যাপারে আমরা চারজনে এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছি। মোটেও এটা বরদাস্ত করতে পারছি না যে আমাদের নাকের ডগায় এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করে কেউ নিরাপদে কেটে পড়বে আর আমরা কিচ্ছু করতে পারব না।

শেখর বলল—রিয়্যালি কর্নেল! একটা কিছু না করলে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে।

রঞ্জন ও সেলিমও সায় দিল। —হ্যাঁ, ভীষণ কষ্ট পাব।

কর্নেল সকৌতুকে বললেন—আপনাদের বয়সের পক্ষে নিশ্চয় সেটা স্বাভাবিক। যৌবনের মূল্য যৌবন ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। তাছাড়া ঊর্মি দেবীর সেই দামী সেন্টও সম্ভবত একটা হিপ্নোটিক ব্যাপার—তাই না? আপনারা হিপ্নোটাইজড্

হয়ে পড়বেন, তাও কিছু দোষের নয়। আহ্ এগ্রি ইতিহাসে ও পুরাণে সুন্দরীদের জন্যে অনেক বড় বৃদ্ধ হয়ে গেছে!

বলে ফের হো হো করে হেসে উঠলেন। এ সময় তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারক যষ্ঠীচরণ ট্রেতে চা ও স্ন্যাক্স্ রেখে গেল। সবাই কাপ তুলে নিল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চা খাওয়ার পর কর্নেল হঠাৎ বললেন—অচ্ছা বিজনবাবু, সেই সন্ধ্যা রাত্রে আপনারা কেউ কোন অস্বাভাবিক বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি? বেশ ভেবে বলবেন কিন্তু। যত তুচ্ছ হোক, এমন কোন ব্যাপার নজরে পড়েছিল?

বিজন একটু ভেবে বলল—কই, তেমন কিছু তো......নাঃ। দেখিনি।

রঞ্জন বলল—আমিও দেখিনি।

শেখর বলল—কই? আমার চোখে কিছু পড়েনি।

সেলিম বলল—না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আপনারা প্রত্যেকেই কিন্তু ঠিক কথা বলছেন না ভাই!

ওরা চমকে উঠল। বিজন বলল—কেন কেন কর্নেল?

—আপনাদের স্টেটমেন্ট কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। আপনারা প্রত্যেকেই অন্তত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন!

ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেলিম অস্ফুট স্বরে বলল—অস্বাভাবিক ব্যাপার!

—হ্যাঁ। মিঃ এবং মিসেস গুপ্টার সঙ্গে আপনাদের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। আপনারা যখন কুঠিবাড়িতে গেলেন, আশা করেছিলেন ওঁরা আপনাদের হইহল্লা শুনে বেরিয়ে এসে আপনাদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন। আপনারা পৌঁছান সন্ধ্যা পৌনে ছটা নাগাদ। তারপর অত কাণ্ড হল, ওঁরা কেউ এলেন না। এটা আপনাদের অস্বাভাবিক লেগেছিল। তাই না?

এবার সবাই হইচই করে বলল—ঠিক, ঠিক। ঠিকই তো!

—এবং সেজন্যেই বিজনবাবু ও রঞ্জনবাবু ওঁদের ঘরে গিয়ে হানা দেন!

বিজন বলল—সেটা তো বলেইছি। এছাড়া কিছু অস্বাভাবিক তো দেখিনি।

কর্নেল হাসলেন। —ওকে, ফ্রেন্ডস। তাহলে এবার আমাদের সভা ভঙ্গ হোক। আপনাদের প্রয়োজন আমার নিশ্চয় হবে, তখন ডাকব। অপাতত আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখি, ওঁরা কী বলেন।

ওরা উঠে দাঁড়াল। সেলিম হতাশ মুখে বলল—পুলিশ কিচ্ছু করবে না কর্নেল!

কর্নেল সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে হঠাৎ বললেন—আচ্ছা মিঃ সেলিম, আপনার সেই অবনীদা ভদ্রলোক কি এখনও আছেন কলকাতায়?

সেলিম বলল—না। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ গতকাল দুপুরের ফ্লাইটে বোম্বে

চলে গেছেন শুনেছি। কুঠিবাড়ি থেকে ফিরে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলুম। হয়নি। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তো! হোটেল ছেড়ে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছিলেন। ঠিকানা যোগাড় করে গেলুম, বেরিয়ে গেছেন ওখান থেকে। তারপর কাল দুপুরে ফোন করলুম—বলল, রওনা হয়ে গেছেন।

কর্নেল বললেন—হুম! আচ্ছা, আপাতত এই।

ওরা বেরিয়ে গেলে কর্নেল কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই সময় ফোন বেজে উঠল। এগিয়ে এসে রিসিভার তুললেন—সত্যেন্দ্র নাকি? মেঘ না চাইতেই জল। আশ্চর্য যোগাযোগ বটে। এক্ষুণি তোমাকে রিঙ করব ভাবছিলুম।

—কর্নেল, আমি বিপন্ন।

—তুমি কি দানিয়েল কুঠির মার্ডার কেসের ব্যাপারে কথা বলছ?

—আশ্চর্য কর্নেল, আশ্চর্য!

—কেন?

—আপনি নিশ্চয় টেলিপ্যাথি জানেন।

—নিছক দৈবাৎ যোগাযোগ বলতে পারো।

—যাক্‌গে, শুনুন। আপনি কেসটার কতখানি জানেন, জানি না। গত রাত্রে হঠাৎ কেসটা ব্যারাকপুর পুলিশ লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টে পেশ করেছে। কারণ...

—কারণ মর্গের রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেছে। কেসটা বার্গলারি নয়।

—আশ্চর্য, কর্নেল!

—একটু কম আশ্চর্য হওয়া ভাল, সত্যেন্দ্র!

—আমি আসছি, কর্নেল। পনের মিনিটের মধ্যেই।

—এসো।...

কর্নেল একটু হেসে ফোন রাখলেন। আজকের সকালটা বেশ চমৎকার ছিল। সব গুলিয়ে গেল। আসলে সেই চিরকালের ধুরন্ধর হত্যাকারীটি তাঁকে নিয়ে অদ্ভুত খেলা করে চলেছে। একটি নির্মল বিশুদ্ধ সময়ের অংশও সে হত্যার রক্ত ছড়িয়ে লাল না করে ছাড়বে না। বয়স এদিকে বেড়ে যাচ্ছে। এই খেলায় জড়িয়ে পড়তে আর ইচ্ছে করে না। অথচ ক্রমশ মানুষের জীবন এত মূল্যবান মনে হয়ে উঠছে যে জীবনবিরোধী ওই হন্তারক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে ইচ্ছে করছে ক্লান্তিহীনভাবে। এমন কোন সমাজ কি সম্ভব, যেখানে মানুষের এই ভয়ংকর বৃত্তিটা লোক পাবে? হননবৃত্তি যেন প্রকৃতির একটা আইন, যার নাম আমরা দিয়েছি পশুত্ব।

কিন্তু দেবত্ব বলেও একটা আইনকানুন প্রকৃতি মানুষের জন্য দিয়েছেন। পশুত্বের সঙ্গে তার লড়াই চলেছে আবহমানকাল ধরে। খ্রিস্টানিটিতে এই পশুত্বকেই বলা হয়েছে শয়তান। শয়তান অজর অমর।

ঘণ্টা বাজল বাইরের ঘরের দরজায়। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর সত্যেন্দ্র ব্যানার্জির সাড়া পাওয়া গেল।

—হ্যাল্লো ওল্ড বস!

—এস সত্যেন্দ্র, তোমার ওই ফাইলটা দেখে অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু।

সত্যেন্দ্র তরুণ অফিসার। সে গোয়েন্দা বিভাগের অন্য অফিসারদের মতো গোমড়ামুখো নয়। প্রচণ্ড হাসতে পারে। কর্নেলের সঙ্গে কৌতুকে ও হাসিতে সে ছাড়া আর কেউ পাল্লা দিতে পারে না। সে বসে ফাইলটা রাখল। তারপর কপালের ঘাম মুছে বলল—অস্বস্তি হবেই। কারণ কে কবে শুনেছে যে ভিকটিমের দেহ খুবলে হত্যাকারী মাংস তুলে খেয়েছে!

—খেয়েছে! বল কী?

—তাছাড়া কী? দানিয়েল কুঠির কেসটা চুরিচামারি বলেই মনে করা হচ্ছিল। লাশ দুটোর গায়ে মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন, মেঝেয় রক্ত। দেখলে মনে হয়, ছোরাটোরা মারা হয়েছে। অথচ মর্গের রিপোর্টে বলছে—মোটেও তেমন কিছু নয়। মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সাইনায়েডই মৃত্যুর কারণ। গুপ্টা দম্পতির হাতের কাছে ছোট ছোট্ট টেবিলে মদের বোতল ছিল। গ্লাস দুটো মেঝেয় পড়ে ছিল—দুটোই ভেঙে গেছে। একটা গ্লাসের টুকরোয় লিপস্টিকের দাগ পাওয়া গেছে। তার মানে দুজনে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েই বিষক্রিয়ার ফলে ঢলে পড়ে। এবার অদ্ভুত ব্যাপার হল, মারা যাবার আন্দাজ ঘণ্টা দুই পরে কেউ মিঃ গুপ্টার পিঠ কোন ধারাল কিছুতে খুবলে মাংস তুলেছে। বিছানায় ঊর্মি গুপ্টার লাশটা কিন্তু যত্ন করে শোয়ানো ছিল। বিষক্রিয়ার পরে ওভাবে সটান চমৎকার শুয়ে থাকা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। তারপর কেউ ওঁর বুকের কাপড় সরিয়ে একইভাবে কিছু কিছু মাংস খুবলে নিয়েছে। কিন্তু কুঠির সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছে আজ সকালে। ফোরেনসিক এক্সপার্ট টিম ওখানে এখনও রয়েছে। ফোনে জানলাম, আর কোথাও এক ছিটে রক্ত ওঁদের নজরে পড়েনি, কোন রকম ক্লুও ওঁরা পাচ্ছেন না। কুকুর স্কোয়াডও কোন সুবিধে করতে পারেনি। শুধু বোঝা গেছে যে খুনী বাইরে থেকে এসেছিল।

—ভাঙা গেলাস দুটোয় তাহলে সাইনায়েড পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ।

—মৃত্যুর সময় ঠিক করতে পেরেছেন ডাক্তাররা?

—বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি। তার আগে নয় এবং ছটার পরেও নয়! তারপর মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে সাড়ে সাতটার মধ্যেই। কারণ...

—পারুল অ্যাডভারটাইজার্সের ছেলেরা ঠিক সাড়ে সাতটায় লাশ দুটো আবিষ্কার করে!

—সে কী! আপনি কেমন করে জানলেন?

—জানি। পরে বলব'খন। আর কী ফ্যাক্ট আছে, বলো।

—ফ্যাক্ট আপাতত কিছু হাতে নেই। সব দিকে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে গুপ্টা ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাব, আশা করছি।

—এবার বলো, আমি কী করতে পারি?

—আপনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন কর্নেল, প্লিজ!

কর্নেল, একটু ভেবে নিয়ে বললেন—কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, চলো—বেরিয়ে পড়া যাক। ইয়ে—ব্যারাকপুর যাচ্ছি আমরা, তাই না?

—হ্যাঁ কর্নেল। আপনারই থিওরি—হত্যাকাণ্ডের জায়গাটাই হত্যাকারীকে সনাক্ত করে।...

সারা পথ আর মুখ খুললেন না কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। চুরুটও খেলেন না অভ্যাসমতো, গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। গভীর চিন্তায় মাঝে মাঝে এমনভাবে ওঁকে ডুবে যেতে দেখেছে সত্যেন্দ্র ব্যানার্জি। এসময় ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না।

দানিয়েলকুঠির সামনে কিছু পুলিশ ছিল। উত্তরের বারান্দায় ফোরেনসিকের লোকেরা ফিতে দিয়ে মাপজোক করছিলেন। দু'জনে কাছে যেতেই ওঁরা কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সত্যেন্দ্র পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই কর্নেল তাঁর সমবয়সী একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যালো, হ্যালো! ডাঃ পট্টনায়ক যে!

—কর্নেল সরকার! আপনাকেও তাহলে পাকড়াও করা হল!

ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ সীতানাথ পট্টনায়ক জড়িয়ে ধরলেন কর্নেলকে। তারপর কর্নেল বললেন—আপনাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম নিশ্চয়, ডাঃ পট্টনায়ক?

—মোটেও না। আসলে কী জানেন? ফ্যাক্টস একটা মার্ডারের কেসের পক্ষে মুখ্য উপাদান। কিন্তু ফ্যাক্টস থেকে ডিডাকশান করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটাই হল কৃতিত্বের পরিচয়। ডিডাকশানের বোধ তো অনেকের থাকে না। একই ফ্যাক্টস থেকে একজন একরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, আরেকজন তার উল্টোও যেতে পারেন এসব ব্যাপারে আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করে কে? ইউ আর ওয়েলকাম, কর্নেল সরকার।

সত্যেন্দ্র কর্নেল আর ডাঃ পট্টনায়ক এবার ভিতরে ঢুকলেন। প্রথমে বসার ঘর। বেশ বড়। যথারীতি ফায়ার প্লেস আছে। সেকালে ইউরোপীয়রা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও স্বদেশের পরিবেশ তৈরি করে বাস করতেন। জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি যে বন্ধ করে দিলে ঘর ঘন অন্ধকার হয়ে যায়। এখন সব খোলা ছিল। ঘরে আলো ছিল যথেষ্ট। কর্নেল ঘরের ভিতরটা দেখছেন লক্ষ্য

করে, এগিয়ে গেলেন সোফা সেটটার দিকে। তারপর একটা কিছু লক্ষ্য করে বললেন—ঘরের কোন কিছু আশা করি নাড়াচড়া করা হয়নি।

—মোটেও না। সব ঠিকঠাক আছে।

কর্নেল হাঁটু দুমড়ে সোফার নীচের দিকটা দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন—দারোয়ান বাহাদুর আর তার বউ তো দক্ষিণের পাঁচিলের কাছে থাকে?

—হ্যাঁ।

—এখানে আসার পর কেউ মিঃ গুপ্টার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না বলেনি? নিশ্চয় তাদের স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে?

—হয়েছে। কাকেও আসতে দেখেনি ওরা।

—এলেও ওদের চোখে পড়ার কথা নয়!

—কিন্তু গেট তো দক্ষিণে! ওদের ঘরের কাছাকাছি!

—আমি দেখলুম উত্তরের পাঁচিলে একজায়গায় একটা ভাঙা জায়গা রয়েছে। যে কেউ ওপথে এদিকে আসতে পারে। ওরা টের পাবে না।

সত্যেন্দ্র চিন্তিতমুখে বলল—তা পারে!

—আমার মনে হচ্ছে, এই সোফাটায় কেউ বসেছিল—যে বাইরের লোক। কারণ, তার জুতোর তলায় সুরকি গুঁড়ো ছিল। ...বলে কর্নেল পকেট থেকে একটা আতস কাচ বের করে পরীক্ষা করতে থাকলেন। —হুঁউ! তাই বটে। তুমি প্লিজ দেখে এসো তো সত্যেন্দ্র, ওই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক গলিয়ে এলে জুতোর তলায় সুরকি গুঁড়ো লাগে কি না।

সত্যেন্দ্র বেরিয়ে গেল। ডাঃ পট্টনায়ক বললেন—ওটা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দবাবু আসতে পারেন!

—পারেন। কিন্তু ওইভাবে আসেননি—তা চোখ বুজে বলা যায়। কেন লুকিয়ে আসবেন তিনি? আনন্দবাবুর ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু আছে বলে মনে হয় না। অন্তত আমার যা শোনাজানা আছে!

ডাঃ পট্টনায়ক একটু হাসলেন। —কোন গ্যারান্টি নেই কর্নেল। সন্দেহ সকলকেই করা উচিত। যে চার বন্ধু খুনের দিনে পিকনিক করেছিলেন বা লাশ দেখতে পান, তাঁদেরও সন্দেহের আওতায় রাখা কর্তব্য।

—রাইট, রাইট! বলে কর্নেল সোফার চারপাশটা ঘুরে দেখতে থাকলেন। সদর দরজা অব্দি মেঝে পরীক্ষা করলেন।

এই সময় সত্যেন্দ্র ফিরে এসে নিজের জুতোর তলায় আঙুল ঘষে বলল—কর্নেল, ইউ আর কারেক্ট।

কর্নেল ও ডাঃ পট্টনায়ক পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। তারপর কর্নেল হঠাৎ ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। ডাকলেন—সত্যেন্দ্র শোন, এবং আতস কাচে সেটা পরীক্ষা করতে থাকলেন।

সত্যেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বলল—কী ব্যাপার?

—মিঃ গুপ্টা কী ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতেন জানা আছে তোমাদের?

—হ্যাঁ। ব্যারনেস-৪০। বিদেশে রপ্তানি হয়। বেশ দাম আছে।

—কিন্তু এই সিগারেটটা সে ব্র্যান্ড নয়। এটা ফাইভ স্টার। এও দামী কিন্তু।

—ফাইভ স্টার। এ তো ফিল্ম মহলে খুব চালু সিগারেট!

—সত্যেন্দ্র প্লিজ। তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

—বলুন না!

—তুমি লোকাল থানা থেকে তোমার অফিসে কনট্যাক্ট করো।

অফিসকে বলো এখনই বোম্বে পুলিসকে কনট্যাক্ট করতে। প্রখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর অবনী ভরদ্বাজের এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকতে পারে। ওঁর একটা বিবৃতি চাই। কলকাতা এসে কোথায়-কোথায় গেছেন বা কী করেছেন, সব ওঁর নিজের মুখের কথায় জানা দরকার। তারপর বিবৃতিটা তোমরা ভেরিফাই করবে।

—আসার আগে সে কাজটা করে এসেছি। রাত্রে বিজনবাবু নামে পারুল অ্যাডের সেই ভদ্রলোকের স্টেটমেন্ট পড়েই আমার সন্দেহ তীব্র হয়েছিল। এই খুনের সঙ্গে ফিল্ম হিরো রূপেশকুমারের খুন হওয়ার কোন যোগসূত্র না থেকে পারে না।

কর্নেল ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—চলুন ডাঃ পট্টনায়ক। আমরা এবার বেডরুমে যাই।

বেডরুমটা মাঝারি শুধু পূবদিকটা ছাড়া জানালায় আলো আসার উপায় নেই। একটা ডবলবেড খাট রয়েছে। চাদর ইত্যাদি সবকিছু ফোরেনসিকের জিম্মায় চলে গেছে। গ্লাসের টুকরো, মদের বোতলটাও। কর্নেল মেঝেয় হাঁটু দুমড়ে আতস কাচটা পেতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পরীক্ষা করছিলেন। ডাঃ পট্টনায়কের ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন—কর্নেল কি এ ঘরে সেই সুরকির ধুলো আশা করছেন?

কর্নেল পাল্টা হেসে বললেন—জানি না।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে সংলগ্ন বাথরুমটা দেখলেন। অব্যবহার্য হয়ে পড়ে ছিল বোঝা যায়। সম্প্রতি সামান্য ব্যবহার করা হয়েছে। কোমোড বেসিন সব ভাঙা। জলের একটা চৌবাচ্চা আছে। সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু জল নেই। জলের পাইপে মরচে ধরে রয়েছে। একটা বড় প্লাস্টিকের বালতিতে তলায় কিছু জল রয়েছে, সম্ভবত বাইরে থেকে আনা হয়েছে।

এবার বাঁদিকে আরেকটা ঘরে ঢুকলেন। কিচেন কাম ডাইনিং ঘর। তার পাশে স্টোর। স্টোরের ভিতর ঢুকে কর্নেল বললেন—মাই গুড্‌নেস! ওপাশে জানালাটা ভাঙা। যে কেউ বাইরে থেকে ঢুকে পড়তে পারে। কিংবা পালাতে পারে। ডাঃ পট্টনায়ক, এসব ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?

—সেটাই তো অদ্ভুত। খোলা ছিল। তার মানে খুনী ওই পথে পালিয়েছে! অবশ্য আমরা কোন সুরকি পাইনি কোথাও! বলে ডাঃ পট্টনায়ক হেসে উঠলেন।

কর্নেল বললেন—প্রিয় ডঃ পট্টনায়ক! পটাসিয়াম সাইনায়েড যে দিয়েছে, সেই খুনী কিন্তু। তার অমনভাবে না পালালেও চলত।

—তাহলে কি মাংস খুবলেছে যে, সে আলাদা লোক বলে মনে করেন?

—এখনও আমি কিচ্ছু মনে করি না ডাঃ পট্টনায়ক। শুধু সম্ভাবনার কথাই বলছি। পটাসিয়াম সাইনায়েড মেশানো মদ কিন্তু বোতলে নেই—গ্লাসে পাওয়া গেছে, তার মানে গ্লাস দুটোর তলায় আগে থেকে রাখা ছিল বিষ, অথবা মদ ঢালার পর মেশানো হয়েছে। আগে থেকে রাখার চান্স শয়ে এক। সেটার চেয়ে বরং মদ ঢালবার পর মেশানোটাই সম্ভাব্য।

—তাহলে তৃতীয় একজন ছিল মদ্যপানের সময়।

—রাইট। এবং তার কোন গ্লাস আমরা পাচ্ছি না। অথচ খুনী নিজে মদ না খেলে বিষ মেশানোর চান্স নেবে কীভাবে? এটাই অবাক লাগছে।

—আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সেই ফিল্ম ডিরেক্টর ভদ্রলোকও ওদের মদ্যপানের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই খুনী?

—কিছু বলতে চাইনি ডাঃ পট্টনায়ক। শুধু সম্ভাবনাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে লোকটি পাঁচিলের ফোকর গলিয়ে এসেছিল, সে ফিল্মের লোক হতেও পারে—চান্স অন্তত সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট। দুই ঃ সে অসম্ভব ধূর্ত। তাই আসার সময়ই জুতো পরে ঢুকলেও খালি পায়ে বেরিয়েছে—সদর দরজার পথেই হোক কিংবা ওই স্টোরের পিছনকার জানালা গলিয়েই হোক। কারণ, জুতোর সুরকির ছাপ বেডরুমে নেই। আবার, বসবার ঘরের জুতোর ছাপগুলো সব ঘরে ঢোকার, বেরিয়ে যাবার নয়। তিন ঃ সে গুপ্টা দম্পতির সঙ্গে মদ খেতে বসেছিল, তা না হলে বিষ মেশানোর সুযোগ করা খুবই কঠিন। এবং বিষ মেশাতে হলে ওঁদের অন্যমনস্কতা থাকা চাই। আমার ধারণা, এমন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—যাতে উভয়েই গুপ্টা দম্পতি ভীষণভাবে ইনভলভড। এমনও হতে পারে, একটা গুরুতর জীবনমরণ প্রশ্ন জড়িত ছিল আলোচনায়।

সত্যেন্দ্র বলল—কারেক্ট। আমি একমত।

ডাঃ পট্টনায়ক সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বললেন—কিন্তু মৃত মানুষকে আঘাত করতে গেল কেন খুনী?

কর্নেল বললেন—পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এটা আজকালকার চুরিডাকাতির ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল সম্ভবত।

—কিন্তু সে যদি অত ধূর্ত, তাহলে কিছু চুরির নমুনা রাখেনি কেন?

—সময় পায়নি!

—কেন?

—মনে রাখবেন, ডাক্তারের হিসেবে ওঁদের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে পারুল অ্যাডের ছেলেরা এসে পৌঁছেছে এখানে, সবদিক বিচার করে আমার অনুমান, ওঁদের মৃত্যু পাঁচটা পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হয়ে থাকবে। তারপর খুনী ডেডবডিতে ছুরি বা ধারালো কিছু চালিয়েছে। কিন্তু চুরির অজুহাত দেখানোর সুযোগ পায়নি বিজনবাবুরা এসে পড়ায়। ওরা খুনীকে দেখতে পেত না। দিব্যি উর্মিদেবীর হার বা চুড়ি নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু মনে রাখবেন, খুনের পর খুনীর মানসিক অবস্থা কেমন থাকে। সে একটু শব্দেই তখন চমকে ওঠে। হঠাৎ সেই সময় বিজনবাবুরা হল্লা করে পৌঁছেছিলেন। কাজেই তাঁর তখনই বিভ্রান্ত হয়ে পালানো স্বাভাবিক। অবশ্য, সবই আমার হাইপোথিসিস যাকে বলে।

—কিন্তু তাহলে শেষ অব্দি অবনী ভরদ্বাজই আপনার ধারণা অনুসারে এই কেসের আসামী। আমি অবাক হচ্ছি যে অমন নামী ভদ্রলোক নিজের কেরিয়ার নষ্ট করার চান্স নেবেন এভাবে? এটা উদ্ভট লাগে না কি? নিশ্চয় ওঁর হাতে একগাদা ফিল্মের দায়িত্ব রয়েছে—আর উনি...

কর্নেল হাত তুলে বললেন—আমরা এখনও সত্যে পৌঁছাইনি ডাঃ পট্টনায়ক। সত্যে পৌঁছাতে হলে অনেক ঘুরপথে যেতে হয়।...

॥ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক ॥

বাগানবাড়ির পাঁচিল ঘেরা মাঠে একটা শিরীষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কর্নেল, সত্যেন্দ্র, ডাঃ পট্টনায়ক আর স্থানীয় পুলিশ অফিসার হিতেন চক্রবর্তী আলোচনা করছিলেন। কর্নেল হিতেনবাবুকে প্রশ্ন করছিলেন। এবার সত্যেন্দ্রের দিকে ঘুরে বললেন—খুনের দিন তাহলে ইদ্রিস খানের সেই কর্মচারী রনু ছেলেটি এসেছিল বিকেল চারটেয়। তাই না?

সত্যেন্দ্র বলল—হ্যাঁ। একটু-আধটু এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে চারটের কাছাকাছি বলা যায়।

—রনু দেখা করেছিল মিঃ গুপ্টার সঙ্গে। ইজ ইট?

—হ্যাঁ। মিঃ চক্রবর্তী, ওর স্টেটমেন্টটা এই ফাইলে আছে। প্লিজ, বের করে ওঁকে দিন না।

হিতেনবাবু ফাইলের নির্দিষ্ট জায়গাটা খুলে কর্নেলের সামনে ধরলেন। কর্নেল চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। তারপর বললেন—হুম! রনুর সঙ্গে বারান্দায় কথা বলেন মিঃ গুপ্টা। তারপর রনু চলে যায় দক্ষিণের পোর্শনে—ওদের ঘরটায়। বিজনদের জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকে। সত্যেন্দ্র, আমি ছেলেটির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

—তাকে এখন এখানে পাবেন কোথায়?

হিতেনবাবু বললেন—না স্যার। রনু আর ইদ্রিস সায়েব সকালে এসেছেন। চলুন, দেখা হয়ে যাবে।

মাঠ ঘুরে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে সবাই দক্ষিণের অংশে গেলেন। সদর ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় চেয়ারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে বসে রয়েছেন। একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে সামনে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এঁদের দেখে ভদ্রলোক শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। হিতেনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। কর্নেল বললেন—আপনিই তাহলে এ বাড়ির মালিক? বাঃ, আলাপ করে খুশি হলুম মিঃ খান। অবশ্য, আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতেই পারছি—একে ছিল ভূতের বাড়ি, এবার খুনের ঘটনা বেচারার বরাতে এসে পড়ল। এসব পুরানো বাড়ির কী যেন অভিশাপ আছে!

ইদ্রিস সায়েব অমায়িকভাবে হাসলেন। হাসিটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

—আর তুমিই তাহলে মিঃ সেলিমের আত্মীয়—রনু?

রনু মাথা নেড়ে হাসবার চেষ্টা করল।

—তুমি আমার ছেলের বয়সী। তাই নাম ধরে ডাকছি বা তুমি বলছি। রাগ করছ না তো ইয়ংম্যান?

—না স্যার। কী যে বলেন?

—এস, আমরা ওই গাছটার নীচে যাই। একটু গল্প করে আসি।

কর্নেল তার হাতে ধরে অন্তরঙ্গভাবে একটা অর্জুন গাছের তলায় নিয়ে গেলেন। সত্যেন্দ্ররা ইদ্রিস সায়েবের সঙ্গে গল্প করতে থাকল।

কর্নেল বললেন—আচ্ছা রনু, তুমি খুনের দিন ঠিক ক'টায় এখানে এসেছিলে?

—সে তো একবার বলেছি, স্যার! প্রায় চারটে-টারটে হবে। ঘড়ি দেখিনি!

—এসে ঠিক কী কী করেছিলে একটু বলো তো বাবা?

রনু নার্ভাস হয়ে বলল—এসে? এসে তো বাহাদুরকে ডাকলুম প্রথমে। বাহাদুরকে বললুম—আমার সেই দাদা আর তার বন্ধুরা আসছেন। সে যেন কাইফরমাশ খেটে দেয় আগের মতো। বাহাদুর শুনে নিজের ঘরে চলে গেল। ওর বউটা খুব দজ্জাল মেয়ে স্যার! পাকা কুল শুকোতে দিয়েছিল, তার পাহারার ভার ছিল বাহাদুরের ওপর। তাই...

—তারপর তুমি কী করলে?

—ঘর খুললুম। কিচেনে গিয়ে কুকার জ্বাললুম। তারপর চায়ের জল চাপিয়ে দিলুম। তারপর মিঃ গুপ্টাকে খবরটা দিতে গেলুম।

—ঠিক কতক্ষণ লাগল এসব কাজে?

—কতক্ষণ?

—ভেবে বলবে কিন্তু।

—বড়জোর মিনিট পনেরোর বেশি নয়।

—কোন পথে মিঃ গুপ্টার কাছে গেলে?

—কেন? এই আগাছার ঝোপ পেরিয়ে। ওই তো পথটা রয়েছে।

—বেশ। গিয়ে কী করলে?

—আমি ওদিকের বারান্দায় উঠতেই মিঃ গুপ্টা বেরিয়ে এসে বললেন—কী খবর রনু? আমি বললুম—আজ সেলিমভাই আর তার বন্ধুরা পিকনিক করতে আসছে একটু পরেই। রাত্রে থাকবে। আপনাকে জানাতে বলেছে।

—মিঃ গুপ্টা কী বললেন?

—খুব খুশি হলেন মনে হল। কী আর বলবেন?

—সত্যি খুশি হলেন?

—হ্যাঁ।

—ভাবো। তোমাকে সময় দিলুম ভাবতে। ভেবে বলো!

রনু আরও নার্ভাস হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল ওর কাঁধে হাত রেখে ফের বললেন—কোন ভয় নেই। জাস্ট থিঙ্ক, মাই বয়!

—স্যার!

—হুঁ?

—মিঃ গুপ্টা বোধ হয় খুশি হননি!

—কেন, কেন?

—ওর মুখটা মনে পড়ছে স্যার। হ্যাঁ—মনে পড়ছে, উনি, ভুরু কুঁচকে ছিলেন। বলেছিলেন—তাই নাকি? এ অসময়ে পিকনিক! আছে ভালো সব! তারপর 'ঠিক আছে' বলে তক্ষুণি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমার বেশ অবাক লেগেছিল কিন্তু। একটু খারাপও লেগেছিল। এলুম তাঁর কাছে, আর উনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লেন...

—আচ্ছা, আচ্ছা! এবার বলো, কতক্ষণ তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে?

—এক মিনিটও নয়। মনে হয়েছিল—হয়তো ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললেন না!

—ওঁর ঘরের কোন আওয়াজ তোমাদের কোন ঘরে পৌঁছায়?

—না স্যার। সলিড দেয়াল রয়েছে ছাদ অব্দি। শুনেছি, দানিয়েল সায়েব তাঁর এক বন্ধুর জন্যে পরে বাড়িটার মাঝামাঝি দেয়াল্ তুলে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন—সেজন্যেই ঘরগুলো ছোট হয়ে গেছে। সেই বন্ধু দানিয়েল সায়েবের স্ত্রীকে নাকি এলোপ করে পালান। তাই সায়েব শেষে পাগল হয়ে যান!

—তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি। আচ্ছা রনু, তোমার কি মনে হয়েছিল, মিঃ গুপ্টার ঘরে তখন ওঁর স্ত্রী বাদে আর কেউ ছিল?

—আমি তো ভেতরে যাইনি স্যার।

—তাহলেও জাস্ট একটা আইডিয়ার কথা বলছি।

—স্যার!

—হুঁ, বলো রনু।

—স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন।

—হুঁউ?

—আমার তাই মনে হয়েছিল বটে। ঘরে কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে এসেছিলেন যেন গুপ্টা সায়েব। কারণ, আমার পায়ের শব্দ পেয়েই উনি বেরোলেন! তারপর হঠাৎ আবার চলে গেলেন! হ্যাঁ—একটা আবছা ধারণা হয়েছিল মনে পড়ছে। তাছাড়া...

—তাছাড়া?

—ওঁকে একটু মাতালও মনে হচ্ছিল। মদের গন্ধ পেয়েছিলুম।

—সেই ঠিকই। কারণ, যে বোতলটা পাওয়া গেছে, তাতে মদ আর অল্পই ছিল। আচ্ছা, চলো—আমার কথা শেষ হয়েছে।

চলতে চলতে রনু বলল—কোন বিপদ হবে না তো স্যার?

—কেন?

—এত সব তো পুলিশকে বলিনি!

—না, না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। বলে কর্নেল বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। কর্নেল ভাবছিলেন, দুটো গ্লাস পাওয়া গেছে। তৃতীয়টা গেল কোথায়?...

ফেরার পথে পুলিশের গাড়িতে বসে কর্নেল ফাইলটা খুললেন। মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দের বিবৃতিটা পড়তে লাগলে।

আনন্দ ৭ই মার্চ বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিট ফ্ল্যাটের জিনিসপত্তর ট্রাকে যাবার সময় সঙ্গে যায়। সব গোছগাছ করতে রাত দশটা বাজে ওখানে। মিঃ গুপ্টা জানান, পরদিন অফিস বন্ধ থাকবে। তিনি বিশ্রাম নেবেন। আনন্দরও ছুটি। তবে ৮ই মার্চ সকালে ওঁর বড় বউকে যেন সে জানিয়ে আসে—সায়েব হঠাৎ কাজে দিল্লি গেছেন। ফিরবেন ১০ই মার্চ। হ্যাঁ, আনন্দ জানে—বড় বউ এতে কিছু হইচই করেন না। স্বামীর খামখেয়ালি আচরণে তিনি অভ্যস্ত। যাই হোক, আনন্দ কথামতো সব করেছিল।

এসব বিবৃতির প্রতি বরাবর কর্নেল গুরুত্ব দেন না। প্রচলিত গতানুগতিক ঢঙে একজন পুলিশ অফিসার খসখস করে লিখে যান এবং সই করিয়ে নেন। খুঁটিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় খুব কমই। অর্থাৎ পুলিশের পদ্ধতি হল, আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছেই ওঁরা প্রমাণ হাতড়াতে ব্যস্ত হন। কর্নেলের হল উলটো। আগে প্রমাণ, পরে সিদ্ধান্ত।

সুতরাং আনন্দকে মুখোমুখি চাই। একটা প্রশ্ন খুব তীব্র। মিঃ গুপ্টা হঠাৎ রাতারাতি কেন বাগানবাড়িতে চলে এলেন উর্মিকে নিয়ে? আনন্দকে তিনি এর কৈফিয়ত দিয়েছিলেন কি? কিংবা আনন্দের কি কোন কৌতূহল হয়নি?

ইদ্রিস সায়েব বলছেন—২১শে মার্চ ও বাড়িতে মিঃ গুপ্টা আসার কথা ছিল।

কিন্তু হঠাৎ ৭ই মার্চ দুপুরে মিঃ গুপ্টা ইদ্রিস সায়েবের কলকাতার অফিসে ফোন করে বলেন যে এদিনই তিনি যেতে চান। ইদ্রিস সায়েব আপত্তি করেননি। তাজ্জব হয়েছিলেন কি? তা তো হবারই কথা। তবে তাজ্জব হয়েছিলেন অন্য কারণে নয়—লোকে ওই বয়সেও কচি বউয়ের বায়না মেটাতে অমন পাগল হয়, সেটা লক্ষ্য করেই। ইদ্রিসের ধারণা, ওঁর দ্বিতীয়পক্ষটি খুব খামখেয়ালি বিবি ছিলেন। হঠাৎ 'উঠল বাই তো মক্কা যাই' গোছের স্রেফ খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া গুপ্টা সায়েব ও বাড়িতে গিয়ে থাকলে ইদ্রিসের একটা বড় অস্বস্তি দূর হয়। কেউ আর গিয়ে জবরদখল করে বসতে পারবে না। সরকারও 'খালি কোঠি' বেমক্কা কেড়ে নিতে পারবেন না। ঠিক এজন্যেই তো ইদ্রিস কষ্ট করে মাসের পর মাস কলকাতা থেকে গিয়ে ওখানে রাত কাটাতেন।

তাই উনি প্রস্তাবটা শোনামাত্র বলেছিলেন—ইন্‌শা আল্লা! খুব ভালো, উম্‌দা বাত আছে। চলে যান এক্ষুণি, কোঠি তো আপনার আছে গুপ্টা সায়েব। রনু বাহাদুরকে চাবি দিয়ে আসছে। সব সমঝে দিচ্ছি ওকে। আভি পাঠাচ্ছি। বাহাদুর ঝামেলা করবে না।

ইদ্রিস খানের কাছে কিছু আর নতুন জানার নেই। এখন আনন্দকে দরকার। কর্নেল একটু কেশে বললেন—সত্যেন্দ্র আমি মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

সত্যেন্দ্র বলল—নিশ্চয় বলবেন। চলুন, লালবাজার পৌঁছেই ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—আমি এখন কিন্তু যাচ্ছি না তোমার সঙ্গে। বাসায় ফিরতে চাই। তুমি বরং আনন্দবাবুকে আমার বাসায় যেতে বলো। ঠিকানা দিয়ে দিও।

কর্নেল বাকি পথ চুপ করে থাকলেন। হুম্‌, বাহাদুর লোকটা বউকে বড্ড ডরায়। রনু ঠিকই বলছিল। সব সময় সে বাচ্চা কোলে নিয়ে পাকা কুঠি পাহারা দেয় বউয়ের হুকুমে। আর দক্ষিণের গেটের দিকে লক্ষ্য রাখে। কেউ ঢুকলে ওখান থেকেই ধমক দেয়। উত্তরের দিকে কিছু ঘটলে সে টেরও পায় না। ৭ই মার্চ মাত্র একবার ওদিকে গিয়ে নতুন সায়েবকে দরজা খুলে দিয়েই দৌড়ে নিজের কাজে চলে এসেছিল সে। সেদিন আর যায়নি। গিয়েছিল ওর বউ লক্ষ্মীরানী। লক্ষ্মী সায়েবদের এক বালতি জল দিয়ে আসে সন্ধ্যার দিকে। তারপর সেও আর সেদিনের মতো যায়নি। পরদিন ৮ই মার্চ সকালে বাহাদুরকে ডাকেন সায়েব। বাহাদুরকে এক বালতি জল দিতে বলেন। সে জল দিয়ে আসে। দুপুরে একবার সায়েব ও মেমসায়েব বেরিয়েছিলেন। দক্ষিণের গেট দিয়ে হেঁটে দু'জনে বেরোন। সেই সময় বাহাদুরকে জিগ্যেস করেন, কোন্‌ রাস্তায় গেলে বাজার বা হোটেল পড়বে। ওঁরা খেতে বেরিয়েছিলেন। ফেরেন আন্দাজ ঘণ্টা দুই পরে। বাজারের দিকে তিনটে বড় হোটেল আছে। পান্থনিবাস

হোটেলের মালিক যা বর্ণনা দিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে ওঁরা সেখানেই লাঞ্চ সেরেছিলেন। বাহাদুরের বউ লক্ষ্মী খুব চাপা মেয়ে। খুব কম কথা বলে। কী যেন জানে ও, বলতে চায় না।

কর্নেল একবার ভাবলেন, এ তাঁর নিছক অনুমান—পরে ভাবলেন, তাহলে লক্ষ্মীর মুখে কেন হঠাৎ অমন ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন তখন?

ভাবান্তর একটা ঘটেছিলই। উত্তরোত্তর এ সন্দেহ দৃঢ় হল। লক্ষ্মী কিছু একটা গোপন করেছে, এ ধারণা কিছুতেই গেল না কর্নেলের মন থেকে।

কিন্তু ওই অশিক্ষিতা লক্ষ্মীর কাছ থেকে কথা আদায় করা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও যেন অসম্ভব। অনেক কূট প্রশ্ন করেও পাত্তা পাননি কর্নেল। লক্ষ্মীর এক কথা—সে ওদিকে আর যায়নি। কিচ্ছু শোনেনি বা দেখেওনি।

অথচ......

কর্নেল নড়েচড়ে বসলেন। শ্যামবাজার চৌমাথা পেরোচ্ছে পুলিশের গাড়ি। বললেন—আমাকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে নামিয়ে দেবে, সত্যেন্দ্র।

সত্যেন্দ্র বলল—কেন বাসায় ফিরবেন না?

—ফিরব। ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না।

—আপনার লাঞ্চের দেরি হয়ে যাবে কিন্তু।

কর্নেল হাসলেন।—না। ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে। এইমাত্র মনে পড়ল!

বড় রাস্তার ওপর বাড়িটা। পাঁচতলা বিশাল বাড়ি। রাজস্থানি স্থাপত্য। কর্নেল মুখ তুলে এক মিনিট বাড়িটার ছাদ অব্দি দেখলেন। তারপর সরু গলিতে ঢুকলেন। বাঁদিকে চওড়া সিঁড়ি। লিফট নেই। বুড়োদের পক্ষে নিশ্চয় খুব কষ্টকর ব্যাপার। তবে কর্নেল অন্য মানুষ। এখনও অনেক কুস্তিগীরকে ধরাশায়ী করার মতো জোর ও কৌশল তাঁর আছে।

অবশ্য কেউ তাঁকে এ বাড়িতে লড়াই দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে না। চারতলায় উঠে একটা ফ্ল্যাটের বোতাম টিপলেন। এখন অসময় দেখা করার পক্ষে। কিন্তু কাজটা সেরেই যেতে হবে।

একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান কিশোর দরজা খুলে হিন্দিতে বলল—কাকে চান?

—তোমার নাম কী বাবা? ...বলে কর্নেল মিষ্টি হেসে ওর চিবুকটা নেড়ে দিলেন।

কিশোরটি ভুরু কুঁচকে ওঁকে দেখছিল। এবার বিরক্ত হয়ে বলল—কে আপনি?

—তোমার বাবার বন্ধু। মাকে বলো আমার কথা।

কিশোরটি মুখ ঘুরিয়ে ডাকল—মা, দেখ তো কে এসেছেন।

একটি মহিলা—চল্লিশের মধ্যে বয়স, সুশ্রী চেহারা, দরজার কাছে এসে বললেন—কাকে চাই আপনার?

কর্নেল একটু হাসলেন। —আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। মিঃ গুপ্টার...

মহিলাটি গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি কি পুলিশের লোক?

কর্নেল জবাব দিলেন—মোটেও না। আমি মিঃ গুপ্টার একজন বন্ধু। দুঃখের ব্যাপার, কাগজে ওঁর মৃত্যুর খবর দেখলুম—প্রথমে বুঝতেই পারিনি উনি আমার বন্ধু প্রকাশ গুপ্টা কি না। পরে খোঁজ নিয়ে জানলুম, ব্যাপারটা তাই। খুব বিচলিত হয়ে পড়লুম। ওঁর সঙ্গে আমার বহুকালের দোস্তি ছিল। বেচারা গুপ্টা...

মহিলাটির দু'চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল। —থাক্। আর দোস্তের জন্য আপনি সিমপ্যাথি দেখাবেন না। আপনারাই তো ওঁকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছেন! আপনারাই অমন ভাল মানুষটার সর্বনাশ করেছেন! এখন এসেছেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে! আমি কারও সান্ত্বনা চাইনে! আপনি দয়া করে আসুন!

কর্নেল বিব্রতমুখে কিছু বলতে যাচ্ছেন, সেই সময় একটি যুবক মিসেস্ গুপ্টার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার চেহারা দেখে মনে হল, সে বাঙালি। সে বলল—কী হয়েছে ভাবীজী? কে উনি?

কর্নেল বাংলায় বললেন—যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, আপনি নিশ্চয় আনন্দ সান্যাল?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—বলছি। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না আনন্দবাবু!

মিসেস্ গুপ্টা আর একবার ওঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বললেন—খুব জরুরি কিছু বলার থাকলে আসুন। তবে আগেই বলে রাখছি, কোম্পানির কোন ব্যাপারে আমি এখন কথা বলব না। বোম্বে থেকে আমার দেওর আসছে। সে এলে কথা হবে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আনন্দবাবু, আপনার বন্ধুরা—আপনার বন্ধুরা—মানে পারুল অ্যাডের বিজনবাবুরা আমাকে চেনেন। আমি...

আনন্দ এবার লাফিয়ে উঠল। —চিনেছি স্যার! আপনি কর্নেল সরকার। ডেসক্রিপসন মিলে যাচ্ছে। আমি আপনার কাছে যেতুম, স্যার।

মিসেস্ গুপ্টা অবাক হয়ে আনন্দের দিকে তাকালেন। আনন্দ ওঁর কানেকানে কিছু বলল। তখন উনি বললেন—আপ অন্দর আইয়ে!

মিঃ গুপ্টার বড় বউ জাঁদরেল ধরনের গৃহিণী সন্দেহ নেই। ঘরদোর পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। সবখানে পরিবারের ধর্মানুরাগের পরিচয় সুপ্রকট। বসার ঘরে ঢুকে কর্নেল লক্ষ্য করলেন—মিঃ গুপ্টার একটি বিশাল ছবিতে মালা দেওয়া রয়েছে। ভারতীয় নারীরা সত্যি খুব অবাক করে দেয়! একটি বারো-তের বছরের ফুটফুটে মেয়ে ও একটি আট-ন'বছর বয়সের সুন্দর ছেলে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেল। আঃ, এমন সুন্দর পবিত্র সংসার ফেলে প্রকাশ গুপ্টা কী খুঁজে পেয়েছিল মিলি সেনের কাছে? ভাবতে কষ্ট হয়।

কর্নেল বসলেন। আনন্দও একপাশে বসল। মিসেস্ গুপ্টা সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। শোকের মলিনতা এরই মধ্যে কাটিয়ে উঠেছেন মহিলাটি। এটা মেয়েরাই পারে সম্ভবত। তারা সর্বংসহা। কর্নেল মনে মনে তারিফ করলেন।

আনন্দ বলল—জানেন? আমিও বিজনদের সঙ্গে আপনার কাছে যেতুম। কিন্তু এ বাড়িতে ভাবীজীকে সামলানো, ওদিকে কোম্পানি—এসব নিয়ে একটু ফুরসত পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল বললেন—আনন্দবাবু, আপনাকে আমি পরে প্রশ্ন করব। আপাতত মিসেস্ গুপ্টার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা সেরে নিই।

মিসেস্ গুপ্টা বললেন—বলুন।

—আপনি বসুন, প্লিজ।

উনি বসলেন। কর্নেল এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললেন—উর্মি দেবীর সঙ্গে মিঃ গুপ্টার সম্পর্কের কথা কি আপনি জানতেন?

মিসেস্ গুপ্টা মুখ নামিয়ে জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

আনন্দ চমকে গেল, তা লক্ষ্য করলেন কর্নেল। তারপর বললেন—আনন্দের কাছে শুনেছিলেন, নাকি অন্য কোন উপায়ে জেনেছিলেন?

—আনন্দ আমাকে কিচ্ছু জানায়নি। বেচারিকে আমি এর জন্যে এতটুকু দোষ দিইনে। ও খুব ভাল ছেলে। ও মাথার ওপর না থাকলে আজ খুব বিপদে পড়ে যেতুম। ও কী করবে? মনিবের বদমাইসি কি তার কর্মচারী মনিবের স্ত্রীর কাছে বলতে সাহস পায়? তবে আমি বরাবর জানতুম। জেনেও আর কী করব? মিঃ গুপ্টাকে ফেরাবার সাধ্য আমার ছিল না।

—কীভাবে জানতে পেরেছিলেন?

—সে অনেক কথা। গত বছর অব্দি আমরা বোম্বেতে ছিলুম। ওঁর ব্যবসাও ছিল সেখানে। মেসিনারি জিনিসপত্রের দালালির কারবার ছিল—কতকটা অর্ডার সাপ্লায়ের মতো। হঠাৎ উনি কলকাতায় ব্যবসা করবেন বললেন। চলেও এলেন। দু'মাস পরে আমাদের নিয়ে এলেন। আমি ভাবলুম, ভাল হল। বেশ্যা মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে এসেই টের পেলুম, ওঁর কলকাতা আসার কারণ কী। মেয়েটা ক্যামাক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে রয়েছে। আর...

বাধা দিলেন কর্নেল। —আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব পাইনি কিন্তু!

—হ্যাঁ, বোম্বোতে উনি ফিল্ম লাইনেও ঘুরতেন। বলতেন—ছবি প্রডিউস করবেন। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন প্রডিউসার। ভদ্রলোক মাদ্রাজি—নাম, নারায়ণ কুমারমঙ্গলম।

—মাদ্রাজি! কর্নেল চমকে উঠলেন।

—হ্যাঁ। ...বলে একটু চুপ করে গেলেন মিসেস্ গুপ্টা। তারপর বললেন—

এসব কথা বলা হয়তো উচিত নয়। কিন্তু বলছি। পাপ কখনও চাপা থাকে না। কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে মিলে উনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কুমারমঙ্গলমও খুব একটা পয়সাওয়ালা ছিলেন না। কিন্তু মাথায় ফিল্মের হাওয়া ঢুকলে যা হয়। দুই বন্ধু মিলে ষড়যন্ত্র করলেন। মিঃ গুপ্টার দু'ভাই। বড়ভাই মারা গিয়েছিলেন অনেক পয়সা কামিয়ে। ওঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল—নাম রূপেশ।

কর্নেল দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন। —রূপেশকুমার!

—হ্যাঁ, ফিল্মে ওই নাম নিয়েছিল বেচারা। বোকা ছেলে! চাচার ষড়যন্ত্র জানতে পারেনি। রূপেশের মাও সরল সাদাসিধে মেয়ে। আমার স্বামী ভেবেছিলেন, রূপেশকে সরাতে পারলে ওঁর সম্পত্তি কায়দা করতে দেরি হবে না। সেই লোভে আমার স্বামী স্যুটিংয়ের সময় নকল রিভলবারের বদলে আসল গুলিভরা রিভলবার পাচার করলেন বেশ্যা মেয়েটার হাতে। সে ছিল ওই ছবির হিরোইন। আগে থেকে সব ঠিক করা ছিল।

—কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে, এখনও বলেননি কিন্তু!

—আমাদের সোফার ছিল আমার বাবার দেশের লোক। তার কাছে জেনেছিলাম। কলকাতায় এসে তার কাছেই জানতে পারলুম, এখানে আমার স্বামী কী করছেন।

—হুম্‌ তারপর?

—গাড়িটা বেচে দিলেন উনি গত মাসে। বেচারার চাকরিও গেল। ও বোম্বে ফিরে গেল। যাবার দিন দেখা করেও যায়নি। এখন ভাবছি, লোকটা থাকলে হয়তো আরও অনেক কিছু জানতে পারতুম।

—মিঃ গুপ্টা এবং ঊর্মি দেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা, জানতে পারি কি মা?

মাথা নাড়লেন মিসেস্ গুপ্টা। —জানি না। তবে আমার সন্দেহ...

—হ্যাঁ, বলুন বলুন!

—সন্দেহ করতুম না। কিন্তু আনন্দ এতদিনে সন্দেহটা মাথায় ঢুকিয়ে দিল। আনন্দই বলুক বরং।

কর্নেল আনন্দের দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন। আনন্দ কুণ্ঠিত মুখে বলল—সন্দেহটা ভুল হতেও পারে। তবে মাঝেমাঝে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোকের কাছে আমাকে পাঠাতেন সায়েব। একটা প্যাকেট দিতেন উনি। প্যাকেটটা গুপ্টা সায়েবকে পৌঁছে দিতাম। বেশ বড় প্যাকেট। বলতেন—স্মাগলিং করে আনা বিলিতি মদ আছে। কখনও বলতেন—কাপড় আছে। বার তিনেক আমি এনেছি গত তিনমাসে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তায় নির্দিষ্ট একটা তারিখে আমাকে যেতে হত। কোন মাসে দু তারিখ, কোন মাসে সাত তারিখে। ভদ্রলোক খুব বদরাগী। সায়েবেরই বয়সী। ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখে

গেলে প্যাকেট দিলেন—বেশ ভারী। কিন্তু খুব ধমকালেন আমাকে। তারপর বললেন—গুপ্টাকে বলো, আর কারবার চলবে না এভাবে। সব কিছুর শেষ হয়ে যাবে। আমি তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে ওঁকে বললে উনি রেগে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি এবার থেকে নিজেই যাব মোকাবিলা করতে।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। —আজ চলি তাহলে। আনন্দবাবু, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সেই ঠিকানাটি কি আপনার মনে আছে?

আনন্দ বলল—খুব আছে স্যার।

—একটা কাগজে লিখে দিন।

মিসেস্ গুপ্টা শশব্যস্তে বললেন—কর্নেল সাহাব, প্লিজ মাফ করবেন। এক গেলাস সরবত খেয়ে যান। আমার ভুল হয়ে গেছে।

কর্নেল হাত তুলে মিষ্টি হাসলেন। —পরে হবে মা, আজ চলি।...

॥ শেষ দৃশ্য ॥

পরদিন সকালে কর্নেলের ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বাজল।

ষষ্ঠীচরণ এসে বলল—কে একজন দেখা করতে এসেছেন!

কর্নেল বললেন—পাঠিয়ে দে।

একটু পরেই ভদ্রলোক ঢুকলেন। খুব উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত আর উত্তেজিত। কর্নেল বললেন—আসুন মিঃ ভরদ্বাজ, বসুন।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—ছবি দেখেছিলুম। বসুন দয়া করে।

অবনীবাবু বললেন। —কী ব্যাপার কর্নেল সরকার? সেলিম ট্রাঙ্ককল করল—ওদিকে বোম্বে পুলিস গতকাল স্টেটমেন্ট নিল, আমি বোম্বে থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে বোম্বে ফেরা অব্দি কোথায় কোথায় গেছি বা কী করেছি! হরিবল্ ব্যাপার!

—উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই মিঃ ভরদ্বাজ।

—অদ্ভুত ব্যাপার। সেলিম খুলে কিছু বলেনি। শুধু বলল—যদি স্ক্যান্ডালের হাত থেকে বাঁচতে চান অবনীদা, এক্ষুণি কলকাতা এসে কর্নেল সরকারের সঙ্গে দেখা করুন। ও আপনার ঠিকানাও জানিয়েছিল। আমি এইমাত্র দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সটান আপনার কাছে চলে এসেছি।

—সেলিমকে আমিই কাল বিকেলে ট্রাঙ্ককল করতে বলেছিলুম।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন—৮ই মার্চ বিকেলে ঠিক ক'টায় আপনি ব্যারাকপুর কুঠিবাড়িতে গিয়েছিলেন?

অবনীবাবু চমকে উঠে বললেন—আমি? আমি....

—প্লিজ, গোপন করবেন না।

—হ্যাঁ। গিয়েছিলুম। মিলি আমাকে বলেছিল ওইদিন বিকেলে ওখানে যেতে।

—মিলির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল তাহলে?

—মোটেই না। হঠাৎ বোম্বেতে ওর চিঠি পেয়েছিলুম। দীর্ঘ চিঠি। রূপেশকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আদ্যোপান্ত সব লিখেছিল। ও নাকি এতদিনে ভুল বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মাসের পর মাস ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে একজন। আমি গিয়ে যেন ওকে বাঁচাই। চিঠি পেয়ে খুব মায়া হল। ইতিমধ্যে কলকাতা যাবার প্রোগ্রাম ছিল আমার। এলুম—এসে ওর কথামতো ফোন করলুম। ও একটা জায়গার নাম বলল—দক্ষিণ কলকাতার একটা রেস্তোরাঁর। সেখানে দেখা হল। খুব কান্নাকাটি করল। ওকে বাঁচাতে হবে। ওকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে অদ্ভুতভাবে।

—রাইট, রাইট। এমন আজব ব্ল্যাকমেইলের কথা শোনা যায় না! ওকে ব্ল্যাকমেলারের স্ত্রী সেজে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। নয়তো ফেরারি আসামীকে তক্ষুণি পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

—আপনি তাহলে জানেন!

—আমার ধারণা তাই। আপনি এবার বলুন।

—মিলির মতে, এতে একটা সুবিধে অবশ্য তার হচ্ছে। ব্ল্যাকমেলার মিঃ গুপ্টার আশ্রয়ে থাকায় পুলিসের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকছে সে। বিনিময়ে বেচারাকে দেহটা ভোগ করতে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এ তো বরাবর মানুষ পারে না। ও একটা মুক্তি খুঁজছে। আমি ছাড়া কেউ নাকি ওকে বাঁচাতে পারে না। যাই হোক, আমি উদ্বিগ্ন হলুম। আফটার অল, অমন চেহারা—শিখিয়ে-পড়িয়ে ভবিষ্যতে স্টার করার সম্ভাবনা নিশ্চয় ছিল। আমি ভাবতে থাকলুম, কী করা যায়। ও আমার হোটেলের ঠিকানা নিল। পরদিন দুপুরে—৭ই মার্চ তারিখে ফের ফোন করবে বলল। তারপর ঠিকই ফোন করল। কিন্তু হঠাৎ নাকি মিঃ গুপ্টা ওকে ব্যারাকপুর বাগানবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আমি যেন ৮ই মার্চ বিকেলে ওখানে চুপি চুপি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি। মিঃ গুপ্টা ওসময় কলকাতায় থাকবে। মিলি জানে, গুপ্টাকে নাকি ওইদিন বিকেলে কলকাতায় থাকতেই হবে।

—আপনি তাহলে কথামতো গেলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু গেটের কাছে ট্যাকসি থেকে নামতেই দেখি এদিকের বারান্দায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিলি আমাকে উত্তর দিক ঘুরে যেতে বলেছিল। কঠোরভাবে নিষেধ করেছিল যে, যেন কেউ আমাকে না দেখতে পায়। কারণ, মিলির কাছে কে আসে—গুপ্টা তার কড়া খবর রাখতে অভ্যস্ত। সে জানতে পারলে মিলিকে মারধর করবে। অতএব উত্তর দিক ঘুরে ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে ঢুকলুম। ঢুকে দরজায় কড়া নাড়লুম। কোন সাড়া পেলুম না। ঠেলতেই দরজা

ফাঁক হল। তখন ঢুকে ওর নাম ধরে ডাকলুম। কানের ভুল হতেও পারে—আবছা শব্দে মনে হল, ও আসছে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসার ঘরের সোফায় বসলুম। বসে আছি তো আছিই। তখন অবাক লাগল। হঠাৎ দেখি কে একজন সাঁৎ করে ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল। চেনা মনে হল। ওই ঘরটায় দেখেছেন নিশ্চয়, একেবারে আলো থাকে না দিনদুপুরেও। কিন্তু যেমনি ও বাইরের দরজার পর্দা তুলল, চিনলুম। তখন অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। এ যে মিঃ গুপ্টার সেই জুটি! তখন বেডরুমে গিয়ে উঁকি দিলুম। তারপর যা দেখলুম, আমার দম বন্ধ হয়ে গেল।....

—কিন্তু জুতো খুলে রেখে কেন?

—পায়ে হাল্কা স্লিপার ছিল। পা তুলেই বসেছিলুম। সেই অবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠে গেছি।

—প্লিজ, গোপন করবেন না।

একটু ইতস্তত করে অবনীবাবু বললেন—মানে, আমার সাবকনসাস মনে হয়ত ধারণা হয়েছিল যে কোন ফাঁদে পড়ে গেছি। নির্ঘাৎ মিলিকে ব্যাটা খুন করেছে! জাস্ট ইনটুইশান! এ অবস্থায় আমার সতর্ক হওয়া দরকার মনে হয়েছিল।

—আপনি বুদ্ধিমান, মিঃ ভরদ্বাজ। যাই হোক, গিয়ে দেখলেন দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

—হ্যাঁ। সে এক বীভৎস দৃশ্য! আমি জুতো আর পায়ে দিলুম না—পাছে জুতোর ছাপ পড়ে। অমনি বেরিয়ে সেই পাঁচিল ডিঙিয়ে পালালুম।

—আপনি কিন্তু ওই ঘরে বসে একটি সিগারেট খেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ।

—দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ, খুনীকে আপনি ছাড়াও আরো দু'জন দেখেছিল। তার আসার সময় দেখেছিল, যাবার সময় কিন্তু দেখতে পায়নি আর। কারণ, সে পালিয়েছিল সেই ভাঙা পাঁচিলের পথে। তার কাছে একটা গ্লাস ছিল আপনি দেখেননি নিশ্চয়?

—না। লক্ষ্য করিনি। কেন, গ্লাস কেন?

—পরে বলব'খন। গ্লাসটা কাল বিকেলে ফরেনসিক এক্সপার্টরা ভাঙা পাঁচিলের ইটের তলায় আবিষ্কার করেছে। আমি কাল সন্ধ্যায় আবার ওখানে গিয়েছিলুম। অবশ্য ছুরিটা পাইনি।

—কিন্তু আর কারা দেখেছিল ব্যাটাকে?

—বাহাদুর দারোয়ান আর তার বউ। বাহাদুর তো বউকে ভীষণ ভয় করে। ওর বউ চেপে গিয়েছিল—পাছে পুলিসের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। কাল চাপে পড়ে বাহাদুরের বউ সব কবুল করেছে।

—কিন্তু কর্নেল সরকার, এখনও আমি বুঝতে পারছি না, কেন কুমারমঙ্গলম খুন করল গুপ্টা আর মিলিকে?

—এ ব্যাপারটাকে বলব এ সার্কেল অফ ব্ল্যাকমেলিং! একটা বৃত্তের মতো। গুপ্টা ব্ল্যাকমেইল শুধু মিলিকেই করত না, কুমারমঙ্গলমকেও করত। কারণ রিভলভারটার মালিক ছিল কুমারমঙ্গলম। অস্ত্রটা মিলি স্যুটিংয়ের জায়গাতেই ফেলে রেখে আসে—তা আপনি নিশ্চয় জানেন! রীতিমতো লাইসেন্স ছিল কুমারমঙ্গলমের নামে। তাই তাকেও ফেরার হতে হয়। ঘুঘু প্রকাশ গুপ্টা কীভাবে জানতে পারে যে লোকটা কলকাতায় রয়েছে। সম্ভবত মিলি কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সে রহস্য অবশ্য এখন আর জানা কঠিন। যদি কুমারমঙ্গলম কবুল করে, তবে অন্য কথা।

এইসময় ফোনে রিঙ বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে বললেন—হ্যালো, এন. এস. কথা বলছি।

—কর্নেল! সত্যেন্দ্র বলছি। গুড নিউজ।

—পাখি ধরেছ?

—হ্যাঁ। চলে আসুন কর্নেল।

—অবশ্যই।

মিঃ কুমারমঙ্গলমকে তখন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের বাড়ি থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাহাদুর, তার বউ, অবনী ভরদ্বাজ—তিনজনেই সনাক্ত করেছে। আনন্দও একসময় এসে সনাক্ত করল। হ্যাঁ—এর কাছ থেকেই প্যাকেট নিয়ে যেত সে।

প্যাকেটে থাকত টাকা। কুমারমঙ্গলম কলকাতায় এসে চোরা নার্কোটিকসের ব্যবসা ধরেছিল। বেশ কামাচ্ছিল। কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। প্রকাশ গুপ্টার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

এমন ঢালাও অবাধ চোরাকারবারের জায়গা তো আর কোথাও নেই। টাকার লোভে কুমারমঙ্গলম চলে যেতে পারছিল না। অতএব ঠিক করল যে গুপ্টাকে সরাতে হবে। তাই সে মিলির সঙ্গে যোগাযোগ করল। মিলি গুপ্টাকে অনেক আগেই জানে মেরে দিতে পারত। সাহস পাচ্ছিল না। এবার দোসর জুটে সাহস পেল। কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে কাজটা করার চেয়ে কোন নির্জন জায়গা সে খুঁজল। দানিয়েল কুঠি কিনতে চেয়েছিল গুপ্টা নিজে—বড় বউয়ের দৃষ্টির আড়াল হবার জন্যে। মিলি প্ল্যানটা কাজে লাগাল। তবে গুপ্টা তড়িঘড়ি বাগানবাড়িতে চলে যাবার কারণ অবনী ভরদ্বাজের আবির্ভাব। মিলির ফোনে ট্যাপ ছিল। গুপ্টা সব টের পেয়েছিল তাই।

পটাসিয়াম সাইনায়েড কুমারমঙ্গলম দিয়েছিল মিলিকে। গুপ্টার সেদিন টাকা আনতে যাবার কথা ওর কাছে। কিন্তু মনে সন্দেহ। তাই থেকে গেল সেদিনটা। নড়ল না। মিলি ওকে আদর করে মদ দিল। গুপ্টা কিন্তু এদিকটা ভাবেনি কখনও। মদে চুমুক দিয়েই পড়ে গেল। মিলি তখন ছটফট করছে। পালাতে

হবে। কুমারমঙ্গলমের অপেক্ষা করছে সে। অবশেষে কুমারমঙ্গলম এল। লাশের কাছে দাঁড়িয়ে কিন্তু হঠাৎ ভয় হয়ে গেল তার।

কর্নেল বর্ণনা করছিলেন কেসটা। এবার থামলেন একটু। তারপর বলেন, এটা অদ্ভুত হিউম্যান সাইকলজি। কুমারমঙ্গলম কোনদিন মহিলাদের প্রতি আসক্ত ছিল না। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল টাকা। গুপ্টার লাশের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার প্রচণ্ড ভয় হল মিলিকে। এই যুবতী সুন্দরী মেয়েটি টাকার লোভে একদিন নির্দোষ নিরীহ একটি ছেলেকে গুলি করতে পেরেছিল। এবার অক্লেশে গুপ্টাকেও বিষ দিয়ে মারতে পারল। এপর যদি কেউ ওকে কুমারমঙ্গলমকে খুন করতে বলে—সে চোখ বুজে তাই করবে—একটুও হাত কাঁপবে না। অতএব সে তীব্র ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত মাত্র। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল ওর পক্ষে। ও সুযোগ খুঁজল। মিলির হাতে তখনও মদের গ্লাস। মিলি নির্বিকার। ওর মতো ঠাণ্ডা নির্বিকার মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ও হাসতে হাসতে বলল— এবার তুমি মনের আনন্দে ফিল্ম করতে পারবে। অবনী ভরদ্বাজকে আমি আসতে বলেছি এখানে। ও আসুক। ও খুব প্রভাবশালী লোক। পুলিশকে ম্যানেজ করে দেবে। তারপর আমরা ফিল্ম প্রডিউস করব। তোমার তো অনেক টাকা এখন।

কুমারমঙ্গলম অমনি ভড়কে গেল আরও। নাঃ, এক্ষুণি পালাতে হবে এই ডাইনীর হাত থেকে। কিন্তু পালানোর আগে তাকে শেষ করে যেতে হবে। সঙ্গে ছোরা ছিল। কিন্তু এ কাজে সে আনাড়ি। সে নার্ভও নেই। তখন ও চালাকি করল।—মিলি, আমার মনে হচ্ছে, কে যেন এসেছে বা আসছে। পায়ের শব্দ পেলুম। দেখে এস তো, মিঃ ভরদ্বাজ এলেন নাকি? মিলি ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল। বেরিয়ে গেল তক্ষুণি।

মদের গ্লাসটা রেখে গিয়েছিল মিলি। ছোরা মারার চেয়ে বিষ প্রয়োগ নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট। কুমারমঙ্গলমের পকেটে পটাসিয়াম সাইনায়েডের পুরিয়ে ছিল—যা থেকে খানিকটা সে গুপ্টাকে আগে দিয়েছিল।

ব্যস, মিলি ফিরে এসে 'কেউ আসেনি' বলল এবং নির্দ্বিধায় নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। বিছানাতে ঢলে পড়ল। বিছানাতে পা ঝুলিয়ে বসে চুমুক দিয়েছিল সে। তারপর....

তারপর কুমারমঙ্গলম ভাবল, সে এবার মুক্ত। কিন্তু পাপী নিজের অলক্ষ্যে ফাঁদে গিয়ে পড়ে এবং ধরা দেয়।.....

কর্নেল চুপ করলেন। চুরুট ধরালেন। তারপর সত্যেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন—চলি, সত্যেন্দ্র।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার রাস্তায় নামলেন। আকাশ দেখলেন। চমৎকার আজ মার্চের সকালবেলাটা। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলেন। এখন কিছুক্ষণ হাঁটতেই ভাল লাগবে।....

কাকচরিত্র

॥ এক ॥

পিকনিকে দুর্ঘটনা

অনেকদিন পরে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ইলিয়ট রোডের বাসায় গেলাম। বাড়িটার নাম 'সানি লজ'। কর্নেল থাকেন তিন তলায়—পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে।

আজ গিয়ে দেখি, কর্নেল পুবের জানলায় ঝুঁকে আমার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভঙ্গিটা দেখে হাসি পেল। থমকে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ কর্নেল ওদিকে মুখ রেখেই বললেন—জয়ন্ত, কাককে শাস্ত্রে অমঙ্গলের প্রতীক কেন বলা হয় জানো?

আমি তো থ। কর্নেল কীভাবে টের পেলেন যে আমিই এসেছি! কাছাকাছি কোন আয়না নেই যে আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছেন।

কর্নেল এবার ঘুরে বললেন—বসো। তোমার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি।

—পায়ের শব্দ শুনে? বলেন কী কর্নেল?

—ওটা অবাক হবার মতো কিছু নয়। নিতান্ত পর্যবেক্ষণের অভ্যাস। তবে সেই সঙ্গে তোমার সিগারেটের চেনা গন্ধটা আমাকে বলে দিয়েছে। বসো।

বসলাম না। ওঁর পাশে গিয়ে জানলার বাইরে তাকালাম। নিচে একটা বস্তি এলাকা রয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলো গাছ আছে। নিম কৃষ্ণচূড়া শিমুল আর জামরুল। মধ্য কলকাতায় একটা পাড়াগাঁ রয়ে গেছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নিমগাছটা প্রকাণ্ড। তার ডালপালা কালো করে বসে রয়েছে কয়েকশো কাক। তাই দেখছিলেন তাহলে! বললাম—কাক কিসের প্রতীক বলছিলেন যেন?

—অমঙ্গলের।...বলে কর্নেল কোণের সোফায় বসে পড়লেন।—এস জয়ন্ত, আজ আমরা কাক নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

আমিও বসলাম। বসে বললাম—সায়েবদের শাস্ত্রে কাক নিয়ে কোন প্রসঙ্গ নেই?

কর্নেল বললেন—ঘেঁটে দেখিনি। কিন্তু যাই বলো জয়ন্ত, প্রাচীন ভারতীয়রা যে কাককে অমঙ্গলের সঙ্গে—অর্থাৎ 'এভিলের' সঙ্গে যুক্ত করেছেন—তার

সঙ্গত কারণ আছে। ওঃ জয়ন্ত, যে কাকগুলো দেখলে এইমাত্র—আমাকে পাগল করে ছাড়লে! কী কর্কশ ডাক, কী চ্যাঁচামেচি সারাদিন!

হেসে বললাম—ওটা নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার! আপনার ক্ষেত্রে।

—ঠিক বলেছ। কাকতালীয় যোগের কথাটা মাথায় আসেনি এতক্ষণ।...বলে উনি সোজা হলেন। চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কর্নেল বিড়বিড় করলেন আপন মনে—হাউ ফানি! ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকতালীয় যোগ! ঠিক, ঠিক। দ্যাটস দা আইডিয়া।

অবাক হয়ে বললাম—কী ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেল প্রশ্নে আমল না দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন—কাক এসে তালের ওপর বসল, ঠিক সেই মুহূর্তে তালটা পড়ে গেল। কেউ যদি তার থেকে ধরে নেয় যে কাকটা বসার দরুন তালটা পড়ল, তাহলে সে নিশ্চয় ভুল করছে। অথচ ঠিক ওইরকম সিদ্ধান্তই আমরা নানা ব্যাপারে করে ফেলি। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটো ঘটনা একত্র ঘটলে আমরা একটাকে আরেকটার কারণ বলে ধরে নিই অনেকক্ষেত্রে। আসলে তালটা পড়ার সময় হয়ে এসেছিল—কাকটা না এলেও পড়ত। তাই না জয়ন্ত?

—হ্যাঁ! সে তো বটেই। যেমন, আপনি তো কতদিন ধরে ওই জানালার বাইরে কাকগুলো দেখে আসছেন, নিশ্চয় আজকের মতো এমন বিরক্ত হননি, কিংবা কাক নিয়ে মাথা ঘামাননি, কাজেই কর্নেল, আজ যখন হঠাৎ কাক দেখে বিরক্ত হয়েছেন এবং আমি আসামাত্র কাকপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করে বসলেন, তখন আমিও এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কাকতালীয় যোগ বলতে বাধ্য হয়েছি। অর্থাৎ আপনার বিরক্তিময় ভাবনার পিছনে অন্য ঘটনা আছে। তা নিতান্ত কাক নয়।

কর্নেল একটু হাসলেন এবার। রাইট, রাইট, তবে কী জানো জয়ন্ত, ভেবে দেখলাম কাকচরিত্র সত্যি বড় রহস্যময়। ভারতীয় পণ্ডিতরা কাকচরিত্র নিয়ে কেন মাথা ঘামাতেন, টের পাচ্ছি। আশা করি, 'কাকচরিত্র' নামে প্রাচীন তত্ত্বশাস্ত্র তোমার পড়া আছে।

—ভ্যাট্! সে সব গাঁজাখুঁরি ব্যাপার। আজকাল কেউ মানে না।

—সে আলাদা প্রশ্ন, কে মানে বা মানে না। কিন্তু কাক—ওঃ! হরিবল্!...আবার বিড়বিড় করে কী বলতে থাকলেন কর্নেল।

সেই মুহূর্তে ঝট করে আমার মনে পড়ে গেল, আজকের কাগজের প্রথম পাতায় বারো পয়েন্ট বোল্ড হরফে ছাপা বক্স করা ছোট্ট খবরটা। পি টি আই এর খবর। 'প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীহিতেন্দ্রপ্রসাদ সেন গত ২৩শে মার্চ তাঁর বিলাসপুরের বাগানবাড়িতে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, উড়ন্ত একঝাঁক কাক লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার সময় দৈবাৎ তিনি গুলিবিদ্ধ হন।' খবরটা এত দেরি করে বেরনোর কারণ সম্ভবত পুলিশের বিধিনিষেধ।

কর্নেলের সামনের টেবিলে একটা স্টেটসম্যান পড়ে ছিল। তক্ষুনি তুলে নিয়ে

দেখি, ওঁরাও প্রথম পাতায় ছেপেছেন খবরটা—বক্স করেই। আর বক্সটা ঘিরে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছেন কর্নেল। এই ব্যাপার তাহলে!

কর্নেল আমার কাণ্ড দেখছিলেন চুপচাপ। তারপর বললেন—হুম্। তোমার উন্নতি হবে জয়ন্ত। তোমার মন খুব দ্রুত কাজ করতে পারে।

—হিতেন সেন মারা গেছেন? কি কাণ্ড! এই তো বিশে মার্চ পার্ক হোটেলে একটা কভারেজে গিয়েছিলাম, বিলাসপুরে একটা স্বদেশী মেলা বসাচ্ছেন—তারই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন।

সর্বনাশ! তাহলে তো আর মেলাটা হবে না।

—হুম্। হবে না। হয়তো হত—ওঁর স্ত্রীর উদ্যোগেই তো ব্যাপারটা হবার কথা ছিল। শ্রী সেন নিঃসন্তান। শ্রীমতী সেন—এসব ক্ষেত্রে যা হয়, সমাজসেবা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মেলাটা হচ্ছে না।

—কেন? অসুবিধা কিসের? সে তো এপ্রিলের মাঝামাঝি শুরু হবার কথা।

—হবে না। কারণ, শ্রী সেনের যে উইল বেরিয়ে পড়েছে—তাতে দেখা যাচ্ছে উনি সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মাত্র সিকিভাগ দিয়ে গেছেন স্ত্রী এবং অন্যান্য কিছু দুঃস্থ আত্মীয়কে, প্রত্যেকে সমান-সমান হিস্যা। বাকিটার অর্ধেক একটা আশ্রমের নামে, অর্ধেক কোন এক শ্রীমতী শ্যামলীর নামে।

—সে কী? ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! কে সে?

—এই শ্যামলী নামে মহিলাটিকে তুমি চিনতেও পারো। অন্তত নাম শোনা উচিত, কারণ তুমি রিপোর্টার।

লাফিয়ে উঠলুম উত্তেজনায়।—কর্নেল, কর্নেল! ক্যাবারে গার্ল মিস শ্যামলী নয় তো?

কর্নেল মৃদু হাসলেন।—দ্যাটস রাইট।

—মিস শ্যামলীকে হিতেন সেনের মতো লোক—ভ্যাট্! অসম্ভব!

কর্নেল জোরে হেসে উঠলেন।—সম্ভব-অসম্ভব সম্পর্কে যা শেষ কথা বলার, শেক্সপিয়ার বলে গেছেন বৎস জয়ন্ত। যাই হোক, আমার বিরক্তির হেতু কিংবা অস্বস্তির উৎস সেটা নয়। কোটিপতিরা অনেক ব্যাপার করেন—যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে নিশ্চয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সেকালে রাজামহারাজা নবাববাদশারা এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর কাজ করতেন। বাদশা সাজাহানের কথাই ধরো। বউয়ের জন্যে তাজমহল নামে কী এলাহি কাণ্ড করে গেলেন! জয়ন্ত, ওসব ছেড়ে দাও। এস, আমরা কাক নিয়ে আলোচনা করি।

—আর কাক!...বিরক্ত হলে বললুম।—আশ্চর্য কর্নেল! হিতেন সেন একটা ক্যাবারে নর্তকীকে অত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন? ইস্ কোন মানে হয় এর?

—মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, তুমি দেখছি নেহাত ছাপোষা মানুষের চোখে ব্যাপারটা দেখছ! ভুলে যাচ্ছ যে তুমি একজন সাংবাদিক। যেখানে-সেখানে অজস্র সম্পদের অপচয় তোমাদের তো চোখে পড়ার কথা। সামাজিক বৈষম্যের

বাস্তব নিদর্শন চারপাশে এত বেশি যে ও নিয়ে নতুন উত্তেজনা প্রকাশ করা বৃথা। তুমি রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী নও, আমিও নই। তুমি-আমি সমাজের উন্নতি বা সাম্য আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। বলতে পারি বড়জোর—উই হ্যাভ দা ফিলিংস, উই আর কনসাস অ্যাবাউট দা রিয়্যালিটি। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে নিতান্ত অসহায়। যাই হোক, আমি একজন অপরাধবিজ্ঞানী এবং তুমি একজন রিপোর্টার হিসেবে এ মুহূর্তে শুধু ওই অমঙ্গলের প্রতীক কালো রঙের পাখি সম্পর্কে কিছু করতে পারি কি না দেখা যাক।

একটু হাসতে হল।—কাক নিয়ে কী করতে চান?

—সত্যে পৌছতে।

—তার মানে?

—একটু আগে আমরা কাকতালীয় যোগের কথা বলছিলাম, জয়ন্ত। তাই না?

—হ্যাঁ, বলছিলুম তো।

কর্নেল ডাকলেন। ষষ্ঠী! কফি।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে ট্রেতে কফির পট, কাপ আর একটা স্ন্যাকসের প্যাকেট রেখে চলে গেল। কর্নেল তার উদ্দেশে কতগুলো মিষ্টি বাক্য উৎসর্গ করে বললেন—কফি বানাও, জয়ন্ত।

কফির পেয়ালা হাতে না পাওয়া অব্দি মুখ খুললেন না কর্নেল।

একটা চুমুক দিয়ে বললেন—হিতেন সেনের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোন বিস্ময় জাগছে না?

—না তো। উড়ন্ত কাক মারতে বন্দুক তুলেছিলেন, হয়তো পোশাকে কিংবা অন্য কিছুতে লেগে নলটা যথেষ্ট ওপরে ওঠবার আগেই ট্রিগারে চাপ পড়েছিল—অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমার বিস্ময় জাগাচ্ছে উইলে মিস শ্যামলীকে—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—হুম্, অ্যাকসিডেন্টের বর্ণনাটা অবিকল তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে জয়ন্ত। পুলিশের রিপোর্ট এবং বিলাসপুর বাগানবাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলের বর্ণনা ওইরকম। কিন্তু কাক আমাকে জ্বালাচ্ছে সারাক্ষণ।

—কেন?

কর্নেল উত্তেজিত হলেন যেন।—মাই ডিয়ার জয়ন্ত, এটা কেন তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না যে হিতেন সেন কাক মারতে বন্দুক তুলেছিলেন? আর কিছু নয়—স্রেফ কাক? হিতেন সেন মোটামুটি ভালো শিকারী ছিলেন, আমি জানি। বয়সেও এমন কিছু বুড়ো হননি। মাথাও ছিল পরিষ্কার। কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না। ওষুধ খাওয়ার বাতিক ছিল না। কোনরকম অ্যালোপ্যাথি

ওষুধ জীবনে খাননি। বড়জোর হোমিওপ্যাথি খেতেন। তাও কদাচিৎ। তা—একজন ধুরন্ধর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ঝানু ব্যবসায়ী মানুষ হিতেন সেন—আর কিছু পেলেন না, কাক মারতে গেলেন?

—হয়তো ওখানে কাকের ভীষণ উপদ্রব আছে। ওই তো দেখুন না, অতসব কাক নিমগাছটাতে রয়েছে। আমারই বিরক্ত লাগছে দেখে। হয়তো হিতেনবাবুও ওদের চ্যাচামেচিতে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই....

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! বুদ্ধির সামনে থেকে ঘষা কাচটা সরিয়ে ফেলো।

—কেন কর্নেল?

—কাক বিরক্তির কারণ নিশ্চয়। কিন্তু তার জন্যে কেউ তাদের তাড়াতেই চাইবে—মেরে ফেলতে নয়। অন্তত যদি সে বদরাগী লোক না হয়। হিতেন সেন মোটেও বদরাগী গোঁয়ার-গোবিন্দ বা হঠকারী বুদ্ধির লোক ছিলেন না। ধরে নিচ্ছি, তিনি বন্দুকই ছুড়েছিলেন কাক তাড়াতে—কিংবা আরও এগিয়ে ধরে নিচ্ছি, কাক মারতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু ছররা নয় কেন? কেন সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা বুলেট ব্যবহার করে বসলেন? এবং ভেবে দ্যাখো—বন্দুক নয়, নিতান্ত শটগান নয়—একেবারে ওঁর উইনচেস্টার রাইফেল হাতে নিলেন।

—তাও তো বটে। পুলিশের কোন সন্দেহ হয়নি এতে?

—কেমন করে হবে? সবাই বলছে এবং তাছাড়া পুলিশ তদন্ত করে প্রমাণ পেয়েছে ওই রাইফেলটা ছাড়া আর কোন অস্ত্র হিতেনবাবুর বাগানবাড়িতে ওই সময় ছিল না। রিপোর্ট বলছে, বাগানবাড়িতে প্রাঙ্গণের শেষদিকে সন্ধ্যার একটু আগে গাছপালার ছায়ায় সুদৃশ্য তাঁবু খাটিয়ে পিকনিক মতো করা হয়েছিল। উনুন এবং খাবারদাবার ছিল গাছের নিচে। কাকগুলোর তখন গাছে বসার সময়। তাই বারবার বিরক্ত করছিল। খাবারে পায়খানা করে দিতে পারে—সেই আশঙ্কায় সবাই মিলে অনেকবার ঢিল ছুড়ে তাড়া করেছিল। তারপর অবশেষে হিতেনবাবু রেগেমেগে রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেইসময় কাকগুলো আচমকা মাথার ওপর থেকে চ্যাচাতে চ্যাচাতে উড়তে শুরু করে। পিছুন পিছুন একা দৌড়ে যান হিতেনবাবু। বাগানের ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে তাঁকে আর দেখা যায় না কতক্ষণ। পিছনে ওই দিকটায় কোন বসতি নেই। জঙ্গল আর আখের খেত আর একটা ছোট নদী রয়েছে। পাঁচিল ওদিকে গত বন্যায় ধ্বসে গিয়েছিল। মেরামত এখনও হয়নি। নদী থেকে ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে ঢালু কুড়ি গজ জঙ্গুলে জায়গার ঠিক মাঝামাঝি পড়েছিলেন হিতেনবাবু। গুলি লেগেছে চিবুকের নীচে, গলার ওপর অংশে—ডানদিকে। গুলি সোজা মগজে গিয়ে ঢুকেছে। ইতিমধ্যে মিনিট দশ—কারো মতে মিনিট পনের পরে ওদিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। হিতেনবাবুর ফেরার নাম নেই। হ্যাসাগ জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। তখনও উনি ফেরেন না। সাড়ে সাতটায় মিসেস সেন উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজতে পাঠান। একজন

চাকর সঙ্গে নিয়ে যান হিতেনবাবুর অ্যাটর্নি মিঃ সুশান্ত মজুমদার। ওঁরা হিতেনবাবুকে আবিষ্কার করেন। টর্চ ছিল দুজনেরই হাতে। অবশ্য পূর্ণিমার রাত ছিল। প্রতি বছর চৈত্রের দোলপূর্ণিমার রাতে বিলাসপুর বাগানবাড়িতে পিকনিক করা অভ্যাস ছিল হিতেনবাবুর। জয়ন্ত, সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করে আমার ধারণা হয়েছে, পুলিশ এবং হিতেনবাবুর আত্মীয়স্বজনের সিদ্ধান্তটা যেন কাকতালীয়। তুমি কী বলো?

—হুঁ, কী রকম যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। অবশ্য মিস শ্যামলীর সম্পত্তি লাভের ফলে আমাদের প্রেজুডিসড্ হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই অঘটনটা হিতেনবাবু না ঘটিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু দুর্ঘটনা বলেই চালানো যেত।

—তোমার কথা অস্বীকার করছি না। পুলিশও পরে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। উইলটা ওদের ধাঁধায় ফেলেছে। কিন্তু এদিকে তো মৃতদেহ আর হাতে নেই যে ফের পরীক্ষা করে দেখবে। ইতিমধ্যে সেটা ভস্মীভূত।

—মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত তো?

—হ্যাঁ, অবশ্যই। ওই রাইফেল থেকেই গুলি বেরিয়ে মাথায় ঢুকেছে। রাইফেলের বাঁটে হিতেনবাবু ছাড়া অন্য কারো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কোন উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যও কেউ দেয়নি। আবার কোন প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল না।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—কর্নেল! তাহলে কি এটা খুনের ঘটনা বলে আপনি নিঃসংশয়?

কর্নেল হাত তুলে বললেন—না, না জয়ন্ত। আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না। কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তেও আমি পৌঁছইনি। শুধু বলতে চাচ্ছি যে হিতেন সেনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পটভূমিকা আমার কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হচ্ছে না। আগেই বলেছি দুটো ব্যাপার আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। এক ঃ হঠাৎ ভদ্রলোকের কাকের ওপর তাদের খেপে গিয়ে পিছনে দৌড়নো, দুই বুলেটভরা রাইফেল হাতে নেওয়া।

—কিন্তু সাক্ষীরা তো বলছেন, তাই দেখেছেন।

—হ্যাঁ; দেখেছেন এবং বলেছেন একবাক্যে।

—তাহলে?

কর্নেল টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—ডার্লিং! তুমি তো দর্শনের ছাত্র ছিলে। অবভাসতত্ত্ব সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ নও। প্রকৃত বস্তু এবং প্রতীয়মান বস্তু অর্থাৎ রিয়েলিটি ও অ্যাপিয়ারেন্সের বিষয় কি নতুন করে বোঝাতে হবে তোমাকে? রেল লাইনে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকালে মনে হয় দুটো লাইন ক্রমশ দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে পরস্পর। কিন্তু বস্তুত—আমরা জানি, ওরা বরাবর সমান্তরাল। হিতেন সেন কাকের ওপর রেগে গিয়ে গুলিভরা রাইফেল হাতে দৌড়ে গেলেন এবং পরে গুলির শব্দ শোনা গেল। এবং ঠিক গলার নিচে গুলি ঢুকে মগজ ফুঁড়ল। একই রাইফেলের গুলি—ছটার মধ্যে একটা খরচ

হয়েছে, পাঁচটা ঠিকঠাক কেসে রয়েছে। এবং আছাড় খাওয়ার চিহ্নও রয়েছে শরীরে। রাইফেলে ওঁর আঙুলের ছাপ ছাড়া কোন ছাপ নেই। সব—সবকিছু আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মিস শ্যামলীকে বিশাল সম্পত্তি দেওয়াটা আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এটা বাদ দিয়েও যে ঘটনাটা দাঁড়ায় অর্থাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যু, সেটা নিছক অ্যাপিয়ারেন্স বা প্রতীয়মানও তো হতে পারে! ধরো—যদি মিস শ্যামলী উইলে নাও থাকতেন, মিসেস. সেনই সব সম্পত্তি পেতেন—তবেও ব্যাপারটা কি তোমার রিয়্যাল ইনসিডেন্ট বলে মনে হচ্ছে জয়ন্ত?

—ঠিকই বলেছেন।

—কেন হিতেন সেন হঠাৎ কাকের ওপর খেপে গেলেন?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললুম—তাই তো! কেন?

—কেনই বা উনি গুলিভরা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। কেন গেলেন?

কর্নেল খপ করে আমার হাত ধরে বললেন—ওঠ, বেরিয়ে পড়ি।

॥ দুই ॥

মিস শ্যামলী ও একটি ফুল

আমার গাড়িটা ফিয়াট। স্টিয়ারিং আমারই হাতে। কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কর্নেল বলছেন না। দু'একবার প্রশ্ন করেও কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাইনি। কর্নেল চোখ বুজে ঝিমোতে ঝিমোতে শুধু বলছেন—চলো তো!

গাড়ি পার্ক স্ট্রিটে ঢুকিয়েছি। ছুটির দিন রোববার। বেলা প্রায় নটা—এখনো অবশ্য ভোঁ বাজেনি। কিন্তু এ এক বিদঘুটে অবস্থায় পড়া গেল দেখছি। অন্ধের মতো চলেছি যেন। চৌরঙ্গির মোড়ে একটা খালি লরি ঢনঢন করে আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে এবং বেআইনিভাবে ওভারটেক করে আচমকা সামনে দাঁড়িয়ে গেল—রোড সিগনাল লাল। ঢুঁ মারতে গিয়ে সামলে নিল আমার ক্রিমরঙা ফিয়াট। আমি লরির শূন্য খোলটার উদ্দেশে খুব চ্যাঁচামেচি করলুম। কর্নেল আচমকা ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে চোখ খুলেছিলেন—বন্ধ করলেন ফের। আলো সবুজ হলে অসভ্য লরিটাকে ডিঙিয়ে যাবার জন্যে বাঁদিকে মোড় নিলাম। পিছনের গাড়িগুলোর খিস্তি এবার আমাকে শুনতে হল। চৌরঙ্গি ধরে দক্ষিণে যাবার সময় কর্নেল যেন নিজের মনে বললেন—ঠিকই যাচ্ছি।

বাঁদিকে থিয়েটার রোডে ঢুকলুম। কর্নেলের কোন সাড়া নেই। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো! আমি যেদিকে খুশি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতলব করলুম—তার ফলে দেখা যাক, কর্নেল বাধ্য হয়ে গন্তব্যস্থান বলে বসবেন নাকি।

খানিক এগিয়ে বাঁদিকে ছোট রাস্তায়, আবার বাঁদিকে ছোট রাস্তায়—তারপর বোঁও করে ঘুরে ক্যামাক স্ট্রিট, তারপর সামনের ছোটরাস্তায়। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে। কর্নেল এবার নির্ঘাৎ জব্দ হচ্ছেন।

কিন্তু একজায়গায় হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন—রোখো, রোখো!

গাড়ি দাঁড় করালুম। পুরো সাহেবপাড়া এটা। উঁচুতলার সাহেবসুবোরা বিশাল সব বাড়িতে এখানে বাস করেন। পাঁচিল, গেট, প্রাঙ্গণ, গাছপালা, সুইমিং পুল, ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রতিটি বাড়ির বৈশিষ্ট্য। বাঁদিকে একটা গেট। কর্নেল দেখলাম দরজা খুলে নামলেন। তারপর আমার দিকে না ঘুরে গেটে চলে গেলেন। উর্দিপরা দারোয়ানকে কী বললেন। দারোয়ান সেলাম করে গেটটা পুরো খুলে দিল। কর্নেল আমার দিকে হাত নেড়ে ভিতরে গাড়ি নিয়ে যেতে ইশারা করলেন।

গাড়িতে আর চাপলেন না। পাশে পাশে এগিয়ে গেলেন উনি! লনের একপাশে তিনটে দেশী-বিদেশী সুদৃশ্য গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। লনে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এলুম। সামনে দেখি একটা স্কাইক্র্যাপার বাড়ি। চারপাশের বনেদী ঐতিহ্যের ওপর আধুনিক স্থাপত্যের টানা একফালি হাসি যেন—হাসিটা অতি উদ্ধত। কর্নেল আমাকে মুখ তুলে বাড়ির উচ্চতার দিকে তাকাতে দেখে বললেন—একালের সুর-সুন্দরীদের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা, ডার্লিং!

কর্নেল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে ডার্লিং সম্বোধন করেন। আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল, আমরা কার কাছে যাচ্ছি? কোন সুরসুন্দরীর কাছেই কি?

পরক্ষণে আমার ধাঁধা ঘুচে গেল আচমকা। আরে তাই তো!

এখানেই তো সেই ক্যাবারে নর্তকী মিস শ্যামলী থাকে! একটা সিনেমামাসিকে শ্যামলী সম্পর্কে কিছু মুখরোচক রেপোর্টাজ পড়েছিলাম বটে! অনেক অবান্তর বিষয় স্মৃতিতে আমরা দুর্জ্ঞেয় কারণে রেখে দিই। মধ্য কলকাতায় এই 'ইন্দ্রপুরী' এবং মিস শ্যামলীর সেখানে অবস্থান অকারণে স্মৃতিতে স্পষ্ট ছিল।

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে একটা হাত ধরলেন। দুজনে এগিয়ে গেলুম।

উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্ধের মতো গাড়ি চালিয়ে শ্যামলীর ফ্ল্যাটে পৌঁছনো নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা ছাড়া কী বলব? এখানে আসবার মতলব মোটেও আমার ছিল না। লিফটের সামনে একটু দাঁড়িয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—তোমার উন্নতি হবে, জয়ন্ত। ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছ।

হেসে বললুম—মোটেও তা নয় কর্নেল। আমি নির্দিষ্ট কোথাও আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে আসছিলুম না। এটা নেহাৎ আকস্মিক ঘটনা। আপনি গন্তব্যস্থানের কথা একবারও বললেন না। ফলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলুম।

—না ডার্লিং, মোটেও তা নয়। আমি 'চলো তো' বলার সঙ্গে তুমি ঠিক করে নিয়েছিলে এমন একটা গন্তব্যস্থান—যা আমাদের কেসের পক্ষে খুবই জরুরি।

—বারে! আমি বলছি তো, উদ্দেশ্যহীনভাবে এসে পড়েছি দৈবাৎ!

—না, না।...বলে কর্নেল লিফটের চাবি টিপলেন। লিফটা ওপরতলায় ছিল।—জয়ন্ত, এই হচ্ছে মানুষের মনের রহস্য। যখনই তোমাকে 'চলো তো' বললুম এবং নির্দিষ্ট জায়গার নাম করলুম না, অমনি তোমার অবচেতনায় লক্ষ্যের কাঁটা মিস শ্যামলীর দিকেই প্রথমে নির্দিষ্ট হল। এই কেসে শ্যামলীকেই তুমি আগাগোড়া 'ভাইটাল' ধরে নিয়ে বসে আছো। সচেতন মনে যেহেতু যুক্তির দৌরাত্ম্য এবং কড়াকড়ি বেশি, তোমার অবচেতন মনের উদ্দেশ্যটা লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করল। তার ফলে যেটুকু পথ এলোমেলো গাড়ি চালিয়েছ—সবটাই তোমার সচেতন মনকে ভাঁওতা দিতে। নিজের সঙ্গে মানুষ এই ভাবেই লুকোচুরি খেলে।

গুম হয়ে রইলুম। লিফট এসে গেল। অটোমেটিক লিফট। ভিতরে ঢুকে কর্নেল ছ-নম্বর বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হল এবং উঠতে শুরু করল। সাততলায় লিফট থেকে নামলুম আমরা। শ্যামলীর ফ্ল্যাট নম্বর আমি জানি না। শুধু জানি এই বাড়িতে সে থাকে।

কর্নেল, আশ্চর্য, ফ্ল্যাট নম্বর জানেন দেখছি! তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপলেন। কোন নামফলক নেই। না থাকা স্বাভাবিক।

ভিতরে পিয়ানোর বাজনার মতো মিঠে টুং টাং শব্দ হল। আমি চাপা গলায় বললুম—আপনি ওকে চেনেন নাকি?

কর্নেল জবাব দিলেন না। দরজার ফুটোর কাচে একটা চোখ আবছা ফুটে উঠল। তারপর খুলে গেল। স্বপ্নে শিউরে উঠলুম যেন। সেই শ্যামলী! যার বিলোল নাভিতরঙ্গ দেখে আমার এক কবিবন্ধু তেত্রিশটা পদ্য লিখে ফেলেছে এবং পত্রিকায় ছাপিয়েও নিয়েছে। মধ্যরাতে চৌরঙ্গি এলাকার হোটেলের মঞ্চে রহস্যময় আলোয় পিছলে বেড়ানো অপার্থিব একটুকরো মাংস—যা যৌনতার পোষা অন্ধ গণ্ডারটা ছেড়ে দিয়ে পুরুষগুলোকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে, সেই মাংসের টুকরোটা এখন স্নিগ্ধ এবং পার্থিব দেখাল।

আর মিস শ্যামলী এখন গৃহস্থকন্যার মতো আটপৌরে বেশভূষায় এত সাধারণ যে 'শ্যামবাজারের শশীবাবুর' মেয়ে বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। কর্নেলকে দেখেই তার মুখ যেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—আসুন, ভেতরে আসুন!

কর্নেলের পিছনে পিছনে অবাক হয়ে ঢুকলুম। ঘরের ভিতর ঐশ্বর্য আর রুচির ছাপ রয়েছে। প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুম। ঠিক মাঝখানে সোফাসেট এবং মেঝেয় সুরম্য কার্পেটে গিটার, পাখোয়াজ ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। এদিকের দেওয়ালে কমপক্ষে ছ'ফুট-চারফুট আকারের একটা বিশাল পোর্ট্রেট। দেখেই চিনলুম—হিতেন সেন!

আমরা দুজনে শোফায় বসলাম। শ্যামলী মেঝেয় পা দুমড়ে গ্রাম্য তরুণীর মতো বসল। হাসিমুখে আমার দিকে কটাক্ষ করে বলল—এঁকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে!

কর্নেল বললেন—হুঁউ! দেখা স্বাভাবিক। ও সর্বচর। জয়ন্ত চৌধুরী—দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। জয়ন্ত, শ্যামলীকে তোমার বিলক্ষণ চেনা আছে।

পরস্পর নমস্কার করলুম। শ্যামলী হাসতে হাসতে বলল—সর্বনাশ! রক্ষে করুন কর্নেল! খবরের কাগজে যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো দারোয়ানকে বলে রেখেছি—প্রেসের লোক জানতে পারলে যেন......

কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে ফের আমার দিকে কটাক্ষ করল। কর্নেল বললেন—না, না, ও আমার সঙ্গে এসেছে। তা ছাড়া তোমার ব্যাপারে ও আমার ডানহাত এখন। জয়ন্ত খুব বুদ্ধিমান ছেলে। খুব ইয়ে। তা, যাই হোক, শ্যামলী, শোন—যেজন্যে এলাম। কাল রাতে তুমি তো আমার ওখান থেকে চলে এলে। আমার ঘুম হল না আর। তোমাকে ফোন করলুম ঘণ্টাখানেক পরে—পৌঁছলে কি না জানতে। কিন্তু তোমার লাইনটা মনে হল ডেড। ভাবলুম, কলকাতার টেলিফোনের ব্যাপার! সকালে ফোন করলুম—একই অবস্থা! তখন ভাবছিলুম, একবার যাবো নাকি। তুমিও রিং করছ না কথামতো। একটু উদ্বিগ্ন হলুম। সেই সময় জয়ন্ত এল। তখনি বেরিয়ে পড়লুম।

শ্যামলীর মুখটা গম্ভীর দেখাল।—কী জানি কী হয়েছে ফোনের। কাল রাত থেকে ডেড ছিল।

—গোটা বাড়ির লাইন ডেড ছিল নাকি গতরাতে?

—না তো! আমারটা এক্সটেনশান লাইন। খালি আমারটা ডেড ছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

—কোন ফ্ল্যাটেই কারো নিজস্ব ডিরেক্ট লাইন নেই?

—জানি না। আছে নিশ্চয়। আমাকেও ডিরেক্ট নিতে হবে দেখছি। প্রাইভেসি রাখা মুশকিল হচ্ছে।

—যাক্ গে। কাল রাত থেকে এখন অব্দি তোমার দেবার মতো খবর থাকলে বলো।

—তেমন কিছু তো...

—আজ সকালে কেউ আসেননি?

—এসেছিল। সে আমার প্রফেশানের ব্যাপারে।

—ওঁদের কেউ আসেনি?

—নাঃ। আর কেউ আসেনি। এলেও আমি বলে দিতুম—না, সম্ভব নয়। উইল ইজ উইল। আমি আমার লিগাল রাইটের সীমানা এক পাও পেরোতে চাইনে।

—মিসেস সেন আমাকে রিং করেছিলেন আজ সাড়ে সাতটায়।

শ্যামলী চমকে উঠল।—মিসেস সেন! চেনেন নাকি আপনাকে!

—না। কেউ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। তবে তুমি ভেবো না ডার্লিং, আমি সবসময় সত্যের পক্ষে।

শ্যামলী উদ্বিগ্ন মুখে বলল—আচ্ছা কর্নেল, সত্যি কি আমাকে এখন কিছুদিন সাবধানে থাকতে হবে? কোথাও ফাংশান করা যাবে না?

—মানুষের এই পৃথিবীটা খুব জটিল, শ্যামলী।

—কিন্তু অতসব কন্ট্র্যাক্ট রয়েছে। আমাকে তো তা মিট আপ করতেই হবে। তা না হলে পার্টিরা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসবে।

কর্নেল হাসলেন—তুমি এখন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবতী মহিলা, মাই ডিয়ার গার্ল!

শ্যামলী চিন্তিতমুখে কী ভেবে তারপর ম্লান হেসে বলল—কিন্তু আমি এখনও আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিনি। যে কেউ যখন খুশি এসে আমাকে মেরে রেখে যেতে পারে।

কর্নেল সশব্যস্তে বললেন—না, না। তোমাকে কেউ দৈহিক দিকে হামলা করবে—আমি মোটেও তা বলিনি শ্যামলী।

—তাহলে সাবধানে থাকার কথা বললেন কেন?

কর্নেল ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—তুমি যথেষ্ট কোমল হৃদয় বিশিষ্ট মেয়ে। আমার ভয় সেখানেই। তোমাকে সহজে কেউ কনভিনস করতে পারে।

শ্যামলী আশ্বস্ত এবং আনন্দিত মুখে বলল—মোটেও না। আমি খুব-খু-উব-ভীষণ কোল্ডব্লাডেড। আমার হৃদয়-টিদয় মোটেও নরম নয়। অনেক তেতো অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি বড় হয়েছি কর্নেল, ভুলে যাবেন না। বললুম তো—উইল ইজ উইল।

—যাক্ গে, শোন। মিসেস সেন ফোন করে বলেছিলেন, তাঁর কিছু কথা আছে আমার সঙ্গে। খুলে কিছু বলেন না। ঠিক দশটায় যাবার কথা দিয়েছি। যাচ্ছি। তার আগে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে এলুম। এগুলো গতরাতে আমার মাথায় আসেনি।

—বেশ তো, বলুন।

—হিতেনবাবু ২৩শে মার্চ সকালে তোমাকে ফোন করে বিলাসপুর যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি যাওনি। কারণ, ফোনে কোন অচেনা লোক তোমাকে শাসিয়েছিল যে গেলে বিপদ হবে। তাই না?

—হ্যাঁ। আপনাকে তো বলেছি...

—কিন্তু তুমি কি সেজন্যেই যাওনি? নাকি—কেউ না শাসালেও তুমি যেতে না?

শ্যামলী নাকের ডগা খুঁটে জবাব দিল—ঠিক বলেছেন। আমি যেতুম না।

—কেন?

আমার প্রথমত ভীষণ অবাক লেগেছিল। ওভাবে পাবলিক্লি মিঃ সেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করবেন—বিশেষ করে ওঁর স্ত্রীর সামনে, আত্মীয়স্বজনও থাকবেন—তাঁদের সামনে! এটা অস্বস্তির কারণ হত আমার পক্ষে।

—কিন্তু মিঃ সেন তোমার সঙ্গে কখনও, মানে—কোনরকম অভব্য আচরণ করেননি!

—না। তা করেননি। খুব দূরত্ব রেখেই মিশতেন। আমিও **খুব সমীহ করে** চলতুম। তাহলেও তো আমি আসলে একজন ক্যাবারে গার্ল।

—কেন যেতে বলছেন, জিজ্ঞেস করেছিলে?

—হ্যাঁ। বলেছিলুম—আমি কী করব ওখানে গিয়ে?

—উনি কী বলেছিলেন?

—খুলে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে আমার পক্ষে ওখানে উপস্থিত থাকা জরুরি। কেন জরুরি তা জানতে চাইলেও বলেননি।

—হুম্! কিন্তু ওর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর ২৪শে মার্চ সকালে তুমি বিলাসপুর চলে গিয়েছিলে। এবারেও অজানা কেউ ফোনে তোমাকে মিঃ সেনের দুর্ঘটনার খবর দিয়েছিল। যাই হোক, বিলাসপুর যাবার কারণ কী শ্যামলী? মিঃ সেনের দুর্ঘটনা না ছবির সুটিং?

—বলেছি তো! যাওয়াটা আকস্মিক। সিনেমা পরিচালক অতীন্দ্র বসুর নতুন ছবিতে আমি একটা রোল করছি। উনি ওইদিন সকালে এসে হাজির। আউটডোর সুটিং-এ যেতে হবে এখুনি। আমি জানতুম না। বিলাসপুরেই ওর লোকেশান। হিরো পার্থকুমার অলরেডি চলে গেছে। তাই গিয়ে পড়লাম যখন, তখন এক ফাঁকে খোঁজ নিয়ে অতীন্দ্রবাবু আর আমি মিঃ সেনের বাগানবাড়িটা একবার ঘুরে এসেছিলুম। নিছক একটা কৌতূহল। আর ফুলটা তো তখনই কুড়িয়ে পাই!

—ফুলটা যেখানে পড়েছিল, তুমি শুনলে যে ডেডবডিটা ওখানেই ছিল। কেমন?

—হ্যাঁ। একটু কৌতূহলী হয়েছিলুম, ফুলটার বোঁটায় চুল জড়ানো দেখে। অতীন্দ্রবাবু ওটা রাখতে পরামর্শ দিলেন। ওঁর পরামর্শেই আপনার কাছে গিয়েছিলুম তাও বলেছি আপনাকে।

—তখনও তুমি উইলের ব্যাপারটা জানতে না বলেছ!

—বলেছি। জানলুম কলকাতায় ফিরে—সন্ধ্যাবেলা। উকিল সুশান্তবাবু এলেন আমার এখানে। বললেন—সুখবর আছে। তারপর আমি তো হতভম্ব। তখন...

—শ্যামলী, মিসেস সেনের সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল—নাকি অ্যাটর্নি চলে যাবার পর সেই প্রথম এলেন?

—সেই প্রথম। এসে একচোট শাসালেন। তারপর লোভ দেখাতে লাগলেন। আপস করার কথা তুললেন। বললেন কতটা নগদ পেলে আমি আমার অংশ ছাড়তে রাজি ইত্যাদি।

—নিশ্চয় তুমি ওঁকে ফুলের কথা বলোনি?

—মোটেও না। আমি আপনার কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত।

—মিসেস সেনের মুখের আধখানা ঢাকা ছিল বলেছ।

—হ্যাঁ কালো তাঁতের শাড়ির ঘোমটা পরা ছিল। আমি তাতে অবাক হইনি। কারণ, মিঃ সেনই একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে ওঁর স্ত্রীর মুখে একপাশটা এক দুর্ঘটনায় পুড়ে যায়। তার ফলে সেদিকটা ঢেকে রাখেন সবসময়।

—তা হলে মিসেস সেনের মুখটাও ঢাকা ছিল?

—হ্যাঁ।

—একপাশের চুল নিশ্চয় দেখা যাচ্ছিল?

—অতটা লক্ষ্য করিনি।

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—পার্থবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের রেজিস্ট্রেশান তো পনেরই এপ্রিল হচ্ছে?

শ্যামলী মুখ নামিয়ে ঈষৎ রাঙা হয়ে জবাব দিল—হ্যাঁ।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, তুমি উদীয়মান ফিল্ম হিরো পার্থকুমারের নাম নিশ্চয় শুনেছ?

—অবশ্যই! খুব ভাল অভিনয় করছেন ভদ্রলোক।

—শ্যামলী! তোমাদের বিয়ের তারিখটা কবে ধার্য করা হয়েছিল?

—গত ফেব্রুয়ারি মাসে। বাইশ তারিখে। ফিরপোতে পার্টি হয়েছিল ছোটখাটো। মিঃ সেনও উপস্থিত ছিলেন তাতে। অ্যাটর্নি সুশান্ত মজুমদারও ছিলেন।

—মিঃ সেন নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন? তিনি তো বরাবর তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

—হ্যাঁ।

—শ্যামলী, আমরা উঠি তাহলে। সময়মতো দেখা হবে কেমন?

আমরা উঠে পড়লুম। বাইরে লিফট অব্দি এগিয়ে দিতে এল শ্যামলী। কর্নেল লিফটে পা রেখে ফের বললেন—ইয়ে, সাবধানে থেকো। না না! তোমাকে কেউ খুনজখম করতে পারে, বলছি না। তাতে কারো লাভ হবে না। তোমার অংশের সম্পত্তি সটান চলে যাবে সরকারের হাতে। কারণ তোমার কোন সন্তানাদি এখন নেই।

শ্যামলী মৃদু হাসল। আমরা খাঁচার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকলুম।

নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসলুম। কর্নেল বললেন, কী মনে হচ্ছে জয়ন্ত?

গিয়ারে হাত রেখে জবাব দিলুম—কাল রাত থেকে এত কাণ্ডে জড়িয়ে রয়েছেন আমাকে বলেননি তো!

—শ্যামলী যত চালাক, তত বোকা।...বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। ফের বললেন—হুম. কী যেন বলছিলে জয়ন্ত? তোমাকে কিছু জানাইনি—তাই না? আগে সব জানালে তোমার রিঅ্যাকশানটা অন্যরকম হত। তার ফলে আমার একটা জিনিস জানা হত না। ঘটনার চেহারাটা দেখে কারো মনে আপনাআপনি সন্দেহ হয় কি না—জানবার উদ্দেশ্য ছিল আমার। দেখলুম, কোন সন্দেহ হয় না—অন্তত তোমার হল না। অথচ তুমি নিতান্ত নোভিস বা লেম্যান নও—একজন দুঁদে রিপোর্টার। কাজেই আমি সিদ্ধান্তে এলুম যে এই দুর্ঘটনার পিছনে ক্ষুরধার মস্তিষ্ক রয়েছে।

—কিন্তু শ্যামলীর সম্পত্তি পাওয়ার তথ্য জেনে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম।

—সে তো নিছক সন্দেহ। প্রেজুডিসড হয়ে পড়া—তোমার ভাষায় কিন্তু আমি আঙুল দিয়ে না দেখালে দুর্ঘটনার বিবরণে কি তোমার কাছে কোন

অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল? অস্বীকার করো না ডার্লিং!

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাব? এবারও কি অবচেতন মনের নির্দেশে গাড়ি চলবে?

—নো, নো!...কর্নেল হেসে উঠলেন।—তাহলে তুমি সোজা এখন বিলাসপুরে নিয়ে তুলবে। আমি তো জানি। তাই এবার বলে দিই—আমরা যাব নিউ আলিপুরে। মিসেস সেনের কাছে।......

॥ তিন ॥

শ্যামলীর প্রবেশ ও প্রস্থান

মিসেস সেনের বয়স অনুমান করার প্রথম বাধা হল ওঁর ঘোমটা-ঢাকা অর্ধেক মুখ। বাকি অর্ধেকও ঢাকা পড়েছে বলা যায়। শরীরে প্রচুর মেদ থাকলেও বেশ শক্তসমর্থ মনে হচ্ছিল। আমি আন্দাজে বয়সটা বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কোথাও দাঁড় করাতে পারি।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরটা অদ্ভুত লাগল। চাপা, একটু ভাঙা, সেইসঙ্গে ফিসফিসানির মতো কতকটা—ইংরাজিতে যাকে বলে হিসিং সাউন্ড। টনসিলের দোষ থাকলে এমন হতে পারে শুনেছি।

আমাদের ড্রইংরুমে ঢোকার আধ মিনিটের মধ্যে উনি এসে গিয়েছিলেন। আমার পরিচয় কর্নেল যথারীতি দিলেন। তারপর ওঁদের কথা শুরু হল। কর্নেল বললে—বলুন ম্যাডাম, অধমকে কী জন্যে স্মরণ করেছেন?

মিসেস স্বাগতা সেন বললেন, আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় মৃগেন দাশগুপ্ত—রিটায়ার্ড মুন্সেফ উনি, বলছিলেন যে উইলটা নিশ্চয় জাল। কিন্তু প্রমাণ করতে হলে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশান দরকার হবে। সেগুলো যোগাড় করে দিলেই উনি কেস লড়বার ব্যবস্থা করতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানও বলেছেন।

কর্নেল টাক চুলকে বললেন—রাইট, রাইট।

—মৃগেনদাই আপনার কথা বলেছেন। আপনি তো একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার—মানে, গোয়েন্দা হিসাবে আপনার কথা আমিও নিউজপেপারে পড়েছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে...

কর্নেল আবার বললেন—রাইট, রাইট।

স্বাগতা সেন সোৎসাহে ঝুঁকে পড়লেন ওঁর দিকে। বললেন—আপনার ফি কত জানি না—যদি কিছু না মনে করেন, আড়াই হাজার টাকা আপনাকে রেমুনারেশান দেব!

কর্নেল—আশ্চর্য, অতীব বিস্ময়কর, সহাস্যে বললেন—অগ্রিম কত দেবেন শুনি?

—আপাতত একহাজার নিন। কেস জিতলে বাকিটা অবশ্য দেব।

আমাকে হতভম্ব করে কর্নেল দরাদরি শুরু করলেন। অগ্রিম অন্তত দুহাজার চাই—কেস জিতুন আর হারুন, বাকি পাঁচশো পুরো তথ্য দাখিল করলে দিতে হবে। অনেকটা সময় এই বিচিত্র এবং অকল্পনীয় দরদস্তুর চলল। আমি ঘেমে সারা। এ কী কাণ্ড করছেন কর্নেল! জীবনে কখনও কোন কেসে একটি পয়সা কারো কাছে চাননি—দাবি করেননি, নিজের পকেট থেকে একগাদা টাকা খরচ করে গেছেন হাসিমুখে, তিনি এই কেসে টাকার অঙ্ক এবং শর্ত নিয়ে তুমুল লড়ে যাচ্ছেন!

অবশেষে রফা হল। স্বাগতা সেন কর্নেলের শর্তই মেনে নিলেন। বুকের ভিতর থেকে যাদুকরীর মতো একটা ছোট্ট পার্স বের করলেন। তার মধ্যে ভাঁজকরা চেকবই আর কলম ছিল। তক্ষুনি একটা চেক লিখে দিলেন। কর্নেল সেটা পকেটস্থ করে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন—হুম! তাহলে এবার আমাকে কিছু সঠিক তথ্য দিতে হবে ম্যাডাম।

মিসেস সেন হিসহিস করে উঠলেন—বা রে! তথ্য যদি আমিই দিতে পারব তাহলে আপনাকে টাকা দিলাম কেন? এ আপনি কী বলছেন?

—দেখুন মিসেস সেন, অন্ধকারে আমি এগোতে চাই না। আমি শুধু আপনাকে প্রশ্ন করে যাবো, আপনি জবাব দেবেন—যে জবাব আপনার জানা। যা জানা নয়, বলবেন—জানিনে, ব্যস! চুকে গেল।

মিসেস সেন একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, ঠিক আছে।

—বিলাসপুরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করার প্রথা আপনাদের নতুন নয়—প্রতি বছর চৈত্রের দোল-পূর্ণিমায় আপনারা সেখানে একটা দিন ও রাত কাটিয়ে আসেন। পার্টি হয়। অনেকটা রাত অব্দি নাচগান ধূমধামও হয়। কেমন?

—হ্যাঁ।

—এবার অর্থাৎ গত ২৩শে মার্চ আপনারা ওই উদ্দেশ্যে গেলেন। এবারও কি পার্টি দিয়েছিলেন?

—না। আমরা পিকনিকটা নিজেদের কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

—কেন?

—মিঃ সেন ইদানীং হইহল্লা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একা থাকতে ভালবাসতেন। বয়স হচ্ছিল—শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। আমি ওঁকে ফিল করতে পেরেছি বরাবর। আমরা নিঃসন্তান দম্পতি—বুঝতেই পারছেন। তাই ঠিক হল, এবার মোটেও পার্টি দেওয়া হবে না।

—রাইট। তা কে কে গেলেন ওখানে?

—আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমার বোনের ছেলে ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, ওঁর বন্ধু অ্যাটর্নি সুশান্ত মজুমদার, এই ক'জন মাত্র। বাকি একজন আমাদের রাঁধুনি ঘনশ্যাম, দুজন চাকর জগন্নাথ আর সোফার সুরেন্দ্র। সুশান্তবাবু নিজের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আমার পৌঁছানোর অনেকটা পরে উনি পৌঁছান।

—এবার খুব ভাল করে স্মরণ করুন মিসেস সেন, ঘটনাটা কীভাবে ঘটল।

মিসেস সেন এতক্ষণে ফোঁস করে উঠলেন।—কী বিপদ! আপনি ওঁর অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি উইল সম্পর্কে কোন কথাও তো জিগ্যেস করছেন না! অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট! আর ওই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ঘেঁটে কি আমার স্বামীকে ফিরে পাব?

মিসেস সেন ঠিক যে সুরে 'অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট' বললেন—লক্ষ্য করলাম—অবিকল একই সুরে বলছিল শ্যামলী। 'উইল ইজ উইল!'

কর্নেল মুখ গোমড়া করে বললেন—ম্যাডাম, আমার কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে আমি এক্ষুনি চেক ফেরত দেব এবং চলে যাব। কোন তথ্য আপনার স্বার্থে যাবে, ডিয়ার ম্যাডাম, তা যদি আপনি টের পেতেন—তাহলে এই নীলাদ্রি সরকারকে কারো দরকার হত না।

—আপনি বলছেন, অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে উইলের সম্পর্ক আছে?

—কে বলতে পারে নেই বা আছে? যদি থাকে?

—কী জানি, আমি ওসব বুঝি না। আপনি যা জিগ্যেস করার করুন।

—যখন রাইফেল হাতে মিঃ সেন দৌড়ে যান......

—উঁহু। গোড়া থেকে শুনুন। তখন সবে সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি হবে—সূর্য গাছপালার আড়ালে গেছে। কিন্তু যথেষ্ট আলো আছে। আমি, অমরেশ আর সুশান্তবাবু তাঁবুর সামনে ঘাসের উপর চেয়ার পেতে গল্প করছি। ঘনশ্যাম কাছেই বটগাছটার নিচে ইট জড়ো করে উনুন জ্বেলেছে সবে। জগন্নাথ আর হরিয়া মশলা বাটা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। সুরেন্দ্র দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। তারপর দেখলাম, সুশান্তবাবু ঢিল ছুড়ে কাক তাড়াতে লাগলেন। তখন সবাই তাকিয়ে দেখি বটগাছটায় রাজ্যের কাক এসে বসে রয়েছে—প্রচণ্ড চেঁচামেচি করছে। আমরাও দেখাদেখি ওর সঙ্গে কাক তাড়াতে লাগলাম হইচই করে। কাকগুলোর নড়ার নাম নেই তবু।

—তখন মিঃ সেন কোথায় ছিলেন?

—ঘরে কোথাও ছিলেন।

—ঘরে মানে?

—কি বিপদ! ওখানে আমাদের—মানে ওঁর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে যে। কুঠিবাড়ি বলে সবাই। নীলকুঠি না রেশমকুঠির কোন ব্রিটিশ অফিসার থাকত। পরে আমার শ্বশুর নাকি কিনেছিলেন। একশ বছরের বেশি বয়স বাড়িটার। একতলা। আটদশটা ঘর রয়েছে। আমরা মোটামুটি সাজিয়ে রেখেছি বরাবর। তা—

—আপনারা যেখানটা তাঁবু করেছিলেন, তার কতদূরে বাড়িটা?

—আমি মেপে দেখিনি। অনেকটা দূরে। ইচ্ছে হলে গিয়ে দেখে আসবেন।

—তারপর কী হল বলুন?

—আশেপাশে ভাঙা পাঁচিলের অজস্র ইট পড়েছিল। আমরা তা গুঁড়ো করে

ছুড়তে শুরু করলাম। একসঙ্গে অতসব তাড়া খেয়ে কাকগুলো পালাতে লাগল। কুঠিবাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি উনি বন্দুক হাতে নিয়ে দৌড়চ্ছেন।

—কোন্‌দিকে?

—কাকগুলো যেদিকে যাচ্ছিল, সেইদিকে।

—তারপর?

—ব্যাপার দেখে আমরা হাসাহাসি করলাম।

—আপনারা কেউ গেলেন না?

—কী হবে গিয়ে? আমরা আবার গল্পগুজবে মেতে গেলাম।...বলে স্বাগতা সেন আবার চটে গেলেন।—ওই দেখুন, সেই অ্যাকসিডেন্ট আর অ্যাকসিডেন্ট! মিঃ সরকার, আমি যা বলার পুলিশকে সব বলেছি। ইচ্ছে হলে ওদের কাছে গিয়ে জেনে নিন। প্লিজ, সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কাছে আমাকে আর নিয়ে যাবেন না।

—প্লিজ মিসেস সেন, এটা ভাইটাল। শুধু বলুন—ঠিক ক'টায় মিঃ সেনকে খুঁজতে পাঠান আপনারা?

—সাড়ে সাতটায়।

—তাহলে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা অব্দি আপনি, ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, মিঃ মজুমদার, রাঁধুনী, দুজন চাকর এবং সোফার ওইখানেই ছিলেন? নাকি কেউ ইতিমধ্যে কোথাও গিয়েছিল?

মিসেস সেন হিসহিস করে উঠলেন—কী বলতে চান আপনি?

—আমি ঘটনাটার একটা স্পষ্ট ছবি চাই।

—কেউ আমরা নড়িনি ওখান থেকে।

—আপনার তাহলে নিশ্চয় কড়া নজর ছিল প্রত্যেকের দিকে?

—তার মানে?

—তা না হলে কেমন করে জানলেন যে কেউ কোথাও গিয়েছিল কি না? দমে গেলেন স্বাগতা সেন। তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমি অত লক্ষ্য রাখিনি। কিন্তু যদি কেউ ওখান থেকে সরে গিয়ে আবার এসে থাকে, সে তো আমাদের রাঁধুনী চাকর দুজন আর সোফারের মধ্যে কেউ। অমরেশ বা মিঃ মজুমদার আমার কাছেই ছিলেন। জগন্নাথদের জিগ্যেস করলেই হবে। কিন্তু ওরা—ওরা কেন...মিঃ সরকার, আবার আপনি সাংঘাতিক কিছু হাতে নিয়েছেন! আপনি কি বলতে চাই কেউ ওঁকে খুন করেছে?

—আমি কিছুই বলতে চাইনে স্বাগতা দেবী। আমি সত্যে পৌঁছতে চাই।

মিসেস সেন এবার ছটফট করে উঠলেন। ঘোমটাটি ভালো করে ঢেকে কুৎসিত ভঙ্গিতে কেঁদে উঠলেন! প্রথমে কিছুক্ষণ কিছু বোঝা গেল না কী বলছেন। অবশেষে বোঝা গেল।—এ আমি ভাবিনি! সত্যি, ভাবিনি! আপনি

ঠিকই বলেছেন। ওই হারামজাদী বেশ্যা মেয়েটা ওঁকে ভুলিয়ে সর্বনাশ করবে আমি জানতাম! ঠিক-ঠিক। ওঁকে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করেছে। আমরা ভুল বুঝেছিলাম! পুলিশ—পুলিশকেও টাকা খাইয়ে ও মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়েছে!

কর্নেল ওঁকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলেন। আমার মাথা ধরে উঠেছিল। কর্নেলকে ইশারায় বললাম—বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করছি। কর্নেল আমার দিকে মনোযোগ দিলেন না। আমি বেরিয়ে এলাম। এটা দোতলা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে গেলাম। কাকেও দেখলাম না। বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল সেইসময়। ভাবলাম কাজটা সেরে নিই। এদিক-ওদিক খুঁজেও টয়লেটের পাত্তা পেলাম না। কোন লোক নেই যে জিগ্যেস করব। ডাইনের ঘরে ভারী পর্দা ঝুলছে। ভিতরে কথা বলার আওয়াজ পেলাম। মরিয়া হয়ে ওখানেই কাকেও জিগ্যেস করব ভেবে পর্দা একটু ফাঁক করলাম। তারপরই অবাক হয়ে পেছিয়ে এলাম। মিস শ্যামলী বসে রয়েছে!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—সেইসময় একজন খাকি হাফপ্যান্ট-শার্ট পরা বুড়ো সারভ্যান্ট গোছের লোক সিঁড়ি বেয়ে নামছে দেখলাম। তাকে জিগ্যেস করতেই বলল—বাঁদিকে পড়বে।

টয়লেটে কাজ সেরে আরামে পাইপ ধরিয়ে আসছি, সেই দরজার কাছে এসে শ্যামলী আর কার চাপা কথাবার্তার আওয়াজটা আবার কানে এল। কৌতূহলও বটে, আবার শ্যামলীকে চমকে দেবার ছেলেমানুষি তাগিদেও বটে—কর্নেলের তোয়াক্কা না করে পর্দাটা ফাঁক করলাম। দেখলাম, শ্যামলীর মুখোমুখি বসে রয়েছেন মিসেস সেন। সেই হিসহিসে ভাঙা কণ্ঠস্বর!

কখন নেমে এসেছেন ভদ্রমহিলা—আমি টয়লেটে ঢোকার পরে। তাহলে কর্নেল বেরিয়ে গেছেন! আমি বেরিয়ে লনে গেলাম। কিন্তু কর্নেলকে খুঁজে পেলাম না। কোথায় গেলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর? আমার গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগ্রেট ধরালাম। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ধরে গেল। এগারোটা বাজল। কর্নেল বেরোচ্ছেন না। বাড়ির কোন লোকও দেখছি না যে জিগ্যেস করব। তখন ফের ঢুকলাম গিয়ে। প্রথমে সেই ঘরের পর্দাটা তুললাম, মিস শ্যামলী নেই—মিসেস সেনও নেই! তাহলে সবাই ওপরে গেছেন! যাক্ গে, উইলের একটা ফয়সালা হয়ে যাক।

ওপরে গেলাম। সেই ড্রইংরুমে কর্নেল নেই। কোথায় গেলেন তাহলে? হয়তো অন্য কোন ঘরে—গোপনে বোঝাপড়া হচ্ছে। টানা বারান্দা দিয়ে এগোলাম সেইসময় ফের সেই খাকি পোশাকপরা লোকটাকে দেখা গেল। বললাম—বুড়ো ভদ্রলোক—মানে যিনি মিসেস সেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি কোথায়?

ও বলল—এই তো একটু আগে নিচে গেলেন। চলুন, আমি দেখছি।

সে পা বাড়াল। বললাম—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, জগন্নাথ স্যার।

—হরিয়া নামে আরেকজন আছে, সে কোথায়?

—দেশে গেছে স্যার। গত কালকে। মেদিনীপুর ওর বাড়ি। সেখানে গেছে। পরশু আসবে।

—জগন্নাথ, তুমি তো অ্যাকসিডেন্টের দিন বিলাসপুরে ছিলে!

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেল সে। সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল—আপনি কি স্যার পুলিশ?

—আরে, না না! আমি এমনি জিগ্যেস করছি। আমি খবরের কাগজের লোক।

—ছিলাম স্যার। আরো সবাই ছিল—হরিয়া, অ্যাটর্নিবাবু...ডাক্তারবাবু তো এখনও আছেন। ওনাকেও জিগ্যেস করুন। সব বলবেন।

—আচ্ছা জগন্নাথ, সেদিন পিকনিকে নিশ্চয় খুব ধুমধাম হয়েছিল?

—আগেরবারের মতো কিছুই নয়।

—তবে ফুলটুল দিয়ে নিশ্চয়, ইয়ে সাজিয়েছিলে তোমরা?

জগন্নাথ ফ্যাঁচ করে হাসল।—কী সাজাব স্যার? ও তো বনভোজন। বনজঙ্গলে জায়গা। ফুল এমনিতেই কত ফুটেছিল চারদিকে। হ্যাঁ—একসময় মালী ছিল, তখন কেতা ছিল। এখন আর যত্ন হয় না। সব জঙ্গল হয়ে গেছে।

—তাহলেও তো আমোদ-প্রমোদের জন্যে যাওয়া। নিশ্চয় তোমরা সবাই জামায় টামায় দু'একটা ফুলটুল গুঁজেছিলে? অ্যাঁ?

আমার কৌতুকি ভঙ্গিতে ও হেসে গড়িয়ে পড়ল প্রায়। বলল—আমরা কাক তাড়াব, না মশলা বাটব—না ফুল...কী যে বলেন স্যার! আমরা চাকরবাকর লোক। আমাদের ও সখ থাকতে নেই।

—তোমাদের সায়েবরা নিশ্চয় ফুল গুঁ...

জগন্নাথ পা বাড়িয়ে বলল, নাঃ—ফুল টুল...না তো!

—তোমাদের গিন্নিমা নিশ্চয় গুঁ...

জগন্নাথ ভাঙা দাঁত খুলে হেসে খুন। তারপর চাপা গলায় এবং নিজের মাথা দেখিয়ে বলল—গুঁজবেন কোথা? মুখ যে পোড়া হনুমান! সে জানেন না বুঝি? আর বলবেন না—যদ্দিন থেকে জুটেছেন, হাড়মাস কালি হয়ে গেল! হরিয়া কি সাধে অ্যাদ্দিন পালিয়েছে? আপনাকে বলার মতো মনে হল—তাই দুঃখের কথা বলছি স্যার। খবরের কাগজে তো আপনারা চাকরদের চোর ডাকাত খুনে বলে নিন্দে করেন, কিন্তু মনিবের সাইডটা তো দ্যাখেন না!

—কেউ বললে তো লিখব সেকথা! এই তুমি বলছ এবার লিখব।

—লিখবেন স্যার, তবে যদি সরকারের চোখে পড়ে! বুঝলেন স্যার হরিয়া আর আসবে না। আমিও কেটে পড়ছি শিগগির।

—কেন, কেন জগন্নাথ?

—বলছি তো। নতুন গিন্নিমা এসে...

—নতুন গিন্নিমা মানে?

—হ্যাঁ স্যার। এই তো কমাস হল সায়েব বিয়ে করে বসলেন আবার। বোম্বে গেলেন—ফিরে এলেন একেবারে বউ নিয়ে। বউ না কালসাপ! এসেই খেল ওনাকে!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সায়েবের আগের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ। সে তো কবে—আট ন'বছর আগে। অমন মানুষ আর জন্মায় না স্যার। আর এনার কথা বলবেন? দজ্জাল, খটরাগী। সবচেয়ে অবাক লাগে স্যার, সায়েব আর মেয়ে পাননি—ওই মুখপোড়া রাক্ষুসীকে ঘরে নিয়ে এলেন?

—বল কী জগন্নাথ! মুখপোড়া অবস্থায় ঘরে নিয়ে এলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নতুন বৌদি এসে অব্দি দেখি ঘোমটা খোলেন না! পরে শুনি কী অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মুখটা গেছে। পেলাস্টিক করিয়েছিলেন—

—প্লাস্টিক সার্জারি?

—তাই হবে। কিন্তু তাতেও নাকি কাজ হয়নি।

আমরা সিঁড়ি থেকে নেমে ইতিমধ্যে লাউঞ্জে এসে কথা বলছি। সেইসময় ফুটফুটে সাদা সায়েবচেহারার এক ভদ্রলোককে ওদিকের একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে ঢুকতে দেখলাম। জগন্নাথ চোখ নাচিয়ে বলল—উনিই গিন্নিমার ভাই—সেই ডাক্তারবাবু। পিকনিকের আগের দিন এসেছেন। থাকেন বোম্বেতে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল জগন্নাথ।—ওই যাঃ! আমার দেরি হয়ে গেল। আপনি ঐ ঘরে চলে যান স্যার, লাইব্রেরি ঘরে। বুড়ো সায়েব ওখানেই ঢুকেছেন।

জগন্নাথ চলে গেল। ও যে ঘরটা দেখাল, সেই ঘরেই আমি শ্যামলীকে মিসেস সেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। সটান ঢুকে দেখি, কর্নেল আর মিসেস সেন কোণে একসার আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে কর্নেল ইশারায় কাছে যেতে বললেন।

অজস্র ছোটবড় আলমারি আর বুকসেলফে ভরতি ঘরটা। কোণের দিকে সোফাসেট একটা। কাছে গিয়ে আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম—শ্যামলীর কী হয়েছে কর্নেল?

শ্যামলী মেঝেয় পড়ে রয়েছে। নিথর একেবারে। চোখ দুটো ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। জিভটাও বেরিয়ে গেছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে! সেই সুন্দর শরীর থেকে একটা ভয়ঙ্কর বিকৃত সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

কর্নেল বললেন, শি ইজ ডেড। একটু আগে কেউ ওকে গলা টিপে খুন করেছে, জয়ন্ত। কিন্তু বুঝতে পারছিনে—কেন এখানে এল ও?

আমি মিসেস সেনের দিকে আঙুল তুলে বলতে যাচ্ছিলাম যে ওঁকেই একটু আগে এখানে শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি—কর্নেল যেন চকিতে টের

পেয়ে বলে উঠলেন—আমি আর মিসেস সেন বরাবর একসঙ্গে ছিলাম, জয়ন্ত। দুজনে একইসঙ্গে এঘরে ঢুকে শ্যামলীর ডেডবডিটা দেখতে পেয়েছি।

মিসেস সেন কাঁপছিলেন। হিসহিস কণ্ঠস্বরে বললেন—কেউ পুলিসে ফোন করছেন না কেন আপনারা? আমি যে বিপদে পড়ে গেলাম! আমারই ঘরে—ওঃ! দু'হাতের তেলোয় মুখ নামালেন উনি। পিঠটা ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকল।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, লালবাজারে আরেক জয়ন্ত রয়েছে। প্রথমে ওকে ডাকো। ওই দ্যাখো, ফোন রয়েছে। শুধু বলো এখানে কর্নেল সরকার এক্ষুনি আসতে বলেছেন।

—যদি উনি না থাকেন?

—ময়ূখ ব্যানার্জিকে ডেকে দিতে বলবে।

আমি ফোনের কাছে গেলাম। ফোন করতে করতে লক্ষ্য করলাম, কাছে যে বিশাল পর্দাটা ঝুলছে, তার ওধারে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পা দুটো দেখা গেল। পুরুষই। পায়ে হালকা চটি রয়েছে। পাজামা পরা লোক।

ময়ূখবাবুকেই পাওয়া গেল। ফোন করেই পর্দা তুললাম। ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত হকচকিয়ে গেলেন। বললাম—এখানে কী করছেন আপনি?

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে জবাব দিলেন—কী ব্যাপার ঘটেছে লাইব্রেরির ভেতরে, আঁচ করছিলাম। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না—পাছে আবার ডেডবডি দেখতে হয়।

—আপনি তো ডাক্তার। ডেডবডিতে ভয় হবার কথা নয়।

কর্নেল ডাকছিলেন।—কার সঙ্গে কথা বলছ জয়ন্ত?

আমি অমরেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক গুটিসুটি দিব্যি চলে এলেন—বাধা দিলেন না। তারপর আঁতকে উঠে বললেন—কী সর্বনাশ!

মিসেস সেন স্প্রিঙের মতো ঘুরে ভাইয়ের বুকে ভেঙে পড়লেন। সে দৃশ্য দেখবার মতো। কর্নেল ঘড়ি দেখছেন আর টাক চুলকোচ্ছেন। আমি...থ।...

॥ চার ॥

চুল এবং ফুল

সেদিন পুরোটা কী হল, সে বর্ণনা আমি দেব না। পুলিশের এসব ক্ষেত্রে যে রুটিন ওয়ার্কস অর্থাৎ ছকবাঁধা কাজকর্ম থাকে, তা যেমন ক্লান্তিকর আর বৈচিত্র্যহীন, তার বর্ণনাও তেমনি বিরক্তিকর হবে। হত্যাকারীর হাতে দস্তানা ছিল নিশ্চয়। কোথাও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কোন সূত্র না—কোন নতুন তথ্যও না। অবশেষে পুলিশ যথারীতি শ্যামলীকে খুনের সন্দেহে মিসেস সেন আর অমরেশকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আমি একটা মারাত্মক সাক্ষী হতে পারতাম—কারণ শ্যামলীর সঙ্গে মিসেস

সেনকে কথা বলতে দেখেছি ওই জায়গাতেই, তখন কর্নেল ওখানে উপস্থিত ছিলেন না।

অথচ কর্নেল বলছেন—তিনি আর মিসেস সেন আগাগোড়া একসঙ্গে আছেন। কথা বলছেন। তারপর একসঙ্গে নিচে নেমে এসেছেন। লাইব্রেরিতে ঢুকেছেন মিঃ সেনের কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করতে।

তাহলে—হয় আমি ভুল দেখেছি, নয় কর্নেল মিথ্যা বলছেন। অথচ দুজনেই জোরের সঙ্গে নিজের নিজের বর্ণনা দিচ্ছে। অগত্যা পুলিশ দুজনেরই সাক্ষ্য থেকে ও প্রসঙ্গটা আপাতত বাদ রেখেছে। মাঝখান থেকে আমি রেগেমেগে কর্নেলের বার্ধক্যজনিত মতিভ্রম ও বুদ্ধিভ্রংশের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে মন খারাপ করে বসলাম। এমন কি একা গাড়ি নিয়ে চলে এলাম। কর্নেলের মুখটা গম্ভীর দেখেছিলাম। একটি কথাও বিতর্কের ছলে বলেননি। পুলিশের গাড়িতে উনি বাসায় ফিরলেন।

রাতে আর ঘুম হল না। কর্নেলের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসব ঠিক করলাম। রাত তখন প্রায় বারোটা, হঠাৎ ফোন বাজল। ভাবলাম, থাকগে, নির্ঘাৎ আমার কাগজের অফিস ডাকছে।

কানে রাখতেই কর্নেলের সস্নেহ কণ্ঠস্বর শুনলাম—ডার্লিং জয়ন্ত, আশা করি তোমার ঘুম হচ্ছে না। শোন, তাই বলে ওষুধ খেয়ে বসো না। ড্রাগ হ্যাবিট মানুষের সর্বনাশ করে। দেখছ তো, আমি কেমন ওষুধ না খেয়েই চালিয়ে দিচ্ছি! ঘুম না এলে ভালো করে ঘাড় আর হাতের কনুই অব্দি ধুয়ে ফেলো। আর ইয়ে শোন ডার্লিং, ইউ আর রাইট। তুমি লাইব্রেরি রুমে খুনীকেই দেখেছিলে। কিন্তু সে মিসেস সেনের ছদ্মবেশে বসেছিল। মুখটা কালো শাড়ির আঁচলে ঘোমটা দিয়ে ঢাকা—অবিকল যেমন মিসেস সেন ঢেকে রাখেন। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত শ্যামলীর ফ্ল্যাটে যে ঝি মেয়েটি থাকে—সে বলেছে, একটা ফোন এসেছিল বাইরে থেকে। ফোন পেয়েই চলে যায় শ্যামলী। ওকে বলে যায়—মিঃ সেনের নিউ আলিপুরের বাড়ি থেকে কর্নেল সরকার ওকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন। বুদ্ধিমতী মেয়ে—বুদ্ধি করে বলেও গিয়েছিল। কিন্তু জয়ন্ত, আগে বলেছিলুম তোমাকে—ও বোকাও তত।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম,—কর্নেল, কর্নেল! আপনি ঠিক বলেছেন। আমি তাহলে ছদ্মবেশী খুনীকেই দেখেছিলাম। ইস্! যদি আর একটু বুদ্ধি করে ওখানটায়—

—যা হবার হয়ে গেছে। তবে আমি এদিকটা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি! শ্যামলীকে কেউ সত্যি মেরে ফেলবে—আঁচ করতে পারিনি। কারণ নিছক প্রতিহিংসা ছাড়া ওকে মেরে তো কেউ লাভবান হচ্ছে না। প্রতিহিংসার একমাত্র জায়গা মিসেস সেন। অথচ ওঁর অ্যালিবাই অর্থাৎ অজুহাত ভীষণ শক্ত। কারণ আমি বরাবর সঙ্গে ছিলাম।

—কর্নেল, আপনি জানেন, ভদ্রমহিলা আপনাকে একটা প্রচণ্ড মিথ্যা বলেছেন। উনি আগের কোন পিকনিকে বিলাসপুরে মোটেও যাননি। কারণ উনি তখন মিঃ সেনের স্ত্রীই ছিলেন না। মাত্র ক'মাস আগে বোম্বে থেকে ওঁকে মিঃ সেন বিয়ে করে এনেছেন।...জগন্নাথের কাছে শোনা ঘটনাটা বললাম কর্নেলকে।

কর্নেল বললেন—মাই গুডনেস্!

—তাছাড়া ওঁর ভাই না কে ওই অমরেশ ডাক্তার এই প্রথম ও বাড়ি আসে পিকনিকের ঠিক আগের দিন।

—ও মাই!

—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ ভুল করেনি। ওই ভাইটাই কালোশাড়ি পরে খুন করেছে শ্যামলীকে। চেহারাটা বা কণ্ঠস্বর কেমন মেয়েলি নয় ওর?

কর্নেলের সাড়া না পেয়ে বললাম—কী হল কর্নেল?

—কিছু না। বলে যাও!

—আরে শুনুন, মিসেস সেন তখন আপনার সামনে যা বলেছিলেন—মানে পিকনিকের ব্যাপারটা—মনে হল, মিঃ সেন কাক তাড়াতে দৌড়ে যাননি। ওটা আকস্মিক যোগাযোগ। আমার ধারণা, তাড়া খেয়ে কাকগুলো যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই উনি কোন কারণে—কাকেও দেখে...

—কী বললে, কী বললে?

—হ্যাঁ। হয়তো এমন কাকেও নদীর ধারের ভাঙা পাঁচিলের দিকে দেখতে পান কাকগুলো তখনই উড়ে যাচ্ছল। তাকে গুলি করে মারাতে তাড়া করেছিলেন।

—বলে যাও, ডার্লিং!

—তারপরে তার সঙ্গে ওঁর ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এবং সেই লোকটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে বুদ্ধি করে ওঁকে গলার নীচে নল রেখে গুলি করে, যাতে আত্মহত্যা বলে চালানো যায়—নয়তো দৈবাৎ গুলি ছুটে যায় কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে।

—তোমার উন্নতি হবে জয়ন্ত। গুলিটা অ্যাকসিডেন্টাল হলে বাঁদিকের কণ্ঠ তালু ফুঁড়ে বেরোনোর চান্স ছিল। লেগেছে ডানদিকে। দিস ইজ অড। তাছাড়া জয়ন্ত, বন্দুকের ট্রিগারে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তা ওঁর বাঁ আঙুলের। আজ লালবাজারে ফরেনসিক এক্সপার্টরা ফের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কাজেই খুনই হয়েছেন মিঃ সেন। কুঁদোতে ডানহাতের আঙুলের ছাপ কেন থাকবে? মিঃ সেন লেফটহ্যান্ডেড ছিলেন না। ওঁর দুটো হাত স্বাভাবিকভাবে কাজ করত জানা গেছে। কাজেই খুনী বন্দুকটা তাড়াতাড়ি ওইভাবে রেখেছিল। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়—বন্দুক ওসব ক্ষেত্রে হাতে থাকবে কেন? ছিটকে পড়বে পাশে। হাতপায়ের খিঁচুনি হবে মৃত্যুর সময়। তাই না?

—অবশ্যই। কিন্তু ফুলের ব্যাপারে কোন সূত্র পেলেন? আমি জগন্নাথকে জিগ্যেস করেছিলাম। ও বলছিল, কেউ ফুলটুল গোঁজেনি—না চুলে, না বাটন হোলে। কর্নেল, ফুলটা কিন্তু আমার দেখাই হয়নি! কী ফুল?

—লাল গোলাপ। আজ বিকেলে লালবাজার থেকে একজন নার্সারি বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, এই গোলাপগুলোর নাম প্রিন্স অ্যালবার্ট। এখন, মজার কথা—মিঃ সেনের নিউ আলিপুরের বাড়িতে এই ফুলের গাছ রয়েছে।

—তাই নাকি? কর্নেল, ফুলের বোঁটায় চুল জড়ানো আছে বলেছিল শ্যামলী।

—একগোছা. চুল। একটু লালচে রঙের। ইঞ্চি চার লম্বা।

—কর্নেল, কর্নেল! অমরেশের মাথার চুল লালচে দেখেছি। নির্ঘাৎ—

—এখন সব ফরেনসিক এক্সপার্টদের কাছে গেছে। কাল ওঁদের মতামত জানতে পারব। তুমি সকাল সাতটার মধ্যে চলে এস। আমরা বিলাসপুর যাবো...

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিলাম সাড়ে ছ'টার। ঘুম ভাঙলো তার আওয়াজে—কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে সাতটাই বেজে গেল।

কর্নেলের বাসায় পৌঁছলাম সাড়ে সাতটায়। গিয়ে দেখি, কর্নেল তৈরি। দক্ষিণের সেই জানালায় ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন। ঢুকে বললাম—দুঃখিত। দেরি করে ফেললাম।

কর্নেল মুখ না ঘুরিয়ে বললেন—একটা মজার কাণ্ড দেখে যাও, জয়ন্ত।

কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। নিচে খানিকটা পোড়ো জায়গা রয়েছে। জানলা থেকে বড়জোর চার মিটার তফাতে একটা জামরুল গাছ—তার মাথার শেষ উঁচু পাতাটি এই জানলার নিচের চৌকাঠের সমান্তরালে। বললাম—কী?

—কাকের বাসা। ঐ দ্যাখো!

হ্যাঁ—ঠিক মাঝখানে ঝাঁকড়া ডালপালা ও পাতার মধ্যে একটা কাকের বাসা রয়েছে। সেখানে বসে ডিমে তা দিচ্ছে একটা কাক। কর্নেল একটু হেসে বললেন—এবার ঐ শিমুল গাছটার দিকে তাকাও। ওই দ্যাখো একটা কোকিল কেমন ঘাপটি পেতে বসে রয়েছে। ক'দিন আগে দেখলাম, ওই কোকিল আর তার সঙ্গীটা কোত্থেকে এসে শিমুলডালে বসল। সঙ্গীটা পুরুষ-কোকিল। সে করল কী, আচমকা এসে কাকটাকে জ্বালাতন শুরু করল। কাকটা অগত্যা ডিম ছেড়ে ওকে তাড়া করল। উদ্দেশ্যটা তখনও বুঝিনি। প্রায় সকাল থেকে দুপুর অব্দি ওইভাবে ওকে ক্রমাগত জ্বালাতন করছিল কোকিলটা। অবশেষে দেখি কাকটা এবার ওকে তাড়িয়ে দূরে নিয়ে গেল। সেইসঙ্গে আরও অনেক কাক যোগ দিল দলে। ওরা ওই দূরের বাড়িটার দিকে চলে গেল। স্ত্রী-কোকিলটা অমনি এসে কাকের বাসায় বসে পড়ল—ডিমগুলোর ওপর। ঠুকরে ফেলে দেবার চেষ্টাও করল। একটা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে উড়ে পালাল। ডিমগুলো এখান থেকে গোনা যায় না। যাই হোক, কোকিলটা যে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে গেল, তাতে কোন ভুল নেই।

—কাকটা ফিরল না আর?

—অনেক পরে ফিরে এল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। আবার তা দিতে থাকল। ওই

দ্যাখ, কেমন চুপচাপ বসে প্রকৃতির নিয়ম পালন করছে। এরপর একদা আমরা কাকের বাচ্চার দলে দুটি-একটি কোকিল বাচ্চা নিশ্চয় দেখব। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার চলে প্রকৃতিজগতে!

—কোকিল যে বাসা বানাতে জানে না। ওরা ছন্নছাড়া হাঘরে পাখি! শুধু গানটান আমোদ স্ফূর্তি করেই জীবন কাটাতে চায়।....বলে আমি হেসে উঠলাম।

—রাইট, রাইট। গানটান আমোদ স্ফূর্তি! ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত, কিন্নরজাত।

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না! গম্ভীর হয়েই বললেন কথাটা! তারপর আমার হাত ধরে বেরোলেন। ষষ্ঠীচরণকে বিদায় সম্ভাষণ করে আসতে ভুললেন না।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম। পার্ক স্ট্রিটে ঢোকার পর কর্নেল মুখ খুললেন—ইয়ে জয়ন্ত, আমরা আপাতত টালিগঞ্জে যাচ্ছি।

—কেন? বিসালপুর কী হল?

—আগে টালিগঞ্জে যাই তো! আটর্নি মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মিঃ সুশান্ত মজুমদারের বাড়িটি অত্যাধুনিক ধাঁচের। বাগবাগিচা, সবুজ লন, টেনিসকোর্ট রয়েছে। কিন্তু বাড়িটা ছোট। একতলা। নানারঙের স্ট্রিমলাইন দেয়াল থাকায় মনে হয় ভীষণ গতিশীল।

সুশান্তবাবু বিপত্নীক মানুষ। হাসিখুশি সৌমকান্তি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে চালচলনে—বিশেষ করে ঠোঁটের কোনা আর চিবুকে দৃঢ়সংকল্প মানুষের পরিচয় রয়েছে। আমাদের পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। বললেন—আজ একটু সকাল-সকাল অফিসে যাব ভেবেছিলাম। যাক্‌গে, সেজন্যে আমার অনারেবল গেস্টদের উদ্বেগের কারণ নেই। অন্তত আধঘণ্টা সময় যথেষ্ট হবে, আশাকরি।

বুঝলাম, ভদ্রলোক খুব নিয়মনিষ্ঠ এবং কেজো মানুষ। সময়ের অপব্যবহার করেন না মোটেও।

কর্নেল বললেন—আপনার ফার্ম তো চার্চ লেনে, মিঃ মজুমদার?

—হ্যাঁ। বোস অ্যান্ড মজুমদার। পৈতৃক বলতে পারেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বাবা মিঃ রথীন্দ্র মজুমদারের খ্যাতির কথা আজও কেউ ভোলেনি। কলকাতার সবেচেয়ে বিজ্ঞ সলিসিটার বলতে........

সুশান্তবাবু হেসে বললেন—সে দিন চলে গেছে, কর্নেল সরকার। বাই দা বাই, আপনি শুনলাম মিসেস সেনের পক্ষে মিঃ সেনের রেজিস্টার্ড উইলটা চ্যালেঞ্জ করতে চান! দেখুন কর্নেল সরকার, আমরা—মানে মেসার্স বোস অ্যান্ড মজুমদার দীর্ঘ একুশ বছর ধরে মিঃ সেনের উন্নতির গোড়া থেকেই ওঁর কাজকর্ম করে আসছি। মিঃ বোস অবশ্য নেপথ্যে থাকেন বরাবর—আমি মিঃ সেনের আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে যে উইল সম্পাদিত এবং যথারীতি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে—তা ওল্টানো শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তব এবং হাসাকর চেষ্টা। দেয়ার আর সাম লজ ইন আওয়ার কানট্রি।

কর্নেল হাত তুলে বললেন—যথেষ্ট, যথেষ্ট মিঃ মজুমদার! আমি একজন নগণ্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার মাত্র। শুধু কিছু জিজ্ঞাস্য নিয়ে এসেছি। জবাব পেলেই খুশি।

—বেশ, বলুন কী জানতে চান?

—মিঃ সেনের উইলের তারিখটা জানতে চাই।

—একুশে ফেব্রুয়ারি—দিস ইয়ার।

—মিঃ মজুমদার, ইতিমধ্যে হিতেনবাবু আপনাকে এই উইল পরিবর্তন করে কোন নতুন উইলের কথা কি বলেননি?

—অ্যাবসার্ড! হাউ ডু ইউ ইমাজিন দ্যাট? কেন ভাবছেন ও কথা?

কর্নেল না দমে বললেন—এ কি সত্য যে দোলপূর্ণিমার পিকনিকের অনুষ্ঠানে হিতেনবাবু তাঁর নতুন উইলের কথা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন?

সুশান্তবাবুর মুখ রাঙা হয়ে গেল। চোখদুটো তীব্রতর হল। বললেন—ননসেন্স! এমন প্রশ্ন আজগুবি শুধু নয়, আমার সুনাম—আমার ফার্মের সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর।

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না। বললেন—সেই নতুন উইল যথারীতি সম্পাদন করা হয়েছিল, হিতেনবাবু সইও করেছিলেন এবং পরদিন রেজিস্ট্রি করা হত কলকাতা ফিরেই। আপনি কী বলেন?

সুশান্তবাবুর মুখটায় যেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু কিছু বললেন না।

এই নতুন উইলের সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন ওঁর শ্যালক ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, সোফার সুরেন্দ্র ঘটক এবং হিতেনবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার সত্যেন সিংহরায় এবং আপনি। কী বলেন মিঃ মজুমদার?

সুশান্তবাবু হো হো করে আচমকা হেসে উঠলেন।—মাথা খারাপ! মাথা খারাপ!

—এই নতুন উইলে মিস শ্যামলীকে মাত্র নগদ দশহাজার টাকা, স্ত্রী স্বাগতা সেনের নামে মোট সম্পত্তির অর্ধেক, এবং কয়েকজন দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের নামে...

সুশান্তবাবু পলকে মুখ বিকৃত করে বললেন—আমার সময়ের দাম আছে মশাই। লেট ইট বি ফিনিশড হেয়ার।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেলের ওঠার চেষ্টা দেখলাম না। আমার ব্যাপারটা খুব অপমানজনক মনে হচ্ছিল। কর্নেলের দিকে তাকালাম। কর্নেলের দৃষ্টি সুশান্তবাবুর মুখের দিকে। বললেন—গতকাল সকাল দশটা নাগাদ আপনি মিঃ সেনের নিউআলিপুরের বাড়ি গিয়েছিলেন। তখন আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে ওপরের ঘরে কথা বলছিলাম। কেন গিয়েছিলেন সুশান্তবাবু। কার কাছে?

—কে বলেছে আপনাকে?

—জগন্নাথ। আমি ও মিসেস সেন কথা বলছিলাম, জয়ন্ত উঠে বাইরে

গেল—তারপর জগন্নাথ মিসেস সেনকে গিয়ে বলল, আপনাকে নিচের লাইব্রেরি ঘরে বসে থাকতে দেখেছে। তাই একটু পরেই আমি ও শ্রীমতী সেন নিচে লাইব্রেরিতে গেলাম। গিয়ে আবিষ্কার করলাম শ্যামলীকে। ইতিমধ্যে আপনি সম্ভবত বাড়ির পেছনে ঘুরে চলে গেছেন। সামনে দিয়ে বেরোলে জয়ন্ত দেখতে পেত।

—গেট-আউট! গেট-আউট ইউ ওল্ড ফুল! গর্জন করে উঠলেন সুশান্তবাবু! থরথর করে রাগে কাঁপছেন ভদ্রলোক।

এবার কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললেন—ফিল্ম অভিনেতা পার্থকুমার ২১শে ফেব্রুয়ারি উইল রেজিস্ট্রির পরদিন ২২শে তারিখে শ্যামলীকে বিয়ে করবে বলে হোটেলে পার্টি হয়। হোটেলের এই পার্টির সব খরচ আপনার নামে বিল করা হয়েছিল। তার মানে—আপনিই এর উদ্যোক্তা ছিলেন। মিঃ মজুমদার, পার্থ আপনার কে?

—গেট-আউট, কোন কথার জবাব আমি দেব না।

—ক্যাবারে গার্ল মিস শ্যামলীকে হিতেনবাবুর প্রথম স্ত্রীর হারিয়ে যাওয়া মেয়ে বলে আপনি হিতেনবাবুকে কনভিনসড করেছিলেন। দিনের পর দিন সুপরিকল্পিত পথে ওঁর বিশ্বাস আপনি এনেছিলেন শ্যামলীর প্রতি। এমন কি হিতেনবাবুর পোর্ট্রেট আঁকিয়ে শ্যামলীর ঘরে রাখতে বলেছিলেন এবং শ্যামলী নামে হতভাগিনী পিতৃমাতৃ পরিচয়হীনা ক্যাবারে গার্লটিকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সে তা টের পায়নি। কিন্তু সুটিঙে গিয়ে পিকনিকের পরদিন সে ফুলটা কুড়িয়ে পেল, পরিচালক অতীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে পার্থকুমার তা জানল এবং আপনাকে জানাল। অমনি আপনি শ্যামলী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে শ্যামলী যখন আপনার ব্রাউন রঙের কোটের বাটনহোলে একই প্রিন্স অ্যালবার্ট গোলাপ দেখে মারাত্মক প্রশ্ন করে বসল—দ্যাট ওয়াজ ইন দা ইভনিং অফ টোয়েনটি ফিফথ—শ্যামলী তারপরই আমার কাছে যায়—মিঃ মজুমদার, আপনি দেখলেন শ্যামলী আপনাকে চিনে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার—সে পার্থকে ফোনে জানিয়ে দিল যে এ বিয়ে হবে না। শ্যামলী ক্যাবারে গার্ল হলেও সে অর্থলোভী হৃদয়হীনা ছিল না। আমি তাই তাকে বারবার কোমল হৃদয়া বলেছি। মিসেস সেনের বাড়িতে আপনি আমার নাম গোপন করে ডেকে পাঠান ওকে। শ্যামলী তক্ষুনি চলে যায়। কেন যায় শ্যামলী? শুধু আমি ডাকছি বলে নয়—সে মিসেস সেনকে তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় না, উইলে যাই থাক্—একথা বলতেই যায়। শ্যামলী ছিল ভীষণ ভাবপ্রবণ মেয়ে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, গিয়ে আপনার ফাঁদে পড়ে যায়। আপনি মিসেস সেনের ছদ্মবেশে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছিলেন ওঁর জন্যে।

—মিথ্যা! সব জঘন্য মিথ্যা! আমি একজন লইয়ার! আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব!

—পর্দার আড়াল থেকে ডাক্তার অমরেশ আপনাকে খুন করার পর পালাতে

দেখেছেন, সুশান্তবাবু। আপনি গরাদবিহীন ফ্রেঞ্চ জানলা গলিয়ে চলে গেলেন। আপনার হাতে কালো শাড়িটা ছিল। আপনি বাথরুম থেকে পোশাক বদলেই লাইব্রেরিতে ঢোকেন। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য, তাড়াতাড়িতে আপনার ব্রাউন কোটটা পরার সময় পাননি। আলমারির পিছনে ফেলে রেখেছিলেন। পরে—মানে, এখনই বেরোতে চাচ্ছিলেন কোটটা এক সুযোগে নিয়ে আসতে। কারণ গতকাল পুলিশ ছিল বাড়িটাতে—আজ নেই। এবং আজই ভোরে ঝাড়ু দিতে গিয়ে জগন্নাথ কোটটা আবিষ্কার করেছে। সুশান্তবাবু, বিলাসপুরে মিঃ সেনের ডেডবডির কাছে পড়ে থাকা ফুলে আপনার কোটের একটা ফাইবার জড়িয়ে রয়েছে—ওটা চুল নয়, আঁশ।

সুশান্তবাবুর মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। দুহাতে একটা চেয়ারের পিছনদিক ধরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—কিন্তু—বাট ইউ আর রং। পিকনিকের দিন সন্ধ্যায় আমি মিসেস সেনের আর অমরেশ ডাক্তারের সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করেছি।

—মোটেও না স্যার। ওঁদের কাছে ছিলেন যিনি—তিনি ফিল্ম অভিনেতা পার্থকুমার। সে সবার শেষে জুটেছিল একা—তখন আপনি মিঃ সেনের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে মোকাবিলা করছেন। আপনার নাম মিসেস সেন জানতেন—সোফার চাকর রাঁধুনীরা সবাই জানত—অমরেশও এসে শুনেছিল, কিন্তু কারো সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আপনার হয়নি। আপনি হিতেনবাবুর বাড়ি কখনও যাননি। কাজ যা কিছু হয়েছে—সব অফিস থেকেই। কাজেই সবার শেষে এমন সময় পার্থকুমার বটতলায় তাঁবুর কাছে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় দিল—যখন মিঃ সেন কুঠিবাড়িতে কী কাজে রয়েছেন। তারপর—

সুশান্তবাবু এবার দৌড়ে আলমারির কাছে গেলেন। চাবি বের করে গর্তে ঢুকিয়েছেন—কর্নেল আচমকা রিভলবার বের করে বললেন—ও চেষ্টা করবেন না মিঃ মজুমদার!

পরক্ষণে হুড়মুড় করে বাইরে থেকে তিনজন পুলিশ অফিসার এসে ঢকে পড়লেন। সবাই সশস্ত্র। চারটে রিভলবারের সামনে সুশান্তবাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন।......

কর্নেল আমাদের কাছে তাঁর ড্রয়িং রুমে বসে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন—হিতেন সেনের স্ত্রীর মৃত্যুর অনেকবছর পরে ঘটনাচক্রে এয়ারহোস্টেস স্বাগতার সঙ্গে পরিচয় এবং প্রেম হয়। বিয়ের সিদ্ধান্তে আসতে বহুদিন লেগে যায়। এদিকে হিতেনবাবুর একমাত্র মেয়ে তিনবছর বয়সে হারিয়ে গিয়েছিল। আর ছেলেপুলে হয়নি প্রথমা স্ত্রীর। অনেক চেষ্টাতেও হারানো মেয়ের সন্ধান পাননি। যাই হোক, স্বাগতার প্রসঙ্গে আসি এবার। স্বাগতার সঙ্গে বিয়ে রেজেস্ট্রি অবশেষে হল। গত সেপ্টেম্বর মাসের দশ তারিখে—বোম্বেতে। হিতেনবাবু একা

কলকাতা ফিরলেন। স্বাগতার চাকরির ব্যাপারে তক্ষুনি ছেড়ে দেওয়ার কিছু বাধা ছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বিমান দুর্ঘটনায় স্বাগতার মুখের একটা দিক পুড়ে বিকৃত হয়ে যায়। হৃদয়বান মানুষ হিতেন সেন বোম্বে গিয়ে অনেক খরচা করেও প্লাস্টিক সার্জারিতে কাজ হল না। অ্যালার্জি শুরু হল। অগত্যা ফের অপারেশান করে বিকৃত মুখ নিয়েই দাম্পত্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্বাগতাকে চলে আসতে হল গত নভেম্বরে—স্বামীর সঙ্গে। মুখটা সবসময় ঢেকে রাখতে অভ্যাস করলেন ভদ্রমহিলা!

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলতে শুরু করলেন—অত খুঁটি-নাটি না বললেও চলবে। সবটা তো তোমরা অনুমান করতে পারছ। মুখ পোড়ার পর থেকে স্বাগতার একটা গুরুতর মানসিক প্রতিক্রিয়াজনিত ভাব প্রকাশ হতে থাকে। সে দজ্জাল হয়ে ওঠে। কথায় কথায় স্বামীকে লাঞ্ছিত করে। হিতেনবাবু ক্রমশ তার ব্যবহারে চটে গেলেন। বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল গত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে সুশান্ত মজুমদার বোকা সরল মেয়ে শ্যামলীকে হাত করে টোপ ফেলে আসছিলেন। ২১ তারিখে উইল রেজেস্ট্রি হল। স্ত্রীকে যখন ডিভোর্সই করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—তখন বেশি কী আর দেবেন হিতেনবাবু! নেহাত হৃদয়বান মানুষ বলে কিছু দিলেন উইলে। এ মাসের অর্থাৎ মার্চের মাঝামাঝি যে ভাবে হোক—আমি জানি না, জানতেও আর পারব না—হিতেনবাবু সুশান্ত মজুমদারের চক্রান্ত টের পেয়ে যান। হয়তো শ্যামলীই বেফাঁস কিছু বলে থাকবে—যাতে সুশান্তবাবুর সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়ে হিতেনবাবুর কাছে। কিন্তু নতুন উইলে শ্যামলীকে বঞ্চনা করতে চাননি। কারণ হারানো মেয়ের জন্য স্নেহ ততদিনে শ্যামলীতে কিছু ঘন হয়ে উঠেছিল অভ্যাসের ফলে। যাই হোক, তিনি ঠিক করলেন পিকনিকের দিন শ্যামলীও উপস্থিত থাকবে এবং নতুন উইল পড়ে শোনানো হবে।

আমি এসময় বলে উঠলাম—কর্নেল, ২১ ফেব্রুয়ারি উইল রেজেস্ট্রির পর দিনই শ্যামলীর সঙ্গে পার্থের বিয়ের পার্টি হয়েছিল। তা হলে দেখছি—

—রাইট। পার্থ হচ্ছে সুশান্ত মজুমদারেরই ছেলে। বাবার সঙ্গে থাকে না। একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিরও বটে। কিন্তু তা হলেও ছেলে তো বটে! সুশান্তবাবু ওকে বলেছিলেন—শ্যামলী সম্পত্তি পাচ্ছে—তার সঙ্গে প্রেম ও বিয়ে পার্থর পক্ষে মঙ্গল। নিজেই ছবি করতে পারবে। পার্থ রাজি হয়—সিনেমাই তার জীবন। এবার আমরা বিলাসপুরের কুঠিবাড়িতে যাই। মিসেস সেন, মিঃ সেন ও অমরেশ এক গাড়িতে, অন্য গাড়িতে জিনিসপত্র, জগন্নাথ, হরিয়া, ঘনশ্যাম এবং ড্রাইভার সুরেন্দ্র। মিঃ সেন চলে গেলেন ওঁর কাছে। তাঁবুর কাছে মিসেস সেন আর অমরেশ এবং সুরেন্দ্ররা থাকল। মিঃ সেন ও মজুমদার ঢুকলেন কুঠিবাড়িতে। একটু পরেই পার্থ বাবার মতো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি পরে চলে এল তাঁবুর কাছে—সে এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষা করছিল কুঠিবাড়ির পিছনে—সম্ভবত গাছপালার

আড়ালে। সে নিজের পরিচয় দিল মিঃ সুশান্ত মজুমদার বলে। গল্পে গল্পে জমিয়ে তুলল। ওদিকে কুঠিবাড়ির ঘরে নাটক চলছে তখন। নাটকটা ঠিক কী রকম—বলা কঠিন। তবে লেটেস্ট তদন্ত থেকে আমার ধারণাই প্রমাণিত হয়। সুশান্তবাবু মিঃ সেনকে আচমকা রিভলবার বের করে গুলি করতে যাচ্ছিলেন—কিংবা অন্য কোনভাবে আক্রমণ করেছিলেন, মিঃ সেন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন তখনকার মতো। ওঁর রাইফেলটা ঘরেই কোথাও রেখেছিলেন—বের করে আনতে আনতে নিশ্চয় সুশান্তবাবু তখন ভোঁ দৌড়। নদীর ধারে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়েই পালালেন। মিঃ সেন রাইফেল হাতে বেরোলেন। ঠিক সেইসময় কাকগুলো তাড়া খেয়ে উড়ে যাচ্ছে। ধূর্ত পার্থ সুযোগটা নিল। জগন্নাথ বলেছে—সে ওই সময় বলে ওঠে, কী কাণ্ড! মিঃ সেন কাকের ওপর রেগে গেলেন দেখছি! কাক মারতে দৌড়চ্ছেন! সবাই এই বাক্যে ধারণা দাঁড় করায়—হ্যাঁ, মিঃ সেন কাক তাড়া করে যাচ্ছেন। পার্থ নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। যাই হোক, ওদিকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন প্রাণভয়ে ভীত সুশান্তবাবু। আর সেই ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে বুলেট-ভরা রাইফেল হাতে এদিক-ওদিক তাঁকে খুঁজছেন হিতেন সেন। সুশান্তবাবুর নার্ভ শক্ত। সুযোগটা নিলেন। আচমকা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লেন। ধস্তাধস্তি হল। তারপর যেভাবেই হোক গুলি বিঁধল মিঃ সেনের ডানদিকে গলায়—কণ্ঠতালু ভেদ করে বুলেট মগজে বিঁধে হাড়ে আটকে গেল। ওখানে সবাই ভাবলেন—মিঃ সেন কাককে গুলি করলেন। অনেক পরে উদ্বিগ্ন পার্থ সুরেন্দ্রকে নিয়ে খুঁজতে বেরোল। সে আশা করেছিল—বাবার মৃতদেহ দেখবে। কিন্তু দেখল হিতেন সেনের মৃতদেহ।.....

কর্নেল চুরুট ধরালেন। ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি নিয়ে এল আরেক দফা।

বললাম—ওই ফুলটাই অবশ্য শ্যামলী আর সুশান্ত মজুমদারের কাল হল।

ডিটেকটিভ অফিসার সত্যেন্দ্রবাবু বললেন—জানেন? আগাগোড়া কাকের ব্যাপারটায় একমাত্র আমারই কিন্তু সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। কাকচরিত্র নামে প্রাচীন শাস্ত্র পড়েছি—কাক যদি ডাকতে ডাকতে কারো মাথার উপর দিয়ে বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণে যায়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। মিঃ সেনের মাথার ওপর ঠিক এই দিকেই কাকগুলো যাচ্ছিল।

আমি বললাম—তাহলেও কাক সবচেয়ে বোকা পাখি। কোকিলের বাচ্চাকে নিজের ভেবে লালনপালন করে। অথচ কোকিল ইজ কোকিল।

কর্নেল হেসে বললেন—তুমি শ্যামলীর কথা বলছ! দ্যাটস রাইট, ডার্লিং। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট, উইল ইজ উইল—এবং অবশ্যই কোকিল ইজ কোকিল। ঘরবাঁধা তার ভাগ্যে লেখেননি প্রকৃতি। বেচারা শ্যামলী!......

একসঙ্গে কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।